নীললোহিত — সমগ্র

নীললোহিত-সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

নীললোহিত-সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NILLOHIT-SAMAGRAH (Volume IV)

Collected prose writings of SUNIL GANGOPADHYAY
Published by SUDHANGSHU SEKHAR DEY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Rs. 130.00

প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবাশিস রায়

একশো তিরিশ টাকা

ISBN-81-7612-392-7

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

শব্দগ্রন্থক : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

উৎসর্গ

অলোকনন্দা ও অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সূচি

হঠাৎ দেখা

আনন্দ বাগচী-কে

আমার এক বউদির বাড়িতে রেখা নামে একটি মেয়ে রান্নার কাজ করত। মেয়েটি বেশ চটপটে, রান্নাও মোটামুটি ভালোই করে, তা ছাড়া বেশ নির্ভরযোগ্য। বউদিদের বাড়িতে মাছের টুকরো কোনোদিন বেড়ালে খেয়ে যায় না, দুধের কড়া হঠাৎ উল্টে যায় না, খুচরো পয়সাও যখন-তখন হারায় না। রেখার ওপর বাড়ি দেখাশুনোর ভার দিয়ে বউদিরা নিশ্চিন্তে দু'-তিনদিন বাইরে বেড়িয়ে আসে।

আজকাল বাড়ির দাসী বা রাঁধুনীদের নাম আর ক্ষেন্তি, পাঁচির মা কিংবা নীরোবালা ধরনের হয় না। তাদের নাম শান্তি, সন্ধ্যা, রেখা, রমলা ধরনের প্রায় সিনেমার হিরোইনদের মতনই। অনেক বাড়ির চাকরের নাম হয় সুনীল, শক্তি বা তারাপদ।

ঐ রেখার স্বামীর নাম অবশ্য ভবসিন্ধু। রেখা সম্ভবত তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, কারণ লোকটির বয়েস যথেষ্ট বেশি, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, গেরুয়া রঙের ধুতি পরে। প্রত্যেক মাসের ঠিক এক তারিখেই লোকটি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে বসে থাকে। টিনের বাটিতে মুড়ি এবং হাতলভাঙা কাপে চা দেওয়া হয় তাকে ভেতর থেকে।

বেশ কয়েক দিন আমিও লোকটিকে দেখেছি। যে-কোনো কারণে হোক লোকটিকে দেখলেই আমার রাগ হতো। লোকটা নিজের বউয়ের রোজগারের পয়সা হাতিয়ে নেবার জন্য ঠিক প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে এসে হাজির হয়। লোভীর মতন মুখ!

স্বামীর রোজগারে স্ত্রীদের সংসার চালানোর ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কিন্তু স্ত্রীর রোজগারে স্বামীর সংসার চালানোটা আমরা এখনো ঠিক মতন মেনে নিতে পারিনি। রেখা সারা মাস পরের বাড়িতে খাটে, আর তার স্বামী সারা মাস গাঁয়ে থেকে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, আর মাস পয়লায় ছুটে আসে টাকার লোভে। ব্যাপারটা ভাবলেই গা কিটকিট করে! সব ধর্মের বিয়ের মন্তরেই আছে, স্বামীই স্ত্রীর ভরণপোষণ করবে—তা যদি না পারে তাহলে লোকটা বিয়ে করেছে কেন?

বউদি রেখাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্বামী গ্রামে কি করে? কাজ-টাজ করে না?

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই রেখা লজ্জা পায়। মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বালিকার মতন হাসে। যদিও বছরে ক'দিনই বা সে স্বামীসঙ্গ পায়?

যাই হোক, তার স্বামী একটু সাধু প্রকৃতির। আগে প্রায়ই সে এদিক-ওদিক চলে যেত। এখন তবু কয়েক বছর যে বাড়িতেই স্থায়ী হয়ে আছে, সেটাই রেখার পরম সৌভাগ্য। নিজেদের জমি-জায়গা সব বেহাত হয়ে গেছে, পরের জমিতে দিনমজুরি করতে তার মানে বাধে। সে এখন সাপের বিষের টোটকা আর ভূত ঝাড়ার মন্ত্র দিয়ে কখনো-সখনো দু'-চার টাকা রোজগার করে মাত্র। ওদের একটি আট ন'বছরের মেয়ে আছে, সে থাকে বাবার কাছেই।

এক সময় কলকাতার অধিকাংশ বাবুদের বাড়ির রান্নাঘরেই দেখা যেত ওড়িশা বা মেদিনীপুরের ঠাকুরদের। এখন বোধ হয় ঐ সব জায়গায় সাধারণ লোকদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, কিংবা তারা অন্য জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। সেই তুলনায় দরিদ্র হয়ে গেছে চব্বিশ পরগণা। কারণ এখন অধিকাংশ কাজের লোক, অর্থাৎ ঝি-চাকর রাঁধুনী-ঠাকুর আসে চব্বিশ পরগণা থেকে। এদের মাসিক মাইনে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি হয় না। মাত্র চল্লিশ টাকায় রেখার স্বামী ভবসিন্ধু তার মেয়েকে নিয়ে কি করে সারা মাস চালায়, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বাবুদের ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স কিছুটা অন্তত বাড়ে, কিন্তু ঝি-চাকরদের মাইনে বাড়ার কোনো নিয়ম নেই। নেই বছর বছর ইনক্রিমেণ্ট কিংবা পুজো বোনাস। দামি সুট আর গলায় টাই বেঁধে, মুখে ফরফরে ইংরিজি বলা যে-বাবুটি রোজ অফিস যান, তিনিও যে আসলে চাকরিই করেন সেটা ভুলে যান, নিজেকে চাকর না ভেবে তিনি বাড়ির চাকরকেই ভাবেন চাকর। এই রকমই চলে আসছে।

গত তিন-চার বছরের মূল্যবৃদ্ধির ছাপ পড়তে দেখেছি রেখার স্বামী ভবসিন্ধুর ওপর। লোকটা আরো রোগাটে হয়ে গেছে, চুপসে গেছে গাল, পরনের গেরুয়া ধুতিটি শতচ্ছিন্ন। আগে সে মুখ ফুটে কিছু চাইত না, এখন সে সিঁড়িতে বসে চা আর মুড়ি শেষ করার পর খুব নিরীহ গলায় বলে, আর একটু চা হবে? বোধ হয় মাসে একবারই সে চায়ের স্বাদ পায়।

সারা বছরে রেখা ছুটি প্রায় নেয়ই না। কখনো সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেলে তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসে। বুঝতে পারি কারণটা। বাবুদের বাড়িতে তার দু'বেলার খাওয়াটা অন্তত বাঁধা। দেশে থাকলে, তার সামান্য রোজগারের টাকা তার নিজের খাদ্যের জন্যও খরচ করতে হয় যে।

একবার রেখা দেশ থেকে ফিরে এসে বউদিকে অনুরোধ করল, তার স্বামীর

জন্য একটা কাজ খুঁজে দিতে। বুঝলাম, ওরা একেবারে অভাবের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। রেখার সন্ন্যাসী স্বভাবের স্বামীও এখন খিদের জ্বালায় অহংকার ছাড়তে বাধ্য।

আমাদেরই এক চেনাশুনো বাড়িতে ভবসিন্ধুর কাজ খুঁজে দেওয়া হলো। দু'-চারদিনেই মানিয়ে নিল ভবসিন্ধু। খবর পেলাম, তার মনিবরা তার ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট, যদিও কাজ সে ভালো পারে না, হাঁটা চলা করে আস্তে আস্তে, কিন্তু লোকটি নরম সরম প্রকৃতির, সব কথা মন দিয়ে শোনে, এবং অসৎ নয়। সে বাড়িতেও বেড়ালে মাছ ভাজা খেয়ে যায় না, দুধের কড়াই ওল্টায় না। রেখার সঙ্গে তার স্বামীর এখন ঘনঘন দেখা হয়—এই ব্যাপারটাতে আমরা সবাই স্বস্তি বোধ করি।

কয়েকদিন বাদে দেখি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়িতে একটি আট-ন'বছরের মেয়ে বসে আছে। মলিন, ছেঁড়া ফ্রক পরা, অসম্ভব ভীতু ভীতু মুখ। শুনলাম, সে রেখার মেয়ে। সে আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাবা-মা দু'জনেই কাজ করতে চলে আসায়, সে বাড়িতে একলা থাকতে পারে না। চব্বিশ পরগণার কোন সুদূরপ্রান্ত থেকে মেয়েটি একলা ট্রেনে চেপে বিনা টিকিটে চলে আসে। সিঁড়িতে বসে কাঁদে।

একে নিয়ে এখন কি করা হবে? আমার মা-বউদিরা খুব চিন্তায় পড়ে যান। ঐটুকু মেয়েকে দিয়ে কোনো বাড়ির কাজ করানো একটা অমানবিক ব্যাপার, আমার মা-বউদির তাতে ঘোর আপত্তি। এমনি তাকে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জায়গাই বা কোথায়! সারা দিন রান্নাবান্না করার পর রেখা রাত্রে রান্না ঘরেই ঘুমোয়। মেয়েটা সারা দিন থাকবে কোথায়? তাছাড়া আর একটা অসুবিধেও আছে। ভবসিন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যদি একজনও কেউ না থাকে, তা হলে দু'দিনেই সে বাড়ি লোপাট হয়ে যাবে। আত্মীয়স্বজনরাই খুলে নিয়ে যাবে জানলা-দরজা। রেখা আর ভবসিন্ধু প্রথম প্রথম মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তারপর ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তবু মেয়েটি হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে। ঐটুকু মেয়ে কি করে রাত্তিরবেলাতেও একটা বাড়িতে একা থাকবে, সেটা আমরাও কেউ বুঝে উঠতে পারি না।

আড়াই মাস সার্থক ভাবে কাজ করার পর ভবসিন্ধু তিন দিনের ছুটি চাইল। সেই সঙ্গে রেখাকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। দু'জনে গিয়ে গ্রামের বাড়ি এবং মেয়ের একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। মেয়ে রোজ খেতে যায় তার মামার বাড়িতে, সেখানেও দিয়ে আসতে হবে টাকাপয়সা।

দুই বাড়ি থেকেই এই ছুটি মঞ্জুর করা হলো। আড়াই মাস বাবুদের বাড়িতে

ভালো মন্দ খেয়ে ভবসিন্ধুর এখন স্বাস্থ্য আবার ফিরেছে। তাদের স্বামী-স্ত্রীকে এখন বেশ সুখী সুখী দেখায়।

যাবার আগে রেখা আমার বউদির কাছে একটা বিনীত আবেদন জানাল। যদি তাদের দুশো টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়, তা হলে তাদের মহা উপকার হবে। তারা স্বামী-স্ত্রীতে এই কদিনে দেড়শো টাকা জমিয়েছে, তাদের একটা তিন বিঘের ধান জমি বন্ধক দেওয়া আছে তিনশো টাকায়ঃ সেই জমিটা এখন ছাড়াতে না পারলে একেবারেই গোল্লায় যাবে। ঐ দুশো টাকা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেওয়া হবে। রেখা আমার বউদির পায়ে হাত দিয়ে সজল নয়নে বলল, বউদি, আমাদের এই উপকারটা করুন। আমরা সারা জীবন আপনার পা-ধোওয়া জল খাব!

আমার বউদি একটু দয়ালু প্রকৃতির, অল্প কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তবু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিতে লাগল, ওরা যদি আর না ফেরে? রেখা আমার মায়ের পা ছুঁয়ে বলল, আমি ভগমানের নামে দিব্যি করে বলছি মা, ঠিক চারদিনের মাথায় ফিরে আসব। ভোরের ট্রেনে এসে রোববার সকালে আপনাদের আমিই চা বানিয়ে দেব।

সেই রবিবার পেরিয়ে আর একটা রবিবার ঘুরে এল, কিন্তু রেখা আর ভবসিন্ধু ফিরে এল না। বউদি মনে একটা দারুণ আঘাত পেলেন। দুঃখ থেকে জ্বলে উঠল রাগ। বউদি বললেন, পুলিস দিয়ে ওদের আমি ঠিক ধরে আনাবো। ওদের জেল খাটাবো! শুধু দুশো টাকার জন্যই নয়, ওরা যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, এটাই বউদির সাঙ্ঘাতিক লেগেছে। তা হলে কি কোনো মানুষকে আর বিশ্বাস করাই যাবে না? বউদি রাগে একেবারে গনগন করছেন। একটা কিছু ব্যবস্থা নিতেই হয়।

আমার দাদা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির ঝি-চাকরদের ব্যাপার নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামান না। সব শুনেটুনেও তিনি বই থেকে চোখ না তুলে বাঁ হাতের ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, ওসব আমি জানি না, ওসব আমি জানি না।

অগত্যা আমারই ওপর তদন্তের ভার পড়ল। ভবসিন্ধুদের গ্রামের নামটা শুধু জানা, সেটা কোথায়, তা কেউ জানে না। বোধ হয় ক্যানিং-এর কাছাকাছি কোথাও। আমি চতুর্দিকে টো-টো করে ঘুরে বেড়াই, আমার পক্ষে একটা গ্রাম খুঁজে বার করা এমন কিছুই শক্ত নয়। একদিন সকালে ক্যানিং-এর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

ট্রেনের জানলার ধারে বসে আমি ভাবতে লাগলাম, ওদের না ফেরার কারণটা কি হতে পারে? রেখা আর ভবসিন্ধু দু'জনেই বেশ সৎ, কোনোদিন চুরিচামারি করেনি। সামান্য দু'শো টাকার লোভ তারা সামলাতে পারল না? ভবসিন্ধু না হয়

আগে চাকরি করেনি, কিন্তু রেখা তার এতদিনের চাকরিটা এমনি করে হারাবে? কী লাভ এতে?

হয়তো এমনও হতে পারে, তিনশো টাকা দিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে ওদের মাথায় অন্য একটা চিন্তা এসেছে। আজকাল তিন বিঘে জমিতে, একটু পরিশ্রম আর যত্ন করলেই, অন্তত পঁয়তাল্লিশ মন ধান পাবার কথা। সেই ধানে ওদের সারা বছর চলে যেতে পারে। ওরা স্বামী- স্ত্রীতে নিশ্চয়ই ভেবেছে, পরের বাড়িতে চাকর-রাঁধুনি থাকার বদলে ওরা আবার চাষী হবে। ওরা থাকবে নিজেদের বাড়িতে, গড়ে তুলবে নিজেদের সংসার, ছোট মেয়েটি সঙ্গ পাবে মা-বাবার। এই তো স্বাভাবিক জীবন। অথচ যেন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নও চোখের সামনে এলে সামান্য দুশো টাকার গ্লানি এমন আর কি? হয়তো ওরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে, এক বছর—দু'বছর বা যতদিন বাদেই হোক, বউদির কাছে গিয়ে ওরা সেই টাকা ফেরত দিয়ে আসবে? যদি আমি গিয়ে ওদের এই অবস্থায় দেখি, তাহলে নিশ্চিত ওদের ফিরে আসতে বলব না।

ক্যানিংয়ের কাছে সেই গ্রাম আর ভবসিন্ধু সাপুই-এর বাড়ি খুঁজে বার করতে আমার বিশেষ কষ্ট পেতে হলো না। একটা ময়লা ডোবার পাশ দিয়ে অতি সরু রাস্তা, তার দু'পাশে খান চার-পাঁচ বাড়ির মধ্যে একটি ভবসিন্ধুর। বাড়ি মানে একটাই খড়ের ঘর, ছোট্ট উঠোন, তারই মধ্যে বেগুন আর লঙ্কার চাষ হয়েছে। বাড়ির সামনে কিছু এঁটো কলাপাতা পড়ে আছে, মনে হয় দু'-একদিন আগে এ বাড়িতে অনেক লোক খেয়েছে।

ভবসিন্ধু আর রেখা দু'জনেই উঠোনে ছিল। ঘরের দাওয়ায় বসা আর দু'চারটি গ্রাম্য বুড়ো। কিসের যেন একটা তুমুল আলোচনা চলছিল, তার মধ্যে আমি একটা উৎপাতের মতন এসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে রেখাই ভয় পেয়ে গেল বেশি, একটাও কথা না বলে, যেন আত্মরক্ষা করার জন্যই ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ভবসিন্ধুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়, আমার মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল, পেছনে আরো লোকজন এসেছে কিনা।

ওর ভয় ভাঙাবার জন্য আমি বসলাম। তারপর বললাম, তোমাদের অসুখ-বিসুখ হয়েছে কিনা সেই খবর নিতে এলাম। আমার মা পাঠিয়ে দিলেন।

আচমকা ভবসিন্ধু হাউমাউ করে কেঁদে উঠে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে লাগল। সব কথার মানেই বোঝা যায় না। অতিকষ্টে এইটুকু উদ্ধার করলাম, সে আজই যাচ্ছিল আমাদের খবর দিতে, তাদের অনেক বিপদ গেছে এই ক'দিনে, মেয়েটার অসুখ, তারপর রেখাকে আবার ভূতে ধরেছিল, তার জন্য খরচপত্র

করতে হলো—আমার যদি বিশ্বাস না হয় তো আমি ঐ গ্রাম্য বুড়োদের জিজ্ঞেস করতে পারি...ইত্যাদি।

ভবসিন্ধুর হাঁকডাকে রেখা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমাকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এসে টাস করে পড়ে গেল মাটিতে, গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল—যেন এখনো তাকে ভূতে ধরে আছে।

একটু পরে আমি ভবসিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, জমিটা ছাড়ানো হয়েছে?

সে আবার কেঁদে ফেলে বলল, না বাবু, হলো নি, জমি আমার ভাগ্যে নেই, টাকাপয়সা সব বেইরে গেল, যেমন কপাল করে এয়েচি, আবার সর্বস্বান্ত...

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হায় স্বপ্ন। আমি ভেবেছিলাম, ওরা ঝি-চাকরের কাজ ছেড়ে আবার চাষী হবে! রেখাকে ভূতে ধরেছে ঠিকই। তবে একটা ভূত নয়, পাঁচটা ভূত। পাঁচ ভূতে ওদের টাকা লুটেপুটে নিয়েছে!

২

সকালবেলা খবরের কাগজ সহযোগে চা-টোস্ট নিয়ে বসেছি টেবিলে, হঠাৎ এক সময় বাইরের বারান্দায় দুটি চড়ুই পাখির ব্যাকুল ডাক শুনতে পেলাম। আমি ছাড়া এই ডাক আর কেউ শুনতে পায় না। বাড়ির অন্যান্যরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত, চড়ুই পাখির ডাক শোনার সময় নেই কারুর।

আমি কান খাড়া করে রইলাম। যদিও চোখটা খবরের কাগজের দিকে, কিন্তু মনোযোগ বাইরে।

চড়ুই পাখি দুটো অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে, তার মাঝখান থেকে ভেসে এল একটা কাকের গম্ভীর মোটা গলার ডাক, ক-অ-অ, ক-অ-অ।

এবাব বুঝতে পারলাম। উঠে এলাম বাইরে। চড়ুই পাখি দুটো ওপরের দিকে মুখ তুলে আরো জোরে চ্যাঁচাতে লাগল। আমি বারান্দার ওপরের দিকে দেখলাম। ঘুলঘুলির কাছে একটা কাক এসে বসেছে, ভেতরে ঠোঁট গলিয়ে বিশ্রীভাবে ডাকছে।

ঘুলঘুলিটার মধ্যে চড়ুই পাখির বাসা, কাকটা এসেছে বাচ্চা চুরি করতে। হাত উঁচু করে হুস হুস শব্দ করলাম। কাকটা রক্তচক্ষে আমার দিকে তাকাল। ঠিক জলদস্যুর মতন তার চেহারা।

আমি দু'-চারবার কাকটার দিকে কাল্পনিক ইঁট ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করতে কাকটা নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়ে গিয়ে খুব কাছেই একটা বিজলি-দণ্ডের ওপর

বসল, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। চড়ুই পাখি দুটো তাদের বাসায় উড়ে গিয়ে অন্যরকম স্বরে ডাকতে লাগল।

আমি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। খাবার ও খবরের কাগজে যেই একটু মনঃসংযোগ করেছি, আবার বাইরে থেকে ভেসে এল চড়ুই পাখির বিপন্ন ডাক। ফের উঠে এলাম বাইরে। কাকটা আবার ঘুলঘুলির কাছে এসে বসেছে, ঠোঁট দিয়ে ভেতরে খোঁচাচ্ছে।

যতই রাগ হোক কাককে মারা যায় না। কাক মারা যে কত বিপজ্জনক তা সবাই জানে। সুতরাং ঘর থেকে একটা পাঁউরুটির টুকরো এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলাম রাস্তায়। কাকটা এবার সেই দিকে উড়ে গেল। চড়ুই পাখি দুটো ডাকতে লাগল টি-টি-টি-টি, টি-টি-টি-টি...

আমি মোটমাট তিনটে পাখির ভাষা জানি। চড়ুই, কাক আর শালিক। প্রায় প্রত্যেকদিন সকালেই আমার কিছুটা সময় এদের নিয়ে কাটে।

মানুষের সঙ্গে কয়েকটা পশুপাখি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। পশুর মধ্যে যেমন বেড়াল আর কুকুর। বইতে পড়েছি, প্রাগৈতিহাসিক আমলে মানুষ যখন জঙ্গলের বড় বড় হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ঘাসবনে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই সময় থেকেই কুকুর তার সঙ্গী হয়। কুকুর আসলে নেকড়ে জাতীয় প্রাণী। মানুষ তার আগে পর্যন্ত অন্যান্য বাঁদরদের মতন ছিল নিরামিষাশী। ঘাসবনে এসে বাধ্য হয়ে তাকে আমিষ খেতে হয়, সেখানে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ সহজে মেরে খাওয়া যায় বলে। নেকড়েও ঘাসবনের প্রাণী, কিন্তু মানুষ এসে তার শিকারে ভাগ বসাবার পর সে বেচারারা কিছুদিন চুরি-ছ্যাচড়ামির চেষ্টা করল, তারপর বুদ্ধিমানের মতন বশ্যতা স্বীকার করে নিল, তারা হয়ে গেল মানুষেরই শিকারের সঙ্গী। নিজেরা খাওয়ার পর মানুষ যে এঁটো-কাঁটা-হাড় ছুড়ে ফেলে দেয় তাই খেয়েই ওরা সন্তুষ্ট।

মানুষ যখন সভ্য হলো, শিকারের অভ্যেস কমে গেল, তখনও এই নেকড়ে জাতীয় প্রাণীটি মানুষের সঙ্গ ছাড়ল না। বাৎসল্য, অপুত্রকের নিঃসঙ্গতা আর অপরের প্রতি হুকুম করার লোভ—মানুষের এই তিনটি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কুকুর নিরাপদ স্থান পেয়ে গেল মানুষের বাড়ির আশেপাশে। বিরাট আকারের কুকুরের গলায় শেকল বেঁধে যারা সকালবেলা বেড়াতে যায়, মনস্তাত্ত্বিকদের মতে তারা আসলে অপরের ওপর প্রভুত্ব করার শখটা সেই সুযোগে মিটিয়ে নেয়।

এত হাজার হাজার বছরের সংসর্গেও মানুষ কিন্তু কুকুরের ভাষা শিখতে পারেনি। বরং কুকুরই অনেকটা মানুষের ভাষা শিখে নিয়েছে। বিশেষত ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যাপারে তাদের বেশ একটা ঝোঁক আছে। সাহেবের চাকরের মতন

কুকুর হুকুম শুনলেই মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, পায়ে এসে মুখ ঘষে এবং রাত জেগে ঘেউ ঘেউ করে।

বেড়াল কি করে মানুষের কাছাকাছি এসেছে, আমি জানি না। বেড়ালও মানুষের বাৎসল্যের সুযোগ নেয়। কিন্তু লক্ষ করে দেখেছি বেড়ালের প্রতি মেয়েদেরই দুর্বলতা বেশি, পুরুষদের খুব ক্বচিৎ। পুরুষের দুর্বলতা না থাকার কারণ বোধহয় এই, বেড়াল নরম ও দুর্বল প্রাণী, তার ওপর হুকুম ফলিয়ে ঠিক সাধ মেটে না।

ইঁদুর আর ছুঁচোও মানুষের কাছাকাছি থাকে বটে, কিন্তু মানুষ এদের পছন্দ করেনি কোনোদিন। তবু যে এত হাজার হাজার বছর ধরে এরা টিঁকে আছে, সেটাই আশ্চর্য। ভারতের সব ইঁদুর মেরে ফেলতে পারলে নাকি আমাদের শস্য ঘাটতির অনেকখানিই সুরাহা হয়। সাঁওতালদের মুখে শুনেছি ইঁদুরের মাংস অতি সুখাদ্য, আমি অবিশ্বাস করিনি—যদিও সভ্য সমাজে আজও ইঁদুরের মাংস চালু হলো না! সাহেবদের একবার কোনোক্রমে ধরিয়ে দিতে পারলে হয়! আমি ইঁদুরের মাংস এখনো চেখে দেখেনি, কিন্তু ব্যাঙ খেয়েছি। সাহেবদের মধ্যে এখন ব্যাঙ খাওয়ার হুজুগ বেড়েছে বলে আমাদের গ্রাম দেশ থেকে ব্যাঙ প্রায় উজাড় হতে বসেছে।

আর একটি যে প্রাণী মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই শয়ন ঘরে যার স্থান, সেই টিকটিকির সঙ্গে মানুষের আজও কোনো বোঝাপড়া হলো না! মানুষ তাদের থাকতে দিয়েছে বটে, কিন্তু কোনো টিকটিকি মানুষের পোষ মানে না!

পাখিদের মধ্যে কাক-শালিক-চড়ুই ছাড়াও আরো কয়েকটি পাখি থাকে আশেপাশে। যেমন পায়রা। পায়রা একটু উদাসীন জাতের পাখি, কারুর সাতে পাঁচে থাকে না। পায়রার চোখের দৃষ্টি সব সময় বিস্ময়পূর্ণ। সেইজন্যই বোধহয় এই পাখিটা এত সুন্দর। গোলা পায়রাগুলো বাসা বাঁধে মানুষের বাড়িতে, কিন্তু আর কোনো ব্যাপারেই মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের ওপর তাদের এই বিশ্বাস কোথা থেকে এল কে জানে! ভাগ্যিস, মুরগির মতন পায়রার মাংস খাওয়ারও চল হয়নি। যদিও পায়রার মাংস মোটেই অখাদ্য নয় কাকের মতন।

কলকাতার মতন শহরেও আরো কয়েকটা পাখি থাকে আমাদের কাছাকাছি। আমাদের বাড়ির সামনের শুকনো খটখটে মাঠে রোজই কয়েকটা সাদা রঙের বক এসে বসে। যদিও ওদের জলের ধারেই থাকার কথা। ডালহাউসি স্কোয়ারে বা ময়দানে দেখেছি ঝাঁকঝাঁক টিয়া পাখি। আকাশের দিকে যে-কোনো সময় তাকালেই দেখতে পাই চিল। কখনো কখনো তারা ছাদের আলসেতে এসেও বসে। পশু জগতে যেমন ঘোড়া তেমনি পাখি জগতে চিলের মতন এমন নিখুঁত স্বাস্থ্যবান

শরীর আর কারুর নেই। চিলের থেকেও বড় পাখি শকুন, কিন্তু কী রকম যেন হ্যালবেলে চেহারা, দেখলে ঘেন্না করে। শকুন আর হাড়গিলে একই পাখি কিনা আমি জানি না, কলকাতা পুরসভায় প্রতীক চিহ্নে আছে হাড়গিলে—শহর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে ওদের দানের স্বীকৃতি।

চিল বোধহয় আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। আগে রাস্তায় ঘাটে ছোট ছেলেদের হাতে খাবারের ঠোঙা দেখলেই চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। এখন আর সেরকম ঘটে না। যেমন আগে সন্ধেবেলা দেখতাম, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বাদুড়, কিংবা বেথুন কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাছগুলি বাদুড়ে ভরা থাকত, এখন আর সে রকম দেখি না।

মশাও কি পাখি! তাহলে এর মতন হিংস্র পাখি আর নেই। প্রতিদিন ধারালো সিরিঞ্জ নিয়ে কোটি-অর্বুদ সংখ্যক মশা ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষের ওপর। পৃথিবী থেকে বাঘ-সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও মশার সংখ্যা আরো বাড়ছে। মানুষ এর কাছে অসহায়।

পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই, কিন্তু চড়ুই, শালিক আর কাকদের নিয়ে আমি খানিকটা জড়িয়ে গেছি। আমাদের বাড়ির ঘুলঘুলিতে চড়ুই-এর বাসা। কাক আর শালিকদের সব সময় ফন্দি সেই বাসা থেকে বাচ্চা বার করার। এর মধ্যে শালিকের হিংস্রতাই সবচেয়ে বেশি।

কাকের দোষ এই, তাকে দেখতে খারাপ। তার চোখে সব সময় একটা ধূর্ত ভাব। কিন্তু কাক আসলে বোকা। কাক যখন চড়ুই-এর বাসা থেকে বাচ্চা চুরি করতে আসে, তখন সে চুপ করে থাকতে পারে না। বিশ্রী মোটা গলায় ক-অ-অ, ক-অ-অ করে ডাকে। সেই ডাক শুনলেই আমি বুঝতে পারি। যেখানেই থাকি, উঠে এসে কাকটাকে তাড়িয়ে দিই।

কিন্তু শালিক আসে নিঃশব্দে। শালিকও দেখতে সুন্দর, তার চোখ দুটি যেন কাজল টানা, কিন্তু মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ভরা।

একদিন বারান্দায় এসে দেখি নীচে একটা চড়ুই-এর ডিম ভেঙে পড়ে আছে। দুটো চড়ুই আকুলভাবে ডাকছে। কাছাকাছি কোনো কাক নেই। পাশের এক নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে রাস্তায় এনে এঁটো-কাঁটা ফেলেছে, সেখানে যত রাজ্যের কাকের ভিড়। কাক সর্বভুক বলেই পাখির ছানার উপর বিশেষ কোনো লোভ নেই। কিন্তু শালিক বোধহয় পুরোপুরি মাংসাশী।

পাশের বাড়ির বারান্দায় দুটো শালিক গর্বের সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডাকছে পিড়িরিং, পিড়িরিং! এ ডাকটা একটু অন্য রকম। কাককে ঢিল ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলে তবু একটু উড়ে যায়, শালিক দুটো আমাকে গ্রাহ্যও করল না।

আমাদের বাথরুমে ট্যাঙ্কের ওপর শালিক পাখির বাসা। কাক এসে কখনো কখনো সেখানেও খোঁচাখুঁচি করে। কিন্তু শালিকের সঙ্গে কাকরা পারে না। তিন-চারটে শালিক মিলে তেড়ে গেলেই কাক পালায়। কাক শুধু বোকা নয়, ভীতুও। কয়েকটা শালিক মিলে একটা কাককে বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি।

কিন্তু চড়ুই পাখিরা কারুকে তাড়া করতে পারে না। তারা শুধু অসহায়ভাবে ডাকে। তাদের সেই ডাকটা আমি সহ্য করতে পারি না।

চড়ুই পাখির অনেকরকম ডাক আছে। আস্তে আস্তে সেগুলো আমি চিনে গেছি। খাবার টেবলে বা লেখার টেবলে বসে তাদের টি টি টি টি, টি টি টি টি ডাকটা শুনলেই আমি উঠে বেরিয়ে আসি বাইরে। ঠিক দেখতে পাই কোনো কাক বা শালিক হামলা করছে তাদের বাসায়।

কাকগুলোকে ঠাণ্ডা করার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। চড়ুই-এর বাসায় হামলা করলেই তাদের আমি দু'এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিই। তারা তাতেই খুশি। এখন সকালবেলা দু'তিনটে কাক প্রথমে বারান্দার রেলিং-এ বসে কা-ক-অ, কা-ক-অ করে ডাকতে শুরু করে। তখন বুঝতে পারি, তারা বলছে, তুমি আমাদের খাবার দেবে, না চড়ুই-এর বাচ্চা খাব? তখন আমি তাদের প্রাপ্য খাবাব মিটিয়ে দিই। কিন্তু শালিককে ঠাণ্ডা করি কি উপায়ে? তারা রুটি-ফুটি পছন্দ করে না।

পর পর দু'দিন দুটো ভাঙা চড়ুই-এর ডিম পড়ে থাকতে দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। আমি বাথরুমে একটা টুল নিয়ে গিয়ে শালিকের বাসার সামনে দাঁড়ালাম। ঝটপট দুটো বড় শালিক এসে বসল জানলায়। প্রথমে ভাবলাম, শালিকের বাসা ভেঙে তছনছ করে ওদের ছানাগুলোকে ফেলে দেব রাস্তায়। শালিক দুটো টুচিটুং টুচিটুং করে ডাকছে। এখন আর কণ্ঠস্বরে গর্বের সুর নেই। কাজল টানা চোখে দারুণ ভয়!

আমি তাদের বাসার কাছে হাত নিয়ে গিয়েও থেমে গেলাম। তারপর বললাম, এই দ্যাখো, আমি ইচ্ছে করলেই তোমাদের বাসা ভেঙে ফেলতে পারি! দেখছ তো? কিন্তু ভাঙলুম না। ফের যদি চড়ুই পাখির বাসায় হামলা করো, তাহলে কিন্তু ঠিক...

বারান্দার রেলিং-এ তখনও চড়ুই পাখি দুটো বসা। আমি তাদের বললাম, যাও, আর ভয় নেই, আমি শালিকদের বলে দিয়েছি।

চড়ুই পাখি দুটো ডাকল, চিড়িং চিং, চিড়িং চিং...

আমি ঐ ডাকের মানে জানি।

৩

অমিয়া ঠাকুরকে কী সুন্দর দেখতে। টুকটুকে ফর্সা রং, মাথার চুল ধপধপে, সেই রঙেরই শাড়ি এবং একটি শাল গায়ে জড়ানো। ঠিক যেন অপ্সরী। বয়েস হলো বাহাত্তর-তিয়াত্তর, কিন্তু সময় হেরে গেছে তাঁর কাছে। আমি অমিয়া ঠাকুরকে সামনাসামনি দেখিনি কখনো, একটা বিশাল হলঘরের একেবারের পিছনের সারি থেকে মঞ্চের ওপর তাঁকে দেখে মনে হলো, বহু দিন এমন সুন্দরী আমার চোখে পড়েনি।

তিনি গাইছিলেন, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।' এর মধ্যে 'ব্যাকুল' শব্দটি বড় ব্যাকুল করে দেয়। মুচড়ে ওঠে বুক। মনে হয়, আমারও অনেক কিছু বলার ব্যাকুলতা আছে, কেউ শুধায় না, কেউ শুনতে চায় না। একটু বাদেই আবার সতর্ক হয়ে যাই। এটা তো মেয়েদের গান, এ ব্যাকুলতা তো মেয়েদের। এরকম দুঃখী দুঃখী মরমী আর্তনাদ তো আমাকে মানায় না। তবু কেন আমার নিজের কথা মনে হচ্ছে? গানের এই জাদু কিছুক্ষণ আমাকে বিমূঢ় করে রাখে।

তারপর মনে হয়, এটা তো অমিয়া ঠাকুরেরও মনের কথা হতে পারে না। এ গান লেখা হয়েছিল তাঁরও জন্মের প্রায় পনেরো বছর আগে। সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি যুবক, অত্যন্ত রূপবান, কিন্নর কণ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠদের অতি স্নেহের এবং সমসাময়িক নারীদের অতি প্রিয় রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' নামের পালা লিখে দিয়েছিলেন সখি সমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনয়ের জন্য। পুরোটাই প্রেমের সুখস্বপ্ন, তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে ইচ্ছে করে তৈরি করা দুঃখ ও বিরহ, যা এখনকার পৃথিবীর সঙ্গে একদম মেলে না। তবু আশী নব্বই বছর পেরিয়ে এসেও সেই গান এক বৃদ্ধার কণ্ঠ থেকে মর্মন্তুদ হয়ে ঝরে পড়ে এবং আমার বুকে ধাক্কা মারে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি। বিশাল হলটির প্রায় প্রত্যেকটি চেয়ারই ভর্তি। সকলেই নিঃশব্দ, উৎকর্ণ এবং ব্যগ্র।

সে কি মোর তরে পথ চাহে
সে কি বিরহ গীতি গাহে...

এই জায়গাটা শুনতে শুনতে মনে হয়, আর কারুর নয়, এটা অমিয়া ঠাকুরেরই নিজস্ব কথা, তিনি এক তন্বী কুমারী, একজনের বাঁশীর ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এইমাত্র, তবু মনের মধ্যে এই সন্দেহ, সে-ও কি আমার অপেক্ষায় রয়েছে, আমার দেখা না পেয়ে দুঃখে কেঁদেছে? দূরে ফুলমালা দিয়ে সাজানো মঞ্চ অলীক হয়ে যায়, অত্যন্ত বেশি ভালোলাগার মতন কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথকে আর একবার কুর্নিশ জানাই। খুব ভালো করে বিচার করে দেখতে

গেলে, এই গানটি, এই বিশেষ গানটির বাণীবন্ধন এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নয়, অল্পবয়সের কাঁচা হাতের ছাপ আছে, এবং মূল কথাটি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার করা। তবু এই সামান্য কথা এবং সুর মিলিয়ে মিশিয়ে সত্যিকারের একটা মায়ার খেলা তৈরি হয়ে গেছে, প্রমদা মূর্তিমতী হয়েছে মঞ্চের ঐ বৃদ্ধার মধ্যে, এবং কয়েক হাজার নারী-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয়েছে।

সিগারেট টানার জন্য বাইরে উঠে আসি। এক সাহেবের লেখায় পড়েছিলাম, সত্যিকারের ভালো শিল্পরস একটানা বেশিক্ষণ উপভোগ করা যায় না। চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট পরে মস্তিষ্কের গ্রহণক্ষমতা কমে যায়। মিউজিয়ামগুলো যেমন ভালো ভালো শিল্পবস্তুতে ঠাসা, সব ঘুরে দেখতে তিন-চার ঘণ্টা লাগে, কিন্তু তার অনেক আগেই আমাদের পা ও মাথা ক্লান্ত হয়ে যায়। শেষের দিকের অনেক কিছু শুধু চোখ দিয়ে দেখা হয়, মন দিয়ে নয়। সেই জন্যই বোধহয় সারা রাত্রিব্যাপী গানের জলসায় অনেকেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

চায়ের সঙ্গে সিগারেটের স্বাদ আজ অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ একটু আগে আমি একটা ভালো গান শুনেছি। শিল্পই তো জীবনকে বেশি উপভোগ্য করে তোলে। কাছাকাছি অন্যদের দিকে তাকিয়ে আমার আর একটি কথাও মনে হয়। এখানে যেন কলকাতার আর একটি রূপও দেখতে পাচ্ছি। দু'তিন হাজার লোক এখানে এসেছে একটাই টানে। রবীন্দ্রনাথের গানের এই চুম্বক-শক্তি এখনো আছে, কিংবা দিন দিন বাড়ছে। পৃথিবীর আর কোথাও, শুধু এরকম একজনের গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে শোনবার জন্য এত লোক ছুটে আসে কি? মনে তো হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আর ফ্যাশানের পর্যায়ে নেই, রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতার তেমন স্নবভ্যালু এখন আর নেই। যতটা আছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সমাদরকারীর কিংবা বিদেশী পপ মিউজিক ভক্তের। এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই শ্রোতারা আগে থেকেই জেনে আসে যে এখানে স্থূলরুচি বা লঘুরুচির কিছুই পাবে না। তা হলে এখনো এত লোক আছে কলকাতায় যারা বিশুদ্ধ শিল্পের আনন্দ পেতে ভালোবাসে? কলকাতার জন্য আমার একটু একটু গর্ব হয়।

অনুষ্ঠানটি ছিল শুধু মহিলা শিল্পীদের। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের কোনো ব্যাপার-স্যাপার ছিল বোধহয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নারীর উক্তি, অনেক গান পুরুষের উক্তি। এখানে, সৌভাগ্যবশত, নারীমুক্তি উপলক্ষে একসঙ্গে অনেক নারীর উক্তিমূলক গান শোনা গেল। বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর, গীতা ঘটক থেকে শুরু করে রাজেশ্বরী, সুচিত্রা, কণিকা পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত উজ্জ্বল নারীরা উপস্থিত। ইস, আমার যে-সমস্ত বন্ধুবান্ধবরা কলকাতার বাইরে থাকে তাদের কী দুর্ভাগ্য।

দু'হাতে দুটি চায়ের ভাঁড় নিয়ে একটি সদ্য যুবক হেঁটে গেল আমার সামনে দিয়ে। এখন পাঁচ মিনিটের বিরতি, তাই অনেকেই বাইরে এসেছে। চা-টা এত গরম যে আমি আমার ভাঁড়টা খালি হাতে ধরতে পারছিলাম না, হাতে রুমাল পেতে নিয়েছি—আর এই যুবকটি দু'হাতে দুটো ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছে কী করে? আমি চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। অদূরে থামের আড়ালে দাঁড়ানো একটি মেয়ে, তার হাতে একটি ভাঁড় ন্যস্ত হলো। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উহু-হু করে আঁচল দিয়ে ধরল ভাঁড়টা। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার গরম লাগছে না?

ছেলেটি স্মিত হাস্যে বলল, লাগছে।

—রুমাল দিয়ে ধরো না!

—রুমাল আনতে ভুলে গেছি!

মেয়েটি মৃদু ধমকের সঙ্গে বললে, কী অদ্ভুত! তারপর অন্য হাত দিয়ে নিজের কোমরে গোঁজা ছোট্ট একটা রুমাল বার করে দিয়ে বলল, এই নাও।

কিছুই না ব্যাপারটা! তবু এই সাধারণ দৃশ্যটি আমার চোখে গেঁথে থাকে। ঐ যে যুবক ঐ যে যুবতীর জন্য হাতে ছ্যাঁকা লাগিয়ে চা নিয়ে গেল, এই যে এখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে চেয়ে আছে, যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই—এই চেয়ে থাকা যেন সুন্দরের বিশুদ্ধ প্রতিমা। মনে হয়, এদেরই জন্য কত বছর আগে লিখে গেছেন গান এক কবি, আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!

তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে এলাম। আমি অনেক দিন পরে একই আসরে কণিকা আর সুচিত্রার গান শুনলাম। ছাত্র বয়েস থেকে আমরা এই দুজনের কাছে হৃদয় সঁপে দিয়েছি, তারপর কত বছর কেটে গেল, কিন্তু এই দুজন এখনো চির-নবীনা। কী জানি ওদের বয়েস বেড়েছে কিনা, কী জানি ওঁদের সংসারে আছে কিনা দুঃখকষ্ট-ঝামেলা আমাদের সেসব জানবার দরকার নেই, ওঁরা শিল্পী, আমরা শুধু ওদের কাছে দাবিই করব। সুচিত্রা মিত্রের এখনো চঞ্চলা গতি, তরতর করে এসে ঝপাস করে বসে পড়েন, মুখের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, মাথাটা একটু নীচু করে গান শুরু করেন। সেই ধারালো ঝকঝকে গলা। বিরাট জনসভায়, মিছিলে, কাঠের বাক্স দিয়ে বানানো মঞ্চে—যেখানেই সুচিত্রা মিত্রকে তুলে দেওয়া হোক অকুণ্ঠ গলায় তিনি গান ধরবেন, প্রেরণার মতন ছড়িয়ে পড়ে সেই গান। এক সময় তিনি দেশাত্মবোধক কিংবা দ্রুতলয়ের গানই বেশি গাইতেন, এখন বেশি গান মার্গসুর ঘেঁষা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সুচিত্রা যেন নিজেই নিজের ভাগ্য-বিজয়িনী।

আর কণিকা, খুব নরম ধীর পায়ে আসেন, এখনো যেন লাজুকতা মাখানো

মুখ, সামনের দিকে চোখ তুলে বেশি তাকান না। কণিকা যেন শুধু নারী নন। মূর্তিময়ী নারীত্ব শুধু কবিকল্পনাতেই যাকে দেখতে পাওয়ার কথা। গান শুরু করার সময়ই মনে হয় যেন ওঁর চোখ বুজে যায়। তারপর হঠাৎ আগে সহস্রবার শোনা থাকলেও আবার বিস্মিত করে বেরিয়ে আসে তরল সোনার মতন এক কণ্ঠস্বর। ঐ স্বর যেন এ জগতের নয়। সমস্ত বিরহ সমস্ত দুঃখ দিয়ে গড়া। যে-সব দরজা কোনোদিন হাত দিয়ে খোলা যায় না, ঐ গান সেই সব দরজা খুলে দেয়।

আমাদের কী সৌভাগ্য যে একই সময়ে, একই যুগে আমরা সুচিত্রা আর কণিকার মতন দু'জন গায়িকা পেয়েছি। আজ সন্ধেবেলাটা অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বেঁচে থাকা সার্থক করে দিলেন।

তবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে একটা জিনিস খারাপ লাগে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেও কি এটা চলত? সামনে খাতা খুলে গান করা? আট দশ লাইনের এক একটা গান, তাও দেখে দেখে গাইতে হয়? আমি তো এমন অনেককে চিনি, যারা গায়ক নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গান তাদের মুখস্থ? আমি নিজেই তো শ'খানেক গান মুখস্থ বলে দিতে পারি! তাহলে গায়িকাদের স্মৃতিশক্তি এত খারাপ হয়? কয়েক জন মাত্র খাতা খোলেন না, বেশির ভাগই খোলেন। এটা অন্যায় নয়? শুনতে শুনতে যখন আমাদের মনে হয়, এটা যেন ঠিক গায়িকারই মনের কথা, সেই মুহূর্তেই যদি তিনি খাতা বা বই থেকে পরের লাইনটা দেখে নেন, তাহলে কি রকম যেন রসভঙ্গ হয় না? অনেক গায়ক-গায়িকাই গানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন, সেজন্য তাদের একটু তো খাটতে হবেই, অন্তত একশো-দেড়শো গান নিশ্চয়ই মুখস্থ করতে হবে।

সবচেয়ে অবাক হলাম ঋতু গুহকে দেখে। আজকাল কী সাঙ্ঘাতিক ভালো গাইছেন তিনি, গলায় যেন মন্দিরের কারুকার্য। একই সঙ্গে এত জোরালো ও সুরেলা গলা ইদানীংকালে আর কার? গানের সময় মনে হয় তিনি তন্ময় হয়ে গেছেন, অথচ তাকেও খাতা দেখতে হয়! 'দিন ফুরালো হে সংসারী'র মতন চার লাইনের গানে? এ কি আত্মবিশ্বাসের অভাব?

এই সব গায়িকাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পর, কোনো অনুষ্ঠানে যখন তাঁদের কেউ গান গাইতে যাবেন, গেটের কাছে গাড়ি থেকে নামবার সময়েই খোঁচা খোঁচা চুল, ঢ্যাঙা, মুখে বসন্তের দাগ, মিশমিশে কালো একজন গুণ্ডা মতন লোক তাঁর হাত থেকে গানের খাতাটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। সেই লোকটি আমি।

৪

লোকটি একটি চাঁদার খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ডোনেশান স্যার, কাইণ্ড স্যার, মাদার কালী'জ পূজা... আই এ সারভেণ্ট স্যার...

আমি হাত জোড় করে বললাম, মাপ করুন!

লোকটি আমার বাংলা কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল। সাধারণত এই ডাকবাংলোয় হোমরা-চোমরা অফিসাররাই আসে এবং তারা বেশির ভাগই অবাঙালি। চৌকিদারের কাছে কাল রাত্রেই শুনেছিলাম, আমার মতো উটকো ভ্রমণকারী গত দু'বছরের মধ্যে আর একজনও আসেনি।

ধুতির উপর সাদা শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বগলে ছাতা, লোকটির বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি মনে হয়।

প্রত্যেকদিন সকালে কাগজ পড়ার একটা বিশ্রী নেশা হয়ে গেছে আমার। এখানকার লোক খবরের কাগজের ধার ধারে না। বাইরের জগতের সঙ্গে যা-কিছু যোগাযোগ রেডিও মারফত। সপ্তাহে দু'দিন স্টিমার আসে। সকালবেলা খবরের কাগজের অভাবে পরপব দু'কাপ চা খেয়েও ঠিক জমেনি, তাই আমি মধ্যপ্রাচ্যের খুনোখুনি বিষয়ে এক ইংরেজি নভেল নিয়ে বসেছিলাম, তার মধ্যে এই চাঁদার উপদ্রব ঠিক পছন্দ হয় না।

আমার বাংলা কথা শুনে লোকটি একটু বেশি সাহসী হয়ে আমার চেয়ারের আবো কাছে এগিয়ে এল, খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে দুম করে বলল, স্যার, বাঙালিকে বাঙালি না দেখলে কে দেখবে? মা কালীর পুজো যদি বাঙালিও না করে...

এমন প্রাদেশিকতা মোটেও প্রত্যাশা করিনি। তা ছাড়া মা কালী যে শুধু বাঙালিদের ওপরেই এতখানি নির্ভরশীল তাও জানা ছিল না।

গলার আওয়াজ এবার একটু কঠোর করেই বলতে হলো—মাপ করবেন, চাঁদা-টাদা দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সকালবেলাতেই ভ্যাপসা গরম। দুপুর একটার আগে এখানে পাখা চলে না। লোকটি ধুতির খুঁট দিয়ে মুখ মুছে বলল, পাহাড়ের ওপর উঠতে বড়ো কষ্ট, হাঁপ ধরে যায়! বয়েস হয়েছে তো! এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

কেউ জল চাইলে তাকে না বলা যায় না। ভিখিরিরা ভিক্ষে চেয়ে না পেতে পারে, কিন্তু কারুর বাড়িতে এসে এক গেলাস জল চাইলে কেউ ফেরায় না। এটা যদিও আমার বাড়ি নয়, ডাকবাংলো, তবুও আমার কাছেই তো জল চেয়েছে।

আমি অনায়াসে বলতে পারতাম, একতলায় জলের কল আছে। সেখান থেকে খেয়ে নিন। কিন্তু একজন বয়স্ক লোকের মুখের ওপর এ রকম ভাবে বলা

যায় না। চৌকিদারের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লাম।

টেবিলের উল্টো দিকে আর একটা চেয়ার আছে। জল আনতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে। এতক্ষণ কি লোকটি দাঁড়িয়ে থাকবে? যদিও চাঁদা আদায়কারীকে বসতে বলা বিপজ্জনক, তবু অনিচ্ছার সঙ্গে বলতেই হলো, বসুন। জল আনছে।

টেবিলের ওপর পা তুলে আমি সকালবেলার আলস্য উপভোগ করছিলাম। একজন বড়ো মানুষের মুখের সামনে পা তুলে রাখা যায় না বলে বিরক্তি গোপন করে পা নামাতেই হলো। কিন্তু বেশি কথা বাড়াবার সুযোগ না দেবার জন্য আমি বইতেই চোখ ডুবিয়ে রাখলাম।

কিন্তু লোকটি কথা বলবেই। ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনি কি ইলেকটিরি ডিপার্ট-এ এসেছেন?

—না!

—তবে কি সুপারভাইজ করতে এসেছেন?

—না।

—তবে?

—এমনি বেড়াতে এসেছি।

—বেড়াতে? এখানে তো শুধু বন-জঙ্গল, এখানে কী দেখবেন?

বিরক্তির বদলে এবার রাগ আসে। হুংকার দিয়ে উঠলাম, চৌকিদার! ইতনা দেরি কাহে করতা?

চৌকিদার ততক্ষণে জলের জাগ আর গেলাস নিয়ে এসেছে। লোকটিকে আমি পুরো এক গেলাস জল শেষ করার সময় দিলাম। তারপর কটমট করে তাকিয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে। আর একবার চাঁদার কথা তুললেই ধমক দেব।

লোকটি সেদিক দিয়েই গেল না! টেবিলের উপর পড়ে থাকা আমার সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে চেয়ে বলল, স্যার, আপনার একটা সিগারেট নিতে পারি?

এ তো মহা জ্বালা দেখছি! জলের সম্পর্কে যে নিয়ম আছে, সিগারেট সম্পর্কেও কি সেই নিয়ম খাটে? কেউ সিগারেট চাইলে তাকে দিতে আমি বাধ্য?

বয়স্ক লোক মাত্রই শ্রদ্ধেয় নয়। প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়লেও অনেকের অভিজ্ঞতা কিংবা সভ্যতা-ভদ্রতাবোধ বাড়ে না। তবু আমাদের অনেক দিনের সংস্কারে আছে, কোনো বয়স্ক লোককেই ঠিক তাচ্ছিল্য করতে পারি না।

বললাম, নিন। সিগারেট নিন। কিন্তু আপনাকে চাঁদা আমি দিতে পারব না। আমি ঘুরে বেড়াতে এসেছি, আমার কাছে পয়সাকড়ি নেই!

—তা বললে কি চলে? এই ডাকবাংলা ছেড়ে যাবার সময় চৌকিদারকে তো অন্তত দুটো টাকা বখশিস দেবেন? আর মায়ের পুজোর জন্য দু'টাকা দিতে পারবেন না?

আমার মুখে প্রথমেই উত্তর এসেছিল, এই চৌকিদার আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে, তাই একে দু'টাকা বখশিস দেওয়া আমার দরকার। কিন্তু আপনার মাকে আমি বখশিস দিতে যাব কোন দুঃখে?

এরকম নাস্তিকের মতন কথা লোকের মুখের ওপরে বলা যায় না। তাই ঘুরিয়ে বললাম, দেখুন, আপনাদের এখানকার পুজোতে স্থানীয় লোকেরা চাঁদা দেবে, আমি বাইরে থেকে দু'দিনের জন্য এসেছি, আমি কেন চাঁদা দিতে যাব?

লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুকফুক করে সিগারেট টানতে লাগল। তারপর আবার বলল, স্যার, আপনি চাঁদা দেন বা নাই দেন, আপনার কাছে দুটো কথা বলব? এখানে একটা কথা বলার লোক নেই। আমি বামুন, আশেপাশে দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে একটা বামুন খুঁজলে পাবেন না।

—আমিও তো শূদ্র!

—তা হোক! তবু আপনি লেখাপড়া জানেন, ভদ্রলোক। আপনি আমার দুঃখুটা অন্তত বুঝবেন।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম' এই সকালবেলা কে এখন এক বুড়োর লম্বা একঘেয়ে দুঃখের গল্প শুনতে চায়? সামনের জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায় অত্যন্ত ঘন সবুজ বন। বিশাল বিশাল পুরোনো সব গাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়। বেলা এগারোটায় এক ভদ্রলোকের জীপ গাড়িতে আমার এ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে যাওয়ার কথা।

আমি যথাসম্ভব নম্রভাবে বললাম, দেখুন, আপনার হয়তো অনেক দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু তার কোনো প্রতিকার করার সাধ্য তো আমার নেই! তাই আমি সেসব শুনে কি করব?

লোকটি এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। রীতিমত চোখের জল পড়তে লাগল টপটপ করে।

পুরুষমানুষের চোখের জল দেখলে আমার মনে দয়া-মায়া-করুণা কিছুই জাগে না। আমি শুধু বিব্রত বা অস্বস্তি বোধ করি। সকালবেলা এই বিড়ম্বনা কি আমার প্রাপ্য ছিল, কে লোকটিকে আসতে বলেছিল এখানে? আমি লোকটির কান্না থামার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, স্যার, আপনি চাঁদা দেন না দেন, তবু আমার মন্দিরে একবার অন্তত চলুন! দিনের পর দিন আমি সেখানে একলা থাকি, একলা

পুজো করি। আর কেউ সেখানে পুজো দিতে আসে না। কেউ আসে না। রোজ পুজো দিতে গেলে সামান্য কটা বাতাসা, কিছু ধূপধুনোও তো লাগে?...তারও তো একটা খরচ আছে...সেকথা কেউ ভাবে না! যত দায় আমার... কিন্তু মায়ের পুজো তো বন্ধ থাকতে পারে না?

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয়, লোকটি কোনো বারোয়ারি পুজোর জন্য চাঁদা চাইতে আসেনি। চাঁদা বলতে আমাদের সেই রকমই মনে হয়। সেরকম চাঁদা চাইতে আসে তিন-চারজন দল মিলে। এ লোকটি এসেছে কোনো মন্দিরের জন্য। মন্দিরের আবার চাঁদা কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মন্দির কোথায়?

লোকটি কান্না থামিয়ে বলল, এই পাহাড়ের ওপরেই, আর একটু ডানহাতি গেলে—পনেরো-কুড়ি মিনিটের পথ... এত উঁচুতে বলে কেউ আসতে চায় না—

ডাকবাংলোটাও পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে। গাড়ি ছাড়া এখানে আসা-যাওয়া বেশ কষ্টকর। কাল রাত্রে আমি নীচে নেমে হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম—ফেরার সময় মনে হচ্ছিল পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাগ্যিস মাথার ওপরে মস্তবড় একটা চাঁদ ছিল, তাই সঙ্গী হিসেবে তাকে পেয়েছিলাম।

—তা এত উঁচুতে মন্দির বানালেন কেন?

—আমি তো বানাইনি, মন্দির বানিয়েছিলেন এক মাড়োয়ারীবাবু।

এবার আমি একটু শ্লেষের সঙ্গে বললাম, মাড়োয়ারীবাবু মন্দির বানিয়েছে তো সেটা চালাবার জন্য আপনাকে চাঁদা তুলে বেড়াতে হয় কেন? এ রকম কথা তো কক্ষনো শুনিনি!

লোকটি উত্তরে যা জানাল, তা থেকে একটা অন্য রকম ছবি ফুটে উঠল। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এখানে কন্ট্রাকটারি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট মন্দির বানিয়ে দেন। বিহার-উত্তর প্রদেশে যেমন প্রায় প্রত্যেক পাহাড়ের ওপরেই একটা করে মন্দির থাকে। বাঙালিদের মন্দির পাহাড়ের ওপর হয় না সাধারণত। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মেইন ল্যাণ্ডে ফিরে গেছেন—এখন স্থানীয় বাঙালিরা মন্দির সম্পর্কে আগ্রহী [illegible] পাহাড়ের ওপর কেউ উঠতে চায় না। তা ছাড়া দে[illegible]জ্ ভক্তিও কমে [illegible] বোধহয়। এখন এই পূজারী বামুনটিকেই একা ম[illegible] চালাতে হয়—একদিনও [illegible] মায়ের পূজা বন্ধ না হয়, সেদিকে তার দারুণ সতর্কতা। এদিকে মন্দিরের এক পয়সাও আয় নেই। দেশে ফিরে গিয়েও মাড়ো[illegible] ভদ্রলোক প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করে পাঠাতেন, কিন্তু বছর দেড়েক আগে [illegible] মারা যাবার পর ছেলেরা আর কেউ কিছু পাঠায় না।

আমি নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দির একবার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে আর বুঝি পুজো বন্ধ করা যায় না?

লোকটি জিব কেটে বলল, তা কখনো হয়? তা হলে যে মহাপাতকী হবো! আমি যতদিন বেঁচে আছি পুজো চালাবই! আমার একটা পেট কিভাবে যে চলছে, তা কেউ চিন্তা করে না! তা না করুক! কিন্তু মায়ের পুজোরও তো কিছু খরচা আছে? তাও লোকেরা দেবে না! পৃথিবীটার হলো কি?

মন্দির থেকে নাকি ডাকবাংলোটা দেখা যায়। পূজারী বামুনটি যেদিনই দেখে রাত্রে ডাকবাংলোর ঘরে আলো জ্বলছে সেদিনই বোঝে যে বাইরের কোনো অফিসার এসেছে। পরদিন সকালে সে তাই চাঁদার জন্য কাকুতি মিনতি করতে আসে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তো সবাই চাষবাস কিংবা চাকরি করতে এসেছে। আপনি পুজো করার জন্য এখানে এলেন কি করে?

সেও এক ইতিহাস। এখানকার সব বাঙালির মতন, ইনিও পূর্ববঙ্গের। চৌষট্টি সালে দেশত্যাগের পর পরিবারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ইনি ছিলেন দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পে আর এঁর জোয়ান ছেলে গিয়েছিল আন্দামানে চাষ করতে। কয়েক বছর পর লোকটি জানতে পারল, এর ছেলে বাড়ি ঘর বানিয়ে সেখানে বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছে। তখন এ নিজেও অপশান দিয়ে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে এল ছেলের কাছে।

কিন্তু সেখানেও থাকতে পারল না। ডিগলিপুরে এর ছেলে এখন সত্যিই বেশ সম্পন্ন চাষী। কিন্তু ছেলে বাড়িতেই শুয়োর আর মুরগি পোষে। বাবা ধার্মিক মানুষ, সেই অনাচার সহ্য করবে কি করে? বামুনের বাড়িতে শুয়োর-মুরগি! এক-একটা মুরগি আবার কক কক করে ঢুকে আসে শোওয়ার ঘরে। এমনকি পুজোর জায়গায় পর্যন্ত। তাই নিয়ে ছেলের সঙ্গে খিটিমিটি। ছেলে একদিন সাফ বলে দিয়েছে, থাকতে হয় তো এইভাবে থাকো, নয় তো নিজের পথ দেখো।

অভিমানী পিতা আবার গৃহত্যাগ করেছে। না খেয়ে মরবে তবু ঐ অনাচার চোখে দেখতে পারবে না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছোবার সময়েই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মন্দির প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই লোকটি তখন পেয়ে গেল নিজের মনের মতন কাজ! কিন্তু বছর দেড়েক ধরে আবার মহা বিপদ। মন্দিরের একটা পয়সা আয় নেই, লোকজনও কেউ যায় না।

কান্না থেমে গেছে, লোকটির গলা তবু এখনো ভাঙা ভাঙা। কথাগুলো হাহাকারের মতন শোনায়। তখনও বলে যেতে লাগল, আমি মন্দিরের চত্বরে আলু আর টমাটোর চাষ করার চেষ্টা দিয়েছিলাম—কিন্তু শক্ত মাটি, বুড়ো বয়েসে গায়েও তেমন শক্তি নেই, কি করি এখন ক'ন তো? এত নিষ্ঠা নিয়ে রোজ দু'বেলা পুজো

করি, কেউ একবার দেখতেও আসে না! একলা একলা পুজো করতে কি ভালো লাগে, বলুন?

আমি আর কি উত্তর দেব?

ঠিক এগারোটার সময় জিপ এল আমার জন্য। জঙ্গলে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গাড়িটা যখন পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামছে, তখন চোখে পড়ল মন্দিরটা। ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পূজারীটি নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গের স্থানীয় ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐটা বুঝি কালী মন্দির!

তিনি বললেন, হুঁ। আমি যাইনি কখনো। শুনেছি একটা পাগলা বামুন একা একাই ওখানে পুজো-টুজো করে!

ঢং ঢং শব্দটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে ভেসে আসতে লাগল। মনে হলো যেন একটি নিঃসঙ্গ লোকের আর্তনাদ।

৫

বিলেত থেকে ফিরে এসে তপনদা একটা নাটকের দল খুললেন। পল্টুদের বাড়ির ঠাকুরদালানে রোজ সন্ধেবেলা রিহার্সাল।

তপনদা বিলেতে ছিলেন পাঁচ বছর। সেখানে যাবার আগে তাঁর নাটক সম্পর্কে কোনো উৎসাহের কথা কখনো টের পাইনি। আমাদেরও তিনি পাত্তা দেননি কোনোদিন। একটু চালিয়াৎ ধরনের মানুষ, আমরা তাঁকে ফাঁটবাজ বলেই জানতুম।

বিলেত থেকে ফেরার পর তপনদার তিনটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। উনি বেশ ফর্সা হয়ে গেছেন। এমনকি মুখে একটা লাল আভা এসেছে। আগে মোটেই ফর্সা ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, উনি এখন আর চাল মারেন না, ইংরিজি বলেন না, খুব শান্ত নম্রভাবে, এমনকি আমাদেরও কাঁধে হাত দিয়ে আপন-আপন সুরে কথা বলেন। এবং এই নাটকের উৎসাহ।

কদিনেই আমরা তপনদার ভক্ত হয়ে উঠলুম। তখন আমরা বেশ ছোট, অবশ্য নিজেদের যথেষ্ট বড় ভাবি, সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করি।

নাটকটা তপনদা নিজেই লিখেছেন, নিজেই তার নায়ক এবং পরিচালক। নায়ক হবার মতন চেহারা তপনদার, বেশ লম্বা, মাথাভর্তি চুল, ফর্সা মুখটাতে

দাড়ি কামাবার পর একটা নীলচে আভা পড়ে। তপনদা বিলেত থেকেই এক সময় একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি ঠিক করে এসেছিলেন, অফিস থেকে ফিরেই রিহার্সাল। পুরো নাটকটারই পটভূমিকা জঙ্গলের মধ্যে একটা বাংলোয়। তপনদা বললেন, জঙ্গল বোঝাবার জন্য স্টেজের ওপর শুধু একটি গাছ রাখা হবে। অরসন ওয়েলস নাকি স্টেজের পেছনে শুধু একটা নীল রঙের পর্দা টাঙিয়ে তাতেই সমুদ্র বুঝিয়ে মবি ডিকের অভিনয় করেছেন।

আমরাও ছোটখাটো পার্ট পেয়ে গেলাম। তপনদার আরো দু'-একজন বন্ধু এলেন। তিনটি নারী চরিত্র, তাদের নিয়েই মুশকিল। পল্টুদার বোন স্নিগ্ধা ভালো গান গায়, কিন্তু সে অভিনয় করতে কিছুতেই রাজি নয়। আবার অরুণদের একতলার ভাড়াটে সবিতা পার্ট করতে খুবই রাজি, কিন্তু সে এত মোটা যে তাকে নায়িকার ভূমিকায় চিন্তাই করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক তিনজনকেই পাওয়া গেল, তবে অবশ্য দীপংকরদার স্ত্রী শান্তা বৌদিকে রাজি করাবার জন্য তপনদাকে খুবই ঝুলোঝুলি করতে হয়েছিল।

শান্তা বৌদি আমাদের পাড়ার নামকরা সুন্দরী। দীপংকরদার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়ে প্রথম যখন শান্তা বৌদিকে দেখি, মনে হয়েছিল, এই মুখ আমি আগে বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নের নারীরাই শুধু এত সুন্দর হয়। শান্তা বৌদি সাধারণত চুলে খোঁপা বাঁধেন না, ওঁর চুল এত কোঁকড়ানো যে নিশ্চয়ই খোঁপা বাঁধার খুবই অসুবিধে। ওরকম কোঁকড়া চুলের জন্যই যেন ওঁকে ঠিক বাস্তবের নারী মনে হয় না। সে বছর আমাদের পাড়ার দুর্গা প্রতিমার মুখও হয়েছিল ঠিক শান্তা বৌদির মতন। দীপংকরদার সঙ্গে শান্তা বৌদিকে মানিয়েছিলও খুব ভালো। দীপংকরদাও খুব দীর্ঘ শরীরের সুপুরুষ, তবে একটু গম্ভীর। দীপংকরদা প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক, পণ্ডিত হিসেবে খুব নাম।

শান্তা বৌদি খুব হাসিখুশি ছটফটে ধরনের। আমাদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে মিশতেন। শান্তা বৌদিকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যেত। সেটা ছিল মন খারাপ করারই বয়েস, যখন-তখন মন খারাপ হলে ছাদে যেতাম, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হতো, এই পৃথিবীতে আমি কত ক্ষুদ্র! আমার বেঁচে থাকা বা না থাকার জন্য কারোর কিছু যায় আসে না। সেই সময়েও শান্তা বৌদির মুখখানা হঠাৎ মনে পড়লে যেন একটা ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ স্পর্শ পেতাম। রূপেরও একটা সঞ্জীবনী ক্ষমতা আছে।

আমাদের রিহার্সাল বেশ জমে গেল। রাত্রি সাড়ে নটা দশটা হইহই করে চলে, পল্টুদা চায়ের ব্যাপারে খুব উদার, পাঁচ-ছ' বার করে চা আসে সবার জন্য। কখনো-বা তপনদার পয়সায় সিঙ্গাড়া ও সন্দেশ।

শান্তা বৌদি এমনিতে এত ছটফটে কিন্তু অভিনয়ের সময় দেখা গেল দারুণ লাজুক। কিছুতেই পুরো একটা লাইন বলতে পারেন না। বারবার উনি হেসে ফেলে বলতে থাকেন, আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা এসব হবে না! আমার মনে হতো, শান্তা বৌদি এমনই সরল আর ভালো যে অভিনয় করা ওঁর পক্ষে সত্যি শক্ত। যে কখনো মিথ্যে কথা বলে না, সে কি অভিনয় করতে পারে? এর ফলে হলো কি আমাদের রিহার্সালের বেশিটা সময়ই খরচ হতো শান্তা বৌদিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করতে।

বেশ কয়েক দিন পর আমি লক্ষ করলুম, তপনদা যখন আমার বা অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন, তখনও তিনি তাকিয়ে থাকেন শান্তা বৌদির দিকে। প্রায় সমস্ত সময়টাই তপনদার চোখ শান্তা বৌদিকে ছেড়ে বিশেষ নড়ে না! সতেরো দিনের মাথায় আমার আর কোনো সন্দেহই রইল না যে তপনদা দারুণ ভাবে শান্তা বৌদির প্রেমে পড়ে গেছেন।

ঘরের মেঝেতে মস্ত বড় কার্পেট পাতা, অরিন্দম তখন একা রিহার্সাল দিচ্ছে, আমরা বসে বসে দেখছি—তপনদা নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চান বলে বার বার নানা জায়গায় গিয়ে বসছেন। একবার গিয়ে বসলেন পেছনেব দেয়াল ঘেঁষে শান্তা বৌদির পাশে, তারপর খুব সন্তর্পণে সবার অজান্তে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন শান্তা বৌদির দিকে, শান্তা বৌদির একটা অনিন্দ্য মাখনের মতন হাত কার্পেটের ওপর—তিনি সেই হাতটা সরিয়ে নিলেন না, তপনদাকে ধরতে দিলেন। অনেকক্ষণ পরস্পরের হাত ঐ রকম ধরাই রইল।

তখন আমি উইপোকার চেয়েও বেশি অধ্যবসায়ী। রাশি রাশি বই পড়ে ফেলেছি। প্রেম কাকে বলে তা আর জানতে বাকি নেই। তপনদার ঐ সবসময় শান্তা বৌদির দিকে গাঢ় ভাবে চেয়ে থাকা, সবার আড়ালে হাতে হাত ধরা এর মানে আমি জানি না?

আমার প্রথমেই মনে হলো, আর কেউ দেখেনি তো? এদিক ওদিক তাকালাম। অরিন্দম তখন এমন মজার ভঙ্গি করে চলেছে যে সবার চোখ তার দিকে, কেউ আর পেছন ফিরে তপনদা আর শান্তা বৌদির হাত ধরে থাকা দেখতে পায়নি।

এরপর কয়েকদিন আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত ছটফটানি জেগে রইল। আমি একটা গোপন জিনিস আবিষ্কার করেছি, কিন্তু কারুর কাছে বলতে পারব না। এই সব ব্যাপার জানাজানি হলেই অমনি সবাই নানান রকম রসালো মন্তব্য শুরু করে দেয়। শান্তা বৌদির সম্পর্কে কেউ কোনো খারাপ কথা বললে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

আমি চোরা চোখে ওদের লক্ষ করি, এবং ক্রমশ আরো ভালো করে বুঝতে

পারি, ওঁদের প্রেম আরো বেশি গাঢ় হচ্ছে। প্রেমটি তপনদারই বেশি। শান্তা বৌদি সেটা মেনে নিয়েছেন এবং কিছুটা প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন। এমনকি একদিন এটাও আবিষ্কার করলাম, শান্তা বৌদি অন্যদের আড়ালে তপনদাকে বলেন, তুমি, আর সবার সামনে আপনি। অভিনয় করতে পারেন না শান্তা বৌদি কিন্তু এই তুমি-আপনিটা একবারও গুলিয়ে ফেলেননি!

আমার ছটফটানি দিন দিন বেড়েই যায়। দীপংকরদা এমন নিপাট ভালোমানুষ, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না। শান্তা বৌদি কি দীপংকরদাকে ছেড়ে চলে যাবেন? তা হলে যে কী হবে, তা ভাবতেও পারি না।

তবে, এ কথাও বুঝতে পারি, ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কেউ টের পায়নি এখনো। এই গোপনীয়তার বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে। তপনদা এবং শান্তা বৌদি দু'জনেই যথেষ্ট বড়ো, তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে কি করবেন সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপাব, অন্য কারুর মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবু আমি কিছুতেই মন থেকে এ চিন্তাটা তাড়াতে পারি না।

একদিন অনেক রাত্তিরে ছাদে একা বসে আছি। তখন বাড়ির মধ্যে ছাদই আমার একমাত্র জায়গা যেখানে নিরাপদে সিগারেট খেতে পারি, এবং সেখানে বসেই আমার যতরকম চিন্তা ভাবনা ও সমস্যার সমাধান করতে হয়। শান্তা বৌদির কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ এক সময় আমার চোখে জল এসে গেল। আমি নিজেই অবাক। শান্তা বৌদির জন্য আমি কাঁদছি? শান্তা বৌদির তো বিপদ-আপদ কিছু হয়নি, তিনি একটু প্রেম করছেন মাত্র—তাও তপনদা মোটেই মতলববাজ বা বদমাইস নন, শান্তা বৌদির কোনো ক্ষতি করবেন না নিশ্চয়ই। তবু কান্না কেন?

তখন আমি আর একটা আবিষ্কার কবলাম। আসলে আমিও শান্তা বৌদিকে ভালোবাসি! যেটাকে আমি পূজা বলে ভেবেছিলাম, সেটা আসলে ভালোবাসাই। আমি শান্তা বৌদির হাত কোনো দিন চেপে ধরতে যাব না। আড়ালে তাঁকে তুমি বলব না, তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। এ অন্যরকম ভালোবাসা!

খুব ভোরবেলা আমি দুধ আনতে যেতাম। একদিন দেখি শান্তা বৌদি তিন-তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই সময়। এত ভোরে তো শান্তা বৌদিকে আর কখনো দেখিনি। উনি আমাকে দেখতে পাননি, তাকিয়ে আছেন রাস্তার অন্য পারে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা তপনদা হেঁটে যাচ্ছেন মন্থর পায়ে। রোজ ভোরে তপনদা দেশবন্ধু পার্কে সাঁতার কাটতে যান। শান্তা বৌদি তপনদাকে দেখার জন্যই এত ভোরে উঠেছেন। সন্ধেবেলা তো দেখা হয়ই, তবু সকালে দেখার জন্য এত ব্যস্ততা? বুকের মধ্যে একটা আকস্মিক দুঃখের ঝাপটা অনুভব করলাম।

আমাদের থিয়েটারের ঠিক আগের দিন আমরাই স্টেজ বাঁধলাম অনেক রাত পর্যন্ত। কোনো হল ইচ্ছে করেই ভাড়া করা হয়নি। পল্টুদাদের মস্ত বড়ো ঠাকুরদালান, সামনে বড়ো উঠোন, সেখানে আড়াই শো-তিনশো লোক ধরতে পারে। প্রথম কয়েকটি অভিনয় ওখানে হবে। তপনদা নিজেই স্টেজ বাঁধায় হাত লাগিয়েছেন।

মার্বেল পাথরের ঠাকুরদালান, তার ওপর মই লাগালে বার বার পিছলে যায়। তপনদা আমাকে ডেকে বললেন, এই মইটা শক্ত করে চেপে ধর তো। সাবধান —ছাড়বি না কিন্তু।

আমি মইটা ধরলাম, তপনদা তরতর করে উঠে গেলেন ওপরে। এই সময় দূরে কোথায় যেন শান্তা বৌদির গলা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছে হলো, মইটা ছেড়ে দিই! শ্বেতপাথরের ওপর তপনদা আছড়ে পড়ুক, মাথাটা চুরমার হয়ে যাক, ঘিলু ছিটকে চারদিকে...।

আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। এ আমি কি সব ভাবছি? আমি তপনদাকে মেরে ফেলতে চাই? আমার ভেতরে এতখানি ঈর্ষা জমে ছিল? অথচ বাইরে তো আমি তপনদাকে শ্রদ্ধাই করি! আমি তো কোনো দিন দীপংকরদাকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করিনি! কক্ষনো না! তা হলে?

শান্তা বৌদিকে আমি ভালোবাসি। প্রেমিকার সম্পর্কে কোনো রাগ থাকে না, কিন্তু প্রেমিকার অন্য প্রেমিক—তাকে সহ্য করা যায় না কিছুতেই। আমি মইটা ভালো করে চেপে ধরলাম যদিও, কিন্তু তপনদাকে ততক্ষণে আমি মনে মনে হত্যা করে ফেলেছি!

৬

মাঝখানে আমার কিছুদিন শখ হয়েছিল সাঁতার কাটার। এমনিতে তো ব্যায়াম-ট্যায়াম কিছু হয় না! বাড়ির কাছেই বালিগঞ্জ লেক, সেটারও সৎ-ব্যবহার করা উচিত। একটা খাকি হাফ প্যান্ট কিনে ফেললাম। অনেক দিন পর হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে বেশ স্কুলের ছেলের মতন লাগে নিজেকে, যদিও আমার বুকে, হাতে-পায়ে বড়ো বড়ো লোম।

কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ভোরবেলা উঠে লেকে যাই, পাবলিক পুলে, যেখানে চাঁদা-টাঁদা কিছু লাগে না, সেখানে অনেক অচেনা নারীপুরুষের সঙ্গে জলের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতরাই। সাঁতার আর সাইকেল

কেউ একবার শিখলে আর ভোলে না, এই নীতি অনুযায়ী আমি সাত-বছর অনভ্যাসের পর একদিন কায়দা করে লাফিয়ে সাইকেলে চাপতে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়েছিলাম সাইকেল-সমেত। কিন্তু সাঁতারটা সত্যিই ভুলিনি, একটু হাঁপিয়ে গেলেও ছোট লেকটা এপার ওপার করা যায়।

সাঁতার শিখেছিলাম ছেলেবেলায়, তখন হাফ প্যান্ট পরেই সাঁতার কাটতাম আমরা। কলকাতার গঙ্গায় কিংবা গ্রামের পুকুরে। সেই ধারণাটাই আমার রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালিগঞ্জের লেকে অন্য রকম কায়দা। সুইমিং ট্রাঙ্ক নামে এক প্রকার উন্নত ধরনের জাঙ্গিয়া পরে সবাই সাঁতার কাটে সেখানে। আমার মতন একজন ধেড়ে লোককে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় দেখে অনেকেই আড় চোখে তাকায়, কেউ কেউ ফিকফিকিয়ে হাসে। ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কয়েকদিন বাদে। কিন্তু তক্ষুনি একটা সুইমিং ট্রাঙ্ক কিনে ফেলতে দ্বিধা হয়। লোকমুখে শুনেছি, জিনিসটার দাম হাফ প্যান্টের তিন গুণ। আমার সাঁতারের ঝোঁক ক'দিন থাকবে কে জানে, শুধু শুধু একটা দামী জিনিস কিনে ফেলব? তা ছাড়া হাফ প্যান্টেই কাজ চলে যাচ্ছে, নেহাৎ ফ্যাশনের খাতিরে...।

এই সময় একদিন সকালবেলা সাঁতার কেটে ফিরছি, দূরে দেখলাম ঝরনাদিকে। ছোট্ট ছেলেটির হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। প্রথমেই আমার মনে হলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। মাথার চুল আঁচড়ানো হয়নি, ভিজে হাফ প্যান্ট তার গায়ে তোয়ালে জড়ানো, এই অবস্থায় ঝরনাদির মতন সুন্দরীর সামনে দাঁড়ানো যায়?

ঝরনাদির ছেলে তার আগেই আঙুল তুলে বলল, মা, ঐ দ্যাখো, নীলুকাকা!

ধরা পড়ে গেলাম। আমি এগিয়ে এসে বেশ সহজ ভাবেই বললাম, কি ঝরনাদি, বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?

ঝরনাদি প্রথমে আমার গোদা গোদা ঠ্যাং সমন্বিত প্যান্ট পরা অপরূপ চেহারাটা দেখলেন। তারপর বললেন, তুই সাঁতার কাটিস বুঝি? ভালোই হলো। তুই একটু আসবি আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—টুবলুটাকে সাঁতার শেখাবার জন্যে ক্লাবে ভর্তি করে দেব ভাবছি! তোর কোন ক্লাব?

—ক্লাব মানে? আমার তো কোনো ক্লাব নেই।

—তুই তা হলে কোথায় সাঁতার কাটিস? অমুক ক্লাবে যাস না?

লেকের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি সাঁতার ও দাঁড় টানার ক্লাব আছে। আধুনিকতম পোশাক পরিহিতা রমণী ও বিভিন্ন প্রকারের মোটর গাড়ি ও কুকুর

দেখবার জন্য ছাত্র বয়সে আমরা ঐসব ক্লাবগুলির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতাম।

আমি বললাম, ক্লাব-ফ্লাবের দরকার নেই। আমার ওপর ভার দাও, টুবলুকে আমি চার-পাঁচ দিনে সাঁতার শিখিয়ে দেব।

ঝরনাদি সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুই সাঁতার শেখাতে জানিস?

—এ আর শক্ত কি? সবাই পারে। তুমি সাঁতার জানো? তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি আমি।

—তোর লাইফ সেভারের সার্টিফিকেট আছে?

—সে আবার কি? সার্টিফিকেট মানে? তুমি দেখতে চাও? তোমাকে আর একবার সাঁতার কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি! আমি সাঁতার শিখেছি গ্রামের পুকুরে। ঐ টুবলুর মতন বয়সে। ঐটুকু ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আবার সার্টিফিকেট লাগে নাকি?

—তুই জানিস না, ওরকম ভাবে শেখা আনসায়েন্টিফিক। ছোট ছেলেদের শেখাতে হয় স্টেজ বাই স্টেজ—হাত আর পায়ের ওপর সমান জোর না পড়লে একটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ক্লাবে ট্রেইনড কোচ আছে।

—কিন্তু আমি যেখানে কাটি সেখানেও তো অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে মা-বাবার কাছে শিখছে। আমি শিখেছিলাম আমার মায়ের কাছে, আমার মায়ের তো কোনো অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়নি?

—তুই কোথায় কাটিস?

আমি আঙুল তুলে পাবলিক পুলটা দেখিয়ে বললাম, ঐ দ্যাখো না, এখানে তো কত লোক সাঁতার...

ঝরনাদি একেবারে আঁতকে উঠলেন। নাক কুঁচকে বললেন, উঃ, অত লোক—কার কী অসুখ আছে কে জানে, সবাই মিলে এক জায়গায়—ক্লাবে নিয়মিত জলে ওষুধ মেশায়...

আমি বুঝলাম, ঝরনাদির শুচিবাতিক আছে। যাদের এই অসুখটা থাকে, তারা কোনো যুক্তি মানে না।

বললাম ঠিক আছে, যাও তা হলে!

—তুই একটু আমার সঙ্গে চল না। কোথায় ফর্ম-টর্ম পাওয়া যায়, আমি জানি না। তোর সঙ্গে যখন দেখাই হলো—

আমি রাজি হয়ে টুবলুর হাত ধরলাম। টুবলু বেশ স্বাস্থ্যবান ছটফটে ছেলে, ভয় ডর নেই। চারদিকে টুকরো টুকরো ভিড়, লোকেরা ফিসফিস করে কথা বলছে।

একজায়গায় একটি বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে একটা বড়ো ভিড়, মেয়েটি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

লোকের ফিসফিসানি থেকে বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে তার বাবা একজায়গায় বসিয়ে রেখে সাঁতার কাটতে গেছে। দু'ঘণ্টা কেটে গেল, তবু ভদ্রলোক এখনো ফেরেননি। লোকটি অবাঙালি, ক্লাবের অনেকেই তাকে চেনেন, তিনি একজন দক্ষ সাঁতারু। তবে তিনি কোথায় গেলেন, খুব সম্ভবত মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

ভিড় এড়িয়ে আমরা কাউন্টারের দিকে এগোলাম। কাউন্টারের ভেতরেও খুব উত্তেজনাময় আলোচনা চলছে। আমি তিন-চারবার বললাম, ও দাদা, শুনছেন, ও দাদা—কেউ কানই দেয় না। এমন সময় আর একটি লোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে, প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, সবাই মিলে চ্যাঁচামেচি শুরু করল, তারপর সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কাউন্টার ফাঁকা।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মাঠের সব লোক ছুটছে একদিকে। ঝপাঝপ করে কয়েকজনের জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনলাম।

আমি ঝরনাদিকে বললাম, তোমরা একটু দাঁড়াও—দেখে আসি ওখানে কী হচ্ছে।

একটু উঁকি মেরেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। অবাঙালি ভদ্রলোকটির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে, পাড়ের কাছেই, কাদার মধ্যে গেঁথে থাকা অবস্থায়। তিনি দক্ষ সাঁতারু ছিলেন কিন্তু ভালো ডাইভ'র ছিলেন না। সেদিন হঠকারীর মতন তিনতলা থেকে ডাইভ দিয়েছিলেন। মৃত্যুই নিশ্চয় হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়েছিল লোকটিকে। কাদার মধ্যে গেঁথে রয়েছেন দু'ঘণ্টা ধরে, কেউ লক্ষও করেনি। এতক্ষণ বাদে একজনের মনে পড়েছে যে লোকটিকে ডাইভিং বোর্ডের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

মৃত্যু যাকে তাকে যখন তখন নেয়। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার বাবাকে না নিয়ে গেলে চলত না? অন্য কোনো সময় ঐ লোকটিকেই নেওয়া যেত না?

কাদা মাখা মৃতদেহটি ধরাধরি করে তুলল তিন-চারজন। ঘাড়টি এমনভাবে ঝুলছে যে মনে হয় শিরদাড়া ভেঙে গেছে। বাচ্চা মেয়েটির কান্না যাতে আমাকে শুনতে না হয়, তাই আমি দু'হাতে কান চাপা দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে এলাম।

আমাকে দেখেই ঝরনাদি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। মুখখানা রক্তহীন, ফ্যাকাসে। আমি যেই বললাম, সেই লোকটা...। ঝরনাদি অমনি বললেন, প্লীজ, প্লীজ, স্পিক ইন ইংলিশ। হি মাস্ট নট নো এনিথিং...

ঝরনাদি বলতে চাইছেন টুবলু যেন কিছু জানতে না পারে। এসব ভয়ঙ্কর কথা টুবলুর মতন ছোট ছেলের জানা উচিত নয়।

আজকাল মিশনারি স্কুলগুলির দৌলতে ছ'সাত বছরের ছেলেরাও দিব্যি ইংরেজি শিখে যায়। সুতরাং তাদের সামনে কোনো গোপন কথা কিংবা অসভ্য কথা ইংরেজিতে বলে পার পাবার উপায় নেই।

সুতরাং আমি ঝরনাদিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গোপন সব ব্যাপারটা জানালুম। ঝরনাদি রীতিমতন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কাতর গলায় বললেন, ইস, কী হবে!

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ঝরনাদির খুব কোমল মন, তিনি ঐ অচেনা লোকটির এরকম বেঘোরে মৃত্যুর জন্য খুব ব্যথা পেয়েছেন। কিংবা ঐ ছোট মেয়েটির কথা ভেবেই—

একটু বাদেই আমার সে ভুল ভাঙল। পৃথিবীর অধিকাংশ মায়েরাই নিজের সন্তানের সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পৃথিবীর আর সব কিছু ভুলে যায়। ঝরনাদি নিজের সন্তানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষ করছেন। তিনি এখন শুধু ভাবছেন, ঐটুকু শিশুর মনে এরকম ঘটনা কী রকম ছাপ ফেলবে। যদি মনের মধ্যে দৃশ্যটা গেঁথে যায়? যদি কোনো 'কমপ্লেক্স' তৈরি হয়? যদি জল সম্পর্কে সারা জীবনের মতন ভীতি জন্মে যায়।

ঝরনাদি বারবার বলতে লাগলেন, ইস, কেন যে আজই এখানে এলাম? কেন যে আজই এরকম একটা...

বললাম, চলো, তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঝরনাদির বাড়িও বেশি দূরে নয়। আমার ভিজে হাফ প্যাণ্ট প্রায় শুকিয়ে এসেছে, লজ্জাটাও কেটে গেছে এতক্ষণে।

ক্লাব থেকে বেরুবার সময় টুবলু জিজ্ঞেস করল, মা, আমি সাঁতার কাটব না?

ঝরনাদি বললেন, না। এ বছর তোমার কাটা হবে না।

—কেন?

—ইয়ে, সব ফর্ম ফুরিয়ে গেছে, এ বছর আর ভর্তি করবে না!

—কেন?

—এবার বেশি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে কিনা।

—কে বলল? ওরা তো কিছু বলেনি।

—এই তো তোমার নীলুকাকা খোঁজ নিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য ঝরনাদি অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যেতে লাগলেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে টুবলু আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিজেই ছুটে গেল আগে আগে।

ঝরনাদি বললেন, আয়, এক কাপ চা খেয়ে যাবি নাকি? দেখিস যেন আজকের এই ব্যাপারটা টুবলুর সামনে আবার দুম করে বলে ফেলিস না। বাড়িতে মা আছেন—

টুবলু সিঁড়িগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, তিনতলার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ঠাকুমা। তিনি বললেন, এর মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে গেল টুবলু সোনা?

টুবলু মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে বলল, না ঠাম্মি, আমি আজ সাঁতার কাটিনি! ওখানে একটা লোক না, জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপর কাদার মধ্যে ঢুকে গেছে ভচাৎ করে! একদম মরে গেছে। তার একটা না মেয়ে, খুব কাঁদছে খুব কাঁদছে—তাই আজ ওখানে কেউ সাঁতার দেবে না!

আমি আর ঝরনাদি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটদের আমরা যতটা ছোট মনে করি, তারা মোটেই ততটা ছোট না। টুবলু পুরো ঘটনাটা আমাদের মতনই জেনে গেছে।

এবং এর পরেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে নস্যাৎ করে টুবলু তক্ষুনি তার ফুটবলটা নিয়ে দুমদাম করে খেলতে লাগল মহা আনন্দে, আপন মনে।

৭

কৃষ্ণা বলল, আমি আত্মহত্যা করব!

আমি কোনো কথা না বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর মুখে ফুটে উঠেছে প্রবল রাগ আর অভিমান। চোখ দুটি বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কিন্তু যে-কোনো সময়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে পারে!

আমি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলাম। গতকাল সন্ধেবেলাতেও দেখা হয়েছিল কৃষ্ণার সঙ্গে। তখন ও চমৎকার হাসিখুশি মেজাজে ছিল। অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। সিঁড়িতে পা দিয়ে ও হেসে বলেছিল, কাল বিকেলে ঠিক এসো কিন্তু!

কাল সন্ধের পর থেকে আজ বিকেলের মধ্যে তো আমি কোনো রকম অন্যায় করিনি। তবু কৃষ্ণা এত রেগে গেল কেন?

কৃষ্ণা বলল, তুমি আর আমাদের বাড়িতে কক্ষনো এসো না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! আমাকে আত্মহত্যা করতেই হবে!

আমি ভয়ে ভয়ে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—তুমি আর কক্ষনো আমার সঙ্গে মিশো না! আমি মরে যাব! আমি ঠিক মরে যাব!

ওর কথাবার্তা উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। যদি ও মরেই যায়, তা হলে আর ওর সঙ্গে মিশব কি করে? তারপর আর ওদের বাড়িতে আসবই বা কেন? তাছাড়া আমার সাহায্য ছাড়া কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেই বা কি করে? আমার সাহায্য ছাড়া তো ও কিছুই পারে না! ওর ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে বই বদলানো শুরু করে পেন সারানো পর্যন্ত সব কিছু তো আমাকেই করতে হয়।

মেয়েরা হঠাৎ রেগে গেলে তাদের সঙ্গে তখন কোনো যুক্তিপূর্ণ কথা বলে লাভ নেই। নীরবতাই তখন শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

কৃষ্ণা তপ্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আরো অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মিনিট পনেরো বাদে আমি বুঝতে পারলাম, সেদিন সকালবেলা কৃষ্ণা একজন অচেনা লোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছে। না, চিঠিখানাতে আমার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই, আমার কোনো উল্লেখই নেই। আগাগোড়া অসম্ভব অশ্লীল কথাবার্তায় ভরা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেজন্য তুমি আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

—আমি নিশ্চয়ই খুব খারাপ! নইলে লোকে আমাকে এরকম খারাপ কথা লিখবে কেন?

—যাঃ, এর কোনো মানে হয়? পৃথিবীতে কত বদমাস লোক আছে।

—না, তবু কেন আমাকে লিখবে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে!

কৃষ্ণার মনটা খুব সরল। ও শুধু এতদিন পৃথিবীর ভালো জিনিস দেখেছে। এরকম আকস্মিক খারাপের ধাক্কায় খুব আঘাত পেয়েছে।

—দেখি চিঠিটা!

—সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি!

চিঠিটা ছিঁড়ে কয়েক টুকরো করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু একেবারে ফেলে দেয়নি। ওর টেবিলের নীচেই টুকরোগুলো পড়ে ছিল, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমি জুড়তে বসলাম। খুব একটা শক্ত হলো না।

চিঠিখানা যে এতই কুৎসিত, তা আমিও ভাবতে পারিনি। নিশ্চিত কোনো অসুস্থ, বিকারগ্রস্থ মানুষ। কৃষ্ণার শরীর অবলম্বন করে যাবতীয় বিকৃত আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। একটাও প্রেমের কথা নেই। এরকম চিঠি মানুষ কেন লেখে? ধরা যাক, ঐ লোকটির খুব পছন্দ হয়েছে কৃষ্ণাকে, কিন্তু এই রকম চিঠি লিখে তাকে রাগিয়ে দিয়ে লোকটির কী লাভ হবে? অবশ্য রাস্তায় ছেলেরা মেয়েদের উদ্দেশে

যে অশ্লীল কথা বলল, তাতেই বা তাদের কী লাভ?

আশ্চর্যের ব্যাপার চিঠিটাতে লোকটির নাম ও ঠিকানা আছে। সে একলা থাকে। তার ঘরে কৃষ্ণাকে ঐসব অসভ্য কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি লোকটার কাছে যাব।

কৃষ্ণা আমার হাত চেপে ধরে বলল, না, তুমি যাবে না!

—কেন?

—এসব লোক যা খুশি করতে পারে! যদি তোমাকে—

আমি আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ওর সামনে তুলে ধরে বললাম, এটা দেখেছ? খুনীদের বুড়ো আঙুল এরকম হয়। কিরোর বইতে ছবি আছে।

রাগে দুঃখে কৃষ্ণার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমার ইচ্ছে হলো লোকটাকে খুন করতে।

লোকটার নাম বাসু হালদার। ঠিকানা রিপন স্ট্রিটে। হতে পারে ছদ্মনাম এবং ঠিকানা। তবু একবার দেখে এলে দোষ কি? তাছাড়া, ছদ্মনাম এবং ভুল ঠিকানা সাধারণত একটু সুন্দর গোছের হয়। বাসু হালদার কিংবা রিপন স্ট্রিট, এ দুটোব মধ্যেই খানিকটা সত্যের গন্ধ আছে।

রিপন স্ট্রিট ঠিক কোথায়, তখন আমি চিনি না। রিপন কলেজের নাম বদলে সুবেন্দ্রনাথ কলেজ হয়েছে জানি তা হলে কি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্ট্রিটই রিপন স্ট্রিট? ঐখানকার একজন লোক কৃষ্ণাকে চিনল কি করে? ঠিকানাই বা জানবে কেমন করে? কৃষ্ণা চিঠির টুকরোগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। আমাকে ও কিছুতেই ওখানে যেতে দেবে না। কিন্তু লোকটার নাম আর ঠিকানা তো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

সেই দিনই সন্ধেবেলা, কৃষ্ণাকে খানিকটা শান্ত করে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দুজন বাস কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করতেই বিপন স্ট্রিটের হদিস পাওয়া গেল।

আমাকে যেতে হলো একাই। কোনো বন্ধুবান্ধবকে এ-কথা বলা যায় না। তাছাড়া কৃষ্ণাকে আমি খুব গোপন করে রেখেছি। এতদিন আমার মনে হতো, মেঘের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাসাদে যেন কৃষ্ণা থাকে, সেখানে আমি ছাড়া কেউ যেতে পারে না। আমি ছাড়া আর কেউ কৃষ্ণার রূপ প্রত্যক্ষ করেনি। হঠাৎ এই কুৎসিত চিঠিটা কৃষ্ণাকে রুক্ষ বাস্তবের মধ্যে টেনে আনে: আমি কৃষ্ণার মুখ, গলা, দুটি হাত, কোমরের খাঁজ আর পায়ের পাতা ছাড়া কিছুই দেখি নি, আর লোকটা কৃষ্ণার নির্লোম উরুর কথা উল্লেখ করেছে। আমি ওর মাথার ঘিলু ছড়িয়ে দেব রাস্তার ধুলোয়।

রিপন স্ট্রিট রাস্তাটা বেশ লম্বা। একদিকে সার্কুলার রোড, অন্যদিকে

ওয়েলেসলি। সার্কুলার রোডে এসে চকিতে আমার একটা কথা মনে পড়ল। এণ্টালির কাছে এক ডাক্তারের চেম্বারে গত সপ্তাহে কৃষ্ণা দিন তিনেক এসেছিল —ওর অ্যালার্জির চিকিৎসা করবার জন্য। একদিন আমিই পৌঁছে দিয়েছি। ডাক্তারখানাটিতে বেশ ভিড়, কৃষ্ণাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল, হয়তো সেই সময়েই ওকে কেউ দেখেছে! এক হাজার জনের মধ্যে বসে থাকলেও কৃষ্ণার দিকে সকলের চোখ পড়বে। ও সাঙ্ঘাতিক কিছু রূপসী নয়, কিন্তু ও আলাদা।

হয়তো লোকটা কৃষ্ণার পাশেই বসেছিল। গা ঘেঁষে। ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে যখন কৃষ্ণা ওর নাম ঠিকানা বলেছিল, সেই সময় লোকটা শুনে নিয়েছে। এই কথা চিন্তা করেই আমার আরো রাগ বেড়ে যায়।

ডাক্তারখানায় একবার উঁকি দিলাম। আজও খুব ভিড়। এর মধ্যে বাসু হালদারকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। আমি তো আর পুলিস নই যে ভেতরে ঢুকে সকলের নাম জিজ্ঞেস করতে পারব।

ঠিকানা খুঁজতে রিপন স্ট্রিটে ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার মতন। এটা ঠিক যেন বাঙালিপাড়া নয়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, অবাঙালি মুসলমান, চীনে—এই ধরনের লোকই বেশি দেখতে লাগলাম। যেন বিদেশের কোনো অচেনা রাস্তায় এসেছি। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আমি এসেছি প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু আমি অসহায়। বাসু হালদার যদি গুণ্ডা হয়? যদি একসঙ্গে চার-পাঁচজন লোক আমাকে ঘিরে ধরে তাহলে আমি কী করব?

এখনো ফিরে যেতে পারি! সসঙ্কোচে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। কেউ কি বুঝে ফেলেছে যে আমি কাপুরুষ? আমার হাতের আঙুল হত্যাকারীর মতন, কিন্তু কোনো মানুষকেই খুন করার সাহস আমার নেই। কিরোর বইতে ভুল ছবি দিয়েছে। আমি যদি এখন ফিরে যাই, কেউ কিছুই বুঝবে না। কৃষ্ণা তো আমাকে আসতে বারণই করেছিল। তবে যদি আমি ফিরে গিয়ে বলি খুঁজে দেখে এসেছি ঐ ঠিকানায় কোনো বাড়ি নেই, ঐ নামে ও পাড়ায় কোনো লোক নেই —তাতে কৃষ্ণা খুশি হবে না? হয়তো সত্যিই ঐ নাম ঠিকানায় কেউ নেই—তবু এত দূর এসেও যাচাই না করেই ফিরে যাব? আর কেউ জানবে না, তবু নিজের কাছেই এই সামান্য মিথ্যেটুকু মেনে নিতে লজ্জা পেয়ে গেলাম।

বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে এগোলাম। খুব কাছাকাছি চলে আসছে। আমার শরীর কাঁপছে। যদি ঠিকানাটা খুঁজে পাই, যদি বাসু হালদারকে দেখি, তখন আমি কী করব? ওকে মারব? শরীরটা যেন ঐ চিন্তাতেই অবশ হয়ে আসে। কোনোদিন কোনো লোককে মারার জন্য এতখানি রাস্তা তেড়ে যাইনি!

এবার আমিই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন ঠিকানাটা ভুল হয়।

যেন ঐ নামে কেউ যেন না থাকে! অশ্লীল চিঠি যারা লেখে, তারা কেউ কক্ষনো সঠিক নাম ঠিকানা দেয় না। আমি শুধু শুধু সন্ধেবেলাটা নষ্ট করতে এলাম!

বাঁ দিকে একটা গলি, সেটাও রিপন স্ট্রিট। একপাশে একটা বস্তি। ঠিক এই রকম জায়গাতেই গুণ্ডাদের আড্ডা থাকে। আমার নিয়তি যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। ঐ গলির মধ্যে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে। আমি নিরস্ত্র অসহায়। তবু আমাকে যেতে হবে। আসলে আমি লাজুক, কোনোদিন তো আমার মারকুট্টে বলে নাম নেই। তবু কেন এলাম!

গলিটায় আবছা অন্ধকার। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পুরোনো আমলের তিনতলা বাড়ি। দেওয়ালের রং চটা, পলেস্তারা খসে পড়েছে। দরজার ওপর ছোট্ট একটা সাইন বোর্ড তাতে বোঝা গেল ওটা একটা মেস বাড়ি। এবং সেই নম্বর।

উত্তেজনায় আমি রীতিমতন কাঁপছি! বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি যে অত দূরে এসে বাড়িটা খুঁজে বার করতে পেরেছি সে জন্য আমার একটু আনন্দও হচ্ছে। কিন্তু এরপর আমি কী করব? আমি বাসু হালদারকে দেখতে চাই না। সে একটা ঘৃণ্য জীব, তার কাছে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

দরজার কাছেই একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পাজামা আর গেঞ্জি পরা, বেশ লম্বা, মাঝারি ধরনের বয়েস। লোকটি আমাকে দেখে ফেলেছে।

—কাকে খুঁজছেন?

যদিও সাইন বোর্ডেই লেখা আছে, তবু আমি বোকার মতন প্রশ্ন করলাম, এটা কি একটা মেস বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে খুঁজছেন?

যদিও লোকটা বাংলায় কথা বলছে, তা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে বাঙালি কেউ থাকে?

—হ্যাঁ আছে কয়েকজন। কাকে খুঁজছেন আপনি?

—বাসু হালদার।

লোকটি কি উত্তর দিতে সামান্য একটু বেশি সময় নিল? বেশি তীক্ষ্ণভাবে তাকাল আমার দিকে? আমার বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ।

—না, ও নামে কেউ থাকে না।

—হালদার কেউ নেই?

—না।

—এই ঠিকানাই তো ছিল।

—না, কেউ থাকে না। ভুল ঠিকানা—

লোকটি আর কোনো কথা না বলে হঠাৎ হন হন করে ভেতরে চলে গেল। আমিও আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। আর কোনো লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে হলো না। আমার হাত-পা হাল্কা হয়ে গেছে। এখন যে রকম ভাবে হোক, এই গলিটা খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া দরকার। আমি চিঠি সঙ্গে আনি নি। যদি বাসু হালদারের দেখাও পেতাম, কী বলতাম তাকে? সে যদি চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করত। কিংবা অন্য কেউও তো বাসু হালদারের নাম করে চিঠিটা লিখতে পারে।

আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, ঐ লোকটাই বাসু হালদার। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? ওই নিশ্চয়ই ভেবেছিল কেউ না কেউ আসবে। যাতে মেসের মধ্যে জানাজানি না হয়।

গলির বাইরে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। লোকটা যদি বাসু হালদার হয়ে থাকে, তবু চট করে অস্বীকার করল কেন? নিশ্চয়ই আমাকে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েই লোকটা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম, ও তা জানে না। বেশির ভাগ সময় আমিই অপরাধী হয়ে থাকি, অন্যরা আমাকে শাস্তি দেয় কিংবা অপমান করে যায়। এক সন্ধের জন্য আমি আমার ভূমিকা পাল্টাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা কি অত সোজা।

৮

এক সময় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি প্রায়ই বই-চুরির অভিযানে বেরুতাম। তা বলে আমাদের নিছক ছিঁচকে চোর ভাবা উচিত নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু।

জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই বা কিছু আগে থেকে আমাদের দেশের বনেদি পরিবার ভেঙে পড়তে থাকে। অনেক বিরাট বিরাট বাড়ি খাঁ খাঁ করে। এক সময় জমিদাররা ছিল শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। উনবিংশ শতাব্দীতে এরকম একটা ঢেউ উঠেছিল, তার মধ্যে বেশ খানিকটা ছিল ফ্যাশান বা হুজুগ।
[illegible] সামগ্রী এবং দুর্লভ বই সংগ্রহ
[illegible] দেখা যাবে সেইসব জমিদারবাড়ির
[illegible] বলছি, অধিকাংশ, ব্যতিক্রম আছে) মূর্খ
[illegible] ধারে না—বাড়ির কোনো ঘরে জমা রয়েছে
[illegible] —যার মধ্যে এমন বইও আছে, বহু দাম দিলেও

এখন পাওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু বহুকাল তালা খোলা হয় না সেই ঘরের, মেঝেতে তিন ইঞ্চি ধুলো। আমার বন্ধু দেবরাজ সেইসব বই ন্যায় বা অন্যায় উপায়ে সংগ্রহ করে এনে পৌঁছে দেয় প্রকৃত সমঝদারদের কাছে। আমি তার তল্পিবাহক মাত্র।

দেবরাজ অনেক কিছু খবর রাখে। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কোথায় কোথায় বড়ো বড়ো জমিদারবাড়ি আছে, তার একটা ম্যাপ সে তৈরি করে ফেলেছে। এ ছাড়া তার অনুচররা খবর দিয়ে যায় কোন দুর্লভ বই কোন্ বাড়ির আলমারিতে বন্দী আছে।

সেবার মুর্শিদাবাদের যে গ্রামটায় আমরা গিয়েছিলাম, তার নামটা বদলে দেওয়া দরকার, ধরা যাক গ্রামটির নাম হেতমপুর। ট্রেন থেকে নেমে মাইল তিনেক সাইকেল রিকশা চেপে গেলে হঠাৎ মনে হয় যেন রূপকথার রাজপুরীর সামনে এসে পড়েছি। কী বিশাল এক প্রাসাদ, প্রথমেই থাকে থাকে উঠে গেছে অনেকগুলো সিঁড়ি, তারপর মস্তবড়ো বারান্দা, তারপর সুগম্ভীর, সুউচ্চ হর্ম্য। সোনা যায় মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়িকে টেক্কা দেবার জন্য এক হিন্দুরাজা এরকম প্রাসাদ বানিয়েছিল।

বাড়িটি তিন মহলা। একটা মহল শুধু ঠাকুরদেবতার মন্দিরেই ভর্তি। ছোট ছোট অনেকগুলো ঘরে অনেক রকম দেবতার মূর্তি—বোঝা যায় সেই দেবতারা বহুকাল বুভুক্ষু আছে, কেউ আর তাদের পুজোটুজো দেয় না। বাড়ির মধ্যেই প্রশস্ত উঠোনে একটি বাগান ছিল, এখন তাকে বাগানের কঙ্কাল বলা উচিত। দোতলা-তিনতলার প্রত্যেকটি ঘরের জানলা বন্ধ অর্থাৎ কেউ থাকে না।

ভেতর দিকে একতলার একটি ঘরে নায়েব বসেন, তাঁকে নায়েব না বলে মুহুরি বা কেরানিই বলা উচিত, কারণ জমিদারিই নেই, তার আবার নায়েব কি? লোকটি এই বাড়িটির সঙ্গে মানানসই রকমের অতি বৃদ্ধ, মাথাভর্তি ধপধপে চুল, আর এতই রোগা যে মনে হয় হাওয়া খেয়েই ওর পেট ভরে। আমরা সেই ঘরে ঢুকলাম।

প্রত্যেকটা বাড়িতে চুরি করার আলাদা আলাদা কায়দা আছে। এই বাড়িতে প্রযোজ্য কৌশল দেবরাজ আমাকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল। সে জন্য ইতিহাস জানতে হয়।

মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল যখন জমজমাট, তখন অনেক রাজপুত, মাড়োয়ারী এবং পাঞ্জাবি এসে এখানে ভিড় জমিয়েছিল। সকলেই মধুর লোভে। কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ বাণিজ্যে। একথা তো আমরা সকলেই জানি যে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস বদলে দিয়েছিলেন, এই মুর্শিদাবাদে বসেই, যার নাম জগৎশেঠ। এদের অনেক বংশধর এখনো এ

অঞ্চলে রয়ে গেছে, পরিষ্কার বাংলা বলে, তাদের পদবী হয় সিংহ, সিংহানিয়া বা হিম্মৎসিংকা—এই ধরনের। যাই হোক, নবাবী আমলের পড়ন্ত বেলায় একজন রাজপুত্র এই এলাকায় খুব দুর্দান্ত হয়ে ওঠে, সে-ই এই হেতমপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তার নাম বিক্রম সিং (নামটা একটু বদলে দিতে হলো, কারণ এখনো আমাদের ধরা পড়ার ভয় আছে)।

বিক্রম সিং-এর বংশের কয়েক পুরুষ খুব দাপটে এখানে রাজত্ব (আসলে জমিদারি, কেননা তাদের রাজা খেতাবটি স্বরচিত) চালিয়েছেন। কিন্তু তাদের মনোকষ্টের একটা কারণ ছিল। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামে বইতে নিখিলনাথ রায় লিখেছেন ঐ বিক্রম সিং (তার আসল নাম বইতে আছে) একটি ডাকাত ছিল, অরাজকতার সময় লুটপাট করে নিজের জমিদারি বানিয়েছে। নিজের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে এরকম কথা কারুর ভালো লাগে না। তখন হেতমপুরের রাজবাড়িতে বিক্রম সিং-এর বিরাট অয়েল পেইন্টিং ঝুলছে। শোনা যায় বিক্রম সিং-এর এক বংশধর নাকি নিখিলনাথ রায়কে তাঁর বই থেকে ঐ অংশটুকু বদলে দেবার জন্যে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। গরীব ইস্কুল মাস্টার নিখিলনাথ রায় নিরীহভাবে বলেছিলেন, আমার বই থেকে দশটা লাইন কাটলেই কি আর আমার ইতিহাস বদলাবে? ইতিহাসকে কখনো কাটা যায়?

ধরা যাক ঐ বংশধরটির নাম জেদী সিং। সে অন্য পথ ধরল। টাকার বিনিময়ে এক সাহেবকে দিয়ে লেখাল রাজা বিক্রম সিং-এর জীবনী। সাহেবও রবিন হুডের গল্পটি দিব্যি ঢুকে দিল। সে লিখল যে বিক্রম সিং ছিল যেমন বীর তেমনি দয়ালু —অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক জমিদারদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সে বিলিয়ে দিত গরীব দুঃখীদের মধ্যে। ইত্যাদি। জেদী সিং সেই বই ছাপাল এক লক্ষ কপি। বিনামূল্যে সে বই বিতরণ করা হতে লাগল। কিন্তু একলক্ষ ইংরিজি বই নেবার মতন লোক সে আমলে মুর্শিদাবাদে খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। বহু বই জমে রইল স্তূপ হয়ে। জেদী সিং উইল করে গেল, যখন যে-কেউ এসে বই চাইবে তার এস্টেট থেকে অবশ্যই তাকে সে-বই দিতে হবে!

এই ইতিহাস জেনেশুনে আমরা ঢুকলাম নায়েবের ঘরে। পাকা মাথার বৃদ্ধটি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে হলো, অনেকদিন এখানে বাইরের কোনো লোক আসে না।

দেবরাজ সবিনয়ে বলল, শুনেছি, এই রাজবাড়ির লাইব্রেরিটি খুব বিখ্যাত, আমরা সেটি দেখতে এসেছি।

নায়েব বললেন, লাইব্রেরি? সেখানে আপনারা কি দেখবেন?

—আজ্ঞে, লাইব্রেরিতে বই দেখব, তা ছাড়া আর কি? আমার এই বন্ধুটি

রিসার্চ করে—ওর কয়েকখানা বিশেষ বই একটু দেখা দরকার—

আমি রিসার্চ স্কলারদের মতন ভারিক্কি গম্ভীর মুখ করে রাখলাম।

নায়েব হাত নেড়ে বললেন, হবে না!

দেবরাজ বিন্দুমাত্র নিরাশ না হয়ে কণ্ঠস্বরে আরো মধু ঢেলে বলল, হবে না? আমরা এতদূর থেকে এসেছি...আপনি যদি একটু দয়া করেন...

নায়েব এবার আরো বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে ভাই, আমি কি করব? এ কি আমার বাড়ি? এ বাড়ি এখন ভূতের বাড়ি! রাজারা শহরে থাকে—তারা সাত ভাই সব সময়ে নিজেদের মধ্যে মামলা-মকদ্দমা লড়ছে—বিষয় সম্পত্তি গেছে রিসিভারের হাতে। আমি নিজেই তিনমাসের মাইনে পাইনি!

—কিন্তু লাইব্রেরির চাবি তো আপনার কাছে আছে!

—লাইব্রেরি ঘর একটা আছে বটে, দশ-পনেরো বছর সে ঘর কেউ খোলেনি। রাজাদের হুকুম নিয়ে আসুন, তবে ঘর খুলব!

টেবিলের উল্টোদিকে দুটো চেয়ার ছিল। নায়েব আমাদের বসতে বলেননি। দেবরাজ চোখের ইশারা করে আমাকে বলল, বোস!

আমরা দুজনে বসলাম। তারপর দেবরাজ বেশ শক্ত গলায় বলল, আমরা 'লাইফ অফ বিক্রম সিং' বইটা নিতে এসেছি। সে বই আপনি দিতে বাধ্য।

—কেন বাধ্য কেন?

—এই এস্টেটের সেই রকম নিয়ম করা আছে। ঐ বই কেউ চাইতে এলে খালি হাতে ফিরে যাবে না!

নায়েবের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। গোল গোল চোখে আমাদের দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এরকম একটা কথা অনেককাল আগে শুনেছিলাম অবশ্য। কিন্তু গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে সে বই কেউ চাইতে আসেনি। আপনারা একথা জানলেন কি করে? ঐ ডাকাতের জীবনী পড়ে আপনাদের কী লাভ হবে?

—আজ্ঞে, আমরা এইসব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করি কিনা—

—ঐ একখানা বই নেবার জন্য আপনারা কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চলুন তা হলে!

ভদ্রলোক টেবিলের টানা থেকে একটা চাবির তোড়া বার করলেন, যাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি চাবি। একসঙ্গে অত চাবি দেখলেই ভয় লাগে, একটু যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

বার বাড়িতে দোতলার উপর টানা তিনটি ঘর জুড়ে লাইব্রেরি। দরজা খোলার

পর সেই ঘরের দৃশ্য দেখলে কান্না পায়। সার সার বইয়ের র‍্যাক। অধিকাংশই কাৎ হয়ে আছে, ঘুণে ধরা, একেবারে ঝুরঝুরে। দুটো আলমারি উল্টে পড়ে আছে। ছিন্নভিন্ন অবস্থায় হাজার হাজার বই। মেঝেতে পুরু ধুলো, ঘরের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত মাকড়সার জাল।

দেবরাজ সত্যিই বই ভালোবাসে। সে ঝাঁঝালো গলায় বলল, আপনারা কি মানুষ? বইগুলোর এ অবস্থা করেছেন? মাঝে মাঝে ঘরটা একটু সাফ করতেও পারেননি?

বৃদ্ধ একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, রাখুন মশাই! আমি নিজে তিনমাসের মাইনে পাইনি, তবু পড়ে আছি! চাকর-বাকররা সব পালিয়েছে! এ ঘর সাফ করা কি আমার দায়?

মুখে রুমাল বেঁধে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। যে-কোনো জিনিসে হাত দিলেই ধুলো ওড়ে। অনেক বই পোকায় খেয়ে একেবারে কুচিকুচি করে দিয়েছে। এ বাড়িতে কোনো এক পুরুষের বইয়ের খুব যত্ন ছিল। বহু বই বাঁধানো হয়েছিল মরোক্কা চামড়ায়। সে চামড়ার লোভেই এত পোকা। বড়ো বড়ো ম্যাপ রাখার জন্য গোল গোল টিনের খাপ করা ছিল, যত্নের অভাবে সেগুলো এখন মুড়মুড়ে, ভেতরে আরশোলার বাসা।

নায়েব বললেন, দেখুন, এই জঞ্জালের মধ্যে আপনাদের সেই বই খুঁজে বার করা যায় কিনা!

দেবরাজ আর আমি দু'দিকে খুঁজতে শুরু করলাম। অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর এক একখানা বই কিছু আস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ারের ফোলিও এডিশন, এরিক প্যাটরিজের আদি ডিকশনারি, মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সংস্করণ—প্রতিটি অমূল্য বই।

এক জায়গায় একসঙ্গে অনেক বই গাদা করা। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সবই সেই 'লাইফ অফ বিক্রম সিং'। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, পেয়েছি!

দেবরাজ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চাপা গলায় বকুনি দিয়ে বলল, চুপ কর না, ইডিয়েট!

তখন দেখলাম দেবরাজ অন্য দিকে এক-একখানা বই তুলছে আর জামার তলায় পেটে গুঁজছে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। আমাকেও ইশারা করল। তারপর দুজনেই পাজামা আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরে এসেছি, তাই বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

খানিকটা বাদে আমাদের দু'জনেরই পেট ফুলে ঢোল। আর জায়গা নেই। বিক্রম সিং-এর 'লাইফ' দু'জনে দু'খানা হাতে নিয়েছি বটে, কিন্তু আর দুটি বেশ

বড়ো বাঁধানো বই সম্পর্কে দেবরাজের দারুণ লোভ। ও দুটো ও নেবেই।

ধুলোর ভয়ে নায়েব ভেতরে ঢোকেননি। দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, হলো আপনাদের? পেলেন?

দেবরাজ বলল, হ্যাঁ, পেয়েছি। আর এই দু'খানা বই আমাদের দেবেন।

নায়েব বলে উঠলেন, না, না, অন্য বই আমি দিতে পারব না। এ তো আমার বাপের জিনিস নয়!

—কিন্তু দেখুন, এগুলো তো নষ্টই হচ্ছে। তবু যদি অন্যের কাজে লাগে!

—আমার তো কোনো হাত নেই। রিসিভার এসে যদি বইয়েরও হিসেব চায়।

—এই বইয়ের হিসেব করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দেখুন কত বই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—কত বইয়ের একটা পাতাও আস্ত নেই। এরকমভাবে বই নষ্ট করা পাপ! আর কিছুদিনের মধ্যে আর একটা বইও আস্ত থাকবে না! তার চে' আমাদের দিয়ে দেওয়া ভালো নয়?

—আমি কি দেওয়ার মালিক!

—আপনার আসল মালিকরা কোনোদিন এ-বইয়ের হিসেব নিতে আসবে না। আমাদের এই বই দুটো অন্তত দিন, আমরা দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছি!

বই দুটি হান্টারের গেজেটিয়ারের দুটি খণ্ড ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের। তখনকার দিনে এক খণ্ডের দাম ছিল চার টাকা।

ভদ্রলোক বই দুটি হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, এসব পুরনো বইয়ের দাম বেশি হয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্তত ডবল দাম তো হবেই।

দেবরাজ আমাকে নকল এক ধমক দিয়ে বলল, তুই খুব জানিস। পোকায় কাটছে, তার আবার দাম। অত টাকা আমরা পাব কোথায়?

আমি বললাম, অন্তত দেড়গুণ দাম দেওয়া উচিত। দুটো বই বারো টাকা।

নায়েব বললেন, পনেরোটা টাকা অন্তত দিন!

পনেরো টাকায় আমরা যে বই কিনলাম, তার দাম এখন অন্তত পনেরো শো টাকা।

সেই পনেরো টাকা পেয়েই বৃদ্ধ নায়েব এত খুশি হলেন যে তিনি জোর করে আমাদের নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে, চা মিষ্টি খাওয়াবেনই। আমি খুব আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দেবরাজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। ওর কায়দাই আলাদা। ও এই বৃদ্ধের সঙ্গে বেশি করে ভাব জমাতে চায়।

রাজবাড়ির সামনের রাস্তার উল্টোদিকে বৃদ্ধের বাড়ি মানে দুটি অন্ধকার কুঠুরি। ব্যাপারটা দেখে খুব আশ্চর্য লাগে। সামনের রাজবাড়িতে অন্তত তিরিশ-

চল্লিশটা ঘর খালি পড়ে আছে তালাবন্ধ অবস্থায়—আর এই বৃদ্ধকে থাকতে হয় এই এঁদো কুঠুরিতে—অথচ ঐ সব ঘরের চাবি ওর কাছে। আমার ইচ্ছে হয় বৃদ্ধের কাছ থেকে চাবির থোকা কেড়ে নিয়ে ঐ প্রাসাদের প্রত্যেকটি ঘরের দরজা খুলে দিতে। আর কিছু নয়—অন্তত আলো বাতাস ঢুকুক!

বৃদ্ধের স্ত্রী নেই। বড়ো ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে, থাকে বহরমপুরে। একটি যুবতী, একটি কিশোরী ও একটি বাচ্চা ছেলে আছে বাড়িতে, ওরা বৃদ্ধের নাতি নাতনী। বৃদ্ধের বড়ো মেয়েটিও গত হয়েছে এক বছর আগে। যুবতী মেয়েটিই চা এনে দিল।

যদিও আমাদের বেশ খিদে পেয়েছে, কিন্তু পেট ভর্তি। পেট ভর্তি বই নিয়ে বসাও বেশ কষ্টকর। বৃদ্ধ আমাদের বারবার একটি চৌকির ওপর বসতে বলছেন। সেখানে অতিকষ্টে বসেই দেবরাজ ওর পাঞ্জাবি তুলে বইগুলো বার করতে লাগল। স্তম্ভিত বৃদ্ধকে একটাও কথা না বলতে দিয়ে ও পকেট থেকে একশোটি টাকা বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বলল, আমরা আবার আসব!

পরের বার আমরা গিয়েছিলাম বড়ো বড়ো টিনের খালি ট্রাঙ্ক নিয়ে। যাতে আর পেটে বই গুঁজতে না হয়। প্রথমবার চুরি করতে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার ডাকাতি। প্রাক্তন ডাকাতের বাড়িতে ডাকাতি করায় দোষ আছে নাকি!

৯

অনেকক্ষণ থেকেই ভদ্রলোক তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। ট্রামে যেদিকে দুটো লম্বা সীট থাকে সামনাসামনি, সেখানে তিনি আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন। একজন অচেনা লোক বার বার মুখের দিকে তাকালে বেশ অস্বস্তি হয়। অথচ আমি একথাও বলতে পারি না যে, আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? মেয়েরাও একথা বলতে পারে না।

লোকটি সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মধ্যবয়স্ক, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই, দু'কানে বেশ বড়ো বড়ো চুল। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখলাম, লোকটিকে আমি চিনি না, কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ে না।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এসে, ট্রাম যখন বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে, ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একটা কথা বলব? আপনার কি কন্যা রাশি?

আমার মুখে একটুও অবাক ভাব ফুটল না। ভদ্রলোকের চোখের দিকে চোখ

রেখে বললাম, জানি না তো?

—আপনি আপনার কোন রাশি জানেন না?

—না।

—আপনার নিশ্চয় ভাদ্র মাসে জন্ম?

—ভাদ্র মাসে যাদের জন্ম হয়, তারা বুঝি নিজেদের রাশি জানে না?

—সে কথা বলছি না। আপনার ভাদ্র মাসে জন্ম কি?

বুঝলাম, ইনি একজন শখের জ্যোতিষী। পেশাদার নন, কারণ নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে পয়সাকড়ির আশা করছেন না। আমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে আমার পকেটে পয়সাকড়ি থাকে না।

বললাম, হ্যাঁ, ভাদ্র মাসেই।

—আপনার বাবা বেঁচে নেই।

—নেই।

—আপনার পেটে মাঝে মাঝে খুব ব্যথা হয়? পেটের একটা অসুখ আছে।

—না তো। মিলল না এটা।

—সতেরো বছর বয়েসে আপনার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। জলে ডোবা, হ্যা জলে ডোবাই, খুব বড়ো ফাঁড়া গেছে।

এবার আমার মতন অবিশ্বাসীকেও লোকটি একটু টলিয়ে দিল। লোকটা আগেরগুলো আন্দাজে বলতে পারে, কিন্তু এটা জানল কি করে! ঐ রকম বয়েসে, বোড়াল গ্রামে একটা মস্তবড়ো দীঘিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে, মাঝ দীঘিতে আমার পায়ের শিরায় টান ধরে ছিল। ডুবেই গিয়েছিলাম সেবার, দুজন জেলে সেখানে মাছ ধরতে এসেছিল, তারা বাঁচিয়ে দেয়। অনেক দিন আগেবার কথা।

আমি উল্টে এবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, আপনার বাড়ি কি বোড়াল গ্রামে?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি অবাক হলেন বেশি। বললেন, না তো। আমি থাকি ফার্ন রোডে। বোড়াল গ্রাম কোথায়?

—চব্বিশ পরগণায়। রাজনারায়ণ বসুর গ্রাম, পথের পাঁচালির শুটিং হয়েছিল।

—সেখানে আমি থাকতে যাব কেন। কোনো দিন যাইওনি।

—আপনি আমার জলে ডোবার কথা বললেন কিনা! যাক গে, আপনি হঠাৎ আমাকে এসব প্রশ্ন করছেন কেন?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন, কেন, আপনি কিছু মনে করছেন, ভাই?

—না, না, তা করিনি! হঠাৎ আপনি আমাকে দেখে এসব বলতে লাগলেন। প্রায় সবগুলোই মিলেছে কিন্তু...আপনি বুঝি জ্যোতিষী?

—ঠিক জ্যোতিষী বলতে যা বোঝায়, তা আমি নই। তবে এই শাস্ত্রটার চর্চা করি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এবার নামবেন। আমি আর কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে আর একবার আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম। তিনি রীতিমতন অবাক হয়েছেন। সেই অবাক-মুখ নিয়ে নেমে গেলেন তিনি।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। শখের ডাক্তারের মতন শখের জ্যোতিষীও কম নেই। এমনকি সাহেব-জ্যোতিষীও আমি দেখেছি। তাদের কেউ আমার হাত দেখে বা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার অতীত কিংবা ভাগ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। কয়েকটা মিলেও গেছে। কিন্তু এই সব জ্যোতিষীদের আমি অবাক করে দিয়েছি প্রত্যেকবার। আমি তাদের কৃতিত্বে কোনো রকম সাধুবাদ দিইনি। নিজের থেকে একটাও প্রশ্ন করিনি কক্ষনো। মিলেছে তো বয়ে গেছে, এরকম একটা ভাব আমার। আমার ভাগ্য সম্পর্কে আমার কোনো রকম আগ্রহই নেই। কোনো অপ্রমাণিত তত্ত্বও আমি মানি না। ফ্রয়েড বলেছেন, কোনো কোনো লোকের খানিকটা টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকে। অনেকের যেমন স্মরণশক্তি সাঙ্ঘাতিক হয়। মেয়েরা যেমন দেড় বছর আগে কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে আমি কোন জামা পরে গিয়েছিলাম তা পর্যন্ত বলে দিতে পারে। এটাও সেই ধরনের ক্ষমতা। এর ফলে কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার জীবনের কিছু কথা এরা বলে দিতে পারে। কারণ সবই তো সেই লোকটির মনের মধ্যে আছে। এই জন্যই অতীতের ঘটনাগুলোই বেশির ভাগ মেলে, ভবিষ্যতের কথা স্রেফ আন্দাজে ঢিল।

কোনো একজন লোকের সঙ্গে নতুন পরিচয় হলে তারপর তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। কোনো একটি নতুন শব্দ শিখলে যেমন পরের দিনই খবরের কাগজে সেই শব্দটা পাওয়া যায়।

কানে-চুলওয়ালা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেও দু'দিন পরেই বাজারে দেখা হলো।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে পরিচয়সূচকভাবে হাসলাম। উনিও চিনতে পেরেছেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এদিকেই থাকেন বুঝি?

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, সেটাও আপনার জ্যোতিষ শাস্ত্র দিয়ে জানা যায় না?

ভদ্রলোকও হাসলেন। তারপর বললেন, আপনার কাছে ভাই আমি একটা ব্যাপারে ঠকে গেছি। এর আগে যতজনকে দেখেছি, সবাই একটু পরে নিজে থেকে কিছু না কিছু জানতে চেয়েছে। অন্তত আমাকে পরীক্ষা করার জন্যও—

আমি বললুম, আপনি ভুল লোককে বেছেছেন। ট্রামে তো আরো অনেক লোক ছিল।

—আপনি এসব মানেন না একদম?

—মানামানির প্রশ্নই নেই। একদম মাথাই ঘামাই না।

—আমিও আগে তেমন বিশ্বাস করতুম না। একবার কাশীতে একজন—

—আপনার জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিয়েছিল তো?

— আমার নয়, আমার মেয়ের সম্পর্কে। আমি একটু ভয় পেলুম। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একটা করুণ কাহিনী শোনাবেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, এমনকি কোনো দুর্ঘটনার কাহিনী শুনতেও আমার খারাপ লাগে—এমনিই তো এসব চোখে দেখছি, আরো বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? ভদ্রলোকের মেয়ে বেঁচে আছে তো?

উনি বললেন, আমার একটিই মাত্র মেয়ে, লেখাপড়াতে ভালো, দেখতে-শুনতেও ভালো। মেয়ের মা এমনিই শখ করে কাশীর এক সাধুর কাছে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কাশীতে আমার বড়ো শালার বাড়ি, সবাই মিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম— তা সাধু আমার মেয়েকে দেখেই বলল, এ মেয়ের বিয়ে দেবেন না। যতবার আমরা জিজ্ঞেস করি ততবারই ঐ এক কথা। এদিকে মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক। মেয়ে নিজেই তার কলেজের এক অধ্যাপককে পছন্দ করেছে, আমরাও আপত্তি করিনি, খুব ভালো ছেলে, আপত্তি করার কিছু নেইও—।

সাধুর কথা শুনে মনে একটু খটকা লেগেছিল, তাই ছেলে আর মেয়ের কুষ্ঠি মেলালাম আর কয়েকজনকে দিয়ে সবাই বলল, চমৎকার মিল। তাই আমরা আর দ্বিধা করলাম না, বিয়ে হয়ে গেল যথাসময়ে। এক বছরের মধ্যে সেই মেয়ে বিধবা হলো।

আমার খুব কষ্ট হলো ভদ্রলোকের মেয়েটির জন্য। সে শুধু বিধবা হয়েছে —এই জন্যই নয়। তার নিশ্চয়ই এখনো মনে হয় সেই তার অধ্যাপক প্রেমিককে হত্যা করেছে। অর্থাৎ অধ্যাপককে সে বিয়ে না করলে তিনি মারা যেতেন না। এ যে সাংঘাতিক আত্মগ্লানি। যেন পৃথিবীতে আর কোনো অধ্যাপক মারা যায় না। যেন আর কোনো মেয়ে কখনো অকালে বিধবা হয় না। মেয়েটির বুকে ঐ পাষাণভার চাপিয়ে দেবার জন্য ঐ সাধুটিই দায়ী।

ভদ্রলোক বললেন, আজকাল বিধবাদেরও বিয়ে হয়। আমরা মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি নয়। বাড়ি থেকে বেরোয় না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না—

আমি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ভদ্রলোক বললেন, সেই থেকেই আমার কৌতূহল। বইপত্র খুঁজে খুঁজে আমিও

চর্চা করতে লাগলাম—তবে কারুর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলি না, কী দরকার মানুষকে আগে থেকে চিন্তায় ফেলার। একবার হলো কি জানেন...

ভদ্রলোক আরো কোনো কাহিনী শোনাতে যাচ্ছিলেন, আমি সবিনয়ে বললাম, আজ চলি, নিশ্চয়ই এর পরে বাজারে মাঝে মাঝে দেখা হবে আপনার সঙ্গে—

প্রায় পালিয়েই গেলাম। আমি এসব কাহিনীকে সত্যিই ভয় পাই। অনেকেই মিলে যাওয়ার নানারকম ঘটনা বলে। এই মিলে যাওয়াটাই বেশি সাংঘাতিক। এক একটা ঘটনা মেলে আর কিছু লোকের ভক্তি বাড়ে। এইসব ঘটনা শুনে আমি মনে মনে একটা কথাই উচ্চারণ করি সব সময়, আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য! একটা প্রশ্নের আজও উত্তর মেলেনি। হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা পড়ে একদিনে পঁচাত্তর হাজার লোক মরে গিয়েছিল—ঐ এক জায়গায় অতগুলো লোকের কি একই দিনে মৃত্যুর কথা ভাগ্যে লেখা ছিল?

১০

ধানবাদ থেকে গাড়িতে ফিরছি, বেশ রাত হয়ে গেছে। পেছনের সীটে সবাই ঘুমোচ্ছে, আমারও চোখ টেনে আসছে, ঢুলে পড়ছি মাঝে মাঝে। অমনি অমিতের কাছে বকুনি খাচ্ছি। অমিত গাড়ি চালাচ্ছে তাকে জেগে থাকতেই হবে। তার সঙ্গে আর একজন অন্তত কারুর জেগে থাকা উচিত। নিজের গায়ে নিজে চিমটি কেটে কেটেও আমি ঘুম তাড়াতে পারছি না।

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে অমিত বলল, ঐ যে!

আমি চমকে উঠে বললাম, কি!

অমিত বলল, সেই যে বলেছিলাম নিরসা'র ভূত! ঐ দ্যাখ দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে পেছনের সীটের সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। তারাও চেঁচিয়ে বলল, কই, কই!

অমিত হেডলাইট জ্বালল। দেখা গেল বেশ খানিকটা দূরে, রাস্তার ধারে সাদা কাপড় পরা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় কোনো স্ত্রীলোক। মাথায় ঘোমটা!

পেছনের সীটের মেয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

জি টি রোডের ওপর, জায়গাটার নাম নিরসা। দু'পাশে খনি এলাকা। এখানকার একটি ভূতের গল্প অনেকদিন প্রচলিত। ভূত নয়, পেত্নী। একটি ছেলে কোলে নিয়ে রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ নাকি দেখেছে ওর কোলে যা থাকে সেটা কোনো শিশু নয়, একটা মরা শুয়োর।

অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে দূরের সেই মূর্তিটা দেখে আমারও গাটা একবার একটু ছমছম করে উঠল। তবু বললাম, যাঃ, ওটা মানুষ নয়। নিশ্চয়ই কোনো কলাগাছ, দূর থেকে ওরকম দেখায়।

অমিত বলল, চল কাছে গিয়ে দেখছি।

পেছনের সীটের একটি নারী প্রায় আর্ত চিৎকার করে বলল, খবর্দার না, ওদিকে যাবে না! গাড়ি ঘোরাও! ঐ ভূতের পাশ দিয়ে গাড়ি গেলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়! আর একটি নারী সাহসিনী। সে বলল, যাঃ তা কখনো হয়! আজ সত্যি দেখব, ওটা ভূত কি না।

অমিত ঘড়ি দেখে বলল, ঠিক বারোটা বাজে। এই সময়েই ও আসে।

মূর্তিটা তখনো সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলাগাছ বলেই মনে হয়।

আমি কখনো ভূত দেখিনি। অনেকবার একটুর জন্যে ফস্কে গেছে। ভূত আমার কপালে সহ্য হয় না। আজ এত কাছে পেয়েও ছাড়ার কোনো মানে হয় না। একটু ভয় ভয় করলেও ভয়েতেও একটা নেশা আছে। তাড়াতাড়ি ড্যাসবোর্ড থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে এক চুমুক দিয়ে মনের জোর বাড়িয়ে নিলাম। তারপর অমিতকে বললাম, গাড়িটা আস্তে আস্তে ঐ দিকে চালা তো!

পেছনের সীটের দুটি মেয়ের প্রবল আপত্তি ও একটি মেয়ের উৎসাহবাণী নিয়ে আমরা এগোলুম। আমার পাশে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে রজত, একটাও কথা বলছে না।

গাড়িটা খানিকটা এগোবার পর স্পষ্ট বোঝা গেল, কলাগাছ নয়, একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকই বটে। মুখটা এখনো দেখা যাচ্ছে না!

—ওমা, এদিকেই আসছে! গাড়ি ঘোরাও!

পেছন থেকে একজন এমন চিৎকার করে উঠল যে সবাই চমকে উঠলাম। তারপর দেখলাম, স্ত্রীলোকটি হাঁটতে শুরু করেছে ঠিকই। তবে এদিকে আসছে না, রাস্তা পার হচ্ছে।

একবার দেখলাম, তার কোলে বাচ্চা বা শুয়োর-টুয়োর কিছু নেই। এমনই একজন স্ত্রীলোক, বেশ বয়স্কা। একবার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির দিকে তাকাল। তারপর রাস্তার পাশে অন্ধকারে নেমে গেল।

তাড়াতাড়ি টর্চ বের করে জানলা দিয়ে ফেললাম। তখনো দেখা যাচ্ছে তাকে। অদৃশ্য হয়ে যায়নি। রজতকে বললাম, চল, নেমে দেখি!

রজত বলল, আমি নামব না।

রজতটা যে এত ভীতু, তা জানতুম না। ও বসে আছে দরজার পাশে। ও না নামলে আমি নামতে পারছি না। ওকে ধমক দিয়ে বললাম, তুই সর না। আমাকে

নামতে দে। রজত বলল, না, নামতে হবে না!

অমিত হো-হো করে হেসে উঠল। দূরে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। দু'পাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ছিল, এবার দেখতে পেলাম একটা আলোর বিন্দু। স্ত্রীলোকটি ঐ দিকেই গেছে। নিশ্চয়ই ওদিকে কোনো বাড়ি আছে। রজতকে সরিয়ে যখন নামলাম, তখন আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

সত্যি ভূত দেখা হলো কিনা, সেটা স্পষ্ট হলো না সেদিন। অনেক রাত্রে রাস্তার পাশে একা একটি স্ত্রীলোককে দেখেছি ঠিকই। কিন্তু গাড়ির জোরালো আলোয় দেখা গেছে, সে একজন মানুষই, ভয়ঙ্কর কিছু নয়, আমাদের ভয়ও দেখায়নি, কোনো ক্ষতিও করেনি। অত রাত্রে একজন স্ত্রীলোক রাস্তার ধারে কেন দাঁড়িয়েছিল, তা বোঝা গেল না। যুবতী হলেও না হয় ভাবতাম অভিসার-টভিসার ব্যাপার, কিন্তু এ যে একদম বুড়ি! হয়তো পাগলী হতে পারে। এ বিষয়ে গাড়ির যাত্রিণীদের মধ্যে রীতিমতন মতভেদ রয়ে গেল।

বাকি রাস্তাটা সবাই মিলে এমন ভূতের গল্প শুরু করল যে কারুর চোখে আর এক ফোঁটাও ঘুম এল না।

অমিত আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোর মনে আছে সেই বীবপুর লেভেল ক্রসিংয়ের কথা?

আমার খুব মনে আছে। ভূতের জন্য সেবার আমবা দারুণ চোখ ব্যথা করেছিলাম।

সেবার আমরা ট্রাকে চেপে ঘুরছিলাম উত্তরবঙ্গ। ট্রাক ড্রাইভারদের দু'তিন টাকা দিলে তারা দশ-পনেরো মাইল রাস্তা তাদের পাশে বসিয়ে পৌঁছে দেয়। একজন ট্রাক ড্রাইভারের মুখেই প্রথম শুনি বীরপুর লেভেল ক্রসিং-এর ভূতের কথা। সে একেবারে সাংঘাতিক পেত্নী। লেভেল ক্রসিং-এর পাশে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে, নাচে, ড্রাইভারদের হাতছানি দেয়। তার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে যে এগিয়ে গেছে, সে আর ফেরেনি। চার-পাঁচজন লোক নাকি এইভাবে মারা গেছে।

আমরা ট্রাক ড্রাইভারটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

না, সে নিজে দেখেনি বটে, তবে তার চেনা জানা অন্য দু'একজন দেখেছে। আর লেভেল ক্রসিং-এর পয়েন্টসম্যান তো রোজই দেখে।

তারপর আরো দু'একজনের মুখে ঐ কাহিনী শুনলাম। কেউ ঠিক নিজের চোখে দেখেনি। তবে সবাই ঐ পয়েন্টসম্যানের কথা বলে। বুঝলাম, ঐ পয়েন্টসম্যানের সূত্র থেকেই গল্পটা ছড়িয়েছে।

অমিত বড্ড গোঁয়ার ধরনের ছেলে। একদিন সন্ধেবেলা আমরা বীরপুর লেভেল ক্রসিং পার হচ্ছি, অমিত হঠাৎ নেমে পড়ে বলল, আজ আমরা এখানেই থাকব! আমার কোনো আপত্তিই শুনল না।

আজকাল বেশির ভাগ লেভেল ক্রসিং-এর দরজাই যন্ত্রে খোলে। তবে এখানে কয়েক জায়গায় হাতে-খোলা দরজা রয়ে গেছে। বীরপুরের এ রাস্তায় রাত্তির বেলা বেশি গাড়ি চলে না। রাত নটা চুয়ান্ন আর রাত তিনটে বাইশে দুটি ট্রেন যায় —সেজন্য সন্ধে থেকেই লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ থাকে—কোনো গাড়ি বা ট্রাক এসে হর্ন দিলে খুলে দেয়।

কাছেই সাদা রঙের একটি ছোট্ট গুমটি ঘর। সেখানে একজন লোক তোলা উনুনে রুটি সেঁকছিল। লোকটির গলায় মোটা পৈতে, মাথায় টিকি। বয়সের মনে হয় গাছপাথর নেই, তবে স্বাস্থ্যটি পেটানো। লোকটি বেশ নিরীহ, মুখে একটা ধার্মিক ধার্মিক ভাব।

অমিত ভালো হিন্দি জানে, লোকটির সঙ্গে অবিলম্বে ভাব জমিয়ে ফেলল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা ওর বানানো রুটি এবং ঢেঁড়স তরকারি পর্যন্ত খেয়েছিলাম। ওর নাম রামখেলাওন, কিন্তু আমরা সংক্ষেপে রামজী করে নিলাম। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে ও বিশেষ অবাক হলো না, বেশ সহজ ভাবেই নিল।

রামজী বলল, হ্যাঁ ও লেড়কি তো হামেশাই আসে, ওকে দেখতে পাওয়া যায় তিনটে বাইশের ট্রেনের একটু আগে। ঐ জন্যই দেখবেন, রাত্তিরবেলা এখন যত ট্রাক যায়, তারা অনেক দূর থেকে হর্ন দিতে দিতে আসে, আমি আগেই দরজা খুলে দিই বলে ওরা আর দাঁড়ায় না।

—ওকে সবাই ভয় পায়?

—হ্যাঁ। বেটি বড়ো বদমাশ। বুকের লহু টেনে নেয়।

—তা রামজী, তোমার ভয় করে না?

—আমার কী ভয় আছে! আমি তো ওর কাছে যাই না! দূর থেকে দেখি। বহুৎ খুবসুরৎ লেড়কি!

পেত্নীটির পূর্ব ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে একটি মেয়েকে হাত পা বাঁধা মৃত অবস্থায় ট্রেন লাইনের পাশে পাওয়া গিয়েছিল। যারা মেয়েটিকে মেরে রেখে গিয়েছিল, তারা বোধহয় ভেবেছিল লাশ ট্রেনে কাটা পড়ে যাবে। কিন্তু কুকুর বা শেয়াল লাশ টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। তাই পরদিন সকালে তাকে প্রায় আস্ত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। তার পরনে ছিল দামী শাড়ি, চেহারাও খুব সুন্দর। তার পরিচয় জানা যায়নি। সেই খুনেরও কোনো কিনারা হয়নি। সেই

মেয়েটিই পেত্নী হয়ে লেভেল ক্রসিং-এর পাশে দাঁড়ায়।

এরকম গল্প হাজার হাজার শোনা যায়। কিন্তু রামজী প্রতিটি কথা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে যে শুনতে মন্দ লাগে না। বিশেষত আশেপাশে আর কোনো লোকজন নেই। ঝিমঝিম করছে রাত। ঘরের পেছনে একটা জারুল গাছ, তার পাতায় বাতাসের শব্দ হলেও গায়ে একটু কাঁটা দেয়।

রামজী আমাদের পেয়ে অনেক কথা বলতে লাগল। লোকটি এখানে দিনের পর দিন একা থাকে—বিশ্ব সংসারে ওর কেউ নেই, যদিও ওর বাড়ি বিহারে, কিন্তু সেখানেও আর যায় না। কেন যাবে? আপনজন কেউ নেই সেখানে। এক টুকরো জমিও নেই—সুতরাং এই গুমটি ঘরটাই তার বিশ্ব সংসার। এ রকম সম্পূর্ণ একলা মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। আশ্চর্য, ওর একাকীত্ব বোধও নেই। ও বেশ তৃপ্ত মানুষ, কোনো অভিযোগ নেই ওর।

ঘরের একপাশে তেল চিটচিটে কম্বলের ওপর বালিশ পাতা। তার ওপরে বসে আমি ওর উনুনে হাত সেঁকতে লাগলাম। বেশ শীত শীত ভাব আছে—যদিও মার্চের শেষ। অমিতই কথাবার্তা চালাচ্ছে, আমি শ্রোতা।

প্রতিরাত্রে রামজী সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। পাতলা ঘুম। হর্নের শব্দ শুনলেই উঠে গিয়ে গেট খুলে দেয়, আবার বন্ধ করে। রাত তিনটের ট্রেনটা চলে যাবার পর একেবারে গেট খুলে দিয়ে এসে ভালো করে ঘুমায়—কারণ পরের দিন সকাল এগারোটার আগে কোনো ট্রেন নেই। সেই ট্রেনটা আসবার আগে ওর ঘুম ভাঙে নূপুরের শব্দ শুনে। তখন সেই মেয়েটি আসে। দূর থেকে তার হাসি শুনতে পাওয়া যায়। তখন রামজী রাম নাম জপতে জপতে গিয়ে গেট খোলে।

অমিত ঘড়িতে দেখল সাড়ে বারোটা বাজে। আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আর জাগতে পারব না। অমিত বলল, চল, বাইরেটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

আমার অতটা উৎসাহ নেই। ঘর থেকেই যখন সব দেখা যায়, তখন আর বাইরে গিয়ে লাভ কি? চাদর মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম। এক একবার মনে হতে লাগল, ডাকবাংলোর সুন্দর বিছানা ছেড়ে এরকম ভাবে এখানে বসে থাকার কি মানে হয়? ভূত জিনিসটা যে পুরোপুরি গাঁজা, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই! তবু কেন শুধু শুধু এই কষ্ট! অথচ একটা অ্যাডভেঞ্চারের লোভও ছাড়া যায় না। যদি সত্যি ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, তা হলে ভগবানও মেনে ফেলব।

কথা বলতে বলতে রামজী এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর অমিত জেগে। চোখ বাইরে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক-এক সময় দৃষ্টি বিভ্রম হয়। মনে হয় যেন কারুকে দেখছি, কিছু যেন নড়ছে,

কেউ যেন এগিয়ে আসছে। হাত দিয়ে চোখ ঘষে নিলেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়। কখনো বেশি সন্দেহ হলে বাইরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি। না, কেউ নেই। অমিত টর্চ ফেলে আগেই আশেপাশের সব কটা গাছ দেখে নিয়েছে—যাতে পরে ঐ রকম কোনো গাছকে মানুষ বলে ভুল না হয়।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। চোখ টনটন করছে। ঠিক রাত দুটোর পর আমার ঘুম আসে। এক জায়গায় বসে বসে আর কতক্ষণ জেগে থাকা যায়! কিন্তু অমিতের জেদ বেশি, ও কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না। আমার ঝিমুনি এলেই ও আমার পায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়। একটা ট্রাকও আসছে না। রামজীরও গেট খোলার দরকার হচ্ছে না। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের প্রতীক্ষা তখন যেন শুধু একটি সুন্দরী মেয়ের জন্য। পেত্নী হোক আর যাই হোক, শুনেছি সে সুন্দরী—সেই জন্যই আমরা তাকে দেখতে চাইছি। বুকের রক্ত শুষে নেয় তো নেবে, কোনো সুন্দরীর জন্য বুকের রক্ত দিতে আর আপত্তি কি?

তিনটে বাজল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি রে অমিত?

অমিত বলল, ট্রেনটা আসুক—সেই পর্যন্ত অন্তত দেখা যাক। প্রত্যেকটা মিনিট কাটছে যেন এক ঘণ্টা। এমন নিঃশব্দ রাত আগে কখনো কাটাইনি। কাছাকাছি কোনো জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত নেই। একটা কুকুরের ডাকও শোনা যায় না! শুধু একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক, সেটাও যেন স্তব্ধতার অন্তর্গত।

হঠাৎ রামজী ধড়মড় করে উঠে বসল। জড়ানো গলায় বলল, ওহি! ওহি! শুনছেন?

কি শুনব! কোনো তো শব্দ নেই? তবু কান পেতে রইলাম।

রামজী বলল, ঘুংঘট? ঘুংঘট শুনছেন না?

কোথায় আবার ঘুঙুরের আওয়াজ? কিছুই না। জারুল গাছে ঝিঁঝির ডাক তো অনেকক্ষণ শুনছি।

—ঐ যে, ঐ যে! হাসি! বেটি হাসছে।

রামজী এবার বিছানা থেকে যেন লাফিয়ে উঠল। অমিত সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেল। রামজী আমার হাত ধরে টেনে দরজার বাইরে এনে বলল, ওহি দেখিয়ে হুঁয়া—কিৎনা খুবসুরৎ লেড়কী—

কিছু দেখলাম না। শেষ রাতে ময়লা ময়লা জ্যোৎস্না, তাতেও কোনো কিছুকেই চোখের ভুলে মানুষ মনে হয় না। অথচ রামজী একদিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল।

আমার মনে হলো, লোকটা পাগল। গলার আওয়াজ চোখের দৃষ্টি ঠিক পাগলের মতন। ওকেই আমার ভয় করতে লাগল।

রামজী আমার হাত চেপে ধরে বলল, দেখেননি? নেহি দেখা আভি?

আমি আস্তে আস্তে বললাম, হ্যাঁ। দেখেছি।

অমিত লেভেল ক্রসিং-এর গেট পর্যন্ত ঘুরে এসে ধমক দিয়ে বলল, ধ্যাৎ! সব বুজরুকি! এ রামজী, তুমি কি আমাদের বুদ্ধুবাক পেয়েছ?

আর কথা শোনা গেল না! একটা জোরালো আলোয় সামনেটা সাদা হয়ে গেল। ঝলমলিয়ে চলে এল ট্রেন! রামজী গেট খুলতে গেল।

আমি অমিতকে বললাম, লোকটা পাগল। আর বেশি ঘাঁটাস নি।

রামজী যখন গেট খুলে ফিরে এল, তখন আবার আগেরই মতন নিরীহ আর বিনীত। বলল, দেখেননি? একদম সামনে থি—

আমরা কোনো আপত্তি করলাম না। আমার মনে হলো, রামজী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একা থাকে। ওরও তো একটা সঙ্গিনী দরকার। সে রকম কারুকে যদি না পায় তাহলে একজনকে বানিয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? ওই সুন্দরীকে ও ছাড়া আর কেউ দেখবে না!

১১

রামপুরহাট থেকে সাত-আট মাইল দূরে তুম্বুনি নামে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম ক'দিন। একদিন রাত বারোটার পর শখ চাপলো বেড়াতে বেরুবার। যদিও শীতকাল, তবু মস্ত বড়ো একটা চাঁদের অনেকখানি জ্যোৎস্নায় পথঘাট ঝকঝক তকতক করছে। লাল রঙের রাস্তা, ঈষৎ ঢেউ খেলানো, দূরে পেন্সিল স্কেচের মতন টিলা ও শালের জঙ্গল। খুব ভালো ভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা দলে চার-পাঁচজন। অনেকটা রাস্তা হেঁটে, গান গেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমরা। মনে হলো সারা রাতই বেড়ানো যায়। আমরা প্রায় অন্য একটি গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় দেখলাম উল্টো দিক থেকে পর পর তিন-চারটে গাড়ি আসছে হেডলাইট জ্বেলে। বেশ অবাক হলাম। এত রাত্রে গ্রামের রাস্তায় তিন-চারটি গাড়ি? তাও তো ট্রাক নয়?

আমাদের সঙ্গে একজন স্থানীয় লোক ছিল, সে বলল, আজই এখানে একটা ফিল্মের দল এসেছে, বোধহয় তারাই শুটিং-এ বেরিয়েছে!

প্রথম জিপ গাড়িটা আমাদের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, বাইরের দিকে অনেকখানি শরীর ঝুঁকিয়ে বসে আছেন একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায় মানুষ, মাথা ভর্তি

এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বোতল।

চিনতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হলো না। ঋত্বিককুমার ঘটক।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাস্তার ধারে ডাইভ মারলাম। খানাখন্দে গড়িয়ে পড়ে সেখানেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম। দেখতে পেলেই হয়েছিল আর কি! ঋত্বিক ঘটককে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি; কিন্তু একবার উনি দেখতে পেলে আমাদের বেড়াবার দফা রফা।

গাড়িগুলো চলে যাবার পর আমরা ধুলোটুলো ঝেড়ে আবার রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এবার বোধহয় আমাদের উল্টো দিকে হাঁটা উচিত। কিন্তু চাঁদের আলোয় আমাদের নেশা লেগে গেছে, তক্ষুনি ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই কারুর। গাড়িগুলো নিশ্চয়ই অনেক দূরে যাবে, সুতরাং আমাদের ভয়ের কিছু নেই।

আরো খানিকটা পথ হেঁটে এসে, একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম, গাড়িগুলো থেমে পড়েছে, শুটিং-এর উদ্যোগ চলেছে। শোনা গেল সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের জোরালো এবং জড়ানো কণ্ঠ।

অত রাত্রেও কিছু গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করছে আস্তে আস্তে। আমাদের মধ্যে একটা মতবিভেদ দেখা গেল। এত কাছে এসেও আমরা ঋত্বিক ঘটকের শুটিং দেখার সুযোগ ছাড়ব কিনা! আমাদের মধ্যে যে দু'-একজনকে ঋত্বিক ঘটক খুব ভালো রকম চেনেন, তাদের একটুও ইচ্ছে নেই ওখানে দাঁড়াবার। কারণ উনি একবার চিনতে পারলেই আগামী দু'তিনদিন ওঁর সঙ্গেই থাকতে হবে, মানতে হবে ওঁর হুকুম। ঋত্বিক ঘটকের চোখে চুম্বক আছে। তা এড়িয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। শেষ পর্যন্ত আমরা মাথায় খুব করে চাদর মুড়ি দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে গ্রামের লোকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে রইলাম। এবং খানিকক্ষণ বাদে একবার উনি খুব কাছাকাছি আসতেই আমরা পিছু হটে হটে একেবারে কেটেই পড়লাম।

পরদিন দুপুরবেলা আমরা রামপুরহাটে একটা হোটেলে খেতে গেছি। দারুণ খিদে পেয়েছে। সবেমাত্র কলাপাতা, নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়েছে, রান্নাঘরে ভাতের ফ্যান গালার গন্ধ পাচ্ছি, খিদের চোটে দু'এক কণা নুনই ঠেকাচ্ছি জিবে, এমন সময় দরজা ঠেলে সদলবলে ঋত্বিককুমারের প্রবেশ। দিনের বেলাতেও সেই উস্কোখুস্কো চুল, টকটকে চোখ, পাঞ্জাবির পকেট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন একটা শিশি। রাজাবাদশার মতন চেঁচিয়ে উঠলেন, কই, খাবার কোথায়?

আমাদের খাওয়া মাথায় উঠল। ওঁর চোখ এদিকে পড়ার আগেই আমরা কলেজের ছাত্রদের মতন পেছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়লাম।

উনি আমাদের কাছে টাকা পেতেন না, কোনোদিন ঝগড়াও হয়নি, বরং ওঁর সঙ্গে একটা স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কই ছিল, তবু ওঁকে দেখেই কেন আমরা

পালাচ্ছিলাম, তা হয়তো ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। ওঁর মধ্যে একটা দারুণ ছটফটানি ছিল। অনেকের প্রতিভা পুরোপুরি সৃষ্টির দিকে না গিয়ে অনেকটা আত্মক্ষয়ের দিকে যায়। সেইজন্যে তিনি বহু কাজই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এবং আত্মক্ষয়ের নেশায় যাঁদের পায়, তাঁরা কাছাকাছি অন্য কারুর ব্যক্তিত্বের কোনো তোয়াক্কা করেন না। এইসব মানুষকে দূর থেকেই বেশি শ্রদ্ধা করা যায়। পৃথিবীতে এরকম অনেক দেখা গেছে।

কিন্তু আর একদিন যা দেখেছি, পৃথিবীতে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেরকম দৃশ্য আর কখনো কেউ দেখেছে কিনা জানি না। তাই সেটা এখানে লিখে রেখে যেতে চাই।

রামপুরহাটে যে ফিল্মের শুটিং চলছিল, কয়েক মাস বাদে জানতে পারলাম, অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সেটা কোনোক্রমে শেষ হয়েছে। ছবির নাম 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। খবর পেলাম এক সন্ধেবেলা টালিগঞ্জের এক স্টুডিওর প্রোজেকশন হলে সেটা দেখানো হবে। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমরা দলবেঁধে সেটা দেখার জন্য ছুটলাম।

পৌঁছে দেখি ততক্ষণে ছবি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার হলঘরে পঁচিশ-তিরিশজন লোক, আমরা পা টিপে টিপে পেছন দিকে গিয়ে বসলাম। পর্দায় দেখি ঋত্বিক ঘটকের নিজের চেহারা। পাজামা পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি না-কামানো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল, হাতে মদের বোতল। প্রথম থেকেই চমক খেলাম! কোনো ছবিতে পরিচালকের নিজের এরকম ছবি কে প্রত্যাশা করে?

আরো কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বুঝলাম, এ ছবিতে ঋত্বিক ঘটক আগাগোড়াই অভিনয় করেছেন, অর্থাৎ তিনিই নায়ক। তিনিই গল্প লিখেছেন —না, গল্প লেখেননি, নিজের জীবনটা ফোটাচ্ছেন। যাঁর জীবনকাহিনী, তিনিই নিজে অভিনয় করেছেন এবং তিনিই পরিচালক—একসঙ্গে এই তিনটি জিনিস আর কোনো ফিল্মে দেখা গেছে? এহ বাহ্য! এখানেই শেষ নয়?

ছবি চলছে এমন সময় একজন লোক চেঁচিয়ে উঠল, লাইট! এখানে লাইট কম! শুয়ারের বাচ্চা!

আমরা অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। কে কথাটা বলল, বুঝতে পারলাম না।

খানিকটা বাদে আবার চিৎকার, এ জায়গাটা আবার হোক! ঠিক হয়নি। একদম ঠিক হয়নি।

একজন কেউ বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ কি হচ্ছে? ডিসটার্ব করছেন কেন?

—চোপ! কোন শুয়ারের বাচ্চা! আমি বলছি ঠিক হয়নি, আবার হোক!

আমরা অবাক। একি থিয়েটার নাকি যে আবার হবে, ঠিক করে নেবে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলবার পর আবার হুংকার, কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এটা কি ছবি? কিস্যু হচ্ছে না!

কথা বলতে বলতে লম্বা মতন লোকটি উঠে দাঁড়াল। সেই চেহারা, সেই চুল এবং হাতে বোতল—চিনতে ভুল হবার কোনো উপায় নেই! পর্দাতে তো ঠিক ঐ চেহারাতেই নায়ককে দেখা যাচ্ছে!

টলতে টলতে উঠে উনি এগিয়ে গেলেন, মনে হলো যেন স্ক্রিনটাই ছিঁড়ে ফেলবেন। দু'তিনজন শুভার্থী দৌড়ে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে বলল, ঋত্বিকদা, কি করছেন কি! বসুন!

কিন্তু অতবড়ো শক্তিমান মানুষটিকে ধরে রাখে কার সাধ্য! এক-একবার এসে বসছেন, আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছেন, কিস্যু হয়নি, কোন শালা কি বোঝে, অ্যাঁ? এসব কি হচ্ছে কি এখানে?

ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে ঋত্বিক কুমারের ছবিটা চলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন তিনি নিজে। উঠে দাঁড়িয়ে বোতলে এক-একটা চুমুক দিয়ে তিনি কখনো বলতে লাগলেন, লাইট কোথায়, অ্যাঁ? লাইটের সেন্স নেই? এই ফ্রেমটা ভাঙো না শালা? এক ফ্রেম কতক্ষণ চালাবে?

কেউ ওকে সামলাতে পারছে না। উনি বারবার ছুটে যাবার চেষ্টা করছেন স্ক্রিনের কাছে, একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অনেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, থাক, থাক! ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত ঐখানেই থাক!

আমরা যেন থ্রি ডাইমেনশানাল ছবি দেখছি। পর্দায় যে ঋত্বিক ঘটককে দেখছি, তিনিই জ্যান্ত হয়ে শুয়ে আছেন পর্দার নীচে।

কিন্তু চুপচাপ থাকার পাত্র তো উনি নন। শুয়ে শুয়েই একটু বাদে উনি দারুণ জোরে নাক ডাকতে লাগলেন। এদিকে ছবি তখন দারুণ সীরিয়াস জায়গায়—জঙ্গলের মধ্যে নকশালদের ঘিরে ফেলছে পুলিস, তাদের মাঝখানে পথ হারানো নায়ক ঋত্বিক—এই সময় আসল ঋত্বিকের নাসিকা-ধ্বনিকে কিছুতেই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে নেওয়া যায় না, হাসি পেয়ে যায়। দর্শকদের মধ্য থেকে জনাচারেক উঠে গিয়ে ওঁকে চ্যাংদোলা করে বাইরে দিয়ে এল।

বাকি সময়টা আমরা নির্বিঘ্নে ছবিটা উপভোগ করলাম।

শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, বাইরের মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন তিনি। এখন অনেকটা জ্ঞান ফিরেছে। দু'চোখে শুকনো জলের রেখা।

মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু হলো কি! এই যে হাবিজাবি মাথামুণ্ডু এতসব করলাম এতদিন, এতে কিছু হলো?

এটা একটা বিরাট প্রশ্ন, যার উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই। তবে সেই দিনই একটা কথা মনে হয়েছিল, ছায়াছবির চেয়েও জীবন্ত ঋত্বিককে অনেক বেশিদিন মনে থাকবে।

১২

হিন্দী সিনেমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সিনেমাই আমি খুব কম দেখি, তার মধ্যে হিন্দী সিনেমা সারা জীবনে ক'টা দেখেছি তা দু'আঙুলে গুণে শেষ করা যায়। রাজকাপুর বা রাজেশ খান্না, হেমামালিনী বা বৈজয়ন্তীমালা—এদের কারুকেই আমি দেখিনি, এমনই নির্বোধ আমি।

তবু পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে পেলেই আমি হিন্দী ফিল্মের নট-নটীদের ছবিগুলো আগ্রহের সঙ্গে দেখি। নতুন নতুন ছবির খবর, অভিনেতাদের নামের তালিকা বা কেচ্ছা-কাহিনীগুলোও পড়ে ফেলি। এর বিশেষ একটা কারণ আছে।

বছর পাঁচেক আগে আমি জামসেদপুর যাচ্ছিলাম। শীতকাল, খুব রমণীয় আবহাওয়া। ট্রেনে একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি রোগা, লম্বা ও লাজুক। লাজুক ছেলেদের আমি এক নজরেই পছন্দ করে ফেলি—কারণ তাদের মধ্যে আমি আমার নিজের কৈশোরকেও দেখতে পাই।

আমার সামনেই বসেছিল দু'জন সাধারণ ভদ্রলোক। দেখলেই বোঝা যায় সেই ধরনের চাকুরিজীবী, অফিসই যাদের ধ্যান-জ্ঞান। বস্তুত আমার অধিকাংশ রেল-ভ্রমণে আমি দেখেছি চলন্ত ট্রেনে আমার নিকটতম প্রতিবেশীরা অনবরত অফিসের গল্পই করে গেছে। একটানা, একঘেয়ে শুধু অফিসচর্চা। তাও জোরে জোরে। এরা একবারও ভাবে না যে এদের কাছাকাছি লোকেদের এই গল্প শুনতে বাধ্য করা অন্যায়।

এই সব লোকদের হাতে কখনো এক-আধটা সিনেমা পত্রিকাও থাকে। কথা বলতে বলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে সেই পত্রিকার পাতা ওল্টায়। বইপত্রের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঐ পর্যন্ত। ট্রেনে উঠে এরা নিজেরা খবরের কাগজ কেনে না, অন্যেরটা চেয়ে নেয় এবং সেটা দুমড়ে মুচড়ে নিজেরা নেমে পড়ার ঠিক আগে ফেরত দেয়।

হয়েছে অফিসের গল্প, খড়গপুরেও শেষ হয়নি। তাদের অফিসের বড়োবাবুটি যে অতি পাজী, দাঁত দিয়ে নখ কাটে, দরকারি কাগজপত্র ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলে —এসব ব্যাপারে দু'জনেই একমত, তবু এত আলোচনার যে কী আছে, তা বুঝি না। শুনতে শুনতে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

এদের মধ্যে একজন বাথরুমে গেলে, অন্য জন তার হাতের সিনেমা পত্রিকাটি খোলে। পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখে। তার সঙ্গীটি ফিরে এলে সে একটা ছবি দেখিয়ে বলে, দ্যাখো, মুখার্জি, অমিতাভ বচ্চন কী অদ্ভুত মেক-আপ নিয়েছে, বোঝাই যায় না!

আমার পাশের রোগা, লম্বা লাজুক ছেলেটি এতক্ষণ নির্বাক হয়েছিল। এবার সে একটু নড়ে চড়ে বসল। ওরা যখন অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করতে লাগল, তখন ছেলেটি হঠাৎ ফস করে বলে ফেলল, ওটা অমিতাভ বচ্চনের ছবি নয়!

লোক দুটি প্রথমে একটু অবাক হলো। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এই তো তলায় লেখা আছে—

ছেলেটি বলল. ওটা ভুল ছাপা হয়েছে। ওটা আসলে বিনোদ মেহরা। দেখছেন না, ওর পাশের লোকটিকে বেশি লম্বা দেখাচ্ছে! তা কখনো হয়? অমিতাভ বচ্চন এখন সবচেয়ে লম্বা হিরো!

—তা বলে কি সিনেমার বইতে ভুল লিখবে?

—হ্যাঁ, ভুলই লিখেছে। আমার কাছে অমিতাভদার সই করা ছবি আছে। আমি চিনব না? আপনারা যেটা দেখছেন, সেটা হচ্ছে দুনিয়া কাহানি ছবিতে বিনোদ মেহরা আর প্রাণ আর শায়রা বানু। অমিতাভ বচ্চনের নতুন ছবি হচ্ছে এই, এই, এই, এই...

হিন্দী ছবির প্রসঙ্গে লাজুক ছেলেটি সবব হয়ে উঠেছে। নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এখন অনেক ছেলেমেয়েরেই জ্ঞানভাণ্ডার ঐসব তথ্যেই পরিপূর্ণ। আমার চেনা একটি মেয়ে আছে, যাকে হিন্দী ফিল্মের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়, প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম তার মুখস্থ। অনেক সময় অন্যরা তর্ক-বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত ঐ মেয়েটিকে বিচারক বানায়।

এই ছেলেটিও নিতান্ত কম যায় না। উল্টো দিকের লোক দুটিকে সে গড় গড় করে বহু খবর শুনিয়ে দিল, মনে হলো যেন হিন্দী চিত্রজগতের সবাই তার খুব চেনা। কেননা সে সব চিত্রতারকাকেই দাদা দিদি বলছে।

খানিকক্ষণ পরে সামনের লোক দুটি আবার অফিসের কথায় ফিরে গেল। ওরা তেমন অল্পবয়েসী নয়, তাই সিনেমার গল্পের চেয়ে অফিসের গল্পই ওদের

কাছে বেশি মুখরোচক।

আমি আমার পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি ভাই?

—জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

—তুমি এদিকে কত দূর যাবে?

—বম্বে।

—বেড়াতে?

—না, ঠিক বেড়াতে নয়। আমি ওখানেই থাকব।

—ওখানে আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বুঝি?

—না।

তখনই আমার একটু একটু সন্দেহ হতে শুরু করল। একটু পরেই নিঃসন্দেহ হলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের এই ছেলেটি ভাগ্যান্বেষণে বোম্বাই যাচ্ছে। ফিল্মে নামতে চায়।

ব্যাপারটা আমার কিছুই খারাপ লাগল না। খুবই স্বাভাবিক মনে হলো। অনেক মানুষেরই একটা ইউটোপিয়া দরকার। এক সময় মানুষ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে যেত। এখন আর পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত দেশ নেই। গুপ্তধনের সন্ধানেও মানুষ কত জায়গায় গেছে, আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে সোনা পাওয়া যায়। কাটাকাটি করেছে। না খেয়ে মরেছে। এই কিছুদিন আগেও বাঙালিদের ধারণা ছিল বার্মায় গেলেই কোনো না কোনো চাকরি পাওয়া যায়, তাই লক্ষ লক্ষ বাঙালি সেদিকে ছুটেছিল। এখন ছেলেরা কোথায় যাবে? সকলেই তো আর বাপ-মায়ের অধীনে থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে চায় না। এখন বোম্বাইয়ের ফিল্ম জগতই একমাত্র ইউটোপিয়া, যেখানে সুযোগ পেয়ে গেলেই সব সুখের উপকরণ করায়ত্ত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, বোম্বাইতে তোমার চেনাশুনো নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছে? অমিতাভ বচ্চন তোমাকে সই করে ছবি পাঠিয়েছেন যখন...

ছেলেটি লাজুকভাবে হেসে বলল, না, সেরকম চেনা কেউ নেই। অমিতাভদা তো আমাকে চেনেন না। আমি স্টুডিও থেকে ওঁর একটা ছবি কিনেছিলাম, তারপর উনি একবার কলকাতায় এসেছেন, আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলের গেটের সামনে ওঁর সামনে দৌড়ে গিয়ে বলেছি, একটা সই করে দিন! অমিতাভদা কী বলেছিলেন জানেন ? বলেছিলেন, একদিন তোমার সই-ও অন্য লোকে নেবে!

সেই কথাতেই নিশ্চয়ই ছেলেটির মাথা ঘুরে গেছে। তারপর থেকে রোজ স্বপ্ন দেখছে, সেও একদিন নায়ক হবে। ওর নাম হবে জয়ন্তকুমার! ভালোই তো নাম। আর কেউ আছে এই নামে? পত্র-পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হবে, শুটিংয়ের

অবসরে জয়ন্তকুমার—তাতে দেখা যাবে পারভীন ববি ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আছে কিংবা গলা জড়িয়ে ধরে হাসছে নিতু সিং। দারুণ ব্যাপার।

ছেলেটির চেহারা নায়কোচিত নয়। লম্বা বটে কিন্তু কোমর ও বুক প্রায় সমান। মুখখানা লম্বাটে। ও নিজে নিশ্চয়ই এসব জানে না। যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তখন নিজের চেহারাটা ও নিশ্চয়ই অবিকল অমিতাভ বচ্চনের মতনই দেখে।

ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এমনি এমনি যাচ্ছ, কি করে সুযোগ পাবে?

—রিসিদাকে কয়েকখানা চিঠি দিয়েছিলাম—তারপর উনি উত্তর দিয়েছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

—রিসিদা কে?

ছেলেটির উচ্চারণ ভালো না। হৃষীকেশ মুখার্জিকে ও বলল, রিসিকেশ মুখার্জি। এই উচ্চারণ নিয়ে ও সিনেমার নায়ক হবে? ও, বাংলা সিনেমা তো নয়, হিন্দী।

—তুমি হিন্দী জানো?

—খানিকটা জানি, আরো শিখে নেব। উর্দুও শিখতে হবে। 'অমর প্রেমে' রাজেশদার সব ডায়ালগ আমার মুখস্থ!

হিন্দী ও শিখতে পারবে ঠিকই, কারণ 'অমর প্রেম'-কে ও উচ্চারণ করল 'আমার প্রেম'—ঠিক হিন্দী ধরনের। আমার পরিচিতা সেই মেয়েটি, যে হিন্দী ফিল্মের এনসাইক্লোপিডিয়া, সে একবার শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান বলেছিল দেবানন্দপুর—আমাদের মতন দেবানন্দপুর উচ্চারণ করতে সে ভুলেই গেছে।

আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি বই পড়ায় মন দিলাম। ছেলেটি রাত্রে ঘুমোবার জন্য ওপরের বাঙ্কে বিছানা পাতল। বিছানা মানে শুধু একটা চাদর আর বালিশ। একবার যেই সে গায়ের জামাটা খুলল, দেখতে পেলাম তার গেঞ্জিটা ছেঁড়া, বুকের হাড় পাঁজরা স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ বুকের মধ্যে সে অনেক স্বপ্ন পুষে রেখেছে।

কোমরে একটা সুতোয় বাঁধা সুটকেসের চাবি। সেই চাবি নিয়ে সে তালা খুলতে গেল, অনেকক্ষণ ঘটাঘট করেও পারল না। নিজের সুটকেসের তালা সে খুলতে পারছে না। অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাল।

প্রত্যেক ট্রেনের কামরাতেই একজন করে করিৎকর্মা লোক থাকে। একজন লোক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পারছেন না? দিন, চাবিটা আমাকে দিন!

সে একবার ঘুরিয়েই কট করে খুলে দিল।

আমার তখন মনে হলো, যে ছেলে নিজের সুটকেসের তালা খুলতে পারে

না, যার ঐ রকম হাড়-জিরজিরে চেহারা, কথাবার্তাতেও চাকচিক্য নেই, সে বোম্বাইয়ের বিশাল প্রতিযোগিতার জগতের মধ্যে পড়ে কী করবে? এ রকম কত হাজার হাজার ছেলে সেখানে মাথা ঠুকে মরেছে। এই ছেলেটা বাঁচতে পারবে? সেখানকার হাঙর-কুমিররা ওকে বাঁচতে দেবে?

কিন্তু ওর বয়েস উনিশ-কুড়ি কিংবা বেশিও হতে পারে। এই বয়েসের একটি ছেলে যদি নিজের ভালো মন্দ বুঝতে না পারে, তবে আর কবে বুঝবে? মায়ের আঁচলের তলায় পুতুপুতু হয়ে থাকবে! প্রায় এই বয়েসেই আলেকজান্দার নামে এক ছোকরা বিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছিল। এই ছেলেটা যদি ভুল করে, তার ফল ওকেই ভোগ করতে হবে, তাই করুক, নিজে নিজেই শিখুক বুঝুক, এই পৃথিবীটা কী রকম।

জামসেদপুরে নামবার সময় আমি ছেলেটির মুখ ভালো করে দেখে নিলাম একবার।

তারপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে। পত্র-পত্রিকায় আমি ছেলেটির ছবি কিংবা কোনো খবর থাকে কিনা খুঁজে দেখি। পাই না। আমার পরিচিতা সেই জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, জয়ন্তকুমার নামে নতুন কেউ নেমেছে? অন্তত ছোটখাটো কোনো পার্টে?

সে বলে, না তো!

ছেলেটির পাঁজরা-বার-করা বুক আর লাজুক মুখখানা মনে পড়ে যায়।

১৩

ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় একজন ম্যাজিসিয়ান থাকতেন। রোগা, লম্বাটে চেহারা, একটা চোখ একটু লক্ষ্মী-ট্যারা, সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল তাঁর চুল। তখন তাঁর সেই চুলের কোনো তুলনা খুঁজে পেতাম না। এখন বলা যায়, তাঁর চুল ছিল অবিকল সাঁইবাবার মতন!

তাঁর নাম ছিল কিউ সি সরকার। কিউ দিয়ে যে কারুর নাম আরম্ভ হয়, তা আমরা জানতাম না। তখন অবশ্য ম্যাজিসিয়ান বলতেই বোঝাত পি সি সরকারকে। আমাদের পাড়ার এনারও পদবী সরকার, সেই হিসেবে ম্যাজিসিয়ান হিসেবে এঁর যোগ্যতা আছেই। আর পি-এর পরে কিউ বলেই বোধহয় তিনি নিজে ঐ রকম নাম নিয়েছে। যদিও পি সি সরকারের সঙ্গে এর কোনো আত্মীয়তাই ছিল না!

প্রথম প্রথম আমরা এঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। তেত্রিশ নম্বর বাড়ির একতলায় ভাড়াটে হয়ে এসেই ইনি বাড়ির দরজায় বড়ো বড়ো করে নিজের নাম লেখা সাইনবোর্ড লাগালেন—এবং এমনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন যেন পাড়ার কারুর সঙ্গে ইনি কথা-টথা বলে সময় নষ্ট করতে চান না। আমরা কৌতূহলী হয়ে ঐ বাড়ির কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি মারতাম। ঐ বাড়িতে উনি ছাড়া ওঁর মা, দুই বোন ও একটি বুড়ো চাকর ছিল। বুড়ো চাকরটি কিউ সি সরকারকে ডাকতেন ছোটকুবাবু বলে। পরে, আমরা ওঁকে ছোটকুদা বলে ডাকতাম। আমরা দারুণ সম্ভ্রমের চোখে ওঁর দিকে তাকাতাম। একজন জলজ্যান্ত ম্যাজিসিয়ান, আমাদেরই পাড়ায়!

ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হয় সরস্বতী পুজো উপলক্ষে। চাঁদা চাইতে গিয়েছিলাম, উনি বললেন, আমি তো চাঁদা দিই না। তবে—

চাঁদা না দিয়ে আমাদের হাত থেকে কারুর পার পাবার উপায় নেই। সে ম্যাজিসিয়ান হোক আর যাই হোক। কিন্তু ওঁর পরের কথাটা শুনে আমরা চাঁদার কথাটা সত্যিই ভুলে গেলাম। উনি বললেন, চাঁদা আমি দেব না—তবে তোমাদের ফাংশানে আমি বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখাব। আমি সাধারণত এক-একটা শো-তে ফাইভ হান্ড্রেড নিই, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তো আর টাকা নিতে পারি না। শুধু স্টেজ সাজাবার জন্য আমাকে পঁচাত্তরটা টাকা দিও!

পাড়ার প্রথম ফাংশানে ছোটকুদা ভালোই খেলা দেখিয়েছিলেন। ওঁর দু বোনই ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। খালি টুপি থেকে এক ডজন রুমাল আর পায়রা বার করা, একটা দড়িকে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে আবার জোড়া লাগানো, একটা জাপানি হাতপাখাকে গোলাপ ফুলের তোড়া বানিয়ে ফেলা—এসব বেশ চমকপ্রদ। সবচেয়ে মজা পেয়েছিলাম, যখন উনি নিজের মাথার চুল থেকে পরপর পাঁচটা মুরগির ডিম বার করে ফেললেন।

শুধু একটা খেলার ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে থেকে উনি আমাদেরই এক বন্ধু আশুকে ডেকে বললেন প্যাকেট থেকে একটা তাস তুলতে। তারপর কারুকে না দেখিয়ে সেই তাসটা রেখে দিতে বলল একটা টুপির নীচে। একটু পরেই তাঁর এক বোন টুপিটা তুলে সকলকে দেখাল যে তাসটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর ছোটকুদা একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে গুলি ছুঁড়লেন একটা ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে। অমনি দেখা গেল যে সেখানে একটা তাস আটকে গেছে। ছোটকুদা আশুকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তো সেই তাসটা?

আশু চিৎকার করে বলল, মেলেনি!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

ছোটকুদা এমন কটমট করে আশুর দিকে তাকালেন যেন ওকে ভস্ম করে দেবেন কিংবা হিপ্নোটাইজড করে ফেলবেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, নেক্সট নাম্বার!

আমরা অবশ্য ভাবলাম, আশু মিথ্যে কথা বলেছে। আশু কিন্তু বারবার মাথা নেড়ে বলেছিল, না মেলেনি, সত্যি মেলেনি! কিন্তু তাসটা তো আশু ছাড়া আর কেউ দেখেনি, তাই সত্যি-মিথ্যে বোঝার উপায় রইল না।

আশুকে অবশ্য পরে এর ফল ভোগ করতে হয়েছিল।

ছোটকুদার সঙ্গে এর পরে আমাদের ভালোই আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ঘাটে উনি আমাদের ছোটোখাটো ম্যাজিক দেখাতেন। পেয়ারাওয়ালার ঝুড়ি থেকে উনি একটা পেয়ারা তুলে নিয়ে নিজের ছুরি দিয়ে সেটা কাটলেন। দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে একটা সিকি! আর একটা কাটলেন, তার মধ্যে একটা আংটি! পেয়ারাওয়ালার চোখ ছানাবড়া। সে পেয়ারার ঝুড়ি তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। জানি না, পরে তার কী অবস্থা হয়েছিল।

একদিন আমরা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি, ছোটকুদা এসে আশুর পকেট থেকে পেনটা হঠাৎ তুলে নিয়ে বললেন, এটা কী কলম রে?

কলমটা খুবই দামী। আশুদের বাড়িতে অনেক পুরোনো আমলের জিনিস আছে। কলমটার নাম 'ওয়াটারম্যান', বিলিতি, পেছন দিকটা ঘোরালে নিবটা ভেতরে ঢুকে যায়। এরকম কলম আজকাল পাওয়াই যায় না।

ছোটকুদা কলমটা ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, দেখবি, এটা তোদের সকলের চোখের সামনে অদৃশ্য করে দেব? আমরা সমস্বরে বললাম, দেখি দেখি!

ছোটকুদা ডান হাতে কলমটা মুঠো করে ধরে হাতটা ওপরে তুলে কয়েকবার ঘুরিয়ে বললেন, হুস! তারপর হাত খুলে দেখালেন। নেই। আমরা মুগ্ধ।

এরপর ছোটকুদা অন্যান্য কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে আশু বলল, কলমটা দিন।

ছোটকুদা বললেন, সেটা তো হাওয়া করে দিয়েছি। ফিরিয়ে আনার কথা তো বলিনি!

ব্যাপারটা আর হাসি ঠাট্টার পর্যায়ে রইল না। ছোটকুদা কলমটা কিছুতেই দিলেন না। আমরা শেষ পর্যন্ত ছোটকুদার বডি সার্চ করলাম। কলমটা তবু পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত এটা অনেক দূর গড়াল। আশুর কাকা ঘটনাটা জানতে পেরে ছোটকুদার বাড়িতে এসে কলমটা চাইলেন। উনি তবু দিলেন না। বরাবর বললেন,

সেটা হাওয়া হয়ে গেছে তো আমি কি করব? আশুর কাকা রেগেমেগে বললেন, জোচ্চোর!

প্রোফেসার কিউ সি সরকার ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গে এর পর আর আমাদের সদ্ভাব রইল না। পাড়ার আরো কয়েকজনের মুখ থেকে শোনা গেল, ছোটকুদা নাকি নানা ছুতোয় তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন, ফেরৎ দেবার নামটি নেই। নেহাৎ ছোটকুদার দুই বোনই বেশ সুন্দরী এবং শান্ত স্বভাবের, তাই ওঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে কেউ হামলা করেনি। দুই বোনের নাম চম্পা আর শম্পা, দুজনেই ডায়াসেসানে পড়ে।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হলো এর পর। দীপুদের বাড়ির অনেক দিনের পুরোনো ভাড়াটে উঠে যাবার পর সেখানে নতুন ভাড়াটে এল। প্রথমে ভেবেছিলাম ভদ্রলোক অবাঙালি। কারণ, ইনি দরজায় নেম প্লেট লাগালেন, ডি কুমারকৃষ্ণ।

দুদিন বাদেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে জানলাম, উনিও একজন ম্যাজিসিয়ান এবং বাঙালিই। নামটা আসলে কুমারকৃষ্ণ দাস, কিন্তু দাস-ঘোষ-বোস-গাঙ্গুলীরা কক্ষনো ম্যাজিসিয়ান হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হয় না বলে ইনি নামটা ঘুরিয়ে নিয়েছেন। একই পাড়ায় দু'জন ম্যাজিসিয়ান!

কয়েকদিনেই টের পাওয়া গেল ডি কুমারকৃষ্ণের নামডাক বেশি। প্রায়ই বাইরের লোকেরা গাড়ি করে এসে ওঁকে নিয়ে যায়, উনি ঝলমলে রেশমী পোশাক পরে গম্ভীরভাবে গাড়িতে ওঠেন।

ছোটকুদার সঙ্গে ডি কুমারকৃষ্ণের ভাব হলো না। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। ছোটকুদা দীপুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকান।

আশুর তখনো ওয়াটারম্যান কলমটার জন্য শোক ছিল। একদিন সে ডি কুমারকৃষ্ণের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলে দিল। উনি একেবারে ছি ছি ছি ছি করে উঠলেন। বারবার বলতে লাগলেন, ইস, ছেলেমানুষদের সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে!

ডি কুমারকৃষ্ণ সত্যিই খুব ভদ্রলোক। ব্যবহার চমৎকার। বাড়িতে ওঁর মা ছাড়া আর কেউ নেই, আমরা গেলেই কিন্তু চা বা মিষ্টি খাওয়ান। উনি যে ম্যাজিকও ভালো জানেন, তার প্রমাণ উনি যখন তখন খেলা দেখিয়ে আমাদের চমকে দেন না, অনেক সাধাসাধি করলে একটা কিছু দেখান—তারপরই বলেন, এমন কিছুই নয় শুধু প্র্যাকটিস, শুধু হাত সাফাই! এই বলে এক টিপ নস্যি নেন। ওঁর খুব নস্যির নেশা!

আমরা ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আশুর কলমটা ফেরত এনে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

উনি বলেন, না, সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে দেখো—ও নিশ্চয়ই বাড়ি বদলাতে চেষ্টা করবে। এ-পাড়া ছাড়বে।

—কেন? কেন!

—এক পাড়ায় দুই ম্যাজিসিয়ানের স্থান হয় না। আমি তো আর বাড়ি বদলাচ্ছি না!

একদিন ডি কুমারকৃষ্ণ বড়ো রাস্তায় এসে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় গলিতে ছোটকুদাকে দেখেই আমরা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম। বললাম, আপনার সঙ্গে ডি কুমারকৃষ্ণের আলাপ হয়নি? উনি খুব বলছিলেন আপনার কথা—

ছোটকুদা কিছুতেই আসতে চান না, কিন্তু আমাদের চার-পাঁচজনের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন কেন? ডি কুমারকৃষ্ণ নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বললেন, নমস্কার!

ছোটকুদা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডি কুমারকৃষ্ণ আবার বললেন, আপনার তো বয়েস অনেক কম বলেই শুনেছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে চুল পেকে গেছে?

ছোটকুদা নিজের মাথায় জঙ্গলেব মতো চুলে হাত দিয়ে বললেন, কই না তো। কে বলল আমার চুল পেকেছে।

—এই তো, দেখুন না!

কুমারকৃষ্ণ ছোটকুদার মাথা থেকে পট করে একটা চুল ছিঁড়ে আনলেন। সত্যি পাকা চুল।

ছোটকুদা রীতিমতন রেগে গেছেন, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারছেন না। কুমারকৃষ্ণ আবার আর একটা চুল ছিঁড়ে আনলেন। সেটাও পাকা। আমরা দেখলাম, ছোটকুদার কানের দু'পাশে বেশ কিছু চুল হঠাৎ পেকে গেছে। কালও দেখিনি। জিনিসটা নিশ্চয়ই ম্যাজিক, কিন্তু চোখের নিমেষে কি করে এটা হয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না। ছোটকুদাও বুঝতে পারলেন না।

ছোটকুদা এতই ঘাবড়ে গেছেন যে উল্টে নিজে যে কুমারকৃষ্ণকে কোনো ম্যাজিকের খেলা দেখাবেন তাও পারছেন না। তাছাড়া চুল সম্পর্কে ওঁর দারুণ দুর্বলতা।

ছোটকুদা দু'হাত দিয়ে মাথার চুল চেপে ধরলেন। তখন চুলের মধ্য থেকে একটা কৌটো বেরিয়ে এসে টক করে মাটিতে পড়ল। ডি কুমারকৃষ্ণের নস্যির কৌটো।

কুমারকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, এটা আবার মাথার মধ্যে লুকোলো কি করে?

তখন আমাদের মনে পড়ল, আশুর পেনটা হাওয়া করার দিন আমরা ছোটকুদার বডি সার্চ করলেও চুলটা দেখিনি। সে কথা মনেই পড়েনি। ওঁর চুলের মধ্যেও তো অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা যায়।

ছোটকুদার তখন একেবারে নাজেহাল অবস্থা। কুমারকৃষ্ণ আর কিছু করলেন না, হাসতে হাসতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, একটু তামাশা করছিলাম। মাথায় একটু কেরোসিন তেল মেখে স্নান করে নেবেন, চুল আবার ঠিক হয়ে যাবে!

এরপর ছোটকুদার আর পাড়াতে মুখ দেখাবার অবস্থা রইল না। সবার মুখে মুখে গল্পটা চালু হয়ে গেল। ছোটকুদা ম্যাজিকে ডি কুমারকৃষ্ণর কাছে হেরে গেছে! আমরা দূর থেকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি, দু-ও!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটকুদারই জিত হলো। কি করে যেন ছোটকুদার বোন শম্পার সঙ্গে কুমারকৃষ্ণের প্রেম হয়ে গেল খুব। উনি একদিন কাঁচুমাচুভাবে ছোটকুদার কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানাতে গেলেন।

চম্পা কিংবা শম্পাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছি খুব কম। কলেজে যায় আর আসে। আর কুমারকৃষ্ণও বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকেন না, প্রায়ই কলকাতার বাইরে যেতে হয় তাঁকে। তবু কুমারকৃষ্ণের সঙ্গে শম্পার কোন্ উপায়ে প্রেম হতে পারে, তা আমাদের মাথাতেই ঢুকল না।

এই প্রেমটাও আমরা একটা ম্যাজিক হিসেবেই ধরে নিলাম! এমনকি, এরপর থেকে সব প্রেমকেই আমার ম্যাজিক মনে হয়।

১৪

আমি মাঝে মাঝে এমন বাড়িতে যাই যে বাড়িতে বিরাশিটা দরজা, একশো ছাপ্পান্নটা জানলা, নব্বই জন দাস-দাসী, আটচল্লিশটা মোটর গাড়ির জন্য ছত্রিশজন ড্রাইভার। না, এটা কোনো রাজা মহারাজার বাড়ি নয়, আজকাল সেরকম রাজা মহারাজাই বা কোথায়? শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলে সার ফ্রান্সিসের বাড়িতে তাঁর একার জন্যই একশো সতেরো জন দাস-দাসী ছিল, সেসব দিন আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। আজকাল যাকে বলে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং! কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হু হু করে উঠছে এই রকম সব বাড়ি, শহরের আকাশ-রেখা বদলে যাচ্ছে। এগুলিকে ঠিক বাড়ি না বলে নাম দেওয়া উচিত গৃহপুঞ্জ, কারণ প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টেরই মালিক আলাদা আলাদা পরিবার। এই সব গৃহপুঞ্জে

গড়ে উঠেছে এক নতুন সমাজ।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যেতে শুরু করেছে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই। এখন ছোটখাটো ছিমছাম সংসারই সবার পছন্দ। অনেক পুরোনো আমলের বাড়িতে এখনো এক পরিবারের লোক একই ছাদের নীচে থাকে অবশ্য কিন্তু সেসব বাড়িতেও অনেকগুলি রান্নাঘর। অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা ঢোকার দরজা। বাইরে দেখা হলে হেসে কথা হয় বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে চলে পরস্পরের ঐশ্বর্য বা অহঙ্কার নিয়ে খুব মুখরোচক নিন্দে।

এই আকাশচুম্বী গৃহপুঞ্জগুলিতে আবার গড়ে উঠেছে এক নতুন রকমের যৌথ পরিবার। এখানে প্রতিটি ফ্ল্যাট স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু সিঁড়ি একটা, লিফটও একই। যাওয়া আসার পথে দেখা হয় এবং দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে দেখা হলে নিরেট মুখ করে থাকা যায় না, দুটো-একটা ভদ্রতার কথা বলতেই হয়, ক্রমশ আলাপ-পরিচয়, কার কোন চাকরি বা ব্যাবসা সেই খোঁজখবর, তারপর একদিন চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

এই সব বাড়িতে আলাপ পরিচয়ের ভাষা ইংরেজি। প্রথম প্রথম সিঁড়িতে দেখা হলে ভুরু নাচিয়ে বলতে হয়, হ্যালো—! যারা একটু আমেরিকান-মনস্ক, তারা বলে, হাই! এবং এর পরেই পাক্কা সাহেবদের মতন আবহাওয়া আলোচনা। ‘ভেরি সালট্রি ওয়েদার টু-ডে’ কিংবা ‘ইটস গোয়িং টু বি রেইনিং এগেইন...’ ইত্যাদি। বাঙালি ছাড়াও এইসব বাড়িতে থাকে মাদ্রাজী, কেরালিয়ান, পাঞ্জাবী, হরিয়ানী, বিহারী, গুজরাতী, মারোয়াড়ী—না, ভুল বললাম, মারোয়াড়ী নয়! মাড়োয়ারীরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে যাবে কোন দুঃখে? পুরো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউই তো তাদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মধ্যে আরো বেশি নিবিড় যোগাযোগ ঘটে বাচ্চাদের মাধ্যমে। বাচ্চারা ভাষার ব্যবধান মানে না, এবং অন্য কেউ ইনট্রোডিউস না করিয়ে দিলে কথা না বলার বৃটিশ কায়দা জানে না। দু-একদিনেই তাদের ভাব হয়ে যায়, তারপর তারা সিঁড়িতে দৌড়োদৌড়ি করে, নীচ তলায় খেলে এবং বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই অন্যের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়। বাচ্চাদের মধ্যে বেশি ভাব হয়ে গেলে, তাদের মায়েদের মধ্যেও ভাব হয়। এবং কান টানলে মাথা আসার মতন তাদের বাবারাও কাছাকাছি আসে।

আবার সমস্যার শুরু করে এই বাচ্চারাই। মায়েরা নিজেদের বাচ্চার দোষ চট করে দেখতে পায় না। প্রেমের চেয়েও মাতৃস্নেহ বেশি অন্ধ। তিনতলার সাউথ ফেসিং-এর মা ভাবলেন ছ'তলার ইস্ট ফেসিং-এর বাচ্চাটা বড্ড পাকাপাকা কথা বলে, ওর সঙ্গে তাঁর ছেলের না মেশাই ভালো। আবার ছ-তলার সেই মা ভাবলেন

আটতলার বাচ্চাটা বই চুরি করে। তিনতলার ছেলে যখন ছ-তলার ফ্ল্যাটে খেলতে যায়, তার মা একটু বাদেই কোনো ছুতোয় তাকে ফিরিয়ে আনেন। আবার আটতলার বাচ্চাটি অন্য কোনো ঘরে এসে তার খেলার সাথীর বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই মায়েরা তার দিকে খরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এইসব কথাও চাপা থাকে না, ছড়িয়ে যায় এক সময়। তারপর সিঁড়িতে বা লিফটে সংশ্লিষ্ট মায়েদের দেখা হয়ে গেলে মুখ গোমড়া থাকে। চেঁচিয়ে ঝগড়া করা উঠে গেছে কিনা আজকাল!

একদিন আমি ঐ বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখলাম একটি তরুণ ও তরুণী গল্প করতে করতে হাত ধরাধরি করতে করতে উঠছে। আমাকে দেখেই তারা হাত ছেড়ে দিল, সেটা লক্ষ করেই আমি তাদের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম। সিঁড়িতে হাত ধরাধরি করে ওঠা দোষের কিছু নয়, আর আমিও কোনো গুরুঠাকুর নই যে আমাকে সমীহ করতে হবে! তা হলে, নিশ্চয়ই ওরা প্রেমিক প্রেমিকা, কেননা খাঁটি প্রেমিক প্রেমিকারাই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ছেলেটা বাঙালি, মেয়েটি দক্ষিণ ভারতীয়। আমি খুব সঙ্কুচিতভাবে ওদের পাশ দিয়ে নেমে গেলাম।

তখনই আমার মনে হলো একটা বাড়িতে যদি চল্লিশটা অপরিচিত-পরিবার থাকে, তাদের মধ্যে অনেক কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী—এদের মধ্যে তো প্রেম হতেই পারে। ট্রেনের কামরায় কিংবা জাহাজে কয়েকদিনের যাত্রায় প্রেম হতে পারে, আর এ-তো এক বাড়িতে মাসের পর মাস থাকা। এই সব প্রেমের পরিণতি হিসেবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিয়েও হবে—তাহলে একই ছাদের তলায় শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি? সেও না হয় হলো, কিন্তু তারপর যদি বিচ্ছেদ হয়? তখনো একই বাড়িতে? দুজনের প্রেমের মাঝখানে এল তৃতীয় ব্যক্তি, প্রেম ভেঙে গেল—এর পর দুঃখ অভিমানে কেউ কারুর মুখ দেখে না সাধারণত। কিন্তু এখানে তো তার উপায় নেই। সিঁড়িতে বা লিফটে কখনো না কখনো দেখা হবেই। এমনকি কোনো মেয়ে হয়তো দেখবে তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পাশে অন্য কোনো মেয়ে। সে যে বড়ো মর্মান্তিক। জানি না, এরা কীভাবে মানিয়ে নেবে।

আমি যাই আটতলায় বিনায়কদার কাছে। উনি বহুকাল মেশে-হোস্টেলে মানুষ, বিয়ে করার পরও মনোমতন ফ্ল্যাটটি পাননি কখনো। অফিস থেকে ধার নিয়ে গুরুসদয় রোডে এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। আটতলা শুনে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই আঁতকে ওঠে—যদি যখন তখন লিফট বন্ধ হয়ে যায়! সিঁড়ি ভেঙে আটতলায় উঠতে হবে? বিনায়কদা ভয় পান না, উনি বলেন, কত জায়গায় কত উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠেছি, কাঠমাণ্ডুতে একটা মন্দিরে উঠতে গেলে সাড়ে পাঁচশো

সিঁড়ি ভাঙতে হয়, আর এই সামান্য আটতলায় উঠতে পারব না।

বিনায়কদার ফ্ল্যাটে বসে চা খেতে খেতে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি, এমন সময় দরজার কাছে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়াল। তাদের হাতে নির্ভুল ভাবে চাঁদার খাতা।

আমি নীচু গলায় বিনায়কদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আটতলার ওপরেও চাঁদার উৎপাত। আমি ভেবেছিলাম এত উঁচুতে ভিখিরি, মশা-মাছি আর চাঁদা থাকবে না!

আমাকে চোখের ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়ে বিনায়কদা বললেন, এরা এখানকারই। ফ্ল্যাটের ছেলেরাই পুজো করছে।

বউদি হাসিমুখে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দিতে হবে ভাই?

ছেলেরা বলল, তিরিশ টাকা।

বউদি বিনায়কদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খুচরো তিরিশ টাকা আছে?

বিনায়কদা বললেন, দ্যাখো, শার্টের পকেটে!

ছেলেরা চাঁদা নিয়ে চলে গেল! আমি স্তম্ভিত। কোনো রকম দরাদরি পর্যন্ত নেই। এক কথায় তিরিশ টাকা চাঁদা, তাও কালী পুজোয়! বিনায়কদা বিখ্যাত সাম্যবাদী নাস্তিক, কলেজে কোনো পুজো-আর্চায় যোগ দেননি, তাঁর এই পরিবর্তন।

বিনায়কদা বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। মুখ নীচু করে বললেন, এখানে সবাই মিলে একটা কিছু ঠিক করলে তাতে আর আপত্তি করা যায় না, বুঝলি! সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো!

আমি বুঝলাম। উনি কম চাঁদা দিলে বা চাঁদা না দিলে সবাই ওকে ভাববে কৃপণ কিংবা গরীব। সেটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো!

পরের মাসে গিয়ে দেখলাম, বিনায়কদার ফ্ল্যাটে টেলিভিসান এসে গেছে! এটাও একটা অবাক কাণ্ড। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত উনি ছিলেন টেলিভিসানের ওপর খড়্গহস্ত। সাহেবদের অনুকরণে ওটিকে বলতেন ইডিয়েট বক্স! তাঁর ঘরে এই জিনিস?

মুখ বেজার করে বিনায়কদা বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে শেষ পর্যন্ত এটা কিনতে হলো। এত ঝামেলা!

—লোন নিয়ে কিনলেন? আপনার নিজের কোনো প্রোগ্রাম ছিল নাকি টেলিভিসানে?

বিনায়কদা বললেন, না, সে জন্য নয়! টেলিভিসানে প্রত্যেক সপ্তাহে দুটো

করে সিনেমা দেখায় জানিস তো। তোর বউদি সন্ধেবেলা একা একা থাকে, নীচ তলায় ফ্ল্যাটে টেলিভিসান দেখতে যেত, শুধু শনি আর রবিবার—কিন্তু ওরা অভদ্র, গত রবিবার ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, একবার বলেও যায়নি?

আমি বললাম, তা হলে অন্য কোনো ফ্ল্যাটে গেলেও তো হতো—আরো তো অনেকের টেলিভিসান সেট আছে নিশ্চয়ই।

তা আছে। গিয়েও ছিল—তা সেই ভদ্রমহিলা টেলিভিসান সেট চালালেন না, তাঁর ছেলের পড়াশুনা নষ্ট হবে। তোর বউদি তো অপমানে মুখ লাল করে উঠে এসেছিল! আসলে তো কারুর সঙ্গে কারুর আত্মীয়তা নেই, কেউ কারুর সুখদুঃখের সাথী হবে না—সকলকেই সমান সমান হয়ে থাকতে হবে—যাতে কেউ কারুকে ছোট না করতে পারে, বুঝলি?

আমি পুরো বুঝলাম না অবশ্য। এই সব প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলিতে কি এসে গেছে সমাজতন্ত্র? সকলেই এখানে সমান, না সমান হবার প্রতিযোগিতা? জানি না, ভবিষ্যতে এর সামাজিক রূপ কী হবে!

১৫

বেনারসে একবার এক সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন সবেমাত্র সাহেবরা জাত খোয়াতে শুরু করেছে। পরাধীন ভারতে যাদের জন্ম, তারা যেসব সাহেব দেখেছে, তাদের সঙ্গে এইসব সাহেবের কোনো মিলই নেই। তখন সাহেবরা ছিল আসল সাহেব, নিখুঁত স্যুট-টাই-পরা, গ্যাটম্যাট করে ইংরেজি বলত, আমাদের মতন নেটিভদের মনে করত মানুষের চেয়ে কিছু ছোটজাতের প্রাণী। হ্যাঁ, সত্যিকারের ভয় ও ভক্তি হতো সেইসব সাহেবদের দেখে।

আমি পরাধীন আমলের শিশু। হাতিবাগান বাজারের কাছে এক সাহেব-পুলিসের হাতে গলাধাক্কা খাওয়ার পর থেকে ওই জাতটির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা ঘৃণা ও আক্রোশের ভাব ছিল অনেকদিন। দন্তী, নখী ও শৃঙ্গীদের মতন আমি এদেরও পরিহার করে চলতুম। সুতরাং কাশীতে সেই সাহেবটির সঙ্গে আমি সহজে আলাপ করতে চাইনি।

যখনকার কথা বলছি, তখনো আমাদের দেশে হাজারে হাজারে হিপি-হিপিনীদের আবির্ভাব শুরু হয়নি। এখন সাহেবরা আমাদের চোখে জলভাত হয়ে গেছে। নোংরা পোশাক, খালি পা, জটলা চুল মাথার সাহেব-মেম দেখলে এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু তখন রাস্তায় বিস্মিত লোকের ভিড় জমে যেত।

ঐ সাহেবটি এবং তার বন্ধুবান্ধবরা ছিল হিপিদের পূর্বসূরী। এদের নাম ছিল বীট, কেউ বলত বীটনিক, এদের উদ্ভব আমেরিকায়—এরা সকলেই কবি বা ঔপন্যাসিক বা শিল্পী বা ধর্মপিপাসু—বুদ্ধদেব বসু প্রথম এদেব সম্পর্কে বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন। ইংলণ্ডে এর কিছু আগে শুরু হয়েছে অ্যাংরি ইয়ংমেনেদের যুগ। এরা হিপিদের মতন নিছক ছন্নছাড়া নয়, তখনো ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হয়নি বলে নিছক নামকাটা সেপাইরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বীটরা চাইত শুধু শিল্প সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে, তাই অন্য কোনো রকম কাজকর্মে তারা বিশ্বাসী ছিল না, জীবন কাটাত খুব সরলভাবে ও কম খবচে।

বেনারসে প্রথম সেই সাহেবটিকে দেখে আমিও চমকে উঠেছিলাম। একটা সাদা নোংরা পাজামা, তাব ওপর টকটকে লাল রঙেব পাঞ্জাবি, পায়ে রবাবের চটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথাভর্তি বাবরি চুল, গালে বিশাল গোঁফদাড়ির জঙ্গল —অনেকদিন রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে রংটা পোড়া পোড়া, প্রথমে সাহেব বলে চেনা যায় না, আবাব একটু পবেই চেনা যায়, কাবণ জলেব মধ্যে তেলের মতন সাহেববা অন্য মানুষের মধ্যে কিছুতেই লুকোতে পাবে না।

আমি মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে ঘুরছিলাম, সাহেবটি সবাসবি আমাব কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি সংস্কৃত জান?

আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধাবণা ছিল, সাহেববা বিনা পরিচয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলে না, শুধু ধমক বা গালাগালি দেওয়া ছাড়া। তা ছাড়া আমেরিকানদের ভাষাও আমি চট কবে বুঝতে পারি না।

সুতরাং একটু থেমে, আগে মনে মনে বাক্যটা তৈরি করে নিয়ে, তারপব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি কী বললেন?

—তুমি সংস্কৃত জানো?

—হ্যা জানি।

উত্তর দিযে আমি মনে মনে জিব কাটলাম! সংস্কৃত? স্কুলে পড়াব সময আমি বরাবর সংস্কৃত পরীক্ষার দিন নাকের জলে চোখের জলে এক হয়েছি। শব্দরূপ মুখস্থ করতে গেলেই মনে হতো কে যেন আমার মাথায় হাতুড়ি মারছে! সেই আমি এ কি বললাম? সংস্কৃতের ব্যাপারে সাহেবদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ সাহেবরাই আমাদের দেশে নতুন করে সংস্কৃতের চর্চা শুরু করে গেছে। এ যদি এখন আমার পরীক্ষা নেয়? সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলির মন্ত্রটুকু ছাড়া আর তো কিছুই আমার মুখস্থ নেই!

সাহেবটি একটি সাধুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তুমি ওকে আমার দু-

একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে?

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ছাড়া, আমি আর কোনো সাধুকে কখনো সংস্কৃতে কথা বলতে শুনিনি। ভাঙা হিন্দীতে দিব্যি কাজ চলে যায়। উৎসাহের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই পারব।

সাধুটির চেহারা একেবারে বাঘের মতন। বাঘের সঙ্গে ঠিক কোন জায়গায় মিল তা আমি বলতে পারব না, তবে তাকে দেখলে ঐ কথাই মনে হয়। জল-কাদার ওপর জোড়াসনে ঋজুভাবে বসে আছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তরুণ বয়স্ক দারুণ সবল চেহারা, শরীরে একছিটে মেদ নেই, চোখদুটি খোলা—এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। সাহেবটির সঙ্গে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সাহেবটি বলল, তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো, আমি জানতে চাই, এই যে উনি শীতের মধ্যে খালি গায়ে জল কাদার মধ্যে বসে আছেন, তা কেন, কিসের জন্য? মানুষ কি করে নিজের চেতনার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে?

আমি সাধুটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললাম, বাবা, এই সাহেব অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে, আপনার কাছ থেকে দু-একটা কথা জানতে চায়। আপনি দয়া করে একটু শুনবেন কি?

সাধুটি কোনো উত্তর না দিয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকাল।

সাহেবটি ভাবল, আমি বুঝি তার কথাই সাধুটিকে জিজ্ঞেস করেছি। সে আবার বলল, তুমি ওকে বলো, আমি একটি শিশু, শিশু যেমন বাবার হাত ধরে অচেনা জায়গায় যায়, সেই রকম আমিও ওঁর নির্দেশ নিয়ে চেতনার সীমানা ছাড়ানো সেই রহস্যময় গহনলোকে যেতে চাই!

আমি এবার সহেবটিকেই আগে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এরকম কথা চট করে শোনা যায় না তো। তার ব্যবহারে কোনো হালকা ভাব নেই। বরং তার চোখে মুখে একটা উঁচু জাতের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সাহেবটি সাধারণ নয়।

সাধুটিকে আবার বললাম, বাবা, ইনি জানতে চাইছেন...

সাধু জলে হাত ডুবিয়ে কাদার ওপরে একটা গোল চিহ্ন আঁকলো। তারপর তার চারপাশে আরো কয়েকটি দাগ কাটতে লাগল। হতে পারে এটা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা, কিন্তু এর মানে বোঝা আমার সাধ্য নয়।

সাধুটিকে খুশি করবার জন্য আমি তার পা ছুঁতে যেতেই সে দড়াম করে আমাকে এক লাথি কষাল। সাধু-সন্ন্যাসীদের এরকম ব্যবহার দেখলে লোকের আরো ভক্তি বাড়ে! আমার রাগ হলো। উল্টে আমিও একটা লাথি ঝাড়ব কিনা ভাবছিলাম তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা কথা মনে পড়ল। সাধুটি আসলে মৌনী আমরা শুধু শুধু ওকে বিরক্তি করছি। সংস্কৃত বা হিন্দী—কোনো ভাষাতেই

ওকে কথা বলানো যাবে না, অন্তত আজ!

সাহেবটিকে সেই কথা বলতেই সে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমা চাইল। লজ্জিত ও অনুতপ্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাঁটতে লাগল আমার সঙ্গে সঙ্গে। একটু বাদে সে তার কাঁধে ঝোলানো চটের থলে থেকে দুটো কলা বার করল। আমাকে দিয়ে বলল, খাও।

আমার পূর্বপুরুষদের মতন কলা সম্পর্কে আমার কোনো আসক্তি নেই। ফলপাকড়ই আমি পছন্দ করি না। তবু প্রত্যাখান করতে পারলাম না। এত অল্প-চেনা লোককে কেউ ফট করে একটা কলা খেতে দেয় না।

খোসা ছাড়িয়ে কলায় একটা কামড় বসিয়ে সে বলল, অপূর্ব! অতীব মহৎ বস্তু!

সত্যিই সেই মর্তমান কলা, ঠিকঠিক পাকা, খুবই সুস্বাদু ছিল। সাহেবটি বলল, ঈশ্বর একজন ভালো পাচক।

একটু থেমে সে আবার বলল, না, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ পাচক। তাই না?

(তার অবিকল ভাষা ছিল, গড ইজ গুড কুক...উমমম, নো, গড ইজ দা বেস্ট কুক! ইজ নট ইট?)

সেই থেকে সাহেবটির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম অ্যালেন। আর এক বন্ধুর সঙ্গে সে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। তারা দুজনেই কবি। আমি মাঝে মাঝে যেতাম ওদের ঘরে। একটা জিনিস দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, কত কম উপকরণে ওরা জীবন কাটাতে পারে। খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক নেই, যখন খিদে পায়, বেরিয়ে গিয়ে কিছু ফলটল বা দুচারখানা হাতে গড়া রুটি কিনে নেয়। দুটি মাত্র কম্বল ছাড়া ওদের শয্যা বলতেও আর কিছু নেই। নানান বইতে পড়েছি, চিত্রশিল্পীরা দেশ-বিদেশের নানান জায়গায় গিয়ে বহু রকমের জীবন কাটিয়েছে—কিন্তু কবিদেরও যে সে রকম জীবন কাটাবার দরকার থাকতে পারে, তা ওদের দেখে বুঝলাম। তখন আমাদের দেশের কবিদের এই সুযোগের অভাবের কথা ভেবে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে।

অ্যালেনের আগ্রহ ঠিক ঈশ্বরে বা ধর্ম সম্পর্কে নয়—বরং ধ্যান বা সাধনায় মানুষের চেতনার আরো বিস্তার হতে পারে কিনা, তাই ও জানতে চায়। ও চায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আরো সূক্ষ্মতর করতে—এটা কবির যোগ্য অনুসন্ধান নিশ্চিত।

যাই হোক, এই রচনাটি শুধু ঐ অ্যালেনের পরিচয় দেবার জন্যই নয়। রচনাটির নাম হওয়া উচিত, সাহেব ও শিবুর মা। শিবুর মা সম্পর্কে একটু পরেই বলছি।

অ্যালেনের সঙ্গে আমার পরে আরো অনেক জায়গায় অনেকবার দেখা

হয়েছে। ও দেশে ফিরে গিয়ে আবার হঠাৎ চলে এসেছে। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওর বাড়িতে থেকেছি। চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, কলকাতায় বসে হঠাৎ ওর টেলিফোন পেয়েছি, ইত্যাদি।

সেই রকমই, অ্যালেন একবার হঠাৎ কলকাতায় এসেছে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে জিনিসপত্র রেখে তারপর সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এসেছে আমাকে খুঁজতে।

সন্ধেবেলায় আমি কি করে বাড়িতে থাকব? তাহলে তো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই উল্টে যায়। সেই সন্ধেবেলা আবার আমাদের বাড়িতে আর কেউই ছিল না। শিবুর মা ছাড়া।

শিবুর মা আমাদের বাড়ির রাঁধুনি। বয়েস হয়েছে অনেক এবং বিশ্ব সংসারে তার কেউ নেই। এমনকি শিবুর মা নামটা এখনো থেকে গেলেও তার শিবু মরে-হেজে গেছে বহুদিন। শিবুর মা বিধবা হয়েছে মাত্র আঠারো বৎসর বয়েসে, তারপর এতগুলো বছর ধরে বহু দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে কিন্তু কোনোরকম তিক্ততা নেই। সব সময় হাসিখুশি মুখ, আমাদের পাড়ার সবাই শিবুর মাকে ভালোবাসে।

শিবুর মায়ের বাড়ি সুন্দরবনের কাছাকাছি, সেখানে তার দু'তিনটি পালিত পুত্র-কন্যা আছে। তার মাইনের টাকা সেখানেই পাঠায়। আমরা কতবার সৎ উপদেশ দিয়েছি, টাকাগুলো তার অথর্ব দশার জন্য জমাতে, কিন্তু সে তা শোনে না। হাসিমুখে বলে, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই!

শিবুর মা তার স্বামীর মৃত্যুটাও ভাগ্য হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। তার স্বামীর পেশা ছিল সুন্দরবন থেকে মধু এনে বিক্রি করা। এ জন্য লাইসেন্স লাগে, কিন্তু শিবুর বাবার লাইসেন্স ছিল না, লুকিয়ে চুরিয়েই কাজটা চালাত। এর ফলে একদিন বাঘের পেটে প্রাণ হারানোই ছিল তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক নিয়তি—কিন্তু সে মরেছিল গুলি খেয়ে। বনবিভাগের সাহেবরা এসেছিল একটা গুণ্ডা বাঘ মারতে, এক আনাড়ি সাহেবের বন্দুক থেকে উল্টোদিকে গুলি ছুটে গিয়ে শিবুর বাবার পেট ফুটো করে দেয়। ঘরে আঠারো বছরের যুবতী বউ ও একটি তিন বছরের শিশু রেখে সে জঙ্গলের মধ্যে চিৎপাত হয়ে মরে পড়ে থাকে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আর কাকে বলে!

যে সাহেবের বন্দুক থেকে গুলি ছুটেছিল, সে ছিল একজন খাঁটি গোরা। কিন্তু তার কোনো শাস্তি হয়নি আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায়। এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় শিবুর মা চোখ বড়ো বড়ো করে আমাদের বলেছে, শিবুর বাপের যে লাইসিন ছিলনি, মা! *লাইসিন না নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, তাই সাহেবরা বলল, আমরা কি জানি! কেন সে এয়েছিল, আগে তার হিসেব দাখিল করো!*

যেন প্রকৃতির জঙ্গলে জীবিকা অর্জনের জন্য গিয়ে শিবুর বাবা মস্ত এক অপরাধ করে ফেলেছিল। এই জন্য যে শিবু এবং শিবুর মাকেও মেরে ফেলা হয়নি, এটাই তো মস্তবড়ো ভাগ্যের কথা! অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন বিভাগ থেকে দয়াবশত চৌদ্দ শো টাকা দেওয়া হয়েছিল শিবুর মাকে। এই কাহিনীর এই অংশটা আমি কখনো বুঝতে পারিনি। ঠিক কোন হিসেবে, কোন বিশেষ কায়দায় যে একটা লোকের জীবনের দাম ঠিক চৌদ্দ শো টাকা নির্দিষ্ট করা হয়, তা বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য।

স্বামীর হত্যাকারীকে তো নয়ই, জীবনে কোনো সাহেবকেই শিবুর মা দেখেনি সামনাসামনি। দেখল সেদিন সন্ধেবেলা।

বাড়িতে আর কেউ না থাকলে শিবুর মা অতিথিদের দরজা খোলে না। খুব সাবধানে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলে দেয়, বাড়ি নেই কেউ!

অ্যালেনের গায়ে সেদিন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, গলায় সেই রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি দেখে ভেবেছে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী। সিঁড়ির আবছা আলোয় তাকে সাহেব বলে চিনতে পারেনি। দু'জনে কেউ কারুর কথা বোঝে না। শেষ পর্যন্ত অ্যালেন হাতের ইশারায় জানিয়েছে যে সে একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাবে।

অনেক চিন্তা করে দরজা খুলে দিয়েছে শিবুর মা। সাধু যখন, তখন ভয় নেই। অ্যালেন হয়তো শিবুর মাকে ভেবেছে আমার মা, কিংবা রাঁধুনি হিসেবে বুঝতে পারলেও কিছু আসে যায় না—সব মানুষকে সে সমান শ্রদ্ধা করে। দরজা খোলার পর সে সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় শিবুর মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছে, মাই রিগার্ডস ম্যাম! কোনো সাধু প্রণাম করতে আসছে দেখে শিবুর মা ধড়ফড় করে তাকে বাধা দিতে গেছে, তখন বুঝেছে, শুধু সাধু নয়, সাহেব!

আমরা রাত্তিরবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি, দরজা খোলা, আর সামনেই মাটিতে বসে আছে শিবুর মা, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

কী হয়েছে, কী হয়েছে শিবুর মা? আমাদের বারবার প্রশ্নেও সে কোনো উত্তর দেয় না। যেন তার ঘোর-লাগা অবস্থা। তারপর এক সময় সে ড়ুকরে বলে উঠল, ওগো সে এয়েছিল, একজন সাহেব, ঠিক সাধুর মতন, কত তার মায়া...

তারপর শিবুর মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কাঁদছ কেন? সাহেব এয়েছিল বলে কাঁদছ কেন শিবুর মা? আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলাম।

—সে আমার পায়ে ধরেছিল! সে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল, সে বলেছিল, আমি এসেছি, মা! সে বোধহয় তার ছেলে, আমার কান্না দেখে সে

রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল—ওগো আমি কোথায় যাব, এত সুখ আমার ভাগ্যে ছিল...

আমরা নির্বাক হয়ে রইলাম। অ্যালেন কোনোদিন জানতেও পারবে না সে সামান্য একটু সৌজন্যে শিবুর মায়ের দুঃখী জীবন কতখানি ধন্য করে দিয়ে গেছে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে, শিবুর মায়ের স্বামীহন্তার জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

১৬

পৃথিবীর মানুষকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, যারা কুকুর ভালোবাসে। এবং যারা ভালোবাসে না। আমি নিজে ঐ দ্বিতীয় দলে পড়ি!

আমি কুকুর ভালোবাসতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। সেই কারণেই 'বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুর' ধরাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে, ভালোবাসতে না পারলেও ঐ প্রাণীটিকে আমি ভয়, ভক্তি ও সমীহ করে থাকি, যতটা করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়েও কুকুর-প্রেমিকদের প্রেম অনেক বেশি তীব্র হয়। সারা দিনরাত কুকুরই ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়ে! লাই পেতে পেতে কুকুর যে একদিন মনিবেরই মাথায় চড়ে বসে, এ দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। লোকে প্রথম কুকুর পুষতে চায় নিরাপত্তার কথা ভেবে, কুকুর বাড়ি পাহারা দেবে, চোর ডাকাত এলে সজাগ করবে। কিন্তু কিছুদিন পরই ব্যাপারটা বদলে যায়—কুকুর কী খাবে, তার মনে শান্তি আছে কিনা, তার গায়ে চুলকুনি হলো কিনা, কার্তিক মাসে কী করে তার প্রেমিকা সংগ্রহ করা হবে—এই চিন্তাতেই বাড়ির লোক ব্যতিব্যস্ত। অধিকাংশ কুকুরই চিঠির পিওন, নিরীহ আত্মীয় ও বস্তা-কাঁধে শিশি-বোতলওয়ালাকে দেখলেই দারুণ ডাকাডাকি শুরু করে—কিন্তু চোর এলে ঘুমিয়ে থাকে।

আমার এক বন্ধু গত পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কলকাতার বাইরে যায়নি। কারণ, সে না থাকলে তার অতি প্রিয় কুকুরটিকে কে খেতে দেবে? অন্য কারুর উপর বিশ্বাস করে সে কুকুরের ভার দিতে পারে না। যদিও সে কুকুরটি পুষেছিল তার বাড়ি পাহারা দেবার জন্য, এখন সে নিজেই কুকুরটিকে পাহারা দেয়। প্রতিদিন মাংস খেয়ে খেয়ে কুকুরটির ইয়া কেঁদো চেহারা হয়েছে!

ছোট্ট ফুরফুরে বা লোমশ তুলতুলে কুকুর সম্পর্কে তেমন কোনো বিরূপতা নেই আমার, কিন্তু যে বাড়িতে বড়ো কুকুর থাকে, সেরকম কত বাড়ির সঙ্গে যে

সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে আমাকে! কুকুরওয়ালা কোনো বাড়িতে মেয়েদের দিকে দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখিনি পর্যন্ত! শিকল-বাঁধা কুকুরের হিংস্র চিৎকারও আমার কানে পীড়া দেয়। বাড়ির মধ্যে অতবড়ো একটা জন্তুকে দেখলেই আমার গা শিরশির করে! অনেক বাড়িতে কিছুই না জেনে বসবার ঘরে সবেমাত্র চা-টা খেতে শুরু করেছি, এমন সময় কোথা থেকে একটা নেকড়ের বংশধর ছুটে এসে গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুরু করে কিংবা দুটো থাবা তুলে ধরে পিঠের ওপর। বাড়ির মালিক তখন সহাস্যে বলে, ভয় নেই, কিছু করবে না, কিছু করবে না!

এই কথা শুনে আরো গা জ্বলে যায়। কিছু করবে না মানে কী? কামড়ে আমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে নেওয়া মানেই কি কিছু করা? কেনই বা সে আমার গায়ের গন্ধ শুঁকবে, কেনই বা লালাভরা জিভ দিয়ে আমার পা চাটবে, কেনই বা আমার পিঠে থাবা তুলে দাঁড়াবে? একটা অচেনা লোককে আমার গা ছুঁতে দিই না, একটা কুকুর এসে কেন ছোঁবে!

কুকুরের মালিক এর পরেও বলে, ও খুব ভালো, দেখবেন কী রকম কথা শোনে! গোল্ডি, গোল্ডি, কাম হিয়ার!

কুকুরের এই ইংরেজি ভাষা-প্রীতিরও কোনো অর্থ আমি বুঝি না।

শাস্ত্র অনুসারে নখী, শৃঙ্গী, দন্তী এবং বাজীদের থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করলেও আমার কপালেই এক সময় দারুণ দুর্ভোগ জুটে যায়!

এক বন্ধুর সুপারিশে আমি একবার একটা টিউশানি করতে গিয়েছিলাম। তখন কাঠ বেকার, পাড়ায় চায়ের দোকানে ধারই জমে গেছে তেষট্টি টাকা, আর সিগারেটের দোকান ধার দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সময় একশো টাকার একটা টিউশানি পাওয়া মানে তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার সমান। নির্দিষ্ট দিনে কর্নফিল্ড রোডের সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বাড়িটি একটু বিচিত্র। এক বিধবা মহিলা তাঁর তিনটি মেয়েকে নিয়ে থাকেন, বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। ওঁদের অবস্থা খুবই সচ্ছল, জীবনযাত্রা খুবই সাহেবী ধরনের, বাড়িখানাও ইংরেজ-পছন্দ। ভদ্রমহিলা চমৎকার বাংলা জানলেও মেয়েরা সব সময় ইংরিজিতে কথা বলে, তাদের শিক্ষাও আগাগোড়া ইংরিজিতেই। কিন্তু সেই সময় সবে মাত্র একটা বিচ্ছিরি নিয়ম হয়েছে সে সিনিয়র কেম্ব্রিজেও বাঙালিদের বাংলায় একটা পেপার পাস করতেই হবে। আমার কাজ সেই বাংলা শেখানো। ব্যাপারটা আমার পক্ষে সব দিক থেকেই সুখের, সুতরাং তক্ষুনি রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা কুকুর ঢুকল। প্রায় সিংহের মতন আকৃতি, চোখ দুটি ভাঁটার মতন। আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম, এ বাড়িতে আর কোনো দিন আসছি না। মাথায়

থাক একশো টাকা! এখন কোনোক্রমে ভালোয় ভালোয় এ বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে হয়। এমন রোগা হয়ে বসে রইলাম যাতে একটু বাদে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি!

ভদ্রমহিলা বোধহয় আমার অবস্থা বুঝলেন। কুকুরটির গলা ধরে টেনে রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি কুকুরকে ভয় পান?

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে খাঁটি কাপুরুষের মতন ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে—একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি তো সন্ধেবেলা আসবেন, এসে সিঁড়ির নীচে থেকে ডাকবেন, আমরা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব, ছাদের ঘরে রাখব, আপনার কাছে কক্ষনো আসবে না।

সেই ব্যবস্থাই হলো। আমি সিঁড়ির তলায় এসে একবার মাত্র ওদের কারুর নাম করে ধরে ডাকলেই কুকুরটা ঘাউ ঘাউ করে ওঠে, তখন ওদের কেউ এসে কুকুরটাকে শেকল বেঁধে নিয়ে যায়। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সতর্কভাবে চারদিক দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠি। কুকুর যেমন মানুষের গন্ধ পায়, আমিও তেমনি কুকুরটির গন্ধ নেবার চেষ্টা করি।

তিন-চারদিন পর বুঝতে পারলাম, ঐ কুকুরটিই ঐ বাড়ির অভিভাবক। বিধবা মহিলার তিনটি মেয়েই বেশ সুন্দরী—তবু পাড়ার রসিক ছোকরা বা ছিঁচকে চোরেরা ঐ কুকুরের ভয়ে ঐ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস করে না।

বাড়িটিতে ছ-সাতখানা ঘর। এর মধ্যে তিনটির বেশি ঘরের কোনো ব্যবহার নেই। দোতলায় সিঁড়ির ঠিক সামনের সাদা টালি বসানো চমৎকার বড়ো ঘরটি ঐ কুকুরটির নিজস্ব। মাঝে মাঝে সেই ঘরটির দিকে তাকিয়ে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

তিন-চার মাস বেশ ভালোভাবেই কাটল। আমার সন্ধেবেলা এই চাকরিটি ক্রমশই বেশি সুখের হয়ে উঠতে লাগল। মেয়ে তিনটির ব্যবহার চমৎকার, তাদের সবচেয়ে ভালো গুণ এই যে, আমি ঘন ঘন ডুব মারলেও তারা কোনো রকম আপত্তি জানায় না। নিছক পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া তাদের বাংলা শেখার আর কোনো আগ্রহই নেই, সুতরাং বাংলার শিক্ষক সম্পর্কেও তারা উদাসীন। আমি আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারে প্রায়ই নতুন নতুন গল্প বানিয়ে শোনাই, তারাও সহজেই বিশ্বাস করে নেয়।

সেবার গ্রীষ্মের ঠিক শুরুতেই কুকুরটি পাগল হয়ে গেল। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। কুকুরটি ঐ বাড়ির মহিলা আর তিন মেয়ের খুবই অনুরক্ত ছিল; একদিন দুপুরে তাকে খাবার দিতে যাবার সময় সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি মেয়েকে কামড়ে দেয়। অন্যদেরও তাড়া করে আসে। অতি কষ্টে তাকে দোতলায় সিঁড়ির

সামনের ঘরটায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এমন জোরে ডাকছে যে সারা বাড়ি কেঁপে উঠছে সেই ডাকে। সন্ধেবেলা গিয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি হতভম্ব।

মেয়েটিকে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, সে ভালোই আছে। কিন্তু কুকুরটিকে নিয়ে এখন কী করা হবে? তিনটি মেয়েই জোর দিয়ে বলতে লাগল, তারা কুকুরটিকে কোথাও নিয়ে যেতে দেবে না! তারা কুকুরটিকে এত ভালোবাসে যে তাকে চোখের আড়াল করতে পারবে না! ভদ্রমহিলা ব্যাকুলভাবে বার বার বলতে লাগলেন, কী করা যায় বলুন তো? কী করা যায় বলুন তো?

আমি আর এর কী উত্তর দেব? কুকুর সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। মনে মনে অবশ্য বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কুকুরটাকে তো এবার মেরে ফেললেই হয়?

এরপর কয়েকজন বিখ্যাত পশু-চিকিৎসককে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন যে কুকুরটি চিকিৎসার অতীত। এইসব ক্ষেত্রে এ কুকুরকে মেরে ফেলাই নিয়ম। কিন্তু তা হলো না, কুকুরটি ঐ ঘরেই বন্দী অবস্থায় রয়ে গেল। তার গর্জন শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, তার চোখ দেখলে শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঐ ঘরের জানলার পাশ দিয়ে আসবার সময় আমি দম বন্ধ করে চোখ বুঝে কোনোক্রমে পার হই। যদিও জানি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। কুকুরটা মাঝে মাঝে দরজার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে দরজাটা ভেঙে পড়তে পারে।

ভদ্রমহিলা এবং তাঁর তিন মেয়ে এখন আর জানলার কাছে যান না বটে কিন্তু এখনো দূর থেকে কুকুরটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তাঁদের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে স্নেহ মমতা ভালোবাসা। কিন্তু কুকুরটি এখন ইংরিজি ভাষা একদম ভুলে গেছে, সে হিংস্র দাঁত দেখিয়ে জানলার কাছে তাড়া করে আসে। তাকে মাংস দেওয়া হয় জানলার বাইরে থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে, একটা লোহার পাইপ ফিট করা হয়েছে, মাঝে মাঝে সেটা দিয়ে তোড়ে জল ছাড়া হয় ঘরের মধ্যে।

কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলা দিন দিন বিমর্ষ আর রোগা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অসাধারণ মনের জোর, অসময়ে বিধবা হয়েও তিনি একা বিষয় সম্পত্তি সব দেখাশুনো করেন, মেয়েদের শিক্ষা দেবার সব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ ভেঙে পড়েছেন। ওঁর বাড়িতে ঝি-চাকর টেঁকে না ঐ কুকুরের জন্যই। মাংস ছুঁড়ে দিতে গিয়ে একদিন একটি দাসী নাকি কুকুরটার মুখে প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছিল। তার পর থেকে তার হিস্টিরিয়ার মতন হয়ে যায়।

উনি আমাকে দুঃখ করে বললেন, দেখুন তো, সবাই বলছে ওকে বিষ খাইয়ে

মেরে ফেলতে। আমার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে যদি পাগল হতো, তাকে কী আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারতাম? আমার সব সময় ভয় হয়, নতুন চাকর-বাকররা যদি লুকিয়ে ওর খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়!

এরপর একদিন এল সেই চরম ক্ষণটি। সেদিন ও বাড়ির দুটি মেয়ে গেছে সিনেমায় তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে। ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে শুধু তার মায়ের কাছে। আমি গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, তখন ওঁরা চা খাচ্ছিলেন। মস্তবড়ো হল ঘরটার একদিকে বসবার জায়গা, আর একদিকে খাবার টেবিল। ভদ্রমহিলা আমাকে ডেকে বললেন, আসুন, চা খাবেন আসুন।

চায়ের টেবিলে বসে নানা রকম গল্প হতে লাগল। কুকুরটা মাঝে মাঝে বিকট জোরে ডেকে উঠছে, আর লাফিয়ে পড়ছে দরজার ওপর। এ শব্দ আমাদের কান-সহা হয়ে গেছে, বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি না।

এক সময় বড়ো বড়ো নিশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে তাকালাম। দরজা দিয়ে কুকুরটা ঢুকছে। ওব ঘরের দরজা ভেঙে গেছে।

যেন চোখের সামনে দেখলাম মৃত্যুকে। আর কোনো উপায় নেই। প্রথমেই নিশ্চয়ই আমাকেই খাবে—কারণ পুরুষদের ওপরে কুকুরদের বেশি রাগ থাকে নিশ্চিত। একবার ভাবলাম টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াব—কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, অতবড়ো কুকুর একলাফে এসে ধরে ফেলবে।

ছোট মেয়েটি পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করে উঠে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা অস্ত্র খুঁজলাম, কিছুই নেই। একটা চেয়ার তুলে মারতে যাব? অতবড়ো কুকুরকে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেও কাবু করা যাবে না, তা ছাড়া একবার ফসকালে আর নিস্তার নেই। আমি টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়ালুম।

কুকুরটা কিন্তু ছুটে এল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, লেজটা নাড়ছে, চাপা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ভদ্রমহিলাই শুধু পালাবার চেষ্টা করলেন না, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু গম্ভীর ভাবে বললেন, গোল্ডি গোল্ডি, গো ব্যাক টু ইয়োর রুম!

কুকুরটা থমকে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করল।

ভদ্রমহিলা দু'পা এগিয়ে দিয়ে আবার সেই কথা বললেন। কুকুরটা কিন্তু ফিরে গেল না। সেও এগিয়ে আসতে লাগল মহিলার দিকে। আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দুমদুম শব্দ হচ্ছে, সর্বনাশ আটকাবার জন্য কোনো রকম উপস্থিত বুদ্ধিই বার করতে পারলাম না।

কুকুরটা যখন ভদ্রমহিলার কাছে এসে পৌঁছে গেছে, তখনও তিনি তাকে ফিরে যাবার জন্য হুকুম করছেন, প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপছে। কুকুরটা

এবার মুখ দিয়ে একটা করুণ শব্দ বার করল, অবিকল কান্নার মতন, তারপর থুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। আর নড়ল না। কুকুরটা মরে গেছে!

তাকে কেউ বিষ খাইয়েছে কিংবা সেটাই তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় তা জানা যায়নি, কিন্তু কুকুরটা মরীয়া হয়ে তার শেষ নিশ্বাস ফেলতে এসেছিল সেই মহিলার কাছে। তিনি যখন টের পেলেন যে কুকুরটা সত্যিই মরে গেছে, তখন বিহ্বল ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তারপর হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। সে কি অসম্ভব গভীর কান্না, একেবারে বুকের অনেক ভেতর থেকে উঠে আসছে, তিনি যেন শারীরিক কষ্ট পাচ্ছেন—কান্নার মধ্যে আঃ আঃ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

ছোট মেয়েটি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

শেষ মুহূর্তে কুকুরটা কি সুস্থ হয়ে উঠেছিল? ফিরে এসেছিল তার স্মৃতি? কি জানি! তবে আমার মনে হলো, কুকুরটার জীবনটা ধন্য, কারণ সে অতখানি ভালোবাসা পেয়েছে! ক'জন মানুষ এতটা ভালোবাসা পায়?

১৭

বাসটা হর্ন দিতে দিতে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, ডান দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল, একটা মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। সকলেরই এক রঙের পোশাক, হালকা নীল রঙের ফ্রক বা শাড়ি পরা কয়েক শো মেয়ে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসছে স্কুলের গেট দিয়ে, তাদের রিনরিনে গলার আওয়াজে আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে। অনেকদিন আগে আমি মধ্যপ্রদেশের পান্না অঞ্চলে একটা জলপ্রপাত দেখেছিলাম, তার জলের রঙও ছিল এই রকম নীল। সেই ঝরনা দেখার মতনই আমি এই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখটা সুস্নিগ্ধ লাগে।

আমাদের বাসটা আটকে গেছে, কারণ মেয়ে স্কুলটার সামনে এখন অনেক গাড়ি আর রিকশা। ওদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। বাসেও উঠছে অনেকে। আমি রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটি ফ্রক পরা মেয়ের দিকে চোখ আটকে গেল। স্কুলের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সাদা টিনের বইপত্রের বাক্স। দু'হাত দিয়ে ধরে আছে বাক্সটা, মুখখানা খুব ক্লান্ত, চোখ দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

আমি প্রথমে একটু চমকে উঠলাম। ঝুমা না? হ্যাঁ, ঝুমাই তো। বেশ বড়ো হয়ে গেছে। পাঁচ-ছ'বছরের দেখেছিলাম, এখন প্রায় দশ-এগারো বছর বয়েস।

তা তো হবেই, অনেকদিন কেটে গেল।

আজ ঝুমাকে কে নিতে আসবে? ঝুমার বাবা না মা? আজ কী বার?

আজ শনিবার। আজ বোধহয় পঙ্কজেরই আসার কথা। রাস্কেলটা যেন দেরি না করে! ঝুমার জন্য আমার একটু একটু দুঃখ হলো। যদিও আমার দুঃখ করার কোনো কারণই নেই, এটা একধরনের বিলাসিতা, এই হঠাৎ হঠাৎ দুঃখবোধ করা।

বাস ছেড়ে দিয়েছে, আমি আর ঝুমাকে দেখতে পেলাম না।

পঙ্কজদের অফিসে পাঁচদিনে সপ্তাহ। শনিবার ওর পুরোই ছুটি, মেয়েটাকে স্কুলের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা ওর কোনোক্রমেই উচিত নয়! যদি পঙ্কজ ভুলে যায়? একদমই না আসে? পঙ্কজটার তো দায়িত্বজ্ঞান বেশি নয়—তা হলে কী হবে? না, এসব আমার ভাবার কী দরকার!

চিত্রলেখার আজ এদিকে আসবার কথা নয়। কিন্তু সে এসে দূর থেকেও কী লক্ষ করবে না যে ঝুমা তার বাবার সঙ্গে ঠিকঠাক গেল কি না গেল?

পঙ্কজ আর চিত্রলেখার বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলাম। তখন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে দেবার মতন তিরিশ-চল্লিশটা টাকা জোগাড় করারই সামর্থ্য ছিল না পঙ্কজের। তবু সেসব দিন কত আনন্দ, কত উত্তেজনার। আমরা বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু টাকা তুলেছিলাম, তাইতেই রেজিস্ট্রির খরচ, দুটো ফুলের মালা আর সকলের জন্য একটা করে মোগলাই পরোটা হয়ে গিয়েছিল। ফুলশয্যা হয়নি। সন্ধেবেলাই চিত্রলেখা ফিরে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে. পঙ্কজ আমাদের আড্ডায় থেকে গিয়েছিল শুকনো মুখে।

চিত্রলেখাদের বাড়ির পূর্ণ সম্মতি থাকলেও পঙ্কজদের বাড়িতে সকলেরই আপত্তি ছিল এই বিয়ের ব্যাপারে। কারণ পঙ্কজ তখন বেকার। কিন্তু বেকারদের কী প্রেম-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা থাকতে নেই? পঙ্কজ রীতিমতন জোয়ান ছেলে, এম এ পাশ—তবু যে সে বেকার হয়েছে সেটা কি তার দোষ? এ দেশে ফ্রি লাভ চালু হয়নি, তাই ওদের বিয়ে করতে হলো। যাই হোক, ওদের বিয়ের ব্যাপারটা দু বাড়িতেই গোপন রাখা হয়েছিল প্রায় এক বছর। তারপর পঙ্কজ হঠাৎ দুম করে পেয়ে গেল একটা বেশ ভালো চাকরি। সেই বছরই ঝুমা জন্মাল।

ঝুমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, চমৎকার ছড়া বলতে শিখেছে আর আমরা গেলেই সে সেধে সেধে নাচ দেখায়—সেবারই পঙ্কজ আর চিত্রলেখার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আদালতে উঠল।

এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার নিগূঢ় সম্পর্ক কী করে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তা বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বাইরে দু'চারটে চিহ্ন দেখা যায়

মাত্র। পঙ্কজের মনটা সত্যি ভালো, মায়া-দয়া আছে, পরোপকারের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানটা একটু কম। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না। টাকাপয়সা সম্পর্কে কোনোরকম হিসেবের ধার ধারেনি কখনো, পকেটে যা আছে তা উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করেনি কক্ষনো। চিত্রলেখাও বেশ ভালো মেয়ে, কিন্তু বড্ড রাগী। এমনিতে খুব শান্ত নম্র, বাড়িতে লোকজন এলে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসে—কিন্তু কেউ কোনো কথা দিয়ে না রাখলে তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। কিন্তু এই সব কারণে কি বিচ্ছেদ হয়?

বিয়ের দু'তিন বছরের মধ্যেই চিত্রলেখা আর পঙ্কজের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল, এক সময়ে তা চরমে উঠল। আমরা প্রথমে কিছুদিন বোঝালাম, তারপর ওদের বাড়িতে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। তবে, যেহেতু পঙ্কজ বা চিত্রলেখা এর মধ্যে অন্য কারুর প্রেমে পড়েনি, তাই ওদের বিচ্ছেদের কথা আমরা চিন্তাই করিনি! আমরা ভেবেছিলাম, এক-একটা দম্পতি থাকে এরকম ঝগড়াটে, ঝগড়াতেই তারা সুখ পায়—তারা চায় না বাড়িতে কোনো বন্ধুবান্ধব আসুক!

একদিন পঙ্কজ এসে বলল, চিত্রলেখা আমার কাছ থেকে ডিভোর্স চাইছে, আমি রাজি হয়ে গেছি। আমি আর পারছি না।

ওদের মামলা বেশি দূর গড়ায়নি। দু-পক্ষেরই সম্মতি ছিল, তাই আইন অনুযায়ী সময় কাটিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পঙ্কজের শুধু একটাই শর্ত ছিল। মেয়েকে সে দারুণ ভালোবাসে। মেয়েকে না দেখে সে থাকতে পারবে না। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন মেয়ে এসে থাকবে তার কাছে।

চিত্রলেখা আগেই চাকরি করত একটা কলেজে, বিয়ের পরেও সে কাজ ছাড়েনি, সে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেল। কিন্তু সে আর পঙ্কজের মুখদর্শনও করতে চায় না বলে ব্যবস্থা হয়েছে যে পঙ্কজ প্রতি শনিবার মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে আবার সোমবার স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবে—চিত্রলেখার বাড়িতে তার যাওয়ার দরকার নেই।

স্কুলের সামনে ঝুমাকে দেখে আমার মনটা একটু খচখচ করতে লাগল। প্রাপ্তবয়স্করা তাদের জীবন নিয়ে যা-খুশি ছিনিমিনি খেলতে পারে। কিন্তু একটা শিশুর সুন্দর শৈশবই প্রাপ্য। ঝুমার সেই ক্লান্ত মুখে স্কুলের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা কিছুতেই মন থেকে মোছে না।

অবশ্য, এর থেকে আর ভালো ব্যবস্থা কী-ই বা হতে পারে! ঝুমা তার পিতৃস্নেহ-মাতৃস্নেহ দুই-ই পাচ্ছে। কত ছেলেমেয়েরই তো বাবা থাকে প্রবাসে বা বিদেশে, কিংবা একজায়গায় থাকলেও কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে শনি-রবিবার ছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা কথা বলারও সময় পায় না। ঝুমাও তো তার

বাবাকে সপ্তাহে দু'দিন পাচ্ছে। অবশ্য মা আর বাবাকে একসঙ্গে পাচ্ছে না। কিন্তু মা আর বাবা এক বাড়িতে থেকে সব সময় ঝগড়া করছে—এ দৃশ্যও বোধহয় কোনো শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত নয়!

ঠিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয় এমনিই সে রবিবার পঙ্কজের বাড়িতে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে দারুণ আড্ডা জমেছে। পঙ্কজের বাবা মারা গেছেন, মেজোভাই নাসিকে চাকরি করে, মা চলে গেছেন সেখানে। বাড়িতে ও এখন একা। চারজন বন্ধু ও দুটি বান্ধবী মিলে প্রচণ্ড শোরগোলের সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে রবিবারের আড্ডা। ডজন দু-এক বীয়ারের বোতল এসেছে। পঙ্কজ আমাকে বলল, কি রে, অনেকদিন তোর পাত্তা নেই কেন?

পঙ্কজের ঘরটা আবার তার ব্যাচিলার জীবনের অবস্থায় ফিরে এসেছে। ঘরভর্তি এলোমেলোভাবে বইপত্তর ছড়ানো। আশট্রেগুলিতে উপচে উঠছে ছাই, খাটের নীচে ময়লা।

এক সময় ঝুমা ঢুকল ঘরে, হাতে একটা ছবির বই। পঙ্কজ তাকে দেখেই বলল, মামণি, কী হয়েছে?

ঝুমা বলল, কিছু হয়নি।

—তুমি খেয়েছ?

—না। এক্ষুনি কি খাব?

—ঠিক আছে, সাড়ে বারোটার সময় খেতে বসে যেও কিন্তু! রাঁধুনিমাসিকে বলো তোমার খাবার দিয়ে দেবে।

ঝুমা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। বড়োদের আড্ডায় ছোটদের থাকাটা ভালো দেখায় না। তখন আমাদের কথাবার্তাও চলছিল রীতিমতন আমিষ বিষয়ে। আমরা চুপ করে গেলাম। পঙ্কজ কিন্তু ঝুমাকে চলে যেতে বলল না। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে এনে, মামণি, আবার মামণিটা, সুন্দর মামণিটা বলে আদর করতে লাগল।

ঝুমা লজ্জা পেয়ে গেল। সে তো এখন আর তেমন ছোটটি নেই। এত লোকের সামনে বাবার আদর খেতে তার লজ্জা পাবারই কথা। সে শরীর মুচড়ে মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

আরো যে দুটি মেয়ে বসেছিল, তারাও ঝুমাকে ডেকে নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগল। তাদেরও কথাবার্তায় যেন মায়া মমতা ঝরে পড়েছে। ঠিক যেমন মা-মরা শিশুর প্রতি অন্যদের করুণা থাকে।

আমার হঠাৎ মনে হলো, চিত্রলেখা এখন কী করছে? ঝুমা কাছে নেই বলে তার কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে? শনি-রবিবারগুলো সে কী ভাবে কাটায়?

ঝুমা একটু পরেই এক ছুটে ভেতরে চলে গেল।

তারপর বীয়ারের বোতলগুলো যতই খালি হতে লাগল, আড্ডা ততই জমে উঠল। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বলে কারুর আর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ইতিমধ্যে একবার পঙ্কজ ওখানে বসেই হাঁক দিয়েছিল, ঝুমা, মামণি, খেয়ে নিয়েছ তো?

দূর থেকেই ঝুমা উত্তর দিয়েছিল, এক্ষুনি খেতে বসছি।

আড়াইটে বাজার পর আমি উঠে পড়লাম। এবার বাড়ি ফিরতেই হবে। একতলার টানা বারান্দার ওপাশে বাথরুম। সেদিকে যেতে গিয়ে ডান দিকে খাবার ঘরটা চোখে পড়ে।

সেদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। খাবার টেবিলে মাথা রেখে ঝুমা ঘুমিয়ে আছে। সামনের থালায় তার ঝোল মাখা ভাত পড়ে আছে, অসমাপ্ত মাছের টুকরোটাও রয়ে গেছে। হয়তো তার খেতে আর ভালো লাগেনি। হঠাৎ ঘুম এসে গেছে। কিন্তু খাবার টেবিলে ঐ ঘুমন্ত বাচ্চা মেয়েটির মধ্যে একটা দারুণ একাকীত্বের দৃশ্য আছে! আমার বুকটা মুচড়ে উঠল।

পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালাম, এরকম তো হয়ই! ঝুমার এগারো বছর বয়েস, সে তো একা খেয়ে নিতেই পারে! ঝুমার মা যদি সিনেমায় যেত কিংবা কোথাও বেড়াতে, তাহলে ওকে তো একাই খেয়ে নিতে হতো। ঘুমিয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ব্যাপার!

কাছে গিয়ে ঝুমার চুলে হাত দিয়ে বললাম, ঝুমা ওঠো!

ঝুমা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ।

আমি আবার নিজেকে বোঝালাম, এরকম তো হয়ই!

১৮

পাঠানকোটের একটা দোকানে এমন ঝাল মাংস খেয়েছিলাম যে তারপর প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত ঠোঁট আর জিভ জ্বলছিল। ওঃ সে কি অসম্ভব আগুনের মতন ঝাল, যেন মশলার বদলে বারুদ দিয়ে রান্না করেছে।

আমি বাজারে কাঁচা লঙ্কা কিনতে গেলে একটা ভেঙে জিভে ঠেকিয়ে আগে দেখে নিই, সুতরাং ঝাল দিয়ে আমাকে জব্দ করা শক্ত। তবু জব্দ হয়েছি দু'বার, একবার দক্ষিণ ভারতে বেজোয়াড়া নামের একটি জায়গায় একটা ছোট হোটেলে, সেখানে মাংসের ঝোলে জিভ ঠেকিয়েই আমি প্রায় নাচতে শুরু করেছিলাম

—মনে হয়েছিল পেটের নাড়িভুঁড়ি সব জ্বলে গেল! আর দ্বিতীয়বার এই পাঠানকোটে!

ঝাল জিনিসটার একটা মজা এই যে, মাঝপথে থামা যায় না। আরো খেয়েই যেতে হয়। এক টুকরো মাংস মুখে তুলছি আর উঃ আঃ করে চেঁচাচ্ছি, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই অবস্থায় প্লেটটা চেটেপুটে শেষ করলাম। তারপর এক ভাঁড় টক দই খেলাম, পাঁচ গেলাস জল খেলাম তবু ঝাল যায় না। তক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে। তাড়াতাড়ি জানলার ধারে আমার সীটটা দখল করে আমি কুকুরের মতন জিভ বার করে হা—হা—হা করতে লাগলাম।

আমার সেই রকম অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য বাসের সব লোকের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল। কেউ কেউ ছুঁড়ে দিয়েছিল দু'একটা সহানুভূতিসূচক মন্তব্য। এক মহিলা একটি সন্দেশ এগিয়ে দিয়ে আমাকে খেয়ে নিতে বলেছিলেন, আর একজন দিয়েছিল এক খিলি পান।

একসঙ্গে অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে তাই যাত্রীদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। নানা প্রদেশের নানা ভাষার লোক তবু এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা সাড়ে ন'জন। আর বাঙালি অবাঙালি মিলিয়ে যুবতী মেয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। যুবতী মেয়েদের কোনো জাত নেই।

পনেরো-ষোলো জনের একটি ছাত্রদল দখল করে রেখেছে সামনের দিকের অনেকগুলো সীট, তারা নিজেদের মধ্যে হইহল্লায় মত্ত হয়ে আছে। আর একটি আট-ন'বছরের বাচ্চা মেয়ে কিছুতেই নিজের জায়গায় বসবে না—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাসের মধ্যে, কখনো বসে পড়ছে অচেনা লোকের পাশে। এইটিই আমাদের সাড়ে নয়তম বাঙালিনী।

অচেনা শিশু এবং অচেনা কুকুরকে আমি রীতিমতন ভয় করি। এদের কাকে যে কখন একটু আদর করতে গেলে চ্যাঁচামেচি করে উঠবে তার ঠিক নেই। একবার একটি বাচ্চা মেয়েকে দেখে আমি বলেছিলাম, বাঃ একে তো খুব সুন্দর দেখতে, ঠিক পুতুলের মতন—তাই শুনেই মেয়েটি ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠেছিল, তার বাবা-মায়ের সামনে আমি একেবারে অপ্রস্তুত! 'পুতুলের মতন' বলাটা নাকি অন্যায় হয়েছে—ঐ ফর্সা মেয়েটিকে দেখেই সবাই ঐ কথা বলে, আর তাতেই সে রেগে যায়। সেই থেকে আর কোনো বাচ্চাকে আমি সুন্দর বলি না।

এই মেয়েটি কিন্তু খুব হাসিখুশি আর টরটরে! একটা হালকা নীল ফ্রক পরে প্রজাপতির মতন উড়ে বেড়াচ্ছে। একবার সে আমার পাশে এসে বলল, এই তুমি সরো না, আমি জানলার ধারে বসব, আমি এদিকটা দেখব। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি বুঝি একদম ঝাল খেতে পারো না? আমি পারি।

তাকে বসতে দিলাম। মেয়েটির নাম জিয়া। তার একটা ভালো নামও আছে, সেটা বেশ খটমটে। দু'তিনবার শোনার পর বুঝতে পারলাম ওর ভালো নাম ঋতুপর্ণা।

জিয়ার মাথায় টগবগ করছে হাজার প্রশ্ন। ঐটা কি গাছ? ঐটা কি পাখি? ঘুঘু পাখিরা কি খায়? একটা ঘোড়া একলা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

জিয়ার বাবা-মা বসেছেন অনেকটা দূরে, তাঁরা বারবার মেয়েকে ডাকছেন, সে কিছুতেই যাবে না। আমার পাশেই বসেছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, তিনি বাস চলার পরই ঘুমোতে শুরু করেছিলেন—জিয়া তাকেও জাগিয়ে দিল। ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন না, জিয়ার ভাষা না বুঝেও মজা পেতে লাগলেন।

আমার ডান পাশে লম্বা সীটটায় বসেছে একটি যুবক ও দুটি যুবতী। এই তিনজনের মধ্যে সম্পর্কটা যে ঠিক কি, তা অনেকক্ষণ ধরে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। মেয়ে দুটি দু' বোন? কিন্তু মুখের কোনো মিল নেই। দুই বান্ধবী? তা হলে সঙ্গে একটি যুবক কেন? মনে হলো ওদের মধ্যে একজন ঐ যুবকটির স্ত্রী, সদ্য বিবাহিত। ওরা কাশ্মীরে হনিমুনে যাচ্ছেন। হনিমুনে যাবার সময় কোনো মেয়ে তার বোন কিংবা বান্ধবীকে সঙ্গে নেয়? ব্যাপারটা বুঝলাম না। যুবকটি একজনের সঙ্গেই কথাবার্তায় মত্ত, অন্যজন চুপচাপ বসে আছে। মনে মনে আমি সেই মেয়েটির নাম দিলাম অনাদৃতা। অনাদৃতা কিন্তু যথেষ্ট সুন্দরী।

পাঠানকোট পর্যন্ত সাংঘাতিক গরম ছিল, জম্মু পর্যন্ত এসেও গরম কমবার নাম নেই। অনেকেই বাক্স থেকে সোয়েটার আর শাল বার করে রেখেছে, কিন্তু কোথায় শীত? বাস যখন সমতল ভূমি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে লাগল, তখন পিঠের ঘাম শুকল।

অনেক বাচ্চা প্রথম পাহাড়ে উঠে একটু ভয় পায়। জিয়ার ভয়-ডর কিছু নেই। আমার জানলার পাশেই খাদ, অনেক নীচে বাড়িঘর, মানুষগুলোকে ছোট্ট ছোট্ট দেখায়। তা দেখে জিয়ার দারুণ আনন্দ। সে মুখ বাড়িয়ে একবার সেই অনাদৃতা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, এই, তোমরা ছোট্ট ছোট্ট মানুষ দেখতে পাচ্ছ?

অনাদৃতা জিয়ার কথা বুঝতে পারল না। মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেয়া?

জিয়া আবার বাংলাতে সেই এক কথাই বলল।

অনাদৃতা তখন আমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকিয়ে বলল, কেয়া পুছতি হ্যায় ইয়ে লেড়কি?

আমার হিন্দীজ্ঞান বড়োই শোচনীয়। তবু কোনো রকমে বুঝিয়ে বলতে হলো। মেয়েটি তখন হেসে জিয়াকে উত্তর দিল, নেহি, কুছ নেহি হায় ইধার!

এই মেয়েটি জানলার ধারে বসতে পারেনি। সেখানে বসেছে অন্য মেয়েটি। মাঝখানে যুবকটি সেই মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে ওদিকে ফিরে আছে। সাধে আর কি আমি এর নাম দিয়েছি অনাদৃতা?

জিয়া বলল, তুমি এদিকে এসো না, এদিকে এসো, দেখতে পাবে। এ-ই-টু-কু ছোট্ট ছোট্ট মানুষ।

অনাদৃতা কি করে এদিকে আসবে? তা হলে আমাকে বা পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে উঠে যেতে হয়। উঠে কোথায় যাব?

মেয়েটি এল না। জিয়া আরো কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা চালাল। মেয়েটি বাংলা জানে না, জিয়া বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। সুতরাং আমাকেই দায়িত্ব নিতে হলো অনুবাদকের। এই সুযোগে মেয়েটির সঙ্গে আমার খানিকটা ভাব হয়ে গেল।

বাস থামল একজায়গায়। নেমে একটু হাত পা ছড়িয়ে নিতে হবে। অনাদৃতার সঙ্গের অন্য মেয়েটি আর যুবকটি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল গাছের আড়ালে। চুমুটুমু খাবে বোধহয়। অনাদৃতা একলা একলা বসে রইল বাসেই।

আমি তাকে একটু সঙ্গ দেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু জিয়া জোর করে আমার হাত ধরে টেনে নামাল। ওর বাবা-মা বললেন, মেয়েটা আপনাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে, না?

আমি ভদ্রতা করে বললাম, না, না!

জিয়া ছুটে ছুটে খাদের ধারে যেতে চায়, আমাকেই সামলাতে হবে দেখছি। সেখানে শক্ত করে আমি তার হাত ধরে থেকে বাসের দিকে তাকাই। অনাদৃতা একা বাসের মধ্যে বসে আছে। আমার ইচ্ছে হলো, হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকি। বাইরে কি সুন্দর দৃশ্য, ও কেন বাসের মধ্যে বসে থাকবে? কিন্তু ওর সঙ্গে এখনো ততটা পরিচয় হয়নি, যাতে হাতছানি দেওয়া যায়।

আবার বাস ছাড়ল, এবং একটু পরেই একে একে বমি শুরু হলো। প্রথমেই বমি করল অনাদৃতা। তারপর জিয়ার মা, তারপর মেয়েদের মধ্যে আরো তিনজন এবং দু'জন পুরুষ। এই রাস্তায় এরকম হয়।

অনাদৃতাকে এবার জানলার ধারের সীট দিতেই হলো। মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে বমি করছে। চোখ দুটো করুণ হয়ে এসেছে। লজ্জা এবং কষ্ট দুরকমই বোধ করছে একসঙ্গে।

এক জায়গায় হঠাৎ আমি রোককে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। এ বাস যেখানে সেখানে থামে না। তবু জোর করে থামানো হলো। আমি একটু দূরে একটা ঝরনা দেখতে পেয়েছিলাম, ঠিক রাস্তার পাশেই। একটু পেছনে ফেলে এসেছি।

জিয়াকে বললাম, চলো, ঝরনা দেখে আসবে?

দু'জনে নেমে ছুটলাম। আমার কাঁধে ঝোলানো ওয়াটার বটল ছিল। ঝরনার কাছে এসে পুরোনো জল ফেলে দিয়ে ওয়াটার বটলে ঝরনার জল ভরে নিলাম। খুব ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার জল। বাসের কাছে এসে এপাশের জানলা দিয়ে অনাদৃতাকে আমার ভাঙা হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে বললাম, এই জলটা দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন, খুব ঠাণ্ডা জল, ভালো লাগবে!

অনাদৃতা প্রথমে অবাক হলো, তারপর ওর চোখে মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল। আমার কাছ থেকে ওয়াটার বটলটা নিতে দ্বিধা করল না।

ঝরনার কথা শুনে অনেকেই নেমে পড়ল। অনেকে সেদিকে গেল। অনাদৃতাও নামল। মেয়েটি বেশ লম্বা, লাল শাড়ি ও লাল ব্লাউজে বেশ একটা অগ্নিশিখার মতন ভাব, পেছন থেকে তার কোমর, পিঠ কাঁধ অনেকটা ভি অক্ষরের মতন দেখায়।

হঠাৎ বাস থামাবার জন্য ড্রাইভার একটু রাগারাগি করছিল। তারপর সে নিজেই কিছু গণ্ডগোল করল কিনা কে জানে, বাসটা আর ঠিক মতন চলল না। মাঝে মাঝে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করতে লাগল। গীয়ারেরও নাকি গোলমাল দেখা দিয়েছে। পাহাড়ী রাস্তায় কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ঠিক হলো কুদ বলে একটা জায়গায় গিয়ে দেখতে হবে, অন্য বাস পাওয়া যায় কিনা। বাস বদলাতেই হবে।

কুদ-এ পৌঁছে দেখা গেল আর বাস নেই। পাঠানকোট বা জম্মু থেকে সব বাস ভর্তি হয়েই আসছে, তাতে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং কুদ-এই আমাদের রাত কাটাতে হবে। তাতে আমি অবশ্য খুশিই হলাম। রুটিন ছাড়া নতুন জায়গায় থাকতে আমার বেশ ভালো লাগে।

কুদ জায়গাটা বিশেষ বড়ো নয়। এখানে একটি বিখ্যাত জেল আছে—এক সময় অনেক রাজনৈতিক নেতাই ঐ জেলে দিন কাটিয়ে গেছেন। এছাড়া আর দু'চারটে দোকানপাট, একটা ধর্মশালা, আর একটা হোটেল।

ধর্মশালায় আমার জিনিসপত্র রেখেই আমি জেলটা দেখতে গেলাম। তারপর আরো খানিকটা ঘুরেটুরে যখন ধর্মশালার কাছে ফিরে এলাম, হঠাৎ সন্ধে হয়ে এসেছে। একটা দোকানে পুরী ভাজছে। খাঁটি ঘিয়ের এমন উগ্র গন্ধ যে, গা ঘুলিয়ে ওঠে। ঐ খাবার খেলে সহ্য হবে কিনা ভাবছি!

কুদ-এ ফিনফিনে শীত। চারপাশে বড়ো বড়ো পাহাড়। আকাশ এখানে নীচু হয়ে এসেছে। পুরুষের দল ধর্মশালায় উঠেছে, যাদের সঙ্গে নারী রয়েছে, তারা গেছে হোটেলে। ধর্মশালাটা বেশ নোংরা, তাও এক ঘরে অনেককে গাদাগাদি করে শুতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবার পর আর কিছুই করার নেই। এক্ষুনি শুয়ে পড়ারও কোনো মানে হয় না। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হঠাৎ কীরকম যেন মন খারাপ লাগছে। শুনেছি, উঁচু পাহাড়ে উঠলে মানুষের এরকম যখন তখন মন খারাপ হয়, একাকীত্ব তীব্র হয়ে ওঠে।

এক সময় দেখলাম হোটেলের চত্বর থেকে নেমে এলো অনাদৃতা। যুবকটি আর অন্য মেয়েটি নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুয়ে পড়েছে। অনাদৃতার আসল নাম কি, তা এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি।

আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ও আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ তুলে তাকাল, একটু হাসল, বলল, হ্যালো!

আমি ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন?

—একটু হেঁটে আসতে যাচ্ছি।

এর পর আমারই বলা উচিত ছিল, আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? কিন্তু সে কথা হলো না। বরং আমি আশা করে রইলাম, মেয়েটিই বলবে, আপনি চলুন না আমার সঙ্গে একটু!

মেয়েটি সে কথাও না বলে লাজুকভাবে হেসে এগিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি ওকে যেতে দিলাম একা। আকাশে জ্যোৎস্না নেই, তবে ঘুরঘুটে অন্ধকারও নয়, বেশ কিছু দূর পর্যন্ত মেয়েটিকে দেখা যায়, তারপর আর দেখা যায় না।

আমি একা একা দাঁড়িয়ে পরপর দুটো সিগারেট শেষ করলাম। তারপর মনে হলো, আমার মতন নির্বোধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আমার কোনো কাজ নেই। একলা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর ঐ মেয়েটি, যার সঙ্গীরা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না—সেও একলা বেড়াতে বেরিয়েছে—এখন আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক নয় কি ওর সঙ্গেই যাওয়া? কেন গেলাম না? মেয়েটি আমাকে দেখে হেসেছে—সুতরাং নিশ্চয়ই আমাকে একেবারে অপছন্দ করে না! তবে, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে বলল না কেন? বোধহয় লাজুক। কিংবা আমারই বলা উচিত ছিল!

এখন যাব? কেন নয়?

আমি সেইদিকেই এগোলাম। একটু দূরে ডান দিকে একটা ছোট টিলা, সেখানে একটি পাথরের ওপর বসে আছে অনাদৃতা। তার ডান পাশে গম্ভীর বিশাল পাহাড়। সামনে খোলা আকাশ। সেই পটভূমিকায় মেয়েটিকে একেবারে অন্যরকম দেখায়। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম অনাদৃতা, এখন ওকে মনে হয় দুর্লভতমা।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। একাকীত্বেরও একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে। এই যে মেয়েটি টিলার ওপর আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছে, আমার মনে হলো,

এমন একটা সুন্দর দৃশ্য আমি বহুদিন দেখিনি।

এখন আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালে এই দৃশ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওখানে আমাকে মানাবে না!

আমি দূর থেকেই দেখতে লাগলাম।

১৯

একখানা দেড়-তে কালো চাঁদিয়ালি ঘুড়ি পাবার দারুণ বাসনা ছিল আমার এক সময়। চকচকে কড়িটানা সেরকম কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি দোকানেও কিনতে পাওয়া যেত না। সেরকম ঘুড়ি শুধু রায়দের বাড়ি থেকে আলাদা অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হতো।

রায়দের ঐ ঘুড়িগুলিকে আমরা বলতাম গুণ্ডা ঘুড়ি। আকাশের অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ হুড়মুড় করে নেমে এসে পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে সাফ করে দিয়ে যেত। কখনো যে ওদের ঘুড়িও কেটে যেত না তা নয়, কিন্তু কাটলে তক্ষুনি ঠিক ঐ রকম আর একটা ঘুড়ি রায়দের বাড়ি থেকে উড়ে এসে প্রতিশোধ নিয়ে যেত।

রায়দের ঘুড়ি ওড়াবার ব্যাপারে আর একটা বিশেষ চালিয়াতি ছিল। যে ঘুড়ি একবার তারা আকাশে ওড়ায়, সেটা আর তারা মাটিতে নামায় না। সন্ধেবেলা, যখন তারা পাড়ার আর সব ঘুড়িকে কেটে ছারখার করেছে, তারপর তারা নিজেদের ঘুড়ির সুতো ইচ্ছে করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত।

সেই ঘুড়ি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত পাড়ার ছেলেদের মধ্যে। সাধারণত সন্ধেবেলায় সেই শেষ ঘুড়ি উড়ে যেত অনেক দূরে, অন্য কোনো পাড়ায় কিংবা মনে হতো যেন নিরুদ্দেশে। আকাশের অনেক উঁচুতে ঐ কালো চাঁদিয়াল রাত্রির সঙ্গে মিশে যাবে, কোনোদিন মাটিতে নামবে না। কেউ কেউ অবশ্য বলত, ঐ ঘুড়িগুলো উড়ে গিয়ে গঙ্গায় পড়ে। রায়রা প্রত্যেকদিন ঐভাবে ঘুড়ি দিয়ে গঙ্গা পুজো দেয়। উত্তর কলকাতায় আমাদের পাড়া থেকে গঙ্গা খুব দূরে ছিল না।

অবশ্য পাড়ার দু'তিনজন ছেলে ঐ ঘুড়ি ধরেছে, তারপর সগর্বে সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছে। যাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা আছে বা কখনো ছিল, তারা বুঝতে পারবে সুতো সমেত একটা জ্যান্ত ঘুড়ি ধরে ফেলার আনন্দ কতখানি! লটারিতে টাকা পাওয়ার চেয়েও বেশি। ঐ কালো চাঁদিয়াল যে ক'জন পেয়েছে, প্রত্যেকেই সেটা টাঙিয়ে রেখেছে ঘরের দেয়ালে, বিশেষ কোনো প্রাইজের মতন।

আমি কখনো পাইনি। সেইজন্য আমার মনের মধ্যে বেশি তীব্র দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ তীব্রতর হল আরো একদিন, যেদিন আমি ঐ রকম একটা ঘুড়ি পেয়েও হারিয়েছিলাম!

সেদিন সন্ধেবেলা রায়রা হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিয়েছে, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছি। হাওয়ায় বেশ জোর ছিল, আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যদি গঙ্গা পর্যন্ত হয়, তাও গিয়ে দেখে আসব!

কিন্তু সেদিন ঘুড়িটা বেশি দূর গেল না, আহিরীটোলার কাছে এসে গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে নীচে নামতে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখি, আমার পিছনে আর কোনো অনুসরণকারী নেই। আবছা আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, অন্য কেউ আকাশের ঐ কালো রঙের ঘুড়িটা দেখতেও পাবে না। শুধু আমার চোখই ওকে দেখবে।

আমার বুক টিপ টিপ করতে লাগল। তাহলে সত্যিই এতদিন বাদে আসবে আমার হাতে রায় বাড়ির কালো চাঁদিয়াল। এতদিনের স্বপ্ন!

ঘুড়িটা শেষ গোঁত্তা খেয়ে পড়ল একটা বাড়ির উঠোনে। আমিও কোনো চিন্তা না করে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

বাড়িটা আমার মুখ চেনা। সেটাও আর এক রায়েদের বাড়ি। পুরোনো কলকাতার বনেদি বেনেদের বাড়ি যেমন হয়। সামনে লোহার গেট, এক সময় সেখানে দারোয়ান থাকত। এখন থাকে না। হয়তো সেখানে এক কালে গেটের মাথায় নহবৎখানায় নিত্য গানবাজনাও হতো—এখন ইট ভেঙে পড়ছে। ভেতরে খানিকটা বাগান, এককালে সেখানে ছিল ফোয়ারা ও নগ্ন নারীমূর্তি—এখন আগাছার জঙ্গল। নারীমূর্তির নাক ভাঙা, হাত ভাঙা। এক পাশে আস্তাবল, জুড়িগাড়ির ঘোড়াগুলো রাখার জন্য—এখন ঘোড়া জুড়িগাড়ি কিছুই নেই—আস্তাবলটায় একটা সাইকেল সারাবার দোকান হয়েছে।

যাওয়া আসার পথে বাড়িটা অনেকবার দেখেছি। ও বাড়ির একটা ছেলে একসময় আমাদের স্কুলে পড়ত, পড়াশুনোয় একেবারে অগামার্কা, ক্লাস এইটে উঠেই পড়া ছেড়ে 'বিজনেস' করতে চলে গেল।

বাড়ির গেটটা হাট করে খোলা, সুতরাং সে বাড়ির বাগানে গিয়ে ঘুড়ি ধরবার জন্য কোনো দ্বিধাই করিনি। ঘুড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা পেয়ারা গাছে। সুতোটা নীচে ঝুলছে। সুতোটা ধরে সবে মাত্র টান দিয়েছি, এমন সময় কে একজন হুংকার দিয়ে বলল, এই কে রে ওখানে?

তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের সঙ্গে যে গজেন পড়ত, তার মেজ-কাকা। অর্থাৎ এ বাড়ির মেজবাবু। গজেনের মুখে শুনেছিলাম, উনি রেস খেলেন। অবশ্য সেটা যে ঠিক কী রকম খেলা, তা তখন জানতাম না।

মেজবাবুর বয়েস তখন বেশি না, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হবে। চেহারা ও গলার আওয়াজ ঠিক বনেদি বাড়ি সুলভ। ধপধপে ফর্সা রং, লম্বা, মুখে একটা পুরুষ্টু গোঁফ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। একটা সাদা গেঞ্জি আর সিল্কের লুঙ্গি পরে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে একটা সোনার তাগা।

আমি বললাম, আমার ঘুড়িটা এখানে পড়েছে, তাই নিতে এসেছি!

কে তোকে ভেতরে ঢুকতে বলেছে? এই রঘু, দ্যাখ তো!

আমি তখনো ঘুড়িটা ধরে টানছি! সেটা নেমে এলেই দৌড়ে পালাব। ঘুড়িটা সহজেই গাছ থেকে নীচে এসে পড়ল। কিন্তু আমি সেটা তুলে নেবার আগেই একজন হুঁৎকো মতন লোক ভেতর থেকে এসে আমার ঘাড় চেপে ধরল।

আমি বললাম, ওটা আমার! ওটা আমার!

লোকটা পা দিয়ে ঘুড়িটা চেপে ধরে আমাকে জোরে একটা ধাক্কা দিল। ওপর থেকে মেজবাবু বললে, রঘু ওটা ওপরে নিয়ে আয়।

আমি বুঝলাম, ঘুড়িটা আমি পাব না। কিন্তু এই লোকটা আমাকে মারবে কেন?

আমি মেজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখুন, ও আমায় মারছে!

মেজবাবু হ্যা-হ্যা-করে হেসে বলল, মারবে না কি আদর করবে? যত সব চোর-ছ্যাঁচোড় যখন তখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম, আমি গজেনের বন্ধু।

মেজবাবু বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে বলল, তবে আর কি, কৃতার্থ করেছ! গজেনের বন্ধু। সবকটাই তো হতভাগা! বদমাইশ। যা ভাগ এখান থেকে!

কালো চাঁদিয়ালটার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে আমি ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। আমার সারা গা জ্বালা করছে। ঘাড়ের কাছে কেউ যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। বাড়িটার সামনে রাস্তায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, সমস্ত পৃথিবী আমার শত্রু।

তারপর সেই বাড়িটার গায়ে থুক্ করে থুতু ফেলে বললাম, তোমায় আমি দেখে নেবো, শালা!

জীবনে সেই প্রথম শালা কথাটা উচ্চারণ করলাম আমি!

কিন্তু এক বনেদি বাড়ির মেজবাবুকে আমার মতন সামান্য এক স্কুল মাস্টারের ছেলে কীভাবেই বা দেখে নেবে! কোনো প্রতিশোধই নেওয়া হলো না। শুধু মনের মধ্যে রাগ পোষা রইল। মাঝে মাঝে ঐ বাড়িটার পাশ দিয়ে যাই, আর ঘৃণার চোখে তাকাই। লোকটার মুখ আমি ভুলিনি, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘুড়ি ধরার শখ অবশ্য আমার কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল। আকাশের দিকে চোখ আটকে রাখবার বদলে আজ মাটির পৃথিবীতে অনেক কিছু

দেখার মতন পেয়ে গেছি।

কলেজে পড়ার সময় একদিন আমার জীবনের প্রথম বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গেছি গঙ্গার ধারে। হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি। নদীর ধারে বৃষ্টিতে ভেজার মতন আনন্দের আর কিছুই নেই। সব লোক যখন ছুটোছুটি করছে আমরা দু'জন তখন মন্থর পায়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খুব জোরে বাতাস দিলে বৃষ্টিকে মনে হয় পাতলা চাদর। গঙ্গার ওপর তখন শত শত পাতলা চাদর উড়ছে।

তা তো হলো। কিন্তু ফেরার পথে ঐ রকম ভিজে জামাকাপড় নিয়ে ট্রাম বাসে ওঠা যায় না। মেয়েদের পক্ষে ভিজে শাড়ি পরে পথ দিয়ে হেঁটে আসারও অসুবিধে আছে। আমার পকেটে চারটে টাকা ছিল, সেটা দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে ভরে রেখেছিলাম, যাতে ভিজে না যায়। সুতরাং অনায়াসেই ট্যাক্সি চাপতে পারি। কিন্তু ট্যাক্সি আর কিছুতেই পাই না। ঠিক এই সময় কোনো ট্যাক্সিই কি খালি থাকতে নেই। বহু ছুটোছুটি করলাম, বান্ধবীর কাছে আর প্রেস্টিজ রাখা যায় না। তারপর একবার রাস্তার উল্টো দিকে একটা ট্যাক্সি থামল। তক্ষুনি খালি হলো। আমরা দু'জনেই ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! করে চেঁচাতে লাগলাম। ড্রাইভার আমাদের দেখল। আমরা ছুটে রাস্তা পার হয়ে এলাম। কিন্তু ট্যাক্সিটার কাছে পৌঁছানোর আগেই আর একজন সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লোক দরজা খুলে ঝট করে উঠে বসল।

আমি গিয়ে বললাম, একি, আমরা আগে ডেকেছি!

লোকটা আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ড্রাইভারকে বলল, চলো, চলো!

আমি ড্রাইভারকে বললাম, কেয়া? হামলোগ আগে নেহি বোলায়া?

ড্রাইভার বলল, হাম কেয়া করেগা।

আমি সিল্কের পাঞ্জাবিকে বললাম, আপনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন না। আমরা আগে এটা ডেকেছি!

লোকটা উত্তর দিল না। ড্রাইভারকে বলল, চলো! দেরি কাঁহে করতা!

এবার আমি লোকটাকে চিনলাম। সেই রায়বাড়ির মেজবাবু। আমার মনে পড়ে গেল পুরনো কথা। সেই সুন্দর নির্দয় মুখ। মনে হলো, এই লোকটা আমার জীবনের চরম শত্রু।

ট্যাক্সি ছেড়ে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ঠিক আছে, একদিন দেখে নেব।

তাও কিছু দেখে নেওয়া হয়নি!

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। সে পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন। উত্তর কলকাতার ঐ অঞ্চলটায় আর যাওয়াই হয় না। বছর পাঁচেক বাদে একদিন

হঠাৎ কোনো কারণে ঐ পাড়ায় গিয়ে চমকে উঠলাম। সি আই টি থেকে নতুন রাস্তা বানিয়েছে, তাতে সেই রায়বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সে বাড়ির আর চিহ্নও কোথাও নেই। রায়বাড়ির বাগানে যে-জায়গাটায় আমি ঘুড়ি ধরতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলাম, আন্দাজে বুঝলাম, সেই জায়গাটা এখন রিকশা স্ট্যাণ্ড হয়েছে। কুড়ি-পঁচিশখানা রিকশা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেললে অনেকের দুঃখ হয়। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে আমার একটুও দুঃখ হলো না। মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে। এই সমস্ত পুরোনো বাড়ি না ভাঙলে শহরের উন্নতি হবে কী করে? রাস্তাটার জন্য উপকার হয়েছে কত লোকের।

এর পরও কেটে গেছে বেশ কিছু বছর। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি আমার এক পরিচিত প্রেসের অফিস ঘরে বসে চা সিঙ্গাড়া খাচ্ছি--এমন সময় একজন বুড়ো মতন লোক ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

প্রেসের মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

লোকটা একটা ছোট বাক্স খুলে কিছু শস্তা ধরনের পেন আর ডট পেন্সিল বার করল, তারপর বলল, আমরা এগুলো নতুন বার করেছি, যদি লাগে একদম নাম্বার ওয়ান জিনিস—

প্রেসের মালিক বললেন, এটা ছাপাখানা মশাই। এখানে পেন-পেন্সিল দিয়ে কী হবে? এটা তো স্কুল নয়।

লোকটি বলল, তাও যদি একটু ট্রাই করে দেখেন। বাঙালির তৈরি—

চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি, গলার আওয়াজে চিনতে পারলাম। সেই রায়বাড়ির মেজবাবু।

এতটা তো বুড়িয়ে যাবার কথা নয়। ফর্সা লম্বা সুপুরুষ ছিলেন। এখন চেহারাটা পাকিয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে মুখের চামড়া। গায়ের জামাটা খুব ময়লা হলেও সিল্কের। গলায় আওয়াজটা অবশ্য সেইরকম বাজখাঁই আছে—অনেকটা যাত্রাদলের সেনাপতির মতন।

আমি স্তম্ভিতভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি, চেনবার কোনো কথাই নয়। কিন্তু আমি ভুলিনি। কৈশোরের ক্রোধ ও অভিমান কখনো মোছে না। এই আমার সেই জন্মশত্রু, যার ওপর আমার প্রতিশোধ নেবার কথা। সে এত কাছে।

কিন্তু এর ওপর আমি কী প্রতিশোধ নেব? ওর ওপর আমার আবার রাগ হলো। কেন ও আমার প্রতিশোধের অযোগ্য হয়ে গেল? ও যদি শক্ত সমর্থ চেহারায় আগেকার মতন দর্প নিয়ে এখন এসে এখানে দাঁড়াত, আমি ঠিক উঠে

দাঁড়িয়ে ওকে অপমান করতাম। ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতাম। তার বদলে ও কেন এমন মলিন, এমন হতশ্রী দুর্বল হয়ে আমার সামনে এল? ও আমাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিল না। আমার আগেই অন্য কেউ, কিংবা অনেকে ওর ওপর সেই প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে।

লোকটি তখনো ঘ্যানঘ্যান করছিল, প্রেসের মালিক বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে যান না মশাই। বলছি তো লাগবে না! এটা কি ইস্কুল?

লোকটি বলল, একটা অন্তত নিন!

ট্রেনের কামরায় এরকম কলম ফেরি করতে দেখেছি, কিন্তু লোকের বাড়ি বাড়ি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাবসাটা আপনার নিজের? মানে, আপনার কোম্পানি?

লোকটি বলল, না, না, আমি এজেন্সি নিয়েছি।

রেসের খেলা ছেড়ে দিয়ে কেন যে এই এজেন্সির খেলা উনি খেলতে নামলেন, তা বুঝলাম না। আমি মুখ ফিরিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

লোকটি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললাম, ঠিক আছে, আমাকে একটা দিন। একটা ডট পেন কিনব কিনব ভাবছিলাম।

দেড় টাকা দাম, দু'টাকার নোট দিলাম। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে তালুর উপর রেখে খুব সাবধানে গুণতে লাগল, ভূতপূর্ব রায়বাড়ির মেজবাবু। তারপর জিভ কেটে বলল, এই রে, পাচ নয়া কম আছে যে!

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ঠিক আছে, তাই দিন!

—আচ্ছা স্যার, নমস্কার, খুব উপকার করলেন—

আমি আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

২০

নার্সিং হোমের কেবিনে বাদলদা'র সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। উনি এসেছিলেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করাতে। সেসব নির্বিঘ্নে চুকে গেছে, এখন আর তিন-চার দিনের বিশ্রাম। একা একা ভালো লাগে না বলে উনি আমাদের অনুরোধ করেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য গল্প করে যাবার জন্য।

গল্প বেশ জমে উঠেছিল। ওয়ার্ডবয়কে ধরে আমরা একবার চা আনিয়ে নিয়েছিলাম, দরজা বন্ধ করে সিগারেটও খাওয়া যায়। অরবিন্দ এমন সব মজার মজার গল্প শুরু করেছিল যে এক সময় বাদলদা বাধা দিয়ে বললেন, আর

হাসাসনি, আর হাসতে পারছি না, পেট ব্যথা করছে! সেলাই ছিঁড়ে যাবে।

হঠাৎ এই সময় পাশের বারান্দায় কান্নার কলরোল শোনা গেল। আমরা অমনি চুপ করে গেলাম। কয়েকটি মহিলা একসঙ্গে সুর করে কাঁদছে।

আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে। নার্সিং হোমে তো মাঝে মাঝে কেউ না কেউ মারা যাবেই। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে কেন? আমি মৃত্যু একদম সহ্য করতে পারি না। আমি মৃত মানুষের মুখ পারতপক্ষে দেখতে চাই না, পালিয়ে যাই, কেননা কোনো অচেনা মৃত মানুষের মুখ দেখে ফেললেও সেটা আমি আর ভুলতে পারি না—বুকের মধ্যে দাগ কেটে বসে যায়। শোকের কান্না থেকেও আমি যতদূর সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করি, ঐ কান্না শুনলেই আমার ভয় হয়, আমার বুক কাঁপে। মৃত্যুর মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গোঁয়ার্তুমি আছে—ঘটনাটা আর কিছুতেই বদল করা যায় না, তাই তাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করি। মৃত্যুর ব্যাপারে আমি স্বার্থপর।

দরজাটা ফাঁক করে সন্তর্পণে বাইরে তাকালাম। তিন-চারজন মাড়োয়ারী মহিলা বারান্দার মেঝের ওপর বসে পড়েছেন পা ছড়িয়ে, কপালে হাত রেখে মুচড়ে মুচড়ে কাঁদছেন। ডেড বডিটা কি এক্ষুনি বাইরে আনা হবে? তার আগেই আমার পালানো দরকার।

ইচ্ছে করলেই নিশ্বাস চেপে নাক বন্ধ করা যায়, কিন্তু কান বন্ধ করার কোনো উপায় নেই মানুষের। বাদলদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যতদূর সম্ভব অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে পা টিপে টিপে চলে এলাম বারান্দা দিয়ে। তারপর সিঁড়িতে এসেই দৌড়—যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায় ঐ শোকের কান্না থেকে।

নার্সিং হোমের গেটের কাছে একজন তরুণ ডাক্তার গল্প করছেন অন্য একজনের সঙ্গে। কয়েকদিন আসা-যাওয়ায় ডাক্তারটির সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে—চোখাচোখি হলে দু-একটা কথা বলা উচিত।

ডাক্তারটি এই সময় হেসে উঠলেন হো হো করে।

আমি একটু দমে গেলাম। ডাক্তাররা কী হৃদয়হীন হয়! এইমাত্র এখানে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে কান্না—আর একজন এত উঁচু গলায় হাসছে! জীবন বোধহয় এমনই নির্বিকার।

ডাক্তারটি আমাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী—চললেন? এখনো তো ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়নি।

আমি বললাম, এই একটু কাজ আছে।

ডাক্তারটি হাসতে হাসতেই বললেন, ঐ কান্না শুনে পালাচ্ছেন তো?

আমি চুপ করে গেলাম।

ডাক্তারটি তখু বললেন, কেন কাঁদছে তা জানেন তো? এদের নিয়ে আর পারা যায় না!

এবার কৌতূহল জাগ্রত হলো। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী হয়েছে?

—মেয়ে হয়েছে! সাত নম্বর মেয়ে।

—অ্যাঁ?

—গত তিনবছর ধরে তো আমিই দেখছি। প্রত্যেকবারই এই রকম। প্রত্যেকবারই মেয়ে হয়, আর বাড়ির সকলের কান্নাকাটির ধুম পড়ে যায়। একটু লজ্জাও নেই, এই নার্সিং হোমের মধ্যেই—

—মেয়ের জন্য কান্না?

—হবে না! বিরাট ব্যাবসা ওদের, অথচ বাড়িতে একটাও ছেলে জন্মায়নি এ পর্যন্ত! আগেকার দিন হলে আরো দু-একটা বিয়ে করে ফেলত।

অরবিন্দ বলল, আজকাল টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায়, আর নিজের একটা ছেলে পাওয়া যায় না? আপনারা ডাক্তাররা কী মশাই!

ডাক্তারটি বললেন, আমাদের সে চান্স দিচ্ছে কোথায়?

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম। অপরের কান্না নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা আমাদের এই প্রথম, কিন্তু আমরা সত্যি তখন বেশ মজা পাচ্ছিলাম।

বারান্দার ওই মাড়োয়ারী মহিলাদের বেশ সরলই বলতে হবে। মনের দুঃখ তাঁরা চেপে রাখতে পারেননি, কেঁদে ফেলেছেন। কিন্তু এরকম দুঃখ অনেক বাড়িতেই চাপা থাকে। পর পর মেয়ে জন্মালে সেই মেয়েদের বাবার চেয়ে মা-ই বেশি দুঃখ পায়, দেখেছি।

আমার তখন মনে পড়ল রেণুর কথা। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে জন্মালে রেণুর নাম হতো আন্নাকালী (আর না, হে মা কালী!)—কারণ সে তার বাবা-মায়ের ষষ্ঠতমা কন্যা। মাড়োয়ারীর ঘরে সাতটি মেয়ে জন্মালেও খুব একটা বিপদ নেই, কারণ তারা খেতে পরতে পারে ঠিকই এবং সমশ্রেণীর মাড়োয়ারীর সঙ্গে বিয়ে হবে। কিন্তু রেণুর বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য কর্মচারী।

ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় রেণুরা থাকত। ওদের বাড়িটা বিখ্যাত ছিল ঝগড়ার জন্য। ওফ্ কী ঝগড়া, কী ঝগড়া! রেণুর বাবা আর মা ঝগড়া করতেন, এক এক সময় রাস্তায় বেরিয়ে আসতেন পর্যন্ত। কোনো কোনোদিন রেণুর মা, চুলগুলো সব পিঠের ওপর ছড়ানো, শাড়িটা কোনো রকমে জড়ানো—কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে যেতেন কোথায় যেন—না, বাপের বাড়ি নয়, বেচারির কোনো বাপের বাড়ি ছিল না। ফিরে আসতেন একটু বাদেই।

রেণুরা ছ' বোন, কেউই সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্যের জৌলুস নেই, কোনোক্রমে বেড়ে

উঠেছিল শুধু। রেণুকে তখন আমরা লক্ষ্যই করিনি, বরং তার ওপরের দুই দিদি হেনা আর লতাকেই বেশি মনে পড়ে। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় ওদেরও কণ্ঠস্বর বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

রেণুর জন্মের আগেই যে তার বাবা মা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে কথা রেণু জানে, আমরা জানি, পাড়ার সবাই জানে। ঝগড়ার সময়ই এসব কথা শুনতে পাওয়া যেত। রেণু যখন গর্ভে তখন তার বাবা-মা হাসপাতালে গিয়ে চেয়েছিলেন তাকে নষ্ট করে ফেলতে। ডাক্তাররা রাজি হননি, কারণ তখন রেণুর মায়ের স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে কিছু করতে গেলে তাঁকে বাঁচানোই শক্ত হবে। সুতরাং বাবা-মায়ের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেণু এই পৃথিবীতে এল।

ঝগড়ার সময় রেণুর মা প্রায়ই বলতেন, এতগুলো মেয়ের বদলে তাঁর একটা ছেলে হলেই সব দুঃখ ঘুচে যেত! তা হলে এই অপদার্থ স্বামীর বদলে সেই ছেলেই তাঁকে ভবিষ্যতে দেখত! সুতরাং, পুত্র-সন্তানের শখ তখনো তাঁর রয়ে গিয়েছিল বলেই রেণুর জন্মের সাত বছর বাদের তিনি আবার গর্ভবতী হলেন। সেবার তিনি আর কোনো নতুন সন্তান নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন না। সন্তানের জন্ম দেবার আগেই মারা গেলেন। হয়তো সেবার তাঁর পেটে একটি ছেলেই এসেছিল, তাকে নিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন। দুঃখিনীদের জন্য যে আলাদা স্বর্গ থাকে, সেইখানে।

রেণুর বাবা অবশ্য আর বিয়ে করলেন না, কারণ রেণুর সবচেয়ে বড়ো বোন হেনার বয়স তখন বাইশ। সে-ই সংসারের কর্ত্রী হলো। যদিও ঝগড়াঝাঁটি কমলো না, হেনা তার মায়ের ভূমিকাটা পুরোপুরিই নিতে পেরেছিল। পাড়ার মধ্যে সেই ঝগড়া-বাড়িটা ঝগড়া-বাড়িই রয়ে গেল।

রেণুর বাবা এর পর এক এক করে মেয়েদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। সেসব কী অদ্ভুত বিয়ে। আমাদের তখন বয়েস কম, তবু বুঝেছিলুম, এই সংসারে প্রত্যেকটি মেয়েকেই বিয়ে করার জন্য একজন করে পুরুষ আছে। গরীব ঘরের কালো মেয়েদের নাকি সহজে বিয়ে হয় না, কিন্তু রেণুর বোনদের বিয়ে হতে লাগল পটাপট করে। আর কী সব বরেদের চেহারা। কারুকে দেখতে দৈত্যের মতন, কারুর আগে তিনটে বউ মরে গেছে, কারুর বয়েস রেণুর বাবার চেয়ে বেশি। কোনো বিয়ে হয় দুপুরবেলা, কোনো বিয়ে সন্ধেবেলা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। বিয়ের পর মেয়েগুলো যে চলে যায়, আর কোনোদিন ফিরে আসে না।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল রেণুর চতুর্থ বোন লতার বিয়ের সময়। পানাগড় থেকে বর এসেছিল একটি এক বছরের ছেলে কোলে নিয়ে। এক বছর আগে

তার বউ মারা গেছে, ছেলেকে কোথাও রেখে আসার জায়গা নেই। সেই ছেলে আবার বাবাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকবে না, অন্য কারুর কোলে যাবে না। বিয়ের সময় ছেলেকে এক পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে, ছেলে হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বাবার কোলে চড়ে বসল। দারুণ কান্না। কোনো রকমে নমো নমো করে বিয়ে সারা হলো। শুভদৃষ্টির সময় লতা একই সঙ্গে তার বর ও ছেলের মুখ দেখল।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেলল রেণু। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল, রেণু ফার্স্ট ডিভিশান ও অঙ্কে লেটার পেয়েছে! সবাই অবাক। ঐ বাড়ির মেয়েরা করপোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে দু-এক ক্লাস পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে—এর মধ্যে রেণু যে কখন উঠে গেল কেউ খেয়াল করেনি। সে একটা নিরীহ রোগাপটকা মেয়ে, তাকে লক্ষই করেনি কেউ।

আবার ও-বাড়িতে একটা ঝগড়াঝাঁটি ও কান্নার রোল উঠে গেল। এবার ধরনটা একটু অন্য রকম। রেণুর বাবা রেণুকে বকছেন আর মারছেন। আর রেণু কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাবা, আমি পড়তে চাই। আমি কলেজে পড়ব, আমার পড়া ছাড়িয়ে দিও না। রেণুর বাবা কিছুতেই রাজি নন। শেষে যখন ধুপধাপ করে তিনি রেণুকে মারতে লাগলেন, তখন পাড়ার অন্য লোকেরা গিয়ে ছাড়িয়ে দিল। পাড়ার একজন গণ্যমান্য প্রৌঢ় লোক প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনিই রেণুর পড়ার খরচ বাবদ প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন।

সবাই স্বস্তি পেল। অবশ্য, কিছুদিনের মধ্যেই সেই গণ্যমান্য প্রৌঢ়টি রেণুর পড়াশুনোর ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে রেণুদের বাড়িতে এত ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন যে অনেকে আবার বাঁকা কথা বলতে লাগল।

এর মাত্র বছর খানেক বাদে রেণুর বাবার মৃত্যু হওয়ায় আমাদের পাড়ায় ঝগড়া-বাড়ির ইতিহাস শেষ হলো। রেণু আর তার আর এক বোনের বিয়ে তখনো বাকি, তারা চলে গেল কোনো এক দিদির কাছে। অবশ্য কেউই গরজ করে নিতে চায়নি, কিন্তু না গিয়ে ওদের উপায় কী?

অনেক গরীব ঘরের মেয়ে কষ্ট করে বড়ো হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত আছে। রেণু যদি একদিন সরোজিনী নাইডু বা শকুন্তলা দেবী হয়ে উঠত, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু রেণু তা হয়নি। কয়েক বছর বাদে রেণু আমাদের পাড়ায় আবার এসেছিল একদিন। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সে বি-এ পাশ করেছে। অনার্স পায়নি, পাস কোর্সে। দিদির বাড়িতে থাকা তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়—তার দিদির পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তারা খরচ চালাতে পারছে না। সে একটা চাকরি চায়!

কালো, রোগা বি-এ পাস মেয়ের কি অভাব আছে কলকাতা শহরে? কে তাকে চাকরি দেবে? আমরা অনেকে মিলে চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কিছু সুবিধে করা গেল না। তবে দুটো টিউশানি জুটিয়ে দেওয়া গেল, যাতে কোনোরকমে খাওয়ার খরচটা চলে।

মাত্র মাস দুয়েক আগে রেণুর সঙ্গে আবার দেখা। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস-এ গিয়েছিলাম কী একটা কাজে, সিঁড়ির মুখে রেণুই আমাকে দেখে ডাকল।

রেণুর স্বাস্থ্যটা একটু ভালো হয়েছে, চোখে মুখেও খানিকটা উজ্জ্বলতা এসেছে। আমাকে দেখে বলল, নীলুদা, তুমি এখানে?

আমি বললাম, আমি তো এসেছি একটা কাজে, তুই এখানে কী করছিস?

—এখানেই তো আমার অফিস। আমি চাকরি পেয়েছি, শোনোনি তুমি? এই তো দু'মাস হলো।

রেণুর চাকরির খবর শুনে সত্যি খুব খুশি হলাম। সারা জীবন তো কিছুই পায়নি মেয়েটা, এবার একটু মানুষের মতন বাঁচবার চেষ্টা করবে।

বললাম, কোনটা তোর অফিস? চল দেখে আসি। চা খাওয়াবি?

—কেন খাওয়াব না? নিশ্চয়ই খাওয়াব!

রেণুর অফিসের দরজার সামনে এসেই চমকে উঠলাম। তারপর ঠোঁটে হাসি এসে যাচ্ছিল, লুকিয়ে ফেললাম সেটা। প্রকৃতির সত্যিই একটা পরিহাসবোধ আছে। বি-এ পাস মেয়ে হিসেবে রেণু তো অন্য কোনো অফিসেও চাকরি পেতে পারত। ও চাকরি পেয়েছে পরিবার পরিকল্পনার দপ্তরে! এখান থেকে, এতদিন বাদে, রেণু তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে!

২১

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, আমার দিদির নামে নানান দেশবিদেশ থেকে ঝকঝকে নতুন স্ট্যাম্প লাগানো খামের চিঠি আসত। আমরা ছোটরা, ডাকবাক্সে দিদির চিঠি কে প্রথম আবিষ্কার করবে, তাই নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলাম। কারণ, দিদির চিঠি যে প্রথম দেখবে, সে-ই নতুন স্ট্যাম্পগুলো পাবে।

দিদির চিঠি আসত অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—এই সব জায়গা থেকে। যারা চিঠি লিখত, তারা দিদিকে কখনো চোখে দেখেনি, দিদিও তাদের দেখেনি। এরা সবাই পেন ফ্রেণ্ড। দিদি তখন মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু

তখনই ইংরিজিতে বেশ বড়ো বড়ো চিঠি লিখতে পারে বলে আমরা রীতিমতন অবাক হয়ে যেতাম! তবে দিদির হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর—পাতলা ফিনফিনে কাগজে দিদি তার মুক্তোর মতন অক্ষরে বন্ধুদের চিঠি লিখত।

বন্ধুরা সবাই ছবি পাঠাত দিদিকে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে উইলো গাছের নীচে দাঁড়ানো একটি ফুটফুটে জাপানী মেয়ের ছবিই আমাদের বেশি মুগ্ধ করেছিল। মেয়েটিকে ঠিক যেন পুতুলের মতন দেখতে। সে এমনকি দিদিকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেছিল জাপানে গিয়ে তাদের বাড়িতে থাকবার জন্য। আর অস্ট্রেলিয়ার একটি গম্ভীর মুখের ছেলে দিদিকে চিঠি লিখত আট পাতা ন'পাতা করে।

একবার বিলেত থেকে এক বাক্স রুমাল এল দিদির নামে। বিলেত থেকে তার এক বান্ধবী পাঠিয়েছে। এর উত্তরে দিদিরও কিছু পাঠানো উচিত। কিন্তু কি পাঠানো যায়? নানারকম জিনিসের কথা চিন্তা করা হলো, কিন্তু কোনোটাই ঠিক পছন্দ হয় না, শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, বাইরে আমাদের দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস চা—সেই চা পাঠানো হবে এক প্যাকেট। শুধু বিলাতের বন্ধুকেই নয়, দিদির সব বন্ধুকেই খুব ভালো জাতের দার্জিলিং চা পাঠানো হলো উপহার হিসাবে। পত্রবন্ধুরা অভিভূত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাল। এবং তারাও সবাই উপহার পাঠাতে লাগল নানারকম।

জাপানী মেয়েটি পাঠিয়েছিল একটা হাত-পাখা। ভারী সুন্দর জিনিসটা। সাধারণত জাপানী পাখা যেরকম ছবিতে দেখা যায়, এটা সে রকম নয়—এটার রং সবুজ। গোটানো পাখাটাকে খুললে মনে হয় যেন ঠিক একগুচ্ছ গাছের পাতা।

আমবা সাধারণত ভালো জিনিস পেলে সেটা ব্যবহার করি না, আলমারিতে তুলে রাখি। বিলিতি জিনিস হলে তো কথাই নেই। দিদিও তার বন্ধুদের পাঠানো জিনিসগুলো সযত্নে তুলে রাখল কাচের আলমারিতে, কারুকে হাতই দিতে দেয় না। এক সময় দিদির চিঠিপত্রের স্রোত বন্ধ হয়ে গেল, বড়ো হবার পর দিদির আর ইংরাজি ভাষায় সেরকম দক্ষতাও দেখা গেল না। কিন্তু সেই উপহারের জিনিসগুলো রয়েই গেল।

কয়েক বছর বাদে দেখা গেল, সেই জাপানী পাখাটির ভেতরে একটু ফুটো হয়ে গেছে রংটাও খানিকটা জ্বলে গেছে। তবু জিনিসটা এখনো দিদির খুব প্রিয়।

সে বছরই আমরা সদলবলে আগ্রা বেড়াতে গেলাম। জুন মাসের সাংঘাতিক গরম, ঐ সময় কেউ উত্তর ভারতের ঐ সব উত্তপ্ত জায়গায় বেড়াতে যায় না। কিন্তু সেই সময় আমাদের স্কুলের ছুটি যে! পুজোর ছুটিতে আমাদের বেশি দূর বেড়াতে যাওয়া হয় না, কারণ তার পরেই পরীক্ষা।

সেবার অবশ্য আগ্রায় যাবার আর একটা গুপ্ত কারণ ছিল। আমাদেরই এক

মাসতুতো দাদা, রমেনদা, তখন থাকতেন আগ্রায়। তাঁর আবার এক বন্ধু আগ্রাতেই সেনাবাহিনীতে উপসেনাপতি। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, খুব বড়ো বংশের ছেলে। তাঁর সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে। বাবা-মা ঠিক করেছিলেন আগ্রাতে বেড়াতে যাবার ছুতোয় পাত্রটিকে দেখে আসবেন—পাত্রও দিদিকে দেখবে। এ খবর আমরা ছোটোরা কেউ তখন জানতুম না, কিন্তু দিদি নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছিল।

যাবার পথে ট্রেনে যখন আমরা গরমে ছটফট করছি, দিদি তখন তার হাতব্যাগ থেকে সেই গোটানো পাখাটা বার করল। এতদিন বাদে দিদি তার শখের জিনিসটা ব্যবহার করতে চায়। তখন অবশ্য বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম যে বিয়ের কথা শুনলে সব মেয়ের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসে। দিদির মুখ চোখও যেন খানিকটা বদলে গিয়েছিল। চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল, মুখের রংটা বেশি লালচে। এবং জীবনের এত বড়ো একটা ঘটনার সম্মানেই দিদি আলমারি থেকে পাখাটা বার করে এনেছে।

আমরা ছোটোরা জানলার ধারে বসবার জন্য সর্বক্ষণ মারামারি করছিলাম। কেউ একটু উঠে গেলেই অন্যজন সেইখানে ঝপাস করে গিয়ে বসে পড়ে। জানলা মোটে দুটো, আর ছোটোরা চারজন।

দিদি হাত পাখাটা বার করবার পর আমাদের মনোযোগ গেল সেদিকে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হাত পাখাটা একটু নিই। পাখাটা আগের মতন আর সুন্দর নেই—তবু ওটার আকর্ষণ আমাদের কাছে কমেনি। দিদি পাখাটা একটু নামিয়ে রাখলেই আমরা কেউ না কেউ সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিই। ঠিক একগুচ্ছ সবুজ পাতার মতন পাখা—তাতে হাওয়া অবশ্য খুব বেশি হয় না, কিন্তু মনের খুব আরাম হয়।

শেষ পর্যন্ত বোকার মতন কাজটা করলাম আমিই। পাখাটা সমেত আমার ডান হাত অন্যমনস্কভাবে একবার বাড়িয়েছিলাম জানলার বাইরে, পরক্ষণেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ওমা! কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই। পাখাটা আমার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে, জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। চলন্ত ট্রেন থেকে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা আর কেউ কখনো পায় না।

ব্যাপারটা সবাই যখন বুঝতে পারল, তখন আমার ওপর শুরু হয়ে গেল বকুনির ঝড়। বাবা, মা আর সবাই মিলে আমায় নিয়ে পড়লেন। শুধু ঐ পাখা হারানোই নয়—এর আগেও যতদিন যতরকম দোষ করেছি সব টেনে আনা হলো।

শুধু দিদি বলল, যাকগে গেছে যাক। নীলু তো আর ইচ্ছে করে ফেলেনি! পুরোনো জিনিস, এমন আর কি।

দিদির এই কথাটার জন্য আমি দিদির কাছে সারা জীবনের মতন কৃতজ্ঞ

হয়ে রইলাম। কারণ শুধু দিদির কথা ভেবেই আমি খুব অনুতপ্ত বোধ করেছিলাম। একটা পাখা হারানো এমন কিছু ব্যাপার নয় কিন্তু যেহেতু ওটা ছিল দিদির খুব প্রিয় জিনিস, তাই ওটা নিয়ে অসাবধানে খেলা করা আমার অন্যায় হয়েছে। দিদি যখন আমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, যাকগে ও নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না—তখন আমার চোখে জল এসে গেল।

আমি মন খারাপ করে বসে রইলাম। আমার মনে পড়ল সেই জাপানী মেয়েটির ছবির কথা। ছবিতে কারুর বয়েস বাড়ে না। সেই তুলতুলে পুতুলের মতো মেয়েটি হাতে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট নিয়ে উইলো গাছের নীচে দাঁড়ানো --কত দূর জাপান থেকে সে পাঠিয়েছিল একটা পাখা, সেটা শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের ট্রেন লাইনের পাশে পড়ে রইল একা একা।

তারপর স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে গেল, আমার আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগল না। দিদি বারবার বলতে লাগল, এই, তুই মন খারাপ করছিস কেন? আমি তবু কোনো উত্তর দিইনি।

পাখাটা হারাবার পর যেন সকলেরই গরম বোধ আরো বেড়ে গেল। সবাই ছটফট করছে আর ঘন ঘন জল খাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে নেমেই ফ্লাস্কে জল ভরে আনতে হয়। একটা স্টেশনে আমি জল ভরতে নামলাম।

জলের কলটা অনেক দূর। সেখানে আবার ভিড়। ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে সেখানে দাড়িয়ে আছি হঠাৎ যেন চুম্বকে আমার চোখ একদৃষ্টে আকৃষ্ট হলো।

একটা কামরা থেকে একটি বাঙালি পরিবার নামছে প্রচুর মালপত্র নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ের হাতে একটি পাখা, অবিকল আমার দিদির পাখাটার মতন। আমার বুকেব ভেতরটা ধক্ করে উঠল। এ কি করে সম্ভব? ঠিক এক রকমের দুটি পাখা? এ পর্যন্ত দিদির ঐ জাপানী হাত পাখাটার মতন দ্বিতীয় কোনো পাখা আমরা দেখিনি। অবশ্য জাপানে নিশ্চয়ই ওরকম একটাই পাখা তৈরি হয়নি—আর কেউ জাপান থেকে ওরকম আর একটা পাখা আনতেও পারে।

কিংবা এমনও তো হতে পারে, আমার হাত থেকে পাখাটা উড়ে গিয়ে ট্রেনের অন্য কোনো কামরায় ঢুকে গেছে। এরকম তো হয়ই। অনেক সময় যেমন ছেঁড়া কাগজ কিংবা চীনেবাদামের খোসা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে।

পাখাটা ফেরৎ চাইব? দিদির অতি প্রিয় জিনিস। কিন্তু যদি ওটা আমাদের না হয়? যদি সত্যিই ওটা ওদেরই পাখা হয়, তাহলে আমাকে কী ভাববে? নিশ্চয়ই ভাববে একটা জোচ্চোর।

তখন আমি মনে মনে কয়েকটা সংলাপ তৈরি করে নিতে লাগলাম। যদি

গিয়ে বলি, দেখুন, এই পাখাটা কি আপনাদের? আমাদেরও এরকম একটা পাখা ছিল—

না, না, এভাবে ঠিক বলা যায় না।

কিংবা যদি বলি, বাঃ পাখাটা খুব সুন্দর তো! কোথা থেকে কিনেছেন?

তা হলেই নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো এটা কিনিনি! জানালা দিয়ে উড়ে এসেছে।

তারপরই আমি হেসে বলব, ওটা আসলে আমাদের। বিশ্বাস না হয়, আমাদের কামরায় চলুন, সবাই সাক্ষী দেবে!

এ পর্যন্ত তো ঠিক করা হলো। কিন্তু একটা অচেনা মেয়ের সামনে গিয়ে হঠাৎ তার হাতের পাখাটার প্রশংসা করার জন্য যতখানি সাহস থাকা দরকার, আমার তা নেই। দারুণ লজ্জা করতে লাগল।

এই রে, মেয়েটি যে এবার পাখাটা গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার নিশ্চয়ই ব্যাগে ভরে রাখবে। তারপর তো আর কিছুই করা যাবে না!

ওদের দিকে দু'এক পা এগিয়েছি, এমন সময় মেয়েটির মা মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বলল, এই, তুই ঐ পাখাটা এখনো ফেলিসনি! কার না কার পাখা, পুরোনো একটা জিনিস—

মেয়েটি বলল, না, আমি এটা রাখব!

কক্ষনো না! পরের জিনিস ওরকম নিতে নেই। রাস্তায় ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস কিছুতেই বাড়িতে ঢোকাবি না। ফেলে দে, ফেলে দে!

আমি হা-হা করে ওঠার আগেই মেয়েটি রাগ করে পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্ল্যাটফরম পেরিয়ে সেটি গিয়ে পড়ল লাইনের কাছে!

আমি স্তম্ভিত। সত্যিই ওটা আমাদের পাখা। এত কাছে এসেও ফেরৎ পেলাম না। ট্রেন দাঁড়ানো অবস্থায় লাইন থেকে কোনো জিনিস তোলা যায় না। তাছাড়া ওখানে কত লোক কত ময়লা জিনিস ফেলে—

তবু একবার চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। এমন সময় ফুর-র-র করে গার্ডের বাঁশী বেজে উঠল। ট্রেন নড়েচড়ে উঠল। আমি দৌড়ে নিজেদের কামরার দিকে চলে এলাম।

ফিরে এসে, উত্তেজনা ও হতাশা মিশিয়ে ঘটনাটা বললাম সবাইকে। আমি যদি অতটা লাজুক হয়ে না গিয়ে মেয়েটিকে একটু আগে বলতাম, তাহলে পাখাটা যে ফেরৎ পাওয়া যেত তাও জানালাম। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না। এমন কি দিদি পর্যন্ত বলল, উফ্ নীলুটা কী গুলবাজ হয়েছে! বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই যে বলে!

২২

ভেবেছিলাম চার-পাঁচ দিন থাকব, কিন্তু দু'দিন পরেই মন ছটফটিয়ে উঠল। জায়গাটা সুন্দর, আবহাওয়া ভালো, খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু, তবু মন টিঁকলো না। থাকার জায়গা পেয়েছিলাম শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে, একটা টিলার ওপর সুদৃশ্য ডাকবাংলোয়, ঘরটায় এতগুলি জানলা যে, পুরো ঘরটাই কাঁচের তৈরি বলে মনে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, চোখে আলো পড়ায় ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরবেলা—পর পর দু'দিন পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যোদয় দেখে ফেললাম। সুতরাং, জায়গাটাকে আদর্শই বলা উচিত, এরকম নিভৃত নিরালাই চেয়েছিলাম। অথচ, এক-এক সময় নির্জনতায় এসেই মানুষের সঙ্গের জন্য মন ছটফট করে। জল যেন জলের দিকেই গড়িয়ে যায়, তেমনি আমার ইচ্ছে হলো মানুষের কাছে যেতে। পাহাড়, আকাশ, সূর্যোদয়—এই সব প্রকৃতি-ফ্রকৃতি আমার কাছে অসহ্য মনে হলো হঠাৎ।

সকালেই ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে ডাকবাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

জায়গাটি উত্তর প্রদেশের একটি পাহাড়ী শহর। শহরের মধ্যে কয়েকটি হোটেল আছে। ভ্রমণকারী আসে পাহাড়ের ওপর একটি বিখ্যাত প্রস্রবণ দেখতে, সেটির জল নাকি হজমের পক্ষে পরম উপকারী। অর্থাৎ সৌন্দর্য-পিপাসুদের চেয়ে পেটরোগাদের ভিড়ই বেশি।

ট্রেন নেই, বাসে যাতায়াত। দিনে দুটি মাত্র বাস। সকালের বাসটি সরকারি —আগে থেকে টিকিট কেটে রাখতে হয়। আমি হাজির হয়ে দেখলুম বাসের টিকিট আগেই শেষ হয়ে গেছে। এর পরের বাস বিকেলে, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আর আমার নেই! একবার যখন জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, আর ফিরে যাওয়া যায় না।

বাস ডিপোর টিকিটবাবুটিকে আমি কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম একটা টিকিটের জন্য। কোনো উপায় নেই?

একটু বাদে দয়াপরবশ হয়ে টিকিটবাবুটি বললেন, বাস ছেড়ে যাবার কথা আটটায়, কিন্তু কিছু একটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ঘণ্টাখানেক দেরি হবে সেদিন। অন্য সব যাত্রীরাই এসে গেছে, শুধু রামশরণ গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক তখনো পৌঁছোন নি। তিনি যদি শেষ পর্যন্ত না আসেন, তা হলে সেই টিকিটটি আমাকে দেওয়া যেতে পারে। অপেক্ষা করতে হবে।

আমি মনে মনে রাম নাম জপ করতে লাগলাম। অর্থাৎ—হে রামচন্দ্রজী, তোমার দয়ায় যেন তোমার শরণকারী সত্যিই গুপ্ত হয়ে যান। আজ যেন না আসে।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না, তাঁর টিকিটটা পেয়ে ধন্য হয়ে আমি বাসে উঠেই বই খুলে বসলাম। একটু একটু শীত, গায়ে রোদ্দুর পড়ায় বেশ আরাম লাগছে।

বাসের অন্য যাত্রীরা বাস ছাড়তে দেরি হওয়ায় অধৈর্য হয়ে নেমে গিয়ে পাশের দোকানে চা আর পেঁয়াজি ভাজা খাচ্ছে।

এক সময় ড্রাইভার এসে ভেঁপু বাজাল। চায়ের দোকান থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এল যাত্রীরা। এক মহিলার গলা শোনা গেল, বাবারে বাবা, এতক্ষণে বাস ছাড়ার সময় হলো! এই পোড়ারমুখোদের একটুও সময়জ্ঞান নেই!

বাংলা কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দুটি মহিলা, দুজন প্রৌঢ়, তিনটি বাচ্চা মিলিয়ে একটি ছোটখাটো দল। বাসটা কলরবমুখর হয়ে উঠল। বেশ কিছু দিন পরে বাংলা কথা শুনে আমার আরাম হলো খুব। বাইরে বেরিয়ে অনবরত ভাঙা ইংরেজি আর ভাঙা বাংলা বলতে বলতে ঠোঁট ক্ষয়ে যায়!

বাস ছাড়ল। আমি বইটা মুড়ে রাখলাম। চলন্ত বাসে বই পড়ার চেয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আমার পাশে বসেছেন এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, নিখুঁত সুট-টাই পরা, মুখের দাড়ি একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হয় খুব গম্ভীর।

সামনের সীটের যুগলকে দেখেই বোঝা যায় নবদম্পতি। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, মেয়েটি পরেছে স্ল্যাকস ও গেঞ্জি ধরনের জামা, বেশ আধুনিকা। মেয়েটির শরীরের গড়ন এমনই চমৎকার যে, ঐ পোশাকে তাকে বেশ মানিয়েছে। আমি অবশ্য মেয়েটির প্রতি একবারের বেশি দুবার তাকাইনি। নববিবাহিত নারী যতই রূপসী হোক, তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আমার রীতিবিরুদ্ধ। তার স্বামীটিও পুরোপুরি দিশি সাহেব, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোনো বড়ো কোম্পানির মাঝারি অফিসার।

বাঙালি দলটি থেকে এক মহিলা বললেন, আমাদের হোটেলের ম্যানেজারটা...কী মোটা...ঠিক যেন কুমড়োপটাস...

ওদের দলের সবাই মিলে হেসে উঠল। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা কিছুই বুঝল না, তারা আধুনিক প্রথা অনুযায়ী আরো গম্ভীর হয়ে রইল।

আর এক মহিলা বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের হোটেলের সেই দু'জন, সেই যে কপোত-কপোতী—এই বাসেই উঠেছে।

—মেয়েটা কী বিচ্ছিরি জামা পরেছে! বেহায়া!

—অসভ্য! দেখছিলে না সবার চোখের সামনে কী কাণ্ড করছিল! আর কারুর যেন নতুন বিয়ে হয় না!

বুঝলাম, আমার সামনের নবদম্পতি সম্পর্কেই এই সব মন্তব্য ছোঁড়া হচ্ছে! আমার লজ্জা করতে লাগল। ওরা বুঝতে পারছে না যদিও, তা হলেও...। বাঙালি দলটার মধ্যেই তো বাচ্চা ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা তো বুঝছে!

—বাসের আর কেউ বাঙালি নেই, না?

—কোথায় বাঙালি? সব তো অ্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই ইডলি ধোসা, নয়তো বাঁধাকপি আর নয়তো যায়ে গা খায়ে গা।

আমার একটু দুঃখ হলো। আমাকে দেখে বাঙালি বলে চেনা যায় না? না হয় দু'দিন দাড়ি কামাইনি। সেই মুহূর্তে অবশ্য আমার আর বাঙালি সাজবার ইচ্ছেও হলো না। আমি মুখখানাকে যত-সম্ভব হিন্দী-হিন্দী করে রাখলাম।

বাসে আব সব যাত্রীই হয় একলা বা দোকলা, ওরাই শুধু একটি দল—সুতরাং আর সবাই নীরব, ওরা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় অনবরত কথা বলে যেতে লাগল।

বাঙালি এমনিতেই একটু পরচর্চা বা পরের সমালোচনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই দলটির দেখলাম পরের সমালোচনার জিভ একেবারে ধার দেওয়া। সমালোচনার বেশি লক্ষ্য ঐ স্ল্যাকস ও গেঞ্জিপরা যুবতীটি!

—এরা কি শাড়ি পরতে ভুলে গেছে? নতুন বউ, ঘোমটা দিয়ে শাড়ি পরলে কত ভালো দেখায়।

—পেণ্ট্ পরে মেম সাজা হয়েছে! যেন হিন্দী সিনেমার হিরোইন। এবার ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেই হয়।

—বিয়ে হয়েছে কিনা তাই দেখো! আমার তো মনে হয়...

—যা আদেখলাপনা করছিল! যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে একেবারে!

—মেয়েমানুষ কখনো গেঞ্জি পরে বাইরে বেরোয়! ঠিক যেন বিলিতি কুকুরের মতন দেখাচ্ছে!

আমি বুঝলাম, এটা শুধু সমালোচনা নয়, ঈর্ষা। যুবতীটির শরীরেব যা গড়ন, যে-কোনো পোশাকেই ওকে মানাবে। সেদিক থেকে বাঙালি মহিলা দু'জনের শরীর...ওঁরা নিশ্চয়ই ঝরনার জল খেয়ে পেটের রোগ সারাতে এসেছিলেন।

—আর বরটাকেও তো দেখতে শেয়ালের মতন। কী রকম ছুঁচোলো গোঁপ রেখেছে!

—দেখিস যেন হঠাৎ বৃষ্টি না নামে?

—বৃষ্টি? কেন?

—শেয়াল-কুকুরের বিয়ে হলে রোদ্দুরের মধ্যেই বৃষ্টি নামে না?

হাসির ধুম পড়ে গেল। আমার মুখটা অবশ্য তেতো লাগছিল এরকম রসিকতায়। অপরের চেহারা নিয়ে রসিকতা করার মধ্যে কোনো রুচি নেই। এই দলটা কেন বাঙালি হয়ে গেল? এখন বাংলা ভাষাই আমার বিশ্রী লাগছে!

ওরা হঠাৎ নামকরণের খেলায় মেতে উঠল। নবদম্পতির নাম শেয়াল-কুকুর

দেওয়ার পর এক মাদ্রাজী ভদ্রলোককে আখ্যা দিল ভূষণ্ডীকাক, আর একজনকে বলল কেলেমানিক। মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক উত্তর প্রদেশীয় মহিলাকে বলল চিটে গুড়ের হাঁড়ি, বাসের কণ্ডাকটরকে বলল ল্যাগব্যাগ সিং...

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলাম। যে-ভাবে ওঁরা এগুচ্ছেন, তাতে আমারও নাম দিয়ে ছাড়বেন মনে হচ্ছে। কী নাম হবে আমার?

ক্রমে আমার পাশের পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লেন ওঁরা সামান্য তর্ক-বিতর্কের পর তাঁর নাম ঠিক হলো হুলো বেড়াল। এবার আমার পালা। আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। উদাসীন ভাবে। কান খাড়া।

প্রথমে এক মহিলা বললেন, ও লোকটাকে তো একেবারে গলাকাটা সেপাইয়ের মতো দেখতে!

আর একজন মহিলা বললেন, যাঃ, হোঁদল কুতকুত!

—না, না, গোমড়ামুখো রামগড়ুরের ছানা!

—না রে, মামদোভূত!

শেষ পর্যন্ত রামগড়ুরের ছানাই সাব্যস্ত হলো। খুব খারাপ নয়, অন্তত অন্যগুলোর চেয়ে ভালো। কিন্তু গলাকাটা সেপাই কেন বলল একজন? আমার তো দিব্যি গলা রয়েছে। তার ওপর আস্ত একটা মাথা!

ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাস থামল একটা ছোট জায়গায়। চা-পানের বিরতি। সবাই নামল। এখানেও একটি চায়ের দোকানে টাটকা জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

আমি বাঙালি দলটির ধারে-কাছেও গেলাম না। আমার হাতের বইটি ছিল বাংলা। সেটা অনেক আগেই মুড়ে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। দোকানদারের সঙ্গে হিন্দী বলছি সঠিক ভাবে।

চায়ের দোকানেও পাঞ্জাবি ভদ্রলোক বসলেন আমার পাশের চেয়ারে। নীরবতা ভেঙে তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় যাব।

আমি বললাম, কলকাতায়।

পাঞ্জাবি ভদ্রলোক বললেন, কলকাতায় বাগড়ি মার্কেটে তাঁর আয়নার দোকান আছে। তার বাড়ি ভবানীপুরে।

আমি সন্দিগ্ধভাবে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি এবার মৃদু হেসে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, আমি আঠাশ বছর ধরে কলকাতায় আছি। আমাকে কি সত্যিই হুলো বেড়ালের মতন দেখতে?

আমি উত্তর দেবার সময় পেলাম না। পাশের টেবিল থেকে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আমাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি ঝুঁকে এসে, একটা চোখ টিপে ফিসফিস করে বাংলায় বললেন, আমিও কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ

করি। আমার মেয়ে দু'বছর আগে হায়ার সেকেণ্ডারিতে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল। আপনিও তো বাঙালি, দেখলেই বোঝা যায়।

আমি মাটির দিকে তাকালাম। বেশ পাথুরে শক্ত মাটি। এখান থেকে অযোধ্যা খুব দূরে নয়। সেই অযোধ্যায় সীতা একবার ধরণী দ্বিধা হও বলতেই মা ধরিত্রী তাঁকে কোল দিয়েছিলেন। মা ধরিত্রী কি আমার আবেদন শুনবেন?

২৩

কলকাতা শহরে সারা রাত কোথায় সিগারেটের দোকান খোলা থাকে? কিংবা, রাত তিনটের সময় হঠাৎ নিজের ছবি তোলবার ইচ্ছে হলে কোথায় চটপট ক্যামেরাম্যান পাওয়া যায়? দুটোরই উত্তর, শ্মশানে।

আমি মাঝে মাঝে শ্মশানে বেড়াতে যাই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। বেড়াবার পক্ষে কলকাতার যে-কোনো শ্মশানই খুব চমৎকার জায়গা, বিশেষত মাঝরাত্রে। রাত্তিরবেলায় কোনো কিছুই কুশ্রী থাকে না, কলকাতার রাস্তাঘাট, সমস্ত বাড়িই সুন্দর দেখায়, এমনকি শ্মশানও!

শ্মশানে গিয়ে আমি অনেকবার ঘুমিয়েও পড়েছি, চিরনিদ্রায় নয় অবশ্য। আর ভোরের দিকে গরম গরম রাধাবল্লভী, জিলিপি আর চায়ের স্বাদ পেলে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

ভাস্করের দাদার খালি ফ্ল্যাটে আমরা সারা রাত্তিরের আড্ডায় বসেছিলাম। খাদ্য, পানীয় এবং তাস—সবাই ছিল, শুধু সিগারেট ফুরিয়ে গেল হঠাৎ এক সময়। তখন রাত মাত্র আড়াইটে। সিগারেট সঙ্গে থাকলে অনেক সময় না খেলেও চলে কিন্তু সিগারেট যদি না থাকে তাহলে মনে হয় এক্ষুনি একটা সিগারেট না পেলে বেঁচে থাকার আর কোনো মানেই হয় না।

মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে একটা পানওয়ালা মাটির নীচে ঘুমোয়, তার কাছে রাত দুটোতেই সিগারেট পেয়েছি একেক দিন। তার দোকানটা ওপরে, কিন্তু যেখানে সে ঘুমোয় সে জায়গাটা প্রায় মাটির নীচে। তার দোকানের টিনের ঝাঁপে কয়েকবার চাপড় মারলেই সে জেগে ওঠে। সেখানেই একবার চেষ্টা করা যাক।

সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। এই সময় মাঝ রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কোনো অসুবিধে নেই। আমরা কয়েকজন বন্ধু পথের রাজার মতন সদর্পে হেঁটে পৌঁছলাম মেডিক্যাল কলেজের সামনে। লোকটিকে ডেকে তোলাও হলো, কিন্তু সে ভেতর

থেকেই উত্তর দিল, সিগারেট নেই।

তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে দিয়ে দোকান খোলালাম। সত্যিই, আমরা যা সিগারেট খাই, চার্মিনার বা ভাজির, তা ওর নেই, আমি সিগারেটের ব্যাপারে চট করে আনুগত্য বদলাই না। তাই বন্ধুদের বললাম, চল, শ্মশানে যাই।

চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ার রাত। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথে অনেক লোকজন ঘুমুচ্ছে, এরা সকলেই দীন দুঃখী নয় জানি, তবু তাদের ঘুমন্ত মুখগুলি দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে কোনো অশান্তি নেই।

নিমতলা শ্মশানে এসে দেখি বেশ জমজমাট ব্যাপার, প্রচুর লোকজন, আলো, এবং মাত্র সাতজন ছাড়া আর সকলেই জেগে আছে। সেই সাতজন আর কখনো জাগবে না। ভাস্কর বলল, এবার মরার সীজন বেশ ভালোই পড়েছে মনে হচ্ছে। এত রাত্তিরেও সাতটা মড়া!

আমরাও স্বীকার করলুম, মড়ার ব্যাবসাটা এখানে ভালোই চলছে। এখানকার লোকজন নিশ্চয়ই তাদের পেশার সঙ্কট বিষয়ে খবরের কাগজে চিঠি লিখবে না।

সিগারেট পাওয়া গেল, কিন্তু তক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে করল না। এবার অনেকদিন বাদে আসা হলো, চেনাশুনো অনেককে দেখতে পেলুম না। সেই বাচ্চা সাধুটা নেই। তার বয়েস ছিল মাত্র বারো তেরো, দারুণ রাগী সাধু, সকলের সঙ্গে খুব ধমকে ধমকে কথা বলত।

আর গাঁজা টানত কী, তিন টানে কল্কে ফাঁক। তবে তার ছিল মিষ্টি খাওয়ার খুব লোভ। একদিন আমরা এক ঠোঙা জিলিপি খেতে খেতে ওকেও একটা দিয়েছিলাম। ও চকচকে চোখে তাকিয়ে ছিল ঠোঙাটার দিকে। সেই জন্য ওকে আর একটা জিলিপি দিতেই ও আস্ত সেটাকে কপাৎ করে মুখে পুরে ফেলল। তারপর তাকে পুরো ঠোঙাটাই দিয়ে দিলাম। ছেলেটি বিহারী, আরা জেলায় বাড়ি। বারো বছরের একটি ছেলে সাধু হয়ে গঙ্গার ধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে, এই দৃশ্যটা দারুণ মজার। তাকে নিয়ে আমাদের বেশ সময় কেটে যেত।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সেই পিওনটিকেও দেখলাম না। ছোট্টখাট্টো চেহারা, ধুতির ওপর নীল শার্ট, হাতে একটা ছাতা—এই ভাবেই তাকে বরাবর দেখেছি। তার কাজ ছিল বিভিন্ন সাধুর আখড়ায় গাঁজার ছিলিম সেজে দেওয়া। সে যে নিজে খুব গাঁজাখোর ছিল তা নয়, দু'এক টান দিত মাত্র, কিন্তু সাধুসেবার দিকেই ছিল তার ঝোঁক। তার সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম, সে রাইটার্স বিল্ডিংসের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের পিওনের কাজ করে। তবে প্রত্যেক রাত শ্মশানে কাটিয়েও যে সে কি করে আবার দিনের বেলায় অফিস করে, সেটাই ছিল এক রহস্য। এক একদিন সে গান ধরত, তার গানের গলাটি চমৎকার। মধ্যরাত্রিতে গঙ্গার দিকে

মুখ করে বসে তার, সেই গান গাওয়ার দৃশ্য দেখে মনে হতো, সে তখন আর সামান্য একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নয়, সে একজন শিল্পী, একজন মহান মানুষ।

তার বদলে এখন নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন সাধু আসে। শ্মশানে কিছুই থেমে থাকে না। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটা আখড়ায় বসলাম একটু করে। আমরা একদল নাস্তিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ আমাদের ভালো লাগে।

কাঠগোলার পাশে একটা বস্তিঘরে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, "এখানে দিবারাত্রি ফটো তোলা হয়।" এই সেই মড়ার ক্যামেরাম্যান। একেও আমরা চিনি। অনেকের শখ হয় শ্মশানে এসে মৃতদেহের ছবি তোলবার। সেই উদ্ভট শখ মেটাবার জন্য এই লোকটির চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে থাকতে হয়।

ভাস্কর সেই সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা ছবি তোলালে মন্দ হয় না। লোকটাকে ডাকবি নাকি? আমাদের গ্রুপ ফটো তুলে দেবে—কে কবে মরে যাই ঠিক তো নেই!

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলাম। একটা কিছু মজা তো হবেই! লোকটার ঘরের দরজার ধাক্কা দিলাম। ভেতর থেকে ঘঙর ঘঙর কাশির শব্দ ভেসে এল।

আমরা আবার ডাকলুম, ও দাদু, দরজা খুলুন।

—ক্যা?

—ছবি তোলাবো, উঠুন!

খাটের মচমচ শব্দ, আবার ঘঙর ঘঙর কাশি। তারপর দরজা খুলে যিনি উঁকি মারলেন, তাঁর বয়েস ষাট থেকে নব্বইয়ের মধ্যে যে-কোনো একটা কিছু হবে। খালি গা, সবকটা পাঁজরা গোনা যায়, গালটা এমন তোবড়ানো যেন মনে হয় দুদিকে দুটো গর্ত। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ডেডবডি কোথায়? কোন ঘাটে!

ভাস্কর বলল, ডেডবডি নেই। এই তো আমরাই কজন আছি।

তিনি বললেন, ঠাট্টা! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে ঠাট্টা কারই বা ভালো লাগে। তিনি একটা অতি অসভ্য গালাগালি দিলেন।

ভাস্কর বলল, রাগ করছেন কেন? আমরা ঠাট্টা করছি না, অ্যাডভান্স পয়সা দেব, বুঝলেন না কাজ সেরে রাখছি!

—তার মানেটা কী হলো?

—মানে মরার পর ছবি তোলার চেয়ে আগেই কাজটা সেরে রাখা ভালো নয়?

—এক কপি সাড়ে সাত টাকা পড়বে!

—তাই দেব।

বুড়ো লোকটি ক্যামেরা বার করলেন। সেটা একটা দেখবার মতন জিনিস। এরকম ক্যামেরা আজকাল ক্বচিৎ চোখে পড়ে। আগেকার সেই ফোল্ডিং ক্যামেরা, স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করানো, ছবি তোলা হয় প্লেটে, ক্যামেরাম্যান নিজের মাথা ও ক্যামেরা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে বলে, রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি!

ভদ্রলোক ক্যামেরা সাজাচ্ছেন, এমন সময় ঠং করে একটা শব্দ হলো। ক্যামেরার লেন্সের ঢাকনাটা পড়ে গেল মাটিতে। তিনি সেটা খুঁজতে লাগলেন। জিনিসটা কিন্তু তাঁর পায়ের কাছেই পড়ে আছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন। লোকটি নিশ্চয়ই রাতকানা। এই লোক আমাদের ছবি তুলবে!

ভাস্কর বলল, দাদা, আমরা কী দাঁড়িয়ে থাকব, না শুয়ে পড়ব?

—সে তোমাদের ইচ্ছে।

—না, ভাবছিলাম যে আপনার তো মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছবি তোলার অভ্যেস নেই, সবাই শুয়ে শুয়ে ছবি তোলায়...তাই, বলেন তো আমরা চারজন পাশাপাশি শুয়ে পড়তে পারি!

—দেখো, মিত্যু নিয়ে অমন মস্করা করো না। যেদিন আসবে, টেরটিও পাবে না। কত দেখলাম...আঃ সে ব্যাটাচ্ছেলে আবার কোথায় গেল?

—কে?

—লেন্সের ঢাকনাটা!

ছবি তোলা শেষ হয়ে যাবার পর নাম-ঠিকানা ও টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে ভাস্কর বলল, দাদু, আপনার নিজের ছবি তোলা আছে তো? একটা কিছু হয়ে গেলে তখন আপনার ছবিটা কে তুলবে?

ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গেলেন এ কথায়। দাঁত খিঁচুনি দিয়ে বললেন, ফকড়ামি হচ্ছে? অ্যাঁ, আমার সঙ্গে ফকড়ামি?

আমরা চোঁচা দৌড় মারলাম।

ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। এবার ফিরলে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো গঙ্গায় একটু সাঁতার কেটে যেতে। অন্যদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ বাকি আছে। তীর্থস্থানে এলে যেমন মূর্তি দর্শন না করে কেউ ফেরে না তেমনি শ্মশানে এসে মৃতদেহগুলি একবার দেখে যেতে হয়।

চারটি চিতা জ্বলতে শুরু করেছে, তিনটি মৃতদেহ তখনো অপেক্ষামান। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে আমরা থমকে গেলাম। খাটিয়ার ওপর একজন শুয়ে আছে, ঠিক যেন আমারই কৈশোরের চেহারা। ষোলো কিংবা সতেরো বছর বয়েস, কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে এসেছে। তার চোখ বোজা, মুখে কোনো বিকৃতি নেই, মৃত্যুর কোনো চিহ্নই নেই। ছেলেটি সুশ্রী কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না,

কারণ ঐ বয়েসের একটা আলাদা রূপ থাকে।

আমি ভাস্করের হাত চেপে ধরে বললাম, ঠিক ঐ বয়েসে আমি একবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। তাই হঠাৎ মনে হলো, বুঝলি, যেন আমিই শুয়ে আছি ওখানে।

ভাস্কর বলল, এ ছেলেটিও বোধহয় আত্মহত্যা করেছে। অসুখে ভুগেছে বলে তো মনে হয় না।

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। ছেলেটির খাটিয়া ঘিরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেহারার নারী পুরুষ বসে আছেন, নিঃশব্দ। শোকের একটা গাম্ভীর্য আছে, তাতে বিঘ্ন ঘটানো যায় না।

শরৎ বলল, ঐ বয়েসে আমি প্রথম একা লক্ষ্ণৌতে দিদির কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেরকম আনন্দ আর জীবনে কখনো পাইনি।

ছেলেটি এই সদ্য যৌবনে কেন চলে গেল? সে কথা জানবার জন্য বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারছি না কারুকে। তার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতেও পারছি না। সে অসম্ভব রূপবান হয়ে রাজকুমারের মতন শুয়ে আছে।

এবার বোধহয় ছেলেটিকে তোলা হবে, তার খাটের পাশে কয়েকজন নারী-পুরুষ হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি দেখলাম ভাস্করও কাঁদছে। তার হাত ধরে বললাম, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চল।

ভাস্কর উত্তর দিল না। শরৎ বলল, আর একটু দাঁড়া। শরৎ আর আশুও রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। তখন আমিও আর থাকতে পারলাম না। দারুণ কান্না এসে গেল।

একটা অচেনা ছেলের মৃত্যুর জন্য আমরা কাঁদছি কেন? আমাদের মতন কঠিনহৃদয় পুরুষের চোখে জল? পরে বুঝলাম, আমরা কাঁদছিলাম আমাদের প্রত্যেকের কৈশোরের কথা ভেবে। যে কৈশোর আমরা আর কখনো ফিরে পাব না!

২৪

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানো আমার একটি নিত্য বিলাসিতা। কোনোদিনই প্রায় এগারোটার আগে ফিরি না। সুতরাং বারান্দায় এসে দাঁড়াতে প্রায় সাড়ে এগারোটা-বারোটা বেজে যায়।

বাড়ির সামনেই ব্রীজ। অত রাত্রে বিশাল ব্রীজটির দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। এই সময়টা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, শুধু কিছু গাড়ি যায় অতি দ্রুতগতিতে, আর কয়েকটা লোক এমনভাবে হাঁটে, যাতে মনে হয় ওরা সারা রাত ধরেই হাঁটবে ঠিক করেছে। চলন্ত গাড়ির জানলায় আমি প্রত্যেকদিনই কোনো চেনা লোক খুঁজি, একদিনও পাই না। ফাঁকা দোতলা বাসের ওপরে দু-তিনটি মাত্র যাত্রী বসে থাকে—এই দৃশ্যটা খুব করুণ লাগে। দোতলা বাস ভিড়ে ভর্তি না থাকলেই মনে হয় রোগা হয়ে গেছে। কোনো অসুখ করেছে বুঝি।

এরকমই একদিন রাত বারোটার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল ব্রীজের একটি বাতিস্তম্ভের গায়ে একটা মই লাগানো। দৃশ্যটি দেখে কীরকম যেন অস্বস্তি লাগে। ঠিক যেন মানাচ্ছে না। এটা দেখে কী যেন মনে পড়ার কথা।

মাথার মধ্যে চিনচিন করতে লাগল। মই, মই, ল্যাম্পপোস্টে মই, কি যেন হয়েছিল একবার?

তারপরেই মনে পড়ল। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আবার মই? মাস কয়েক আগে আমাদের ঠিক বাড়ির পাশেই ল্যাম্পপোস্টে এরকম একটা মই লাগানো ছিল। রাত্রে একবার দেখেছিলাম আর বিশেষ কিছু খেয়াল করিনি! সেই দিন রাত্তিরেই আমার ঘর থেকে অনেক কিছু চুরি হয়ে যায়। রেডিও, ঘড়ি, জামা-কাপড়। রেডিও, ঘড়ি-ফড়ির জন্য খুব একটা দুঃখ হয়নি, ওসব জিনিস থাকলে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই, দিব্যি জীবন চলে যায়। কিন্তু একটা নীল ডোরাকাটা জামা ছিল আমার খুব প্রিয়। জামা-প্যান্টের মধ্যে এক-একটার প্রতি হঠাৎ ভালোবাসা জন্মে যায়। আমার সেই প্রিয় জামাটা কোনো এক চোর-জোচ্চর গায়ে দেবে ভেবেই আমার রাগ হচ্ছিল আর দশটা জামা কিনলে ও দুঃখ ঘুচবে না।

সেবার চোর যে কেন আরো কিছু নেয়নি, সেটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। চোরকে কিছুই কষ্ট করতে হয়নি। ল্যাম্পপোস্টের মইটি সরিয়ে এনে আমার বারান্দায় লাগিয়েছে। তারপর তরতর করে উঠে এসেছে। গ্রীষ্মকালে তিন তলায় দরজা-জানলা সবাই খুলে শোয়। চোর বারবার আনাগোনা করতে পারত ইচ্ছে করলে। নিশ্চয়ই কোনো পাকা চোর সেদিন এ পাড়ায় আসেনি, কোনো শৌখিন চোর বা বাচ্চা ছেলের কাজ। হাতের কাছে ওরকম একটা মই পেলে যে কেউ চোর হয়ে উঠতে পারে।

আজ এই মইটা তো এক্ষুনি সরানো দরকার।

কলকাতার শহরে লোকের বাড়িতে মই থাকে না। অন্তত আমি কোথাও দেখিনি। ঐ ধরনের কাজ টুল দিয়েই সারা হয়। একবার এক বিয়ে বাড়িতে খুব

উঁচুতে একটা বালব লাগাতে গিয়ে আমি একটা জলচৌকির ওপর টুল বসিয়ে তার ওপর উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম। এখন এই মইটা দেখে সেই কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আরো রাগ বাড়ল।

প্রথমে ভাবলাম, নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে মইটা কোথাও সরিয়ে রেখে আসব, কিন্তু পরে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। রাত বারোটার সময় আমি একটি মই কাঁধে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—এ দৃশ্যটা অতি যাচ্ছেতাই! এ কখনো আমাকে মানায়! তাছাড়া এত বড়ো মই আমি একা বইতে পারব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। যদিই বা পারি, মইটা নিয়ে রাখব কোথায়? যার সামনে রাখব, সে বাড়ির কেউ যদি সেই সময় দেখে ফেলে? তাহলে আমাকেই তো চোর ভাববে! এক হয়, ওটাকে রেল লাইনের ওপর ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারপর যদি কোনো ট্রেন দুর্ঘটনা হয়, সেজন্য আমাকেই দায়ী হতে হবে।

অথচ, মইটা ওখানে রাখা বিপজ্জনক। ছিঁচকে চোররা আমার বাড়ি চিনে গেছে। তারা তো আর জানে না যে আমি আর রেডিও বা ঘড়ি কিনিনি! তারা যদি ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে আসে, কিছু না কিছু পাবেই।

মাথায় একটা অন্য বুদ্ধি এল। এরকম দুতলা তিনতলা সমান মই কলকাতায় শুধু একটি মাত্র কোম্পানিরই থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। মইটা লাগানোও রয়েছে বিজলি বাতির স্তম্ভে। পুরোনো টেলিফোন গাইডের মলাটে দেখেছি, যে কোনো সময়ে ঐ কোম্পানিকে খবর দেবার জন্য একটা আলাদা নম্বর আছে। টেলিফোনে সেই নম্বরটা ডায়াল করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দুটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। একবারের চেষ্টাতেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল। এবং ক্রিং ক্রিং করে বাজাতেই একজন রিসিভার তুলে বললেন, ইয়েস? এত রাত্রে সত্যি সত্যি একজন টেলিফোনের সামনে জেগে বসে আছেন।

এই সার্থকতায় আমি রীতিমতন মুগ্ধ হয়ে গেলুম। তাহলে আর ভয় নেই। এবার সমস্যা আছে ভাষার। এর আগে আমি বিদ্যুৎ কোম্পানিতে একবার ফোন করায় এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক ধরেছিলেন। তখন সব কথা ইংরেজিতে বলতে হয়। এখন এত সব কথা কি আমি ইংরেজিতে বলতে পারব?

আমি বিনীতভাবে প্রথমে ইংরেজিতেই বললাম, দেখুন এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি কি বাঙালি?

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ইংরেজিতে জবাব দিলেন, কেন, আমি বাঙালি না অবাঙালি সেটা না জানলে বুঝি আপনার ঘুম হচ্ছে না? শুধু এটা জানবার জন্যই—

আমি বললাম, দাঁড়ান, দাঁড়ান, টেলিফোনটা রাখবেন না, রাখবেন না! অন্য কথা আছে। মানে আমি বলছিলাম, আপনি বাঙালি হলে বাঙলায় কথা বলতে পারি, নইলে আমার কথাটা ইংরেজিতে বলতে হবে।

—আপনি ইচ্ছে করলে ফ্রেঞ্চ-জার্মানেও বলতে পারেন!

ততক্ষণে বুঝে গেছি, ইনি বাঙালি না হয়ে যান না। সুতরাং বাঙলাতেই শুরু করলাম।

আরো বিনীতভাবে বললাম, দেখুন, হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি, কিন্তু আমার সমস্যা একটা মই সম্পর্কে।

—কি বললেন, মুড়ি?

—না, মুড়ি নয়, মুড়ি নয়, মই।

—মুই? তার মানে কি?

—মুই-ও নয়। আমি বলছি মই, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে ল্যাডার। আপনি সাপ লুডো খেলেছেন কখনো, তাতে অনেক ঐ জিনিস থাকে।

—ও, মই! তাই বলুন? তা মইয়ের কথা আমাকে কেন? আপনি কি এত রাত্রে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চান?

রাত জেগে টেলিফোনের সামনে বসে থাকা নিশ্চয়ই কিছু সুখের কাজ নয়। ভদ্রলোক বিরক্ত হতেই পারেন। তাই আবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, মইটা আপনাদের কোম্পানির। একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এটা কি উচিত কাজ হয়েছে? ছ মাস আগে এরকম একটা মইয়ের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে অনেক কিছু চুরি হয়ে গেছে!

—চুরি হয়ে গেছে তো থানায় খবর দিন। সেকথা আমাদের কেন?

—এ আপনি কী বলছেন? ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি হলে কেউ কি থানায় খবর দেয়? আপনিই বলুন, আপনি কখনো দিয়েছেন? আপনার বাড়ি থেকে চুরি হয়নি? আমি শুধু বলছিলাম, এই মইটা ফেলে যাওয়ায় চুরির সম্ভাবনাটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কেউ ঐ মইয়ের সাহায্য নিয়ে চুরি করতে পারে।

ভদ্রলোক এবার একটু নরম হলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, এরকমভাবে রাস্তায় মই ফেলে আসার নিয়ম নেই। মইটা এখনো ওখানে আছে?

—হ্যাঁ আছে। আপনাকে টেলিফোন করতে করতেও দেখতে পাচ্ছি। ওটাকে সরানো যায় না?

—কিন্তু এটা তো আমার কাজ নয়। কারুর যদি কারেন্ট ফেইল করে—

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কী করা যায় বলুন তো! চোরের ভয়ে তো আমার আজ সারা রাত ঘুম হবে না।

—আচ্ছা আমি দেখছি, কি করা যায়? এত রাত্রে লোকজন পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবু আমি চেষ্টা করছি, যাতে ওটা সরিয়ে ফেলা যায়। তবে কথা দিতে পারছি না কিছু।

—তা তো বটেই। তবু অনেক ধন্যবাদ।

ফোন রেখে দিলাম। বুঝতেই পারলাম, ভদ্রলোক অসহায়। এত রাত্রে তিনি মই সরিয়ে নিয়ে যাবার লোকই বা পাবেন কোথায়?

আজ আর হাওয়া খাবার লোভ করা চলবে না। রাস্তার দিকের সবকটা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিলাম ভালো করে। তারপর শুয়ে পড়লাম আলো নিবিয়ে।

সহজে ঘুম আসে না। রাত্তির বেলা আপনি আপনি অনেক খুটখাট শব্দ হয়। সেই রকম শব্দ হলেই মনে হয়, এই বুঝি চোর এল! জানলার খড়খড়ি তুলে বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলা যায়! সেই রকম ভাবে যদি চোর এসে জানলা খুলে ফেলে! জানলার পাশেই তো আলনা। উঠে গিয়ে আলনাটা সরিয়ে আনলাম ঘরের মাঝখানে। কিন্তু বইয়ের টেবিলটা তো আর এক জানলার কাছে। কত জিনিস সরাব?

এক কাজ করলে হয় না? একটা দরজা একটু ফাঁক করে খুলে রাখলে কেমন হয়। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকব। চোর ব্যাটা যেই ঢুকবে অমনি লাফিয়ে তাকে ধরে ফেলব। আমি জীবনে কখনো জ্যান্ত চোর দেখিনি। এই একটা সুযোগ!

কিন্তু একজনের বদলে যদি দু-তিনটে চোর একসঙ্গে আসে? মই বেয়ে উঠে আসতে আর অসুবিধে কি? কিংবা যদি পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়? থাক, আর দরজা খোলা রাখার বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। তাছাড়া সারা রাত বিছানায় শুয়ে মোটেই আমি জেগে থাকতে পারব না। চোর আসে আসুক। আমি টুপ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ঘরের চারদিকে চোখ বোলালাম। সব ঠিকঠাকই আছে, চোর আসেনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। মইটা এখনো সেখানেই আছে। তবে রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টেও বাল্ব নেই। যাক, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে!

২৫

সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে ছিল। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মন বসল না। দাঁত মাজতে গিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মুখে দিয়েই থুঃ থুঃ করে উঠলাম।

ব্রাশে টুথ পেস্ট লাগাবার বদলে দাড়ি কামাবার ক্রিম লাগিয়ে বসে আছি। যতবার কুলকুচো করি, কিছুতেই আর সাবানের স্বাদটা মুখ থেকে যায় না।

এরপর চা খেতে গিয়ে কাপটা হঠাৎ উল্টে গেল। গরম চা পড়ে গেল পাজামায়। রাগে আমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কার ওপর রাগ? আসলে আমিই তো অন্যমনস্ক হয়ে আছি। একটা কিছুতেই মন বসানো দরকার।

ইস্তিরির প্লাগ পয়েন্টটা ক'দিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। আজ একটা জামা ইস্তিরি করতেই হবে। প্লাগ সারিয়ে ফেললেই হয়। সেটা তবু একটা কাজ হবে। স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এসে সুইচ বোর্ডটা খুলে ফেললাম। একটা তার আলগা হয়ে গেছে। জুড়ে দেওয়া কিছুই না। একটা ছোট কাঠের চৌকির ওপর সাবধানে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কখন একটা হাত মনের ভুলে দেয়ালে রেখেছি। এমন সময় শক খেলাম, মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। তখন বলে উঠলাম, বেশ হয়েছে! আমার এই শাস্তিই পাওনা ছিল!

পরপর এসবগুলো হচ্ছে শুধু একটিই কারণে। আজ আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। সকালবেলা ঘুম ভাঙবার পর এই কথাটাই প্রথম মনে পড়েছে। কী কঠোর উপলব্ধি! পয়সা নেই, এর থেকে বড়ো কোনো ঘটনা আর হয় না! তাহলে আজ সারাটা দিন কাটবে কী করে? আজ সাড়ে চারটের সময়—

অনেক ভেবেচিন্তেও কোনো দিক থেকেই টাকা পাওয়ার কোনো উজ্জ্বল আশা দেখা যায় না। সবগুলি উপায়ই বহু ব্যবহৃত হবার ফলে এখন অচল। এমনকি পুরোনো খবরের কাগজ বা শিশিবোতলও বিক্রি করার মতন জমেনি। ধার পাওয়া যেতে পারে অবশ্য। বন্ধুবান্ধবরা এখনো ধার দেয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রথম মুখ ফুটে ধারের কথাটা বলা বড়োই শক্ত! একবার অন্য কথা শুরু হয়ে গেলে আর টাকার কথাটা উচ্চারণ করা যায় না। কতবার এমন হয়েছে, কারুর কাছে ধার চাইতে গিয়ে দু'ঘণ্টা গল্প করার পর শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। সেই বন্ধু জানতেও পারেনি, তার রসিকতা শুনে হাসবার সময় আমার ভেতরে কত যন্ত্রণা হয়েছিল।

আজ কিছু টাকা চাই-ই। কিছু না পেলে চলবেই না। আজ সাড়ে চারটের সময়—

দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। আমার জামা-প্যান্ট পরিষ্কার, মসৃণভাবে দাড়ি কামানো, পায়ের চটিজোড়াও প্রায় নতুন—অথচ পকেটে মাত্র কুড়ি পয়সা। কেউ বিশ্বাস করবে? পকেটে দু'চারটে টাকা অন্তত না থাকলে নিজেদের কী মলিন আর নীচু মনে হয়। লোকের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না পর্যন্ত।

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম ডালহৌসিতে। বন্ধুদের মধ্যে অরবিন্দর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবেই। ওর পকেটে না থাকলেও ওর অফিস থেকে টাকা যোগাড় করার একটা রাস্তা আছে। অরবিন্দ আবার টিফিনে বেরিয়ে না যায়।

লিফটম্যানকে পাওয়া গেল না, পাঁচতলার সিঁড়ি ভেঙে অরবিন্দর অফিসে এসে পৌঁছে গেলাম। এই পরিশ্রমের মূল্য হিসাবেই বোধ হয় অরবিন্দকে ওর টেবিলেই পাওয়া গেল। একটা বই পড়ছিল, আমাকে দেখে বইটা মুড়ে রেখে বলল. তুই এসেছিস? খুব ভালো হয়েছে।

পাছে লজ্জায় বলতে না পারি, তাই আগেই একটা কাগজে লিখে এনেছিলাম। প্রথমেই সেই কাগজটা বাড়িয়ে দিলাম। 'অরবিন্দ, পনেরোটা টাকা চাই। আজই। শোধ করে দেবো সামনের মাসে।'

সামান্য দু'লাইনের চিঠি, তবু অরবিন্দ সেটা মন দিয়ে পড়ল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে খুব যত্নের সঙ্গে কুটিকুটি করে ছিঁড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।

পাঁচ মিনিট বাদে ফিরে এসে অরবিন্দ বলল, চল বেরোই। আমি হাফ-ডে ছুটি নিয়ে এলাম, আর অফিসে ফিরব না।

যতক্ষণ টাকাটা হাতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বুকের মধ্যে একটু দুরুদুরু ভাব থাকে। হবে কি হবে না! আজ কি টাকাটা কোনো কারণে...। অরবিন্দর অফিসের এক বেয়ারার কাছ থেকে যখন তখন ধার চাওয়া যায় জানি। আজ যদি সে না এসে থাকে।

অফিসের বাইরে এসে অরবিন্দ বলল, মধুসূদন বেয়ারার কাছে খুচরো টাকা নেই। দিতে চাইছিল না। তাই একটা একশো টাকার নোটই নিয়ে এলাম। তুই পঞ্চাশ। আমি পঞ্চাশ। পাশের দোকান থেকে টাকাটা ভাঙাই আগে।

বেয়ারার কাছে খুচরো পনেরো টাকা নেই, একশো টাকার নোট? এক-একটা বেয়ারাও কত বড়োলোক! পাশের দোকান একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে দেয় —সেই বা কম বড়োলোক কিসে?

অরবিন্দ গুণে গুণে পঞ্চাশ টাকা আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, চল কিছু খাই! চিকেন আর মোগলাই পরোটা—

আমি বললাম, নারে, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

অরবিন্দ বলল, দামটা আমার টাকা থেকে দেব, চল না!

—সত্যি আমি বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছি!

—ধ্যুৎ! মোগলাই পরোটা-মাংস কি কেউ পেট ভরাবার জন্য খায়? এ তো যখন তখন খাওয়া যায়।

জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকে অরবিন্দ এক গাদা খাবারের অর্ডার দিল। তারপর বলল, আজ সারা দিন একদম মেজাজটা ভালো নেই, জানিস?

—কেন?

—কি জানি! এমনিই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। রোজ রোজ সেই একঘেয়ে অফিস, সেই ভিড়ের ট্রাম-বাস ধরে আসা, সেই একই মানুষজন, ভালো লাগে না। তুই আজ এসেছিস, আজ খুব ভালো হয়েছে! আজ চুটিয়ে আড্ডা দেব!

আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আজই? ইস, কেন আজ অরবিন্দর কাছে এলাম? এর বদলে অন্য কারুর কাছে গেলেই হতো।

অরবিন্দ বলল, চল, একটা সিনেমা দেখবি।

আমি বললাম, না রে, আমাব একটা কাজ আছে। তুই যা না।

—একা একা? একা সিনেমা দেখতে ভালো লাগে? কত ছেলের কত মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার শালা তাও একটাও জোটে না! তোর কী কাজ আছে?

—আমাকে একবার সায়েন্স কলেজে যেতে হবে সাড়ে চারটের সময়—

অরবিন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, সায়েন্স কলেজে?

বলেই বুঝেছি যে ভুল করেছি। সত্যিই তো, সায়েন্স কলেজে আমার কী দরকার থাকতে পারে? কোথায় বিজ্ঞান, আর কোথায় আমি! ঠিক সময় মতন মিথ্যে কথা কিছুতেই আমার মুখে আসে না। অন্য কোনো একটা জায়গার কথা জানিয়ে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!

অরবিন্দ বলল, ঠিক আছে, চল, আমিও তোর সঙ্গে যাব। আমাদের অপরেশদা তো ওখানে পড়ান, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসব!

আমার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সর্বনাশ, অরবিন্দকে এড়াই কি করে?

আমতা আমতা করে বললাম, আমি ঠিক সায়েন্স কলেজে যাব না। তার পাশের গলিতে একটা বাড়িতে...খুব জরুরি একটা কাজ...

—ঠিক আছে, তোর কাজটা কতক্ষণ লাগবে?

—বেশিক্ষণ নয়।

আসলে তখনই অরবিন্দকে সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল। তাহলে অরবিন্দ আমাকে ঠিকই ছেড়ে দিত। কিন্তু রাজ্যের লজ্জা আমাকে পেয়ে বসল। সত্যি কথাটা মুখে এল না।

অরবিন্দ বলল, আমি তোর জন্য দাঁড়াব। তুই তোর কাজটা সেরে নিবি। তারপর কোথাও বসে দু'জনে একটু গল্প করব। বললাম না, আজ আমার মেজাজটা একদম ভালো লাগছে না। তুই আজ আমার বাড়ি যাবি? বাড়িতে কেউ নেই,

সবাই বেড়াতে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে আমার একলা একলা ফিরতেও ইচ্ছে করে না।

আমি চুপ করে রইলাম। দোকানের ঘড়ির দিকে চোখ। পৌনে তিনটে বাজে। এখনো অনেক দেরি আছে।

বললাম, চল এখন একটু কফি হাউসে যাই। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

কফি হাউসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না। সে-রকম কারুকে পাওয়া গেলে, তার হাতে অরবিন্দকে সঁপে দিতাম। আধ-চেনা ছেলেদের একটা বড়ো দল বসে আছে একটা টেবিলে। তারা ডাকল, সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারা সুভাষ বসু সম্পর্কে দারুণ তর্কে মেতেছিল, অবিলম্বে অরবিন্দ সেই তর্কে যোগ দিয়ে বসল।

তর্ক যখন তুমুল তুঙ্গে উঠেছে, সেই সময় আমি চুপি চুপি উঠে পড়লাম টেবিল থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে যখন নেমে এসেছি, তখনই সিঁড়ির ওপর থেকে অরবিন্দ বিস্মিত ভাবে ডেকে বলল, কি রে, তুই চলে যাচ্ছিস?

আমি মুখ থেকে ধরা-পড়া ভাবটা নিমেষে মুছে ফেলে বললাম, না তো! সিগারেট কিনতে এসেছিলাম!

অরবিন্দ বলল, সাড়ে চারটে বাজতে তো আর দেরি নেই, যেতে হবে না আমাদের? চল।

নীচে নেমে এসে অরবিন্দ বলল, দূর দূর—যতসব বাজে এঁড়ে তর্ক। ছেলেগুলো কিছু বোঝে না সোঝে না! কেন যে ওদের সঙ্গে এতক্ষণ বাজে বকতে গেলাম! মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল—। চল, তোর কাজ সেরে নেবার পর আমার বাড়িতে যাব—ছাদের ওপর মাদুর পেতে হাওয়া খাব, খুব হাওয়া দেয় ওদিকে...টবে অনেকগুলো জুঁই ফুলের গাছ বসিয়েছি, তুই যদি জিন-টিন খেতে চাস, তাও খাওয়াতে পারি—

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম সায়েন্স কলেজের কাছে। আমার বুক টিপটিপ করছে। এখনো যদি অরবিন্দকে বলা যায়, এখনো—। অথচ বলতে পারলাম না।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, কোন গলিটায় তুই যাবি?

আমি শুকনো মুখে, একদিকে আঙুল তুলে বললাম, ঐ তো—

—আমি আর তাহলে ভেতরে যাব না। আমি এখানেই দাঁড়াই। কতক্ষণ লাগবে তোর, আধঘণ্টা?

আমি ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। ঢুকে পড়লাম গলিতে। কিন্তু গলিতে থাকলে তো চলবে না। ঠিক সাড়ে চারটের সময় সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকের ফুটপাতে বকুল গাছের নীচে আমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সেখানে নীরা আসবে,

ওর ছুটির পরে।

প্রত্যেকদিন নীরার সঙ্গে দেখা করা যায় না। ওর এক মাসতুতো দাদাও পড়ে এখানে। সে থাকলে আর আসা হয় না, আমি তার চোখে পড়তে চাই না। যেদিন তার ক্লাস ছুটি থাকে কিংবা কোনো কারণে অনুপস্থিত হয়, সেদিনই নীরার সঙ্গে এখানে আমার দেখা করার কথা থাকে। নীরাদের বাড়িতে হঠাৎ অনেক লোক এসেছে, সেখানে গেলেও নিরিবিলিতে কথা বলার উপায় নেই। আজ প্রায় দশ-বারো দিন বাদে নীরার সঙ্গে আমার দেখা হবে—ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁয় ওকে নিয়ে চা খেতে যাব।

রাস্তা পেরিয়ে আমি বকুল গাছটার নীচে এসেই দাঁড়ালাম। উল্টোদিকে, বেশ খানিকটা দূরে অরবিন্দ একটা মুচির সামনে উবু হয়ে বসে চটি সারাচ্ছে। ভাগ্যিস আমার দিকে পেছন ফিরে বসা!

প্রতিটি মিনিট যেন এক ঘণ্টার চেয়েও লম্বা। নীরা এত দেরি করছে কেন? সাড়ে চারটে কি বাজেনি? সায়েন্স কলেজ থেকে কিছু ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি সমস্ত মন-প্রাণ দু'চোখের মধ্যে এনে সেদিকে তাকিয়ে আছি। কই, ওদের মধ্যে তো নীরা নেই! নীরা আজ আসেনি? হতে পারে না, নিশ্চয়ই আসবে।

মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি অরবিন্দর দিকে। ও এখনো বসে আছে মুচিটির সামনে। চটি সারাতে কি এতক্ষণ লাগে? নাকি কথা বলার কেউ নেই, ও মুচির সঙ্গেই গল্পে মেতে আছে?

বেশ কিছুক্ষণ পর নীরা বেরুল। আর কোনো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নয়, একা। এই জন্যই বোধহয় ও দেরি করছিল। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে নীরা। আমার দিকে না তাকিয়ে ও একবার তাকাল আকাশের দিকে। ওর সেই গ্রীবার ভঙ্গিতে সমস্ত কলকাতা আলো হয়ে গেল।

নীরা যখন রাস্তা পেরিয়ে আসে তখন সমস্ত ট্রাম বাস ওর সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। কোনো লোক চেঁচিয়ে কথা বলে না, কেউ ওর সামনে রাস্তায় থুতু ফেলে না।

নীরা আমার কাছে এসে বলল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? চলো—

আমি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এবার অরবিন্দকে বলতেই হবে, আজ ওর সঙ্গে যেতে পারব না। কাল নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যাব।

অরবিন্দ এই সময় উঠে দাঁড়াল। ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখল। এগিয়ে এল কয়েক পা। তারপর থমকে দাঁড়াল। আমার পাশে নীরাকে দেখে ও কিছু একটা বুঝে নিল। তারপর উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে লাগল হনহন করে।

আমি অরবিন্দর প্রতি খুব কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। আমাকে আর মুখে কিছু বলতে হলো না। নীরাও জানল না কিছু। নইলে, অরবিন্দকে দেখে ও হয়তো ভাবত, আমাদের এই গোপন কথাটা আমি আরো অনেককে বলে দিয়েছি। কিংবা ভাবত, একদিনও কি আমি বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে ওর জন্য আলাদা সময় দিতে পারি না?

পরমুহূর্তেই দারুণ অনুশোচনা হলো আমার। ছি ছি ছি, এ আমি কী করলাম! আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে টাকা ধার চাইতে গেলেও খুশি হয়, যে পনেরো টাকা ধার চাইলে পঞ্চাশ টাকা দেয়, তাকে আমি এমন ভাবে বিদায় করে দিলাম? তার আজ মন খারাপ, সে আজ আমার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত যত্ন করবে বলেছিল—সেসবের আমি কোনো মূল্যই দিলাম না! শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে একা সময় কাটাবার লোভে? আমার যে-কোনো জিনিস আমি বন্ধুদের ভাগ করে দিতে পারি—তা হলে আজ সন্ধেবেলায় নীরাকে আমি আর অরবিন্দ দুজনে ভাগ করে নিতে পারি না?

নীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি একটাও কথা বলছ না যে?

আমি বললাম, নীরা, আমার এক বন্ধু এখানে রয়েছে, তাকে ডাকব? আমাদের সঙ্গে যদি যায়—

নীরা একটু অবাক, চোখ তুলে বলল, বন্ধু? কোথায়? বাঃ ডাকো—

অরবিন্দ ছিল রাস্তার ওপারে। তাকে ধরবার জন্য আমি এমনভাবে ছুটে গেলাম, যে আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়তাম। দু'দিক থেকে গাড়ি প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল আর কি! একজন বাস ড্রাইভার বিশ্রীভাবে গালাগাল দিয়ে উঠল আমাকে। সেসব অগ্রাহ্য করে আমি ছুটে গেলাম।

কিন্তু রাস্তার ওপারে এসে অরবিন্দকে আর পেলাম না। ও এর মধ্যেই কোনো চলন্ত ট্রামে উঠে পড়েছে!

২৬

আমীর খাঁ সাহেব বললেন, চলো বাচ্চা, তোদের এক জায়গা থেকে বহুত আচ্ছা গান শুনিয়ে আনি!

বুঝলাম, খাঁ সাহেব উঠে পড়তে চাইছেন। ঘর ভর্তি লোক, সন্ধের দিকে তিনি বেশ আড্ডার মেজাজে ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে এক অবুঝ ভক্ত বারবার অনুরোধ করছে কেদারার কয়েকটি বিশেষ তান শোনাবার জন্য। অনেকেই বোঝে

না যে, শিল্পীদের মানসিক ছুটির দরকার কত বেশি। খাঁ সাহেব ভোরবেলা উঠে প্রায় সারাদিন রেওয়াজ করেন। উৎকৃষ্ট শিল্প মানুষকে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্ত করে দেয়। স্রষ্টাকে ক্লান্ত করে আরো বেশি। সুতরাং সারাদিন চর্চার পর খাঁ সাহেব তো ক্লান্ত হয়ে থাকবেনই। যখন তখন গান গাইতে বললেই কি গাওয়া যায়? তা ছাড়া কিছু আগে তিনি খানিকটা হুইস্কি পান করেছেন। এসব পান করার পর তিনি সচরাচর তানপুরা ছুঁতে চান না।

ভক্তটি তবু নাছোড়বান্দা। ঐ একই অনুরোধ সকাতরে করে যাচ্ছে বারবার। অবশ্য, অনেক ভক্ত এরকম পাগলই হয়।

আমীর খাঁ অতিশয় সজ্জন ও অমায়িক। কারুর মুখের ওপর রূঢ় কথা বলতে পারেন না। বেশ কয়েকবার না না করে তিনি ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছেন। তারপর যেই তিনি উঠে পড়তে চাইলেন, তখনই বোঝা গেল এই উপায়ে তিনি ভক্তটিকে কাটাতে চাইছেন।

একটা পুরোনো ছোট্ট গাড়ি যোগাড় হয়েছে। সেকালের স্ট্যাণ্ডার্ড টেন, অনেকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতন চেহারা। ভেতরে জায়গা খুব কম, আমীর খাঁ সাহেব বেশ লম্বা মানুষ, তাঁর পা ছড়িয়ে বসার খুব অসুবিধে।

সে কথা বলতেই তিনি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, না না, কোনো অসুবিধে নেই! গাড়ি চড়তে পেরেছি এই ঢের! ভারত বিখ্যাত মানুষ, হুকুম করলে ভক্তরা দশটা গাড়ি নিয়ে আসবে এক্ষুনি। সেই লোক এই ভাঙা গাড়িতে চড়েও এরকম কথা বলছেন: ভদ্রতা ও বিনয় এক-একজনের মুখে এত সুন্দর হতে পারে।

অবশ্য ছোট গাড়ি হওয়ার একটা সুবিধা হয়েছে। বেশি লোক উঠতে পারেনি, তাঁর সেই নাছোড়বান্দা ভক্তটিও বাদ পড়ে গেছে। আমরা দু'তিনজন বন্ধু আগেভাগে উঠে বসে পড়েছি। সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি নিতান্ত তালকানা মানুষ, তবু মাঝে মাঝে আমীর খাঁর কাছে আসি গল্প শোনার লোভে। উনি কথাবার্তাও খুব সুন্দর বলেন। সরল সাদাসিধে দার্শনিকের মতন। এমনকি ওঁর মুখের উর্দুও বেশ সহজে বোঝা যায়।

উনি বললেন, তোমরা জানো না, কলকাতায় যখন থাকতাম আমার যৌবনকালে, বউবাজারে এক বাড়ির দারোয়ানের কাছে একটা খাটিয়া চেয়ে নিয়ে রাত্রে শুতাম। সে খাটিয়াটা এত ছোট, খাটিয়া থেকে আমার পা বেরিয়ে থাকত। লম্বা হওয়ার অনেক বিপদ!

শুনেছিলাম, গলব্রেথ সাহেব যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, কোথাও বেড়াতে গিয়ে কোনো বাংলোতেই ওঁর মাপ মতন বিছানা পেতেন না। সব সময় পা বেরিয়ে

থাকত। সত্যজিৎ রায়েরও নিশ্চয়ই সেই অবস্থা হয়। অবশ্য গলব্রেথ সাহেবের জন্য পরে অর্ডার দিয়ে আলাদা স্পেশাল খাট বানানো হয়েছিল।

খাঁ সাহেব বললেন, চলো, বউবাজারে আমি যে বাড়িটাতে থাকতাম, সেইখানে নিয়ে যাব।

তাঁর নির্দেশে গাড়ি গিয়ে থামল বউবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছাকাছি একটি বাড়ির সামনে। এদিককার বাড়িগুলো সব পুরোনো পুরোনো, সরু অন্ধকার প্যাসেজ।

ফুটপাতে একটা ঠ্যালার ওপর একটা বুড়ো মতন লোক বসে ঝিমোচ্ছিল, খাঁ সাহেব তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, ক্যায়সা হ্যায়?

লোকটি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে, বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল খাঁ সাহেবের দিকে। তারপর বলল, আপ?

প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা গিয়ে সিঁড়ি। অন্ধকার। অনেকখানি উঁচুতে একটা বালব ঝুলছে, কিন্তু তার আলো নীচে পৌঁছয় না। সিঁড়িগুলো বহু লোকের যাতায়াতে প্রায় ক্ষয়ে গেছে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি তো উঠছিই। শেষ নেই যেন। তারপর চারতলায় এসে থামা হলো। খাঁ সাহেবের বয়স তখন ষাটের বেশি, কিন্তু ঋজু সবল চেহারা, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙেও একটুও হাঁপালেন না।

চারতলার বারান্দায় এসে ডাক দিলেন—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

ততক্ষণে বাড়িটা কি ধরনের তা বুঝে গেছি। বিভিন্ন ঘরের দরজায় দেখা যাচ্ছে গালে রুজ মাখা মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে। এবং অনেক ঘরের মধ্য থেকে হারমোনিয়াম ও ঘুঙুরের আওয়াজ। না, এটা বেশ্যাবাড়ি নয়। বেশ্যাবাড়ির ঘুঙুর হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যেত গত শতাব্দীতে। এ বাড়িতে গত শতাব্দীরই অন্যরকম ঐতিহ্যের কিছুটা রেশ এখনও রয়ে গেছে।

বারান্দায় একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটির সামনে এসে খাঁ সাহেব আবার ডাকলেন—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

একজন পরিচারক বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেবকে দেখেই লম্বা সেলাম দিল। তারপর অত্যন্ত যত্ন করে দরজার পর্দা সরিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ঘরটা রীতিমতন বড়ো। তার অর্ধাংশে কার্পেট ও বাকি অর্ধাংশে পুরু গদি পাতা। বেশ একটা পরিষ্কার ঝরঝরে ভাব আছে। একটা মস্ত বড়ো কাচের আলমারিতে প্রত্যেক তাকে শুধু কাচের গেলাস সাজানো। প্রায় একশোটা হবে! এক সঙ্গে এত কাচের গেলাস আমি কোনো বাড়িতে আগে দেখিনি।

এ ঘরেও ডুগি তবলা এবং হারমোনিয়াম সাজানো। একটি লোক চুপচাপ

বসে আছে, তাকে দেখলেই তবলচি বলে চেনা যায়।

গদির ওপর আমাদের সকলকে বসতে বলে খাঁ সাহেব জানালেন যে, লক্ষ্মী দারুণ গজল গায়। একেবারে বুলবুল। ও আমার মেয়ের মতন। আমি কলকাতায় এলেই একবার ওর গান শুনতে আসি। প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

আমীর খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ খেয়ালী। কোনো অনুষ্ঠানে খেয়াল ছাড়া আমি ওকে ঠুংরি বা ভজন গাইতে শুনিনি। উনিও তাহলে গজল পছন্দ করেন! এবং উনি যখন প্রশংসা করছেন, তখন নিশ্চয়ই দারুণ গায়িকা! কখনো নাম শুনিনি অবশ্য।

প্রথমে এল শরবত। আমাদের প্রত্যেকের জন্য। তারপর একটা রুপোর রেকাবি ভরতি প্রায় ডজন দুয়েক পান। তারপর এল লক্ষ্মী।

দেখলে মোটেই বাঈজী বলে মনে হয় না। বেশ মোটার দিকে চেহারা, বয়েসেও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। দু'হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, গায়ে একটা বেনারসী শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ।

খাঁ সাহেবের কাছে এসে সে প্রায় শুয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। খাঁ সাহেব বললেন, এই সব বালবাচ্চাদের নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

লক্ষ্মী আমাদেরও নমস্কার জানাল বিনীতভাবে।

খাঁ সাহেব গদির ওপর চাপড় মেরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বসো! এদের এনেছি। একঠো গান শুনাও!

আমাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, খাঁটি সমঝদাররাই শুধু লক্ষ্মীর কাছে আসে, ফালতু লোকেরা আসে না।

কিন্তু গানের অনুরোধ শুনে লক্ষ্মী একেবারে হায় হায় করে উঠল। সে বলল, ওস্তাদজী, আমার কি কপাল! আপনার মতন মানুষ চাইছেন আমার গান শুনতে, আর আমার সৌভাগ্য হবে না! আমার তো আজ গান গাইবার উপায় নেই!

—উপায় নেই? কেন?

—ওস্তাদজী, এটা রোজার মাস! এ সময় তো আমি গান করি না।

খাঁ সাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমাদের দিকে ফিরে আবার বললেন, শোনো মজার কথা। রোজার মাস বলে এ বেটী গান গাইবে না! আরে গাও গাও, কিছু হবে না!

লক্ষ্মী কানে এক হাত দিয়ে জিভ কেটে বলল, আমার ওস্তাদের কাছে কথা দিয়েছি। এ সময় আমি কোনো মেহমানকেও ডাকি না ঘরে।

—তা হলে কি আমাদেরও চলে যেতে বলছ?

লক্ষ্মী খাঁ সাহেবের পা ধরে বলল, সে কি কথা! আপনি কি মেহমান? আপনি আমার গুরুর গুরু। আপনি বসুন, কি খাবেন বলুন, আমাকে শুধু হুকুম করুন!

—দূর বেটী, তোকে গান গাইতে বললাম, তুই শোনাবি না—

আমার মনে হলো, একটা রূপকথার জগতে এসেছি। এখানকার নিয়মকানুন কিছুই জানি না। লক্ষ্মী যে জাতে হিন্দু, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু সে পবিত্র রোজার মাস উপলক্ষে গান গাইবে না! আর আমীর খাঁ সাহেব ভক্ত মুসলমান, তিনি তাকে পেড়াপিড়ি করছেন গান গাইবার জন্য। সঙ্গীতের জগৎটাই এরকম বিচিত্র।

সে জায়গায় আর কিছুক্ষণ বসে আমরা উঠে পড়লাম। গান শোনা হলো না। লক্ষ্মী অবশ্য বলেছিল, অন্য কোনো ঘর থেকে আর কোনো মেয়েকে ডেকে এনে গান শোনাতে পারে। খাঁ সাহেব রাজী নন। তিনি যার-তার গান শুনবেন না।

বাইরে বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেব বললেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়?

রাত প্রায় সাড়ে দশটা-এগারোটা। এখন যাবার বিশেষ জায়গা নেই। খাঁ সাহেব নিজেই বললেন, চলো ময়দানে গিয়ে বসা যাক। বিনা পয়সায় কি চমৎকার হাওয়া পাওয়া যায় ময়দানে!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে গিয়ে বসলাম আমরা। সন্ধের দিকে এখানে খুব ভিড় থাকে। এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। কয়েকজন লোক মাত্র বসে আছে এদিক সেদিক। পরিষ্কার আকাশ, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, এবং সত্যিই বিনা পয়সার প্রচুর টাটকা বাতাস ওড়াউড়ি করছে সেখানে।

খাঁ সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। মনে হয় যেন ধ্যানস্থ। আমরা কথা বলছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো, প্রকৃতি থেকে যেন একটা গম্ভীর নাদ উঠছে। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। খাঁ সাহেব সুর ধরেছেন। কেদারা। সন্ধেবেলা যে অনুরোধ তাঁকে করা হয়েছিল, সেটাই বোধহয় মনের মধ্যে ঘুরছিল এতক্ষণ। এখন আপনি আপনি সুর বেরিয়ে এসেছে। আলাপ শুরু করেছেন আদি সপ্তকে, ঠিক বাঘের মতন গলা। না, বাঘের গলায় কোনো সুর নেই, আমি বলতে চাইছি, খাঁ সাহেবের গলায় জোরালো ভাবটা বাঘের মতন।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আমরা, এমন সময় অল্প দূরে একটা বিশ্রী বেসুরো শব্দ জেগে উঠল। তাকিয়ে দেখি যে, খানিকটা দূরে দু'জন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক একটা হুইস্কির বোতল খুলে বসেছিলেন, তাঁদেরই একজন হঠাৎ নিজে গান গেয়ে উঠেছেন কিংবা খাঁ সাহেবকে ভ্যাঙচাচ্ছেন।

রাগে আমাদের শরীর জ্বলে গেল। খালি গলায় মাঠের মধ্যে বসে আমীর খাঁর গান শোনার মতন দুর্লভ সুযোগ এরা নষ্ট করে দিচ্ছে। ইচ্ছে হলো তক্ষুনি গিয়ে ওদের গলা টিপে দিতে। এর মধ্যে ওরা দু'জনই এক সঙ্গে গান ধরেছে। তারস্বরে খাঁ সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে গান

থামালেন। আমরা ঐ লোক দুটোকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য একজন উঠে পড়েছিলাম, খাঁ সাহেব থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে প্রাণের আনন্দে গাইছে, গাইতে দাও!

তারপর তিনিই চেঁচিয়ে বললেন, গাইয়ে, জোরসে গাইয়ে!

পাঞ্জাবি ভদ্রলোক দু'জন এই ঠাট্টা বা কিছুই বুঝলেন না। আরো বেসুরো গলায় চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন। খাঁ সাহেব তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে আমাদের একজনের পিঠে তাল দিতে লাগলেন রীতিমতন। উৎসাহ পেয়ে পাঞ্জাবিদ্বয় আমাদের কাছে উঠে এলেন, তাঁদের গলায় সুর নেই বিন্দুমাত্র, তদুপরি মাতাল অবস্থা, তবু তাঁদের প্রাণের আনন্দের গানে তাল দিতে লাগলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক!

এর কিছুদিন পর, ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম আমীর খাঁ সাহেব একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। প্রত্যেক কাগজে তাঁর ছবি। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল সেই দুই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক কি তখনো চিনতে পেরেছেন যে সেই রাত্রে তাঁদের গানের উৎসাহী শ্রোতাটি কে ছিলেন?

২৭

ছেলেটি প্রথমেই এসে আমাকে বলল, আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব!

আমি তক্ষুনি বুঝে গেলাম, চাকরির ব্যাপার। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পৃথিবীর অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে গেছে যে আমার মতন একজন অভাগা অভাজনের কাছেও কেউ অনুগ্রহ চাইতে আসে। আমার নিজেরই নেই চালচুলো, পকেটে অধিকাংশ সময় হাওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সেই আমি কাকে কী দিতে পারি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেটির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। রোগা লম্বাটে চেহারা, শ্যামল রং, মলিন ধুতি ও শার্ট পরা। দেখলেই অনুমান করা যায় গ্রামের ছেলে। তবে চোখ দুটি ভারী মমতা মাখানো। মনে হয়, ঐ চোখ দুটিতে আকাঙ্ক্ষা আছে।

আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি, বলো ভাই?

ছেলেটি বলল, আমি আপনার ভরসাতেই কলকাতায় এসেছি। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

আমি তাকে বললাম, বসো. চা খাবে?

চিৎকার করে চায়ের কথা বললাম। ছেলেটিকে খানিকক্ষণ আপ্যায়ন করা দরকার। যাকে আমি চাকরি দিতে পারব না, তার জন্য কিছুটা সময় অন্তত দেওয়া উচিত। চাকরিও দেব না, সময়ও দেব না—দু'কথায় বিদায় করে দেব—এটা কোনো সভ্যতা নয়।

সে বলল, না, আমি চা খাই না। আমি আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না। আমি চাকরি চাই না, আপনি শুধু কলকাতা শহরে আমার একটু থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এ দেখছি অন্যরকমের প্রস্তাব। এবার একটু শ্লেষের সঙ্গে বললাম. চাকরি না করেও থাকা খাওয়ার জায়গা যদি পাওয়া যেত, তাহলে সেরকম জায়গা তো আমিই নিতাম!

সে বলল, মানে আমি তো জানিই, চাকরি পাওয়া কত শক্ত। তাই বলছিলাম, খাওয়া থাকার বদলে আমি ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা এরকম কাজও করতে পারি—আমি শুধু চাই একটা ভদ্র পরিবেশ—আমি বি-এ পাশ।

কোনো বি-এ পাশ ছেলেকে কেউ বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখে না। তার প্রথম কারণ, বি-এ পাশ চাকর ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার কাজ ঠিকমতন পারবে না। এবং তার স্থায়িত্বের ওপরও নির্ভর করা যাবে না।

আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি সেরকম কোনো বাড়ি জানি না, যেখানে তুমি থাকতে পার। আমার চেনাশুনোরা সবাই মাঝারি মধ্যবিত্ত লোক তাদের বাড়িতে একটা বেশি ঘর পর্যন্ত নেই!

—তা হলে আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে!

ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ছেলেটির সমস্যাটা ঠিক দারিদ্র্যও নয়। ছেলেটি বলেনি যে, ও খেতে পাচ্ছে না। ও বলছে, কলকাতায় ওর থাকার একটা জায়গা চাই।

আমি বললাম, আচ্ছা ভাই, তুমি আত্মহত্যা করবে, এটা কিছু নতুন কথা নয়—অনেকেই আত্মহত্যা করে, কিন্তু সেটা তুমি আমাকে জানিয়ে করতে চাও কেন? আমাকে দায়ী করতে চাও?

—না, না, স্যার আপনাকে দায়ী করব কেন? আমার শুধু একটা দুঃখ রয়ে গেল, আপনি আমাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। আমি লেখক হতে চাই—

—লেখক হবার জন্য কলকাতায় থাকতে হবে কেন? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি মেদিনীপুরের এক গ্রামে। বিশেষ কিছুই নেই, তাও বাবা

বলেছেন কাজকর্ম দেখতে, ঘরে বসে বসে আমাকে কিছু লিখতে দেখলেই রাগ করেন। আমি স্যার, প্রত্যেকদিন কিছু না লিখে পারি না। না লিখলে আমার মনে হয়, জীবনটাই বৃথা।

আমি একটা সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলাম। এমনও তো হতে পারে, এই ছেলেটি বিরাট প্রতিভাবান লেখক। সত্যিই সুযোগের অভাবে এত বড়ো প্রতিভা অকালে শুকিয়ে যাবে! একটু দেখে নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার লেখা-টেখা কিছু সঙ্গে আছে? একটু দেখতাম। তুমি আত্মহত্যা করলে তো আর সে সুযোগ পাব না!

সে এবার উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, অনেক লেখা আছে। আমার দুটো লেখা ছাপাও হয়েছে। আপনি কোনটা দেখবেন, হাতের লেখা, না ছাপা?

—ছাপাটাই দাও।

কাঁধের ঝোলা থেকে সে একটি অল্পখ্যাত সিনেমার পত্রিকা বার করল। তার মধ্যে নিজের লেখাটির পৃষ্ঠা খুলে এগিয়ে দিল আমার দিকে। দুটি পৃষ্ঠায় চোখ বোলালাম। আর বেশি পড়বার দরকার নেই। গল্পটি আসলে শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি। অর্থাৎ রামের সুমতি গল্পটাই নাম-টাম বদলে ছাপা হয়েছে। গল্পটার নামও রাখা হয়েছে কুমতি-সুমতি। পত্রিকার সম্পাদকও সেটা খেয়াল করেননি।

আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এই রকম একটা সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল ওর মুখে স্যার সম্বোধন শুনে। এর আগে যারাই আমাকে স্যার বলেছে, পরে দেখেছি তাদের মাথায় কিছু নেই।

পৃথিবীর অনেক অসুখের মধ্যে লেখার বাতিকও একটা অসুখ। আমাদের দেশের মতন আর্দ্র জলবায়ুর দেশে ঐ রোগের প্রকোপ একটু বেশি। অনেক ছেলেকে আমি দেখেছি, কবিতা লিখতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমি দারুণ লিখছি, অথচ আমার লেখার ঠিক মতন সমাদর হচ্ছে না—এই রকম চিন্তাই হচ্ছে ঐ অসুখের প্রথম লক্ষণ। এই ছেলেটির রোগ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে রামের সুমতিকে এ নিজের গল্প মনে করে বিরাট সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখছে। সাহিত্য জিনিসটা অনেকটা আগুনের মতন, না জেনে ছুঁতে গেলে হাত পুড়ে যাবেই।

আমি পত্রিকাটি ছেলেটির হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, দেখো—সারা জীবনে আমি নিজেও অন্তত তিনবার আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছি, চেষ্টা করেছি। কোনোবারই ঠিক সফল হয়নি। তুমি ঠিক কোন্ উপায়ে আত্মহত্যা করবে বলো তো?

ছেলেটি বলল, আমি সাঁতার জানি না। আমি সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেব!

আমার বলতে ইচ্ছে করল, বাঃ আমার শুভেচ্ছা রইল। দেখি তো, পার কিনা।

কিন্তু এরকম কথা মুখে বলা যায় না। এ ধরনের শুষ্ক রসিকতা অনেকেই বুঝতে পারে না, মনে করে নিষ্ঠুরতা। সুতরাং নরমভাবে বললাম, আমি অতি সামান্য লোক, আমার কোনো উপায় নেই তোমাকে সুযোগ দেবার। তুমি বরং দেশের বাড়িতেই ফিরে যাও, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দ্যাখো বরং—

ছেলেটি চলে গেল। কিন্তু একটা খোঁচা রেখে গেল আমার মনের মধ্যে। ব্যাপারটা চট করে ভোলা যায় না। ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে মনে হলেও ছেলেটি যদি হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলে! ছেলেটি বোকা, এ ছাড়া আর তো কোনো দোষ নেই। শুধু বোকা হওয়ার জন্য একজনকে মরতে হবে কেন? পৃথিবীতে কি জ্যান্ত বোকার অভাব আছে। আর আমিই বা কী এমন দোষ করেছি, যার জন্য আমাকে এ খবর জানিয়ে যেতে হবে?

খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হরফের খবর ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পড়তাম না। এরপর থেকে ছোট ছোট খবরও পড়তে লাগলাম। তাও খুব সন্তর্পণে। যদি ছেলেটির আত্মহত্যার কোনো খবর ছাপা হয়! মাস চারেকের মধ্যেও সে-রকম কিছু চোখে না পড়ায় আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। তা হলে ফাঁড়া কেটে গেছে। দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না।

এরপরই একটা চিঠি পেলাম পুরী থেকে। সেই ছেলেটিই লিখেছে। সম্বোধন করেছে দাদা বলে। যাক, স্যার লেখেনি। সে লিখেছে যে পুরীতে সে এসেছিল আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই, কিন্তু সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল...

ছেলেটি বেশ রোমান্টিক তো! আত্মহত্যার জন্য পুরী চলে গেছে। মেদিনীপুর জেলাতেই তো সমুদ্র পাওয়া যায়, তা তার পছন্দ হয়নি, কোনো বিখ্যাত জায়গা চায়।

যাই হোক, ছেলেটি পুরীর একটি হোটেলে বেয়ারার কাজ নিয়েছে। সারাদিন অসহ্য পরিশ্রম, অন্য বেয়ারারা তার ওপর অত্যাচার করে। মালিক অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়—কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বেশি কষ্ট তো আর নেই, তাই সে লিখেছে, এ সবই সে সহ্য করতে পারছে। শুধু তার একটা অনুরোধ, তার জীবন নিয়ে আমি যেন একটা গল্প লিখি।

মেসের ঝি নিয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু হোটেলের বেয়ারাকে নিয়ে তো কিছু লেখেননি। সেই অপরাজেয় কথাশিল্পীই যখন ওকে নিয়ে লিখতে পারেননি, তখন আমি তো কোন ছার। তা ছাড়া গ্রামের চাষবাস ছেড়ে একটা হোটেলের বেয়ারাগিরি করার মধ্যে কী যে গৌরব আছে, তা বোঝাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

তবু চিঠিটা নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলেটি ভবিষ্যতে কী হবে? আমার মনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। এক অংশ বলল, হোটেলের ঐ কাজের কষ্ট ছেলেটি বেশিদিন সহ্য করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আবার দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্রের অন্য কোনো কাহিনীর অনুকরণে আবার কিছু লিখে সিনেমা পত্রিকায় পাঠাবে। অথবা ও ঐ হোটেলেরই ম্যানেজার হয়ে উঠবে। দু' বছর সময় ধরা যাক, এর মধ্যে কোনটা হবে? আমি নিজের সঙ্গেই একটা বাজি ধরে ফেললাম। আমার মনের রক্ষণশীল অংশটা বলল, ও ঠিক বাড়িতে ফিরে গিয়ে একদিন বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়ে করে ফেলবে। সাহিত্য-বাতিক একেবারে ঘুচবে না, গ্রামের থিয়েটারে শরৎ-কাহিনীর নাট্যরূপ দেবে। অন্য মন বলল, না না, ও যখন একবার বেরিয়ে পড়েছে, আর ফিরবে না, কোনো না কোনোভাবে উন্নতি করবেই। এমনকি নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় একদিন সত্যিকারের লেখক হয়েও উঠতে পারে। রক্ষণশীল মন বলল, কত বাজি? আমি বললাম, দশ টাকা!

আরো দু' এক মাস ছেলেটির চিঠি আসতে লাগল মাঝে মাঝে। ঐ হোটেল থেকেই। নানারকম রোমহর্ষক বর্ণনা। রাত দেড়টায় কাস্টমার এলে ওকে জাগিয়ে তুলে কত কষ্ট দেওযা হয়। হেড বেয়ারা কেন ওকে সহ্য করতে পারে না। একজন বেয়ারা জোর করে ওকে একদিন মদ খাইয়ে দিয়েছিল, তার ফলে কী দারুণ কাণ্ড হলো ইত্যাদি।

সব চিঠিই বেশ দীর্ঘ, গোটা গোটা হাতের লেখা, কিন্তু ভাষার কোনো উন্নতি হয়নি। সব সময় একটা কান্না কান্না ভাব। যেন সারা পৃথিবী শুধু ওর ওপর দয়া করবে, ও তাই চায়।

আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে পেয়ে ওর চিঠি লেখা এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ওর কথা ভুলিনি। হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে পড়ে, কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কোনো সরল মুখের বেয়ারাকে দেখলে আমি দু'-এক মুহূর্ত ঐ ছেলেটির কথা ভাবি।

দু' বছর নয়, আড়াই বছরের মাথায় আমাকে একবার পুরী যেতে হলো। আসলে কাজ ছিল ভুবনেশ্বরে, তবু একদিনের জন্য পুরীতে চলে এলাম। হোটেলের নামটা মনে ছিল, সেখানেই উঠলাম। ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না। আমার মনের রক্ষণশীল মন বলল, কী বাজিতে হেরেছ তো? বলেছিলাম না, সে ঠিক বাড়িতে ফিরে যাবে?

খানিকটা বাদে ধীরে-সুস্থে অন্য একটি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম ওর কথা। ছেলেটির নাম নাও মিলতে পারে, সে হয়তো এখানে অন্য নাম নিতে পারে।

তার চেহারারও বর্ণনা দিলাম।

বেয়ারাটি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, কানাইয়ের কথা বলছেন তো! সে তো আত্মহত্যা করেছে।

—অ্যাঁ? কবে?

—এই তো দু' মাস আগে বিষ খেয়েছিল। কোথা থেকে বিষ পেল তা জানি না। বেশ ঠাণ্ডা মতন ছেলে ছিল।

আমি একটু দমে গেলাম। যাঃ—বাজিতে হেরে গেলাম তা হলে?

শুধু আমার মনের কোন অংশটা যে কার কাছে হারল, সেটাই বোঝা গেল না!

২৮

—আচ্ছা, আপনাকে কী বলে ডাকব? নীললোহিতদা, না, শুধু নীললোহিত?

—শুধু নীললোহিত। আর তুমি। আমাকে আপনি বলার দরকার নেই!

—কেন, আপনি তো অনেক বড়ো?

—কে বলেছে আমি বড়ো? আমি সাতাশ বছরে থেমে আছি। এর থেকে আর আমি বড়ো হব না ঠিক করেছি। আমার বয়েস বছর বছর বাড়তে থাকবে ঠিকই, সেটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু আমি বড়ো হব না। বড়ো হতে আমার ভাল্লাগে না!

মেয়েটি টেলিফোনে কুলকুল করে হেসে বলল, আমার বয়েস কিন্তু সাতাশ বছরেরও অনেক কম।

আমি বললাম, সেটা তোমার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। মেয়েরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি বয়েসের পুরুষদেরও তুমি বলতে পারে।

—মোটেই কেউ তা বলে না।

—হ্যাঁ বলে। মনে করো তোমার সঙ্গে চল্লিশ বছরের কোনো লোকের বিয়ে হলো, তাকেও তো তুমি তুমিই বলবে?

—চল্লিশ বছরের লোককে আমি বিয়ে করতে যাব কেন? বয়ে গেছে!

—সে কথা তুমি জোর দিয়ে বলতে পার না। ধরো যদি উত্তমকুমার তোমাকে বিয়ে করতে চান?

—ধ্যাৎ! যাকগে ওসব কথা। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি, আপনি মার্গারিটকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন—

—গল্প কোথায়? ওটা তো অনেক বড়ো। উপন্যাসই বলা যায়।

—সে যাই হোক, ঐ গল্পটা যে লিখেছেন, তা কি সত্যি? মার্গারিট বলে কেউ আছে?

অনেক মেয়েই উপন্যাস-টুপন্যাস কিছু বোঝে না। যা পড়ে, সবই তাদের কাছে গল্প। লাইব্রেরিতে গিয়ে তারা ছোটগল্পের বই ও উপন্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে, টুকরো টুকরো গল্প, না টানা গল্প? এটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি।

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ ভাই, সত্যি। একদম সব সত্যি।

—আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল? আপনি সত্যিই ওদেশে গিয়েছিলেন।

আমি যে কখনো বিদেশে ছিলাম, সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। আমার একটাও সুট-টাই নেই, মোজার সঙ্গে বুট জুতোর বদলে চটি পরে ঘুরি, আর বার্ডকে ব্যা-র-ড, গার্লকে গ্যা-র-ল—এই ধরনের উচ্চারণে ইংরিজিও বলতে পারি না। আমার চেহারা একদম ভেতো বাঙালির মতন। কেউ কেউ বলে গেঁয়ো ভূত।

অচেনা মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ ঠাট্টা ইয়ার্কির পর আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমাকে মার্গারিটের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিল।

মার্গারিটের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার বয়েস সাতাশ। আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বয়েস উনিশ আর সাতাশ। ঐ দুই বয়েসে আমি দুটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলাম।

একটা বই খুলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসল না। চোখের সামনে ভেসে উঠল, মার্গারিটের মুখ। সে হাসছে, খানিকটা দুষ্টুমি মেশানো হাসি।

...ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন ছিল পল এঙ্গেলের বাড়িতে। মার্গারিটের নেমন্তন্ন নেই, কারণ পলের স্ত্রী মেরি মেয়েদের তেমন পছন্দ করে না। মেরি খানিকটা পাগলাটে ধরনের, কখন কী রকম ব্যবহার করবে, তার কোনো ঠিক নেই। মার্গারিট সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, তাকে ফেলে একা আমার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া [illegible]। অথচ পলের কাছে মুখ ফুটে মার্গারিটের কথা বলতে পারিনি। [illegible] সমাধান করে দিল। ওকে গীর্জায় যেতে হবে [illegible]। ক্যাথেলিকরা এদিন গীর্জায় যাবেই। তার আগে [illegible]গের অধ্যাপকের বাড়িতে যাবে একবার। তিনি অবশ্য [illegible] নেমন্তন্ন করেছেন। আমি সেখানটা একবার ঘুরে চলে যাব [illegible]।

[illegible] কিন্তু আমি পল এঙ্গেলের বাড়িতে গিয়ে লাভ করলুম এক [illegible]তা।

পল নেমন্তন্ন করেছে মাত্র দশ বারোজন লোককে। শান্ত ছিমছাম পার্টি। অন্যান্য জায়গায় খ্রিসমাসের উৎসবে দারুণ হৈ-চৈ হয়, কিন্তু এখানে আমরা সবাই বসে অল্প অল্প স্কচে চুমুক দিয়ে ম্যারি ম্যাকার্থির সদ্য আলোড়ন তোলা উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করছি। মেরির দেখা নেই।

আমার বেশ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু মেরি না এলে খাবার কে দেবে? এদের বাড়িতে তো আর ঠাকুর-চাকর নেই। অন্যরা আলোচনায় মেতে থাকলেও খাবারের জন্য খানিকটা চাঞ্চল্যও প্রকাশ করছে। লেট সাপারের পক্ষেও দেরি হয়ে গেছে অনেক।

একসময় পল আমাকে বলল, নীল, দেখো তো মেরি কোথায়? একটু ডেকে আনো না!

মেরির পাগলাটে স্বভাবের জন্য অনেকেই তাকে ভয় করে। কিন্তু মেরি আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। পল সেটা জানে বলেই আমাকে বলল মেরিকে ডেকে আনতে।

বসবার ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেলাম। মেরির শোবয়ার ঘরের দরজা খোলা, মেরি বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। সামনেই টেলিভিশন সেট।

আমি নরম করে ডাকলাম, মেরি! সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কোনো সাড়া নেই।

আর এক পা এগিয়ে বললাম, মেরি, তোমার কি শরীর খারাপ?

গো অ্যাওয়ে! লীভ মি অ্যালোন!

এই রে, তার মানে আজ মেরির মেজাজ খারাপ। আর কথা বলার সাহস হলো না, ফিরে এলাম। পলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইশারায় জানালাম ব্যাপারটা। পল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চলো, আমরা নিজেরাই নিজেদের খাবার নিয়ে নিই।

রান্নাঘরে অনেক রকমের খাবার সাজানো। ওভেনে চাপানো আছে স্টেক, একটু বোতাম ঘুরিয়ে সেটা গরম করে নেওয়া খুব সোজা। সবাই আমরা যে-যার প্লেটে খাবার তুলে নিলাম। আজ এখানে ফ্রায়েড রাইস পর্যন্ত আছে, সম্ভবত আমার সম্মানে।

খাবার প্লেট নিয়ে সবে মাত্র বসবার ঘরে এসেছি এমন সময় মেরির আবির্ভাব। সকলকে ছেড়ে সে আমারই দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। তারপর কড়া গলায় বলল, তুমি এখানে বসে বসে খাচ্ছ? তোমার লজ্জা করে না?

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী অন্যায় করেছি রে বাবা?

মেরি বলল, আমি এই মাত্র টেলিভিশনে কলকাতার একটা ছবি দেখলাম।

সেখানে হাজার হাজার লোক খেতে পায় না। পথে পথে ভিখিরি। রাত্তিরে সত্তর হাজার লোক রাস্তায় শুয়ে থাকে, এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত! উঃ! কী ভয়ঙ্কর!

মেরি চোখে হাত দিয়ে কেঁদে ফেলল।

পল উঠে এসে মেরির কাঁধ ধরে খুব কোমল ভাবে বলল, মেরি, প্লীজ, আজ ক্রিসমাস...

মেরি এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তোমাদের লজ্জা করে না? কলকাতায় এই মুহূর্তে কত লোক না খেয়ে আছে, আর তোমরা এত খাবার... উঃ, মানুষের এত কষ্ট—আর ঐ ছেলেটা—

মেরি ছুটে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এই ছেলেটা—নিজের দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, আর এখানে ও বসে বসে হাসছে? ছি ছি।

মেরি একটা থাপ্পড় লাগাল আমার হাতের খাবারের প্লেটে। সেটা উড়ে গিয়ে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে, ঝনঝন শব্দে ভাঙল, সমস্ত খাবার ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তখন পর্যন্ত আমি একটা কিচ্ছু মুখে দিইনি।

তারপর মেরি এমন পাগলামি শুরু করল যে আর নতুন করে খাবার নেওয়া কিংবা সেখানে বসে থাকারও কোনো মানে হয় না। পার্টি ভেঙে গেল। সবাই মেরিকে জানে, তার মাঝে মাঝে এরকম হয়। আর একজন অধ্যাপক তাঁর গাড়িতে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি জামা-প্যান্ট না ছেড়েই বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম। মনটা বিষম দমে গেছে। টেলিভিশনওয়ালারা কী পাজি! আজই ঐ কলকাতায় দারিদ্র্যের ছবি না দেখালে চলত না? বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। এখন কত জায়গায় কত রকম আনন্দ উৎসব চলছে, আর আমি শুধু ঘরের মধ্যে একা। তাও পেটে অসহ্য খিদে! দূর ছাই!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় খটখট শব্দ হলো। আবার কে এই অসময়? দরজা খুলে দেখি মার্গারিট। মাথায় এলোমেলো সোনালি চুলগুলো একটা স্কার্ফে বাঁধা। ওভারকোটে তখনও বরফের টুকরো জমে আছে। ঘরে ঢুকেই বলল, উঃ, সাংঘাতিক শীত করছে, হাত দুটো জমে যাবে—আমার হাতে হাত ঘষে দাও শীগগির!

আমি ওর হাতে হাত আর গালে গাল ঘষে দিতে লাগলাম। তারপর ওকে নিয়ে এলাম বিছানায় কম্বলের নীচে।

মার্গারিট বলল, আমি চার্চ থেকে হেঁটে ফিরছিলাম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে চলে এলাম। তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? ক্রিসমাস পার্টি তো ভোর পর্যন্ত চলে?

আমি ওকে সব ঘটনাটা বললাম। মার্গারিট খিলখিল করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, বেশ হয়েছে! যেমন আমাকে না নিয়ে গেছ! খুব নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে তো! আমেরিকানরা এই রকমই ইমোশনাল হয়। হঠাৎ হঠাৎ পরের দুঃখ দেখে প্রাণ একেবারে উথলে যায়। কালকেই সব ভুলে যাবে। কিংবা বড়ো জোর কুড়ি পঁচিশ ডলার সাহায্য পাঠিয়ে দেবে, ব্যস তাতেই বিবেক পরিষ্কার হয়ে গেল!

—মাঝে মাঝে হলেও তবু তো ওরা ভাবে।

—চুপ করো, ওটা বড়োলোকদের বিলাসিতা।

একটু পরেই মার্গারিট ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, কিন্তু কলকাতায় সত্তর হাজার লোক না খেয়ে থাকলেও আর একজন ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়বে কেন? তাতে কি ওদের কোনো উপকার হবে? আমি এক্ষুনি তোমার জন্য রান্না করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এখন রাত দেড়টা বাজে। বাকি রাতটুকু না খেলেও চলবে।

মার্গারিট কোনো কথাই শুনল না। সে শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মঁসিয়ো অ্যাসপেলের বাড়িতে অনেক রকম খাবার খেয়ে এসেছি। আর তুমি না খেয়ে থাকবে? আমি এটা সহ্য করতে পারি?

আমার ভাঁড়ারে খাবার বিশেষ কিছু নেই। ফ্রিজে শুধু খানিকটা কর্নড বীফ বা মাংসের কিমা আর একটা বাঁধা কপি। মার্গারিট উনুনের দুটো মুখ জ্বেলে একটাতে ভাত চাপাল আর একটাতে বাঁধা কপি আর কিমা দিয়ে একটা তরকারি বানিয়ে ফেলল। রাত আড়াইটের সময় সেরকম অপূর্ব সুস্বাদু খাদ্য বোধহয় আমি জীবনে আর কখনো খাইনি।

এর দু'-তিন দিন বাদে মার্গারিট নিজেই একটা পাগলামির কাণ্ড করে ফেলল। দুপুরবেলা আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, মার্গারিট গেছে ওর মাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে। এক সময় দরজার বেল শুনে বুঝলাম, ও ফিরেছে। দরজা খুলে দেখি, ও একা নয়, ওর পেছনে তিনটি প্রায় দৈত্যের মতন চেহারার নিগ্রো।

মার্গারিট তাদের যত্ন করে ঘরে এনে বসাল, তারপর বলল, এঁরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, আমার কাছে রাস্তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। এরা অনেক দূর থেকে আসছেন। খুব ক্লান্ত, তাই আমি এঁদের কফি খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি। ঠিক করিনি?

আমি অবাক। তিন তিনটে জোয়ান লোক রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, তার মানে? এখানে হাইওয়েগুলির ব্যবস্থাপনা চমৎকার। প্রায় প্রত্যেক মোড়ে মোড়েই নানান জায়গায় নির্দেশ লেখা থাকে—দূরের যাত্রীদের কোনোই অসুবিধে হয় না।

আমি নিগ্রো তিনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন?

একজন অস্পষ্ট ভাবে একটা জায়গার নাম করল। আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে সোজা বাহাত্তর মাইল গেলে সেখানে পৌঁছানো যায়। একটু আগেই ব্রীজের কাছে সে কথা লেখা আছে, চোখে না পড়ে উপায় নেই।

লোকগুলি বেশি কথা বলে না। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হলো, আমি ওদের দেখে যতটা অবাক হয়েছি, ওরাও আমাকে দেখে তার কম অবাক হয়নি।

ব্যাপারটা অনেকটা বুঝতে পারলুম। ছুটির সময়, অনেকেই বাইরে বেড়াতে গেছে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এই সময় এই তিন নিগ্রো পথের মধ্যে এই একাকী শ্বেতাঙ্গিনী রমণীকে দেখে কুমতলব করেছিল। রাস্তা দেখিয়ে দেবার নামে মার্গারিটকে গাড়িতে তুলত, তারপর শহর ছাড়িয়ে কোনো নির্জন জায়গায় বলাৎকার ও খুন করে ওর দেহটা মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে যেত। খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই পড়া যায়। মার্গারিটের কফি খাওয়াবার আমন্ত্রণে যে ওরা এসেছে, তার কারণ ওরা মনে করেছিল মার্গারিট একা থাকে। তা হলে ফ্ল্যাটে নিরিবিলিতে কাজটা আরো সুবিধাজনক হয়।

ফ্ল্যাটের মধ্যে একলা মেয়েদের খুন হবার ঘটনাও এখানে প্রায়ই ঘটে।

লোকগুলোর চেহারা মোটেই সুবিধেজনক নয়। মুখে নিষ্ঠুর ভাব, এই দুপুরেই ওদের গা থেকে কড়া মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে বার বার। আমাকে ওরা একটুও পছন্দ করেনি। ওদের কোটের তলায় পিস্তল বা ছোরাছুরি আছে নিশ্চয়ই। এখন ওরা যদি আমাকে মেরে মার্গারিটকে নিয়ে পালাতে চায়, আমি কী করে বাধা দেব?

মার্গারিট কফির জল চাপাতে রান্না ঘরে গেছে, আমি সেখানে উঠে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, এদের নিয়ে এলে কেন এখানে?

মার্গারিট বলল, কেন, কী হয়েছে? এরা ক্লান্ত, সারা রাত ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে—

—কিন্তু এরা যদি খারাপ লোক হয়?

মার্গারিট তার সরল নিষ্পাপ মুখখানা আমার দিকে তুলে বলল, কেন, খারাপ লোক হবে কেন?

যেন পৃথিবীতে কোনো খারাপ লোক নেই, ওর এই রকম ভাব। আমি আরো কিছু বলতে গেলাম, ও আমাকে বাধা দিয়ে বলল, ওরা সাধারণ শ্রমিক, আমেরিকানরা ওদের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে...

মার্গারিট হয়তো ভেবেছে, আমি খয়েরি দেশের লোক বলে নিগ্রোদের দেখে

খুশি হব। কিন্তু শ্রমিক হলে কি খুনী হতে পারে না? আমেরিকায় অনেক নিগ্রোই নির্যাতিত হয়, আবার অসম্ভব হিংস্র খুনীও আছে ওদের মধ্যে। বিশেষত সাদা মেয়েদের প্রতি ওদের অসম্ভব লোভ এবং ক্রোধ আছে।

আবার ঘরে এলাম। ওদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। ওরা আমাকে একদমই পছন্দ করেনি, বোঝা যায়। আমি যেন কাবাবের মধ্যে হাড্ডি কিংবা গুড়ের মধ্যে বালি। ওরা আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। আমাকে ঠিক কোন মুহূর্তে মারবে সেই প্ল্যান করছে!

আমার বাড়ির অন্যান্য আপার্টমেণ্টে কেউ নেই। চ্যাঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। কিংবা ওরা যদি উঠে আমাদের দু'জনের মুখ চেপে ধরে তাহলে চ্যাঁচাবারও উপায় থাকবে না। একমাত্র ভরসা টেলিফোন। আমি টেলিফোনে আমার কোনো বন্ধুকে ডাকবার জন্য যেই এগিয়েছি, অমনি একটা নিগ্রো উঠে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় বলল, আমি তোমার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

সে গিয়ে টেলিফোনটা নিয়ে এলোমেলো ডায়াল ঘোরাতে লাগল। তার মাতাল হাতে বার বার গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম, লোকটি ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছে। এবার আমার রীতিমতন ভয় করতে লাগল। আর বোধ হয় কোনো উপায় নেই। ছুরি-পিস্তলেরও দরকার হবে না, ওরা খালি হাতেই আমাকে শেষ করে দিতে পারবে।

একটা নিগ্রো সোফার ওপর বসে তার লম্বা ঠ্যাং দুটো বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রেখেছে সামনে। তার একটা জুতোর মুখ ছেঁড়া, হাঁ করা। অচেনা লোকের বাড়িতে গিয়ে কেউ এভাবে বসে না। মার্গারিট ঘরে ঢুকে লোকটিকে সেই অবস্থায় দেখে বলল, আপনি জুতো খুলে ফেলুন না! আরাম করে বসুন! জুতো খুলে ফেলুন।

লোকটা বিড়বিড় করে বলল, দরকার নেই!

—কেন, খুলে ফেলুন, কোনো লজ্জা নেই। একি, আপনার একটা জুতো ছেঁড়া? কী সাংঘাতিক, এই ঠাণ্ডার মধ্যে! আজই এক জোড়া জুতো কিনুন! এই জুতো নিয়ে বরফের মধ্যে হাঁটলে আঙুলে ফ্রস্ট বাইট হয়ে যাবে! আপনি এক্ষুনি জুতো খুলে ফেলুন, আমি গরম জল আনছি, তাতে পা ডুবিয়ে রাখুন, আরাম হবে! সারারাত এই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে—ছি ছি।

লোকটি আপত্তি করতে লাগল, মার্গারিট শুনল না কিছুতেই। গামলায় করে গরম জল এনে লোকটির পায়ের কাছে বসে পড়ল। আর একটু হলে সে নিজেই জুতো খুলে দিত। লোকটি বাধ্য হয়ে গরম জলে পা ডোবাল। আর দু'জন লোককেও মার্গারিট বলল, আপনারাও তো ক্লান্ত, স্নান করবেন? অন্তত মুখ-টুখ ধুয়ে নিন, কলে গরম জল আছে, এই নিন তোয়ালে—

শেষ পর্যন্ত লোক তিনটি খারাপ কিছুই করল না। কফি খেয়ে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকগুলির উদ্দেশ্য খুব খারাপ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা হেরে গেল।

সেদিন মার্গারিটকে দেখে আমি বুঝেছিলাম খাঁটি সরলতা ও সততার কাছে হিংস্রতাও অনেক সময় হেরে যায়!

২৯

আমার বন্ধু মণীশের বড্ড শখ ছিল বাড়ি থেকে পালাবার। তখন আমরা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ভোরবেলা দু'জনে একসঙ্গে পার্কে বেড়াতে যাই সবুজ দেখবার জন্য। ভোরবেলা সবুজ দেখলে নাকি চোখ ভালো হয়। আমার অবশ্য চোখ যথেষ্ট ভালো, কিন্তু মণীশের ছোটবেলা থেকেই চোখে চশমা।

পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ প্রায়ই বলত, চল, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

—কেন, পালাবি কেন?

মণীশ হেসে বলত, বাড়ির লোককে বেশ কষ্ট দেওয়া হবে। বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি করবে, পুলিশে খবর দেবে, হাসপাতালে যাবে, বেশ মজা হবে! আমি কিন্তু আর ফিরব না। পালাব মানে একদম পালাব!

ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। মণীশরা মাঝারি ধরনের বড়োলোক। মণীশ বাড়ির আদুরে ছেলে, ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি পড়ে যাবে। মণীশের বাবার দু'তিন রকম ব্যাবসা, দারুণ পরিশ্রম করেন, সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত—সপ্তাহের মধ্যে ছদিন—বাবার সঙ্গে মণীশের দেখাই হয় না। এই কারণেই বাবার ওপর মণীশের একটা রাগ ছিল। মণীশ বাড়ি ছেড়ে পালালে ওর বাবা জরুরি সব কাজকর্ম ফেলে যে মণীশের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটবেন—এটাই মণীশের মজা।

কিন্তু আমার তো সে ব্যাপার নয়। আমি অতি সাধারণ বাড়ির ছেলে। আমি চলে গেলে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাবে না। বরং হয়তো ভাববে, যাক, গেছে বাঁচা গেছে! তাছাড়া আমি খুব অল্প বয়েস থেকেই বাড়ি ছেড়ে একা একা চলে গেছি নানান জায়গায় সুতরাং আমার কাছে এর নতুনত্ব কিছু নেই।

মণীশ তবু প্রায়ই আমাকে বলে, চল পালাই, চল পালাই!

আমি ওকে বলি, তাহলে তুই একাই পালিয়ে যা না! বাড়ি থেকে পালাবার

সময় একা যাওয়াই তো নিয়ম?

মণীশ বলে, দূর, তা ভাল্লাগে না! একা গেলে কথা বলার কোনো লোক পাব না! তুই চল।

—কেন, যেখানে যাবি, সেখানেই অনেক লোকের সঙ্গে ভাব হবে।

—আমার একদম নতুন লোকের সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে না! তা ছাড়া ধর, যেখানেই যাব, সেখানে নিশ্চয়ই প্রায়ই সাইকেল রিকশা ভাড়া করতে হবে! দুজনে সাইকেল রিকশা চাপলেও যা ভাড়া, একজন চাপলেও সেই একই ভাড়া। তাহলে শুধু একজন যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

মণীশের এই অদ্ভুত যুক্তি আমি বুঝতে পারি না।

একদিন সকালবেলা পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ বলল, চল, শিয়ালদা স্টেশনে যাই। আজই পালাব!

আমি বললাম, ধুৎ! সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু নেই, পালাব কি করে?

মণীশ বলল, আমার কাছে আছে, এই দ্যাখ।

মণীশ পকেট থেকে এক গাদা টাকা বার করে দেখাল। সবসুদ্দু তিনশো টাকা। তখন আমাদের কাছে তিনশো টাকা মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কলেজে যাবার সময় বাস ভাড়া ও জলখাবারের জন্য রোজ আট আনা করে পাই। আর মণীশের পকেটে জলজ্যান্ত তিনশো টাকা! বললাম, চল!

হাওড়ার বদলে শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়াই আমাদের প্রথম ভুল। হাওড়া থেকে অনেক দূরপাল্লার ট্রেন ছাড়ে। শিয়ালদার অধিকাংশ ট্রেনই কাছাকাছি জায়গার। তা ছাড়া, শিয়ালদা স্টেশন তখন এত নোংরা আর রিফিউজিতে ভরা যে একটুক্ষণও সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে ট্রেন, মণীশ সেটাতেই উঠে পড়তে চায়। আমরা পেলাম ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন।

সেটা ছুটির দিন নয়, সপ্তাহের মাঝামাঝি, এরকম দিনে কেউ ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যায় না। হকার, ফড়ে আর মলিন মানুষে কামরা ভর্তি, চকচকে প্যান্ট-সার্ট পরা শুধু আমরা দু'জন। মণীশ এর আগে কখনো বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ছাড়া কোথাও যায়নি। ও এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে, মুখ চোখে এমন অস্থিরতা যে, যে কেউ একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, আমরা বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। অবশ্য সে রকম লক্ষ করে দেখবার মতন কেউ ছিল না।

আমি এর আগে ডায়মণ্ডহারবার দু'বার গেছি। অর্থাৎ আমার চেনা জায়গা। চেনা জায়গায় কেউ পালায় না। সুতরাং ডায়মণ্ডহারবারে নেমে আমরা আবার কাকদ্বীপের বাস ধরলাম।

কাকদ্বীপে পৌঁছে দেখা গেল, সেটা মোটেই দ্বীপ নয়। এমনিই একটা

ছোটখাটো শহর-বাজার জায়গা। নামটা আমাদের ঠকিয়েছে। সেইজন্যই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হলো না। সেখান থেকে আবার বাসে চেপে চলে এলাম নামখানায়। এবার বেশ অনেকটা দূর আসা গেছে। এবার এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যায়।

নামখানা জায়গাটা ছোট হলেও বেশ একটা বন্দর-বন্দর ভাব আছে। জাহাজ নয়, নৌকোর বন্দর। নদীর এপারে থেমে আছে অনেকগুলো বেশ বড়ো বড়ো নৌকো। ঘাটের কাছে গেলেই লাইন বাঁধা অনেকগুলো হোটেল। বেছে-টেছে আমরা একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। দুপুর হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব।

হোটেল ঘরের মেঝেতে যেন একটি জ্যান্ত কার্পেট পাতা। এত অসংখ্য মাছি যে সেইরকমই মনে হয়। ভেতরে পা দিলেই কিছু মাছি উড়ে গিয়ে শুধু পা ফেলার জায়গা করে দেয়। প্রত্যেক টেবিলে রয়েছে কয়েকটা হাত পাখা। খাবার সময় এক হাতে পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াতে হয়। ফ্লিট বা অন্য কিছু দিয়ে মাছি তাড়াবার কথা এখানে কেউ চিন্তা করে না।

খাওয়াটা কিন্তু দারুণ জমল। গরম গরম মোটা চালের ভাত, বিউলির ডাল আর আলু ভাজা, পার্সে মাছ ভাজা। তারপর ভেটকি মাছের ঝোল, তারপর চিংড়ির মালাইকারি। মণীশ আমার তুলনায় অনেক ভোজনরসিক। সে এর পরও নিল একটা প্রকাণ্ড কাৎলা মাছের মুড়ো। সেই আস্ত মুড়োটার চেহারা রীতিমতন ভয়াবহ। মণীশ কিন্তু বেশ সুচারুভাবে সেটা খেয়ে ফেলল। আমাদের বিল হলো সতেরো টাকা। এই রেটে চললে আমাদের তিনশো টাকা খুবই স্বল্পজীবী হবে।

রাত্রে থাকার জায়গাটা আগেই ঠিক করে রাখা দরকার। মণীশ হোটেলের মালিককে জিজ্ঞেস করল, এখানে রাত্তিরে কোথায় থাকা যায় বলতে পারেন?

হোটেলের মালিক আমাদের দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকাল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে এখানে থাকবেন? কেন?

মণীশ বেপরোয়াভাবে বলল, এমনিই! ইচ্ছে হয়েছে, তাই থাকব!

মালিক বলল, ডাকবাংলো আছে, কিন্তু সেখানে তো এখন জায়গা পাবেন না। কাল থেকে এক মিনিস্টার তাঁর পার্টি নিয়ে সেখানে আছেন।

—আর কোনো জায়গা নেই?

—জায়গা আছে, আমার এখানেই আছে। কিন্তু সেখানে আপনারা থাকতে পারবেন না। আপনারা ভদ্দরলোক।

যেন ভদ্দরলোক কথাটা একটা গালাগাল, সেইভাবে উচ্চারণ করল হোটেলের মালিক। আমরা চটে গেলাম। মণীশ কড়া গলায় বলল, কে বলেছে আমরা ভদ্দরলোক? আমাদের গায়ে লেখা আছে? কোথায় আপনার জায়গা দেখান।

—ওপরে আমার রুম আছে। সেখানে দেড় টাকা করে খাট ভাড়া পড়বে।

আমরা সেটা দেখতে গেলাম। হোটেল বাড়িটা পাকা নয়, মাঠকোঠা, তবু তারও দোতলা আছে। ওপরের ঘরটা বেশ বড়ো, সেখানে আটখানা খাট পাতা, সঙ্গে তোষক আর বালিশ। ঘরের জানলা দিয়ে নদী দেখা যায়। আমাদের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। টাকা অ্যাডভান্স করে দিলাম তক্ষুনি। জানলার ঠিক নীচেই একটা টিউবওয়েল, সেখানে স্নান করছে একটি মেয়ে। স্বাস্থ্যটি ভালো, বেশ চমকানো চমকানো চেহারা। যাক, এখানে থাকলে তাহলে কিছু সৌন্দর্যচর্চাও করা যাবে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নদী পেরিয়ে আবার বাসে করে ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু তিনদিন ধরে কী কারণে যেন বাস বন্ধ। সুতরাং ওদিকে আর যাওয়ার উপায় নেই।

নৌকোর ঘাটে একটা পাগলকে নিয়ে অনেকে মস্করা করছে। পাগলটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গলায় আবার একটা সাপ জড়ানো। মস্ত বড়ো সাপ। এদিকে সাপ প্রচুর। আমরা কাকদ্বীপ থেকে বাসে করে আসার সময়ই দেখেছিলাম, একটি বিশাল সাপ হেলে দুলে রাস্তা পার হচ্ছে। বাস ড্রাইভার কিন্তু সাপটাকে চাপা দিল না। বাস থামিয়ে সাপটাকে রাস্তা পার হবার সময় দিল। এরা চট করে সাপ মারে না। পাগলটা সাপটাকে দিব্যি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা একটা নৌকো ভাড়া করলাম। নৌকোর মাঝিরা এখন অলস। বড়ো বড়ো নৌকো ছাড়বে শেষ রাত্রে, তখন জোয়ার আসবে। এইসব নৌকো যাবে সুন্দরবনে, আবার উল্টো দিকে খুলনার দিকেও যাওয়া যায়।

নৌকো করে বেড়াতে বেড়াতে মনে হলো, আমরা সত্যিই মুক্ত, স্বাধীন। কোনো অভিভাবকের চোখ রাঙানি নেই। হু হু করছে হাওয়া, কাছেই সমুদ্র। আমরা ইচ্ছে মতন যেখানে খুশি যেতে পারি। ঘণ্টাখানেক নৌকো করে এগোবার পরই কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যায়। কোনো কোনো দ্বীপে গাছপালা, মানুষজনও আছে, কোনো দ্বীপ একেবারে ফাঁকা।

আমি মণীশকে বললাম, এরকম একটা ফাঁকা দ্বীপেই তো আমরা থেকে যেতে পারি? কী বল!

মণীশ চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সেখানে বসে তুই শুধু কবিতা লিখবি?

—লিখলেই বা ক্ষতি কি?

—আর খাবটা কি? হাওয়া! শুধু হাওয়া খেয়ে কবিদের পেট ভরতে পারে,

আমার চলবে না! আমি ঐ নামখানাতেই থাকতে চাই, ওখানে একটা বইয়ের দোকান খুলব।

কলেজ স্ট্রিটে মণীশদের মস্ত বড়ো বইয়ের দোকান। সুতরাং ও বইয়ের ব্যাবসাটা বোঝে। কিন্তু নামখানায় শুধু মাঝিমাল্লা আর মাছের ব্যাপারীদের ভিড়, সেখানে বই কিনবে কে?

কোনো একটা দ্বীপে নামবার ইচ্ছে ছিল, তা আর হলো না। দারুণ বৃষ্টি এসে গেল। এবং অনেকক্ষণ ধরে সেই বৃষ্টি চলল। সন্ধের সময় আমরা ফিরে এলাম নামখানায়। তখনো বৃষ্টিই চলছে। আর বাইরে ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ওপরের ঘরে শুতে চলে গেলাম।

এর মধ্যে আরো চারখানা খাটে লোক এসে গেছে এবং এরই মধ্যে তারা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। এরা শেষ রাতের নৌকোয় যাবে, তাই এখনই ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

ঘরে একটি মিটমিটে হ্যারিকেন ছিল। একটু বাদেই হোটেলের মালিক এসে সেটা নিয়ে গেল। সারা রাত হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখার বিলাসিতা চলে না। মালিক জানিয়ে দিয়ে গেল বাইরের তাকে মোম আর দেশলাই আছে, রাত্রে বাথরুমে যেতে হলে মোম জ্বেলে নিতে হবে। বাথরুম মানে অবশ্য হোটেলের পেছন দিকের খোলা মাঠ।

ফুটফুটে অন্ধকারে আমি আর মণীশ পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে রইলাম। মাথার বালিশটা চিটচিটে, তার থেকে সরষের তেলের গন্ধ ছাড়ছে। মোটে সাড়ে আটটা-পৌনে নটা বাজে, এর মধ্যেই বাইরেটা একদম চুপচাপ।

মণীশ জিজ্ঞেস করল, কি রে নীলু, তোর বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

আমি বললাম, একটু একটু!

—আমার কিন্তু একটুও মনে পড়ছে না। বেশ মজা লাগছে। বাবা এখন কত ছোটাছুটি করছে বলত! বেশ হয়েছে!

একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মণীশ, তুই এই তিনশো টাকা কোথা থেকে পেয়েছিস রে?

মণীশ বলল, তুই কি ভাবছিস আমি চুরি করে এনেছি? মণীশ ব্যানার্জী কোনোদিন চুরি করে না আর মিথ্যে কথা বলে না!

আমি বললাম, আমি ঐ দুটোই করি। কিন্তু তুই টাকাটা পেলি কোথায়?

—আমার পৈতের টাকা। মায়ের কাছে ছিল। ইচ্ছে মতন খরচ করব বলে চেয়ে নিয়েছি কালকে।

—কিন্তু তিনশো টাকায় কতদিন চলবে রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে?

—বললাম তো বইয়ের দোকান খুলব।

—এখানে বইয়ের দোকান চলবে না।

—চলবে না? ঠিক আছে, তা হলে হোটেল খুলব। হোটেল খুব ভালো চলবে। তুই রান্না করতে জানিস না?

রান্না আমি বেশ ভালোই পারি। বয়েজ স্কাউটে থাকবার সময় কুকিং ব্যাজ পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনশো টাকা ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে, এ দিয়ে হোটেল খোলা যায়?

মণীশ বলল, উঃ, কী কামড়ালো রে?

আমি বললাম, আমাকেও কামড়াচ্ছে।

মণীশ বলল, সারা গা কুটকুট করছে। ব্যাপারটা কি?

—এমন কিছু না! ছারপোকা।

—অ্যাঁ ছারপোকা? তা হলে তো সারা রাত কামড়াবে!

ক্রমশ ছারপোকার উৎপাত এত বাড়ল যে আমরা বিছানায় দাপাদাপি করতে লাগলাম। সেই যে সুচ রাজার গল্প পড়েছিলাম, আমাদের অবস্থাও সেই রকম। সারা গায়ে সুচ ফুটছে। মণীশ চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। অন্য খাট থেকে একজন ঘুম জড়ানো গলায় বলল, আঃ মশাই, চুপ করুন না!

সারারাত আমরা ঘুমোতে পারলুম না একেবারে! তখনই বুঝতে পারলুম, হোটেলের মালিক কেন আমাদের ভদ্দরলোক বলে ঠাট্টা করেছিল। অন্য লোকগুলি তো ঐ ছারপোকার কামড় খেয়েও দিব্যি ঘুমিয়েছিল নাক ডাকিয়ে।

চা-টা খেয়ে আমরা বাইরে বেড়াতে এলাম। মণীশ আর আমার দু'জনেরই সারা গা ছারপোকার কামড়ে ফুলে গেছে। চোখ লাল করকরে। তবু নদীর টাটকা হাওয়ায় একটু ভালো লাগে। ঘাট আজ অনেক ফাঁকা, বেশির ভাগ নৌকোই শেষ রাতে ছেড়ে গেছে। কিছু নতুন নৌকো আসছে।

ঘাটের কাছে এক জায়গায় কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে কিন্তু কালকের সেই পাগলটি নয়, একটি ন'দশ বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি ইজের পরা, খালি গা, কাঁদছে। কান্না শুনলেই বোঝা যায়, ছেলেটি কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে।

ভিড়ের লোকরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ ছেলেটির কান্না থামাতে চাইছে না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই আমরা কারণটা বুঝতে পারলাম। ছেলেটিকে তার বাড়ির লোক ইচ্ছে করে এখানে ফেলে চলে গেছে। শুনলাম এরকম ঘটনা মাঝে মাঝেই হয়। সুন্দরবনের কোন দূর গ্রামে ওর বাড়ি, ওদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে, বাবা-

মা সবাইকে খেতে দিতে পারে না। তাই কুকুর-বিড়াল পার করবার মতন ছেলেটিকে এত দূরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, যাতে আর ফিরতে না পারে। এখন কে এই ছেলেটির ভার নেবে? আজকালকার দিনে কেউ নিতে চায় না। কেউ ছেলেটির হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরো ডুকরে উঠছে।

আমি আর মণীশ চোখাচোখি করলাম। মণীশের মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। আমার বুকটা কাঁপছে, কেন জানি না।

বলাই বাহুল্য, সেই তিনশো টাকা ফুরোবার আগেই আমরা দু'জনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বিশেষত ঐ ছারপোকার অত্যাচারই আমাদের বেশি মনমরা করে দিয়েছিল। আমাদের দু'জনের বাড়িতে অবশ্য অভ্যর্থনা হয়েছিল দু' রকম। মণীশ যে নিজের থেকেই আবার ফিরে এসেছে, এতেই তার বাড়ির লোক এত খুশি হয়ে গেল যে তাকে একটুও বকুনি দিল না, বরং তার আদর-যত্ন বেড়ে গেল। আর আমি, বাড়ির লোককে অকারণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলাম বলে, বাবার হাতে প্রচণ্ড মার খেলাম। সে যাকগে, এমন কিছু নয়, ওরকম মার তো আমি কতই খেয়েছি।

কিন্তু তারপরে যতবারই আমাদের ঐ ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কথা ভেবেছি, ততবারই মনে পড়েছে সেই ইজের পরা ছেলেটির কথা। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছেলেটি, মা-আ-আ বলে কাঁদছিল, কী অসম্ভব করুণ সেই আর্তনাদ? আমরা শখ করে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিলাম, আর ঐ ছেলেটিকে তার বাড়ির লোকই ফেলে পালিয়েছে!

কখনো কাছে কখনো দূরে

মনীষা ও দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে

আমার ছোটমাসির প্রাণের বন্ধু ছিলেন ঝর্নাদি। আমরা তাঁকে ঝর্নামাসি না বলে ঝর্নাদিই বলতাম, কারণ তাঁর দাদা রতনদা ছিলেন পাড়ার সকলের দাদা। দাদার বোনকে তো আর মাসি বলা যায় না। অবশ্য সব জায়গায় এরকম সম্পর্ক আমরা মেনে চলতে পারিনি, আমার বন্ধু বিষ্ণুর কাকাকে আমরা সবাই কাকা বলে ডাকতাম, কিন্তু তিনি যখন বিয়ে করলেন, তাঁর স্ত্রীকে আমরা কাকিমা না ডেকে বউদি বলতে লাগলাম প্রথম থেকেই। কারণ কাকার স্ত্রী জয়শ্রীর এমন ছোটখাটো ফরফুরে চেহারা যে তাকে ঠিক কাকিমা হিসেবে মানায় না।

ছোটমাসি আর ঝর্নাদি একসঙ্গে স্কুলে যেতেন। প্রায় একরকম চেহারার বেণী-ঝোলানো দুই কিশোরী। ওঁদের পড়াশুনো, বিকেলবেলায় ছাদে আড্ডা কিংবা সিনেমা দেখা, সব একসঙ্গে। একবার ঝর্নাদির টাইফয়েড হলো বলে আমার ছোটমাসি অশোককুমার কাননবালার 'চন্দ্রশেখর' সিনেমাটা দেখলই না। আমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই গেলাম। ঝর্নাদি দেখতে পারবে না বলে ছোটমাসি কিছুতেই দেখবে না। স্কুল থেকে কলেজে গিয়েও ওঁদের বন্ধুত্ব সেরকমই থেকে গেল। ওঁদের আরো বন্ধু হলো বটে কিন্তু দু'জনের যে নিবিড় সম্পর্ক তা একটুও আলগা হলো না। আমরা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গেলাম দার্জিলিং আর ছোটমাসি গেল ঝর্নাদিদের সঙ্গে দেওঘরে। কে না জানে, দেওঘরের চেয়ে দার্জিলিং অনেক ভালো জায়গা, তা ছাড়া দেওঘর আমাদের আগেই দেখা।

বি-এ পাস করার পর ছোটমাসি আর ঝর্নাদি দু'জনেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার উদ্যোগ করছেন, এই সময় ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দেওর ঝর্নাদিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানাল। সেই প্রস্তাব শুনে ঝর্নাদি কেঁদে আকুল। কিন্তু ছেলেটি বড্ডই ভালো, চেহারা সুন্দর, পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট, সদ্য দারুণ চাকরি পেয়েছে —একে প্রত্যাখ্যান করার কোনো যুক্তিই তো নেই। মেয়েদের তো এক সময় না এক সময় বিয়ে হয়ই। যদি বহুবিবাহের যুগ থাকত, তা হলে ঝর্নাদি বোধ হয় তাঁর বরকে অনুরোধ করতেন ছোটমাসিকেও বিয়ে করে ফেলার জন্য। প্রাণের বন্ধুকে সতীন করে নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন।

একমাসের মধ্যে ঝর্নাদির বিয়ে হয়ে গেল এবং জানা গেল, ঝর্নাদিকে তাঁর বরের সঙ্গে মীরাটে গিয়ে থাকতে হবে। যাওয়ার দিন ঝর্নাদির কি কান্না! আমার

ছোটমাসিকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে তুলে বলতে লাগলেন, আমি কী করে পারব? আমি পারব না অতদূরে থাকতে! কিছুতেই পারব না! আমাদের ভয় হলো, ঝর্নাদি বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবে!

প্রথম বছরেই দু'বার কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন ঝর্নাদি। দ্বিতীয় বছরে একবার। তৃতীয় বছরে একবারও না। পঞ্চম বছরে আর একবার এলেন, সেবারই তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল।

এদিকে এম-এ পড়তে পড়তেই প্রেমে পড়লেন ছোটমাসি। না, কোনো সহপাঠীর সঙ্গে নয়, এক সহপাঠিনীর দাদার সঙ্গে। জাতের কিছু গরমিল ছিল, তাই নিয়ে বাড়িতে সামান্য কিছু মনকষাকষি হলো, শেষপর্যন্ত মেনেও নিল সবাই। এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই ছোটমাসির বিয়ে হয়ে গেল তরুণদার সঙ্গে। এবারেও আমরা একটা সম্পর্কের গোলমাল করে ফেললাম। তরুণদা দারুণ স্পোর্টসম্যান, সব খেলাই ভালো খেলেন, তার মধ্যে ক্রিকেটে বেশ নাম আছে। একবার রঞ্জি ট্রফিতে বেঙ্গলের উইকেট-কীপার হয়েছিলেন পর্যন্ত। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে কি মেসোমশাই বলে ডাকা যায়? বিশেষত যার নাম তরুণ? ছোটমাসির বর হয়েও উনি আমাদের কাছে তরুণদাই রয়ে গেলেন। বিয়ের পর ছোটমাসি চলে গেলেন নিউ আলীপুরে তরুণদার ফ্ল্যাটে, তিন বছর পর তাঁর একটি মেয়ে হলো। মাঝে মাঝে আমি যাই ছোটমাসির কাছে, বিশেষত টাকা ধার করার জন্য। ছোটমাসি খুব ভালো পার্টি, কক্ষনো ফেরত চান না।

একদিন শুনলাম, ঝর্নাদির বর ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। এবং অফিস থেকে ফ্ল্যাট পেয়েছেন নিউ আলিপুরেই। ছোটমাসির বাড়ির খুব কাছেই। এটা একটা সাংঘাতিক যোগাযোগ। দশ বছর বাদে দুই সখীর আবার পুনর্মিলন।

বিয়ের পর মেয়েদের আগেকার বন্ধুত্ব সবসময় টেকে না। অনেকখানি নির্ভর করে তাদের বরেদের সামাজিক মর্যাদার ওপর। একজনের বর গরীব আর একজনের বর অবস্থাপন্ন হলে কি আর আগেকার সেই বন্ধুত্ব সমান থাকে; বড়োলোক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে জল খেতে চাইলে সে যদি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে দেয়, অমনি মনে হয়, ইস খুব চাল মারছে। আর যে গরীব, সে দেখাবে সততার অহংকার। কথায় কথায় শুনিয়ে দেবে, ওর আফিসে তো দারুণ ঘুষের ব্যাপার, কিন্তু ও কিছুতেই নেবে না, মানুষটা এমন জেদি...। আসলে হয়তো ঘুষ পাবার কোনো সুযোগই নেই! যাই হোক, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে আবার বন্ধুত্ব!

কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ছোটমাসি আর ঝর্নাদি— দু'জনেরই স্বামী বেশ সুপুরুষ, সৎ, সমান অবস্থাপন্ন, বাড়িও একই পাড়ায়। এবং প্রত্যেকেরই একটি করে সন্তান।

ঝর্নাদিকে পেয়ে ছোটমাসি একেবারে উচ্ছ্বসিত। যেন আবার ফিরে গেছেন সেই কৈশোর বয়েসে। দু'জনের যেন একটাই বাড়ি হয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে রান্না আসছে এ-বাড়িতে, কিংবা ছোটমাসি স্পেশাল কিছু রান্না করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ও-বাড়িতে, ঝর্নাদির সঙ্গেই বসে খাবেন। ওঁদের দু'জনের দুই স্বামীর মধ্যেও বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল—প্রায়ই সন্ধেবেলা একসঙ্গে আড্ডা দেন।

এই যে দুটি পরিবার, পরস্পরের মধ্যে এত বন্ধুত্ব, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এঁরা কত সুখী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম, এঁদের সুখের জীবনে একটা সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে। তার জন্য দায়ী এক খলনায়ক আর এক খলনায়িকা। প্রকৃতপক্ষে তারা দু'জন হচ্ছে আসলে দুটি সরল নিষ্পাপ শিশু। ঝর্নাদির ছেলে আর ছোটমাসির মেয়ে।

একদিন বিকেলে ঝর্নামাসির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম দুটি সমবয়সী বালক-বালিকা বসবার ঘরে হুটোপুটি করছে। ছোটমাসির মেয়ে পাপিয়াকে তো আমি একটি খাঁটি দস্যি বলে জানিই। ঝর্নাদির ছেলেটিকে দেখে বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়, যদিও সেই মুহূর্তে সে একটি টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ছিঁড়ছিল খুব মনোযোগ দিয়ে।

ভেবেছিলাম ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু ঝর্নাদি নেই সেখানে। ছোটমাসি বললেন, ঝর্নারা জমি দেখতে গেছে যাদবপুরের দিকে, তাই ওর ছেলেকে রেখে গেছে এ-বাড়িতে।

আমি বললাম, বাঃ, তোমাদের তো বেশ সুবিধেই হয়েছে। তুমিও কোথাও গেলে পাপিয়াকে ওদের বাড়িতে রেখে যেতে পার।

ছোটমাসি গম্ভীর হয়ে গেলেন, কোনো কথা বললেন না।

আমরা গিয়ে খাবার টেবলে বসলাম। ছোটমাসির একটাই মাত্র দোষ, বাড়িতে গেলেই জোর করে কাস্টার্ডের পুডিং খাওয়াতে চান। কিন্তু ওগুলো যে কি বিচ্ছিরি খেতে হয়!

চায়ের কাপে সদ্য চুমুক দিয়েছি এমন সময় বাইরের ঘরে বেশ জোরে ঝনঝন করে শব্দ হলো।

ছোটমাসি বললেন, এই রে, আবার বুঝি কিছু ভাঙল।

দু'জনেই উঠে গেলাম।

একটা সুন্দর পোর্সিলিনের বুদ্ধমূর্তি মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

আমরা যাওয়া মাত্রই পাপিয়া বলল, আমি ভাঙিনি! আমি ভাঙিনি! ঐ বাবলু ভেঙেছে।

বাবলুর মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে। একবার মুখ তুলে বলল, আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়।

ছোটমাসির মুখখানা থমথমে। টুকিটাকি পুতুল-টুতুল দিয়ে ঘর সাজাতে খুব ভালোবাসেন। ঐ জিনিসগুলো তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু রেগে গেলেও পরের বাচ্চাকে তো আর বকতে পারবেন না। তাই বললেন, বাবলু, থাক—ওতে আর হাত দিও না, হাত কেটে যাবে!

মূর্তিটা ছিল একটা বেশ উঁচু বইয়ের র‍্যাকের ওপরে। অত উঁচুতে বাবলুর হাত যাওয়ার কথা নয়। তবু হাত গেল কি করে? পাপিয়া জানিয়ে দিল বাবলু বুক শেলফ বেয়ে বেয়ে উঠেছিল। সর্বনাশের ব্যাপার, পুরো বুক শেলফটাই উল্টে পড়ে যেতে পারত!

ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলে আমরা আবার চলে এলাম খাওয়ার টেবিলে। ছোটমাসি বললেন, ঝর্না এমনিতে এত বুদ্ধিমতী, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। ছেলেকে কক্ষনো বকে না। এত জিনিসপত্র ভাঙে।

আমি বললাম, ঝর্নাদি বুঝি ডঃ স্পকের বই পড়েন নি? তোমার তো বইটা আছে, দিয়ে দাও না।

আমরা দেখেছি, পাপিয়া জন্মাবার পরই ছোটমাসি সব সময় ঐ বইখানা সঙ্গে রাখতেন। বাচ্চার তিন মাস, চার মাস, পাঁচ মাস বয়েসে মাকে কী কী করতে হবে, সবই নাকি বইতে লেখা আছে। পাপিয়া দোলনা থেকে মাটিতে পড়ে গেল, ছোটমাসি দৌড়ে গিয়ে বই খুলে দেখলেন, এগারো মাসের বাচ্চা মাটিতে পড়ে গেলে কী হয়! ছোটমাসি বই পড়ে বাচ্চা মানুষ করেন বলে আমরা এক সময় হাসাহাসি করতাম। আমরা বলতাম, আমাদের মা কিংবা দিদিমারা তো ঐ বই পড়েননি, তবু আমরা ঠিকঠাক মানুষ হলাম কি করে?

এ কথা ঠিক, পাপিয়া জিনিসপত্র ভাঙে না। ছোটমাসি তাকে এক বছর বয়েস থেকেই শিখিয়েছেন, কোনটা পাপিয়ার নিজস্ব জিনিস। আর কোনটা বড়োদের জিনিস। পাপিয়ার খেলনা বা বেলুন বা প্লাস্টিকের ছবির বই তার নিজের, সেগুলো সে ভাঙতে বা ছিঁড়তে পারে, কিন্তু মায়ের সেন্টের শিশি কিংবা বাবার হাতঘড়িতে সে হাত দেবে না। এই শিক্ষায় কাজ হয়েছিল। কিন্তু পাপিয়ার অন্য দোষ আছে। ডক্টর স্পকের শিক্ষাতেও একেবারে আদর্শ শিশু গড়ে তোলা যায় না। ছোটমাসি ঝর্নাদিকে ছেলের ব্যাপারে অন্ধ বললেন, সেই হিসেবে ছোটমাসিও অন্ধ। আজকাল অধিকাংশ মায়েদেরই একটা করে বাচ্চা। সুতরাং সমস্ত মাতৃস্নেহ ঐ

একটি শিশুর ওপর বর্ষিত হয়—অতখানি স্নেহ সহ্য করা সব শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মা-ই ভাবে, তার সন্তানটির কিছু দোষ নেই।

ছোটমাসি বললেন, বাবলুর পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখন আর ঝর্নার ডক্টর স্পকের বই পড়ে কী লাভ হবে? একদম গোড়া থেকে সাবধান না হলে...অথচ বাবলু এমনিতে এত ভালো ছেলে...

একটু বাদেই ঝর্নাদি এসে উপস্থিত হলেন। দরজা খোলা মাত্র পাপিয়া বলে উঠল, ঝর্নামাসি, ঝর্নামাসি, আজ না বাবলু না বুদ্ধমূর্তিটা ভেঙে ফেলেছে। একদম ভেঙে ফেলেছে!

ছোটমাসি নিজের মেয়েকে একটু বকুনি দিয়ে বললেন, ছিঃ পাপিয়া, ওরকম নালিশ করতে নেই।

ঝর্নাদি হেসে বললেন, আবার বুঝি বাবলু কিছু ভেঙেছে! ওকে নিয়ে এমন লজ্জায় পড়তে হয়। সেইজন্য আমি যে বাড়িতেই যাই, তাদেরই বলি, দামী দামী জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতে। কখন যে কোনটা ভেঙে ফেলবে!

ছোটমাসি আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। অর্থাৎ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, ঝর্নাদি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলেকে। জিনিসপত্র সরিয়ে রাখাটা মোটেই ঠিক কাজ নয়। বরং বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, সব জিনিস ভাঙা চলে না। বাড়িতে কোনো বাচ্চা ঢুকলেই কি লোকে ঘড়ি-পেন-সেন্টের শিশি-কাপ-ডিস-গেলাস সব লুকিয়ে ফেলতে পারে?

একটু বাদে বাবলু এসে বলল, মা দ্যাখো, পাপিয়া আমার পায়ে আঁচড়ে দিচ্ছে।

ঝর্নাদি বললেন, খেলতে গেলে ওরকম হয়। নালিশ করতে নেই।

বাবলুর ডানপায়ে স্পষ্ট নখের দাগ। ছোটমাসি তখন এমন গল্পে মত্ত যে সেটা দেখলেনই না। নিউ মার্কেটে কবে তিনি অপর্ণা সেনকে সামনাসামনি দেখেছিলেন সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানাচ্ছেন।

একটু বাদে আবার বাবলু ও পাপিয়ার মারামারির প্রবল শব্দ শোনা গেল। মেয়ে হলেও পাপিয়া বেশি গুণ্ডা ধরনের, সেই বেশি মারছে বাবলুকে।

ছোটমাসি হালকা গলায় বললেন, এই ওরকম মারামারি করে না!

বাবলু এসে আবার নালিশ করল, দ্যাখো না মা, পাপিয়া আমার মাথায় স্কেল দিয়ে মেরেছে।

বাবলুর কপালের খানিকটা জায়গা ফুলে গেছে। ছেলের সেই অবস্থা দেখে ঝর্নাদির মুখমণ্ডলে একটা ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু তিনি তো আর পাপিয়াকে বকতে পারেন না। নিজের ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই এই ঘরে থাক।

ছোটমাসি পাপিয়াকে মৃদু, খুবই মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পাপিয়া, এরকম করে না! এমনি এমনি খেলতে পারো না? মারামারি করবে কেন?

ডক্টর স্পকের বইতে কী লিখেছে জানি না, আমার মনে হলো, এই সময় পাপিয়ার কান ধরে একটা চড় মারা উচিত ছিল। যাতে সে লোহার স্কেল দিয়ে আর কারুকে মারতে সাহস না পায় ভবিষ্যতে। কিন্তু ছোটমাসি প্রায় কিছুই বললেন না। এর আগে একদিন বড়ো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আর একটা বাচ্চা ছেলে পাপিয়াকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল বলে রাগে-দুঃখে ছোটমাসি বলেছিলেন, ও-বাড়িতে আর কক্ষনো যাবেন না! কিন্তু নিজের মেয়ের ব্যাপারে তিনি অন্ধ।

আবার একটু বাদে শোনা গেল, বাবলু একটা চামচ জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। একটা চামচ হারানোর চেয়েও সেটা রাস্তায় কোনো লোকের মাথায় যদি পড়ে তাহলে অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ছোটমাসি চাকরকে নিচে পাঠালেন।

ঝর্নাদি এবারও কিন্তু ছেলেকে বকলেন না। হালকাভাবে বললেন, ছেলেটার জ্বালায় হাতের কাছে কিছু রাখবার উপায় নেই। আমার তো এই মাসে তিনটে চামচ হারিয়েছে।

এই সময় আমি প্রস্থান করলুম।

মাস তিনেক বাদে আমি আবার গিয়েছিলাম ছোটমাসির বাড়িতে। কথায় কথায় ঝর্নাদির প্রসঙ্গ উঠল জিজ্ঞেস করলাম, ঝর্নাদিদের খবর-টবর কি?

ছোটমাসি উদাসীনভাবে জানালেন যে, ওদের খবর-টবর সব ভালোই। তবে দিন-দশেক দেখা হয় না।

আমি স্তম্ভিত। দু'জনে এত প্রাণের বন্ধু, এখন এক পাড়াতে থেকেও দিন দশেক দেখা হয় না। প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি, শুধু ছেলেমেয়ে সামলে আর সময় পান না। এককালের দুই সখী এখন হয়ে উঠেছেন দুই অন্ধ জননী।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্য দৃশ্য। ছোটমাসির চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে পাপিয়া আর ঝর্নাদির চাকরের সঙ্গে বেরিয়েছে বাবলু। দু'জনে মহানন্দে খেলা করছে ত্রিকোণ পার্কে। শিশুদের হৃদয় জলের মতন। কোনো দাগ স্থায়ী হয় না, ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যায় দু'মিনিটে। পাপিয়া আর বাবলু দু'জনেই যখন আর একটু বড়ো হবে, তখন পাপিয়া আর মারামারি করবে না, বাবলুরও জিনিসপত্র ভাঙার নেশা চলে যাবে—তখন আশা করা যায়, ছোটমাসি আর ঝর্নাদি—এই দুই সখীর পুনর্মিলন হবে।

পুনশ্চ : ছোটমাসির বাড়িতে বেড়াতে যেতেই উনি আমাকে প্রায় মারতে এলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, তুই আমাদের নামে কী সব আজেবাজে কথা লিখেছিস, তোর এত সাহস! আমি নিরীহভাবে উত্তর দিলাম, যা দেখেছি তাই তো লিখেছি। কিছু তো বানাইনি! শুধু নামগুলো বদলে দিয়েছি। কেউ চিনতে পারবে না!

—আমার বন্ধুর সম্পর্কে তুই যা-তা লিখেছিস। তোর সঙ্গে দেখা হলে দেখবি ও কি করে!

—কি লিখেছি ঝর্নাদি সম্পর্কে? খারাপ তো কিছু নেই।

—খারাপ নেই! তুই লিখেছিস, ও তার মাসতুতো ভাইকে বিয়ে করেছে। ছিঃ, ছিঃ।

—মাসতুতো ভাই? তা কখন লিখলাম!

—তুই লিখেছিস ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দেওরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তার মানে কি হয়? বউদির মাসতুতো দেওর মানে মাসতুতো ভাই হয় না?

—এই রে! আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখতে গিয়েছিলাম—এসব সম্পর্ক-টম্পর্ক আমার মাথায় ঢোকে না একদম! আসলে ওটা বউদির মাসতুতো দেওর নয়, বউদির মাসতুতো ভাই হবে, তাই না? ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে তো!

২

আমার সহপাঠিদের মধ্যে সুব্রত ছিল সবচেয়ে ভালো ছেলে। যেমন পড়াশুনোতে ভালো, তেমনি লাজুক। এই লাজুকতার জন্যই সুব্রত আই এস-সি পরীক্ষার সময় একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলল।

সেদিন ছিল কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের দিন। এখনকার নিয়ম কী জানি না। আমাদের সময় অন্য কলেজের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হতো। সুব্রতর আর আমার দুটো আলাদা কলেজে সেন্টার পড়েছে। পরীক্ষা-টরিক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি আমার কলেজের গেটের সামনে সুব্রত শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনই শেষ পরীক্ষা। এরপর দারুণ দারুণ হুল্লোড়ের পরিকল্পনা আছে। সুব্রতর কাঁধে চাপড়া মেরে বললাম, চল, আগে অনাদির মোগলাই পরোটা খাব, তারপর অন্য কথা।

আরো সব বন্ধুবান্ধবরা মিলে চ্যাঁচামেচি করছে, সুব্রত তার মধ্যে চুপ। হঠাৎ

ওর চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, কী ব্যাপার?

সুব্রত বলল, আমার পরীক্ষা হয়নি!

ঘটনা শুনে আমরা স্তম্ভিত। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় হঠাৎ সুব্রতর হাত থেকে পড়ে ওর টেস্ট টিউব ভেঙে যায়। টেস্ট টিউবে করে প্রত্যেককে সল্ট দেওয়া হয়, পরীক্ষা করে সেটার নাম বলতে হয়। সুব্রত ডিমনস্ট্রেটারের কাছে গিয়ে আবার সল্ট চেয়েছিল তিনি বলেছেন, আমি কি জানি! ব্যস, সুব্রত আর লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি।

আমরা সবাই ওকে ছি ছি করতে লাগলাম। সল্ট টেস্ট করা তো কোনো ব্যাপারই না। নিজেরা পরীক্ষা করে যা পেলাম তা তো পেলামই, তা ছাড়া ল্যাবরেটরির বেয়ারাদের প্রতিটি সল্ট মুখস্থ। ওরা একটুখানি নিয়ে জিভে ছুঁইয়েই নাম বলে দেয়। আমিও তো বেয়ারাকে দু-টাকা বখশিশ দিয়ে নাম জেনে নিয়েছি। সুব্রত তা পারল না? যে-কোনো বেয়ারাকে বললেই মাটি থেকে একটু তুলে নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে নাম বলে দিত। কিংবা আর একটা সল্ট আদায় করতে পারল না? আমরা হলে চ্যাঁচামেচি করে সকলের পরীক্ষাই বন্ধ করে দিতাম। সুব্রত লাজুক, সে কিছুই করেনি, টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে বেরিয়ে এসেছে।

আমরা সবাই সুব্রতকে সান্ত্বনা দিলাম, যাক গে যা হয়েছে, হয়েছে! একটা সল্টের রেজাল্টের জন্য আর কি নম্বর কাটবে। এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু একথা মুখে বললেও আমরা মনে মনে জানি, টেস্ট টিউব ভেঙে পুরো পরীক্ষাটা না দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য হয়তো সুব্রতকে কম্পার্টমেন্টাল পাইয়ে দেবে! সুব্রতর ফার্স্ট ডিভিশান বাঁধা ছিল, এর পর ওর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তিও প্রায় ঠিকঠাক—কিন্তু কম্পার্টমেন্টাল হলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সুব্রত কেন আমাদের তক্ষুনি খবর দেয়নি? আমরা হই-হই করে ছুটে গিয়ে ঠিক একটা কিছু ব্যবস্থা আদায় করে নিতাম। এখন যে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছুই করার নেই।

প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুব্রত কাঁদতে লাগল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন পরীক্ষা-শেষের আনন্দ, আমরা ছটফট করছি, কতক্ষণ আর সুব্রতর দুঃখ নিয়ে আমরা দুঃখিত হয়ে থাকব! ওকে বললাম, আচ্ছা, আর মন খারাপ করিস না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েই যাবে! কাল ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে ধরব।

সবাই আমরা এসপ্ল্যানেড পাড়ায় যাব, সুব্রতকেও বাসে তুলবার জন্য টেনে

নিয়ে গেলাম। সুব্রত শেষ মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তোরা এগো, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

সেই সময় সুব্রতকে একা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমরা সবাই তো স্বার্থপর। আমরা নিজেদের আনন্দে মশগুল হয়ে চলে গেলাম।

সেদিন রাত্তির বেলা সুব্রতর দিদি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যারে নীলু, সুব্রত কোথায়? ও তোদের সঙ্গে ছিল না?

আমাব বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল, সুব্রতর সেই জলে ভেজা বিবর্ণ মুখ, আমি বললাম, সুব্রত বাড়ি যায়নি? ও যে বলল বাড়িতে যাচ্ছে।

অনুপমাদি বলল, না, ও তো পরীক্ষার পর বাড়িই ফেরেনি। মা চিন্তা করছেন খুব।

সুব্রত আমাদের মতন উড়নচণ্ডী নয়। আড্ডায় বসেও কখনো বেশি রাত করে না। ঠিক সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে। ওর আর ভাইবোন, এক দিদি আর তিন ছোট বোন। সুব্রতর বাবা দু-মাস আগে বিলেতে গেছেন।

অনুপমাদির সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় খোঁজ করব? আমরা অন্য বন্ধুবান্ধবরা তো সবাই একসঙ্গে ছিলাম, সুব্রত আর কার কাছে যাবে? তবু ট্যাকসি নিয়ে ঘুরলাম কয়েক জায়গায়। প্রত্যেকেই সুব্রতর কথা শুনে মুখ শুকনো করে ফেলল, প্রত্যেকের মধ্যেই অপরাধীর ভাব। আমরা ঠিকঠাক পরীক্ষা দিয়েছি, সুব্রত পারেনি। অথচ, তারই সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা দেবাব কথা।

খানিকক্ষণ বাদে, অনুপমাদি জিজ্ঞেস করল, সত্যি কথা বলত নীলু, আজ পরীক্ষা হলে সুবু কিছু গণ্ডগোল করেছিল?

আমি বললাম, না, না! সুব্রত কি কখনো গণ্ডগোল করতে পারে নাকি?

অনুপমাদি শেষ পর্যন্ত থানায় ডায়েরি করতে গেল। থানার অফিসারও বললেন, আজ শেষ পরীক্ষা ছিল না।? দেখুন কোথায় ফুর্তি-টুর্তি করতে গেছে!

কিন্তু সুব্রত যে সেরকম ছেলেই নয়, সে কথা কি করে বোঝাব? সুব্রত পরীক্ষার হলে বেয়ারাকে ঘুষ দিতে পর্যন্ত শেখেনি। সামান্য একটা টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?

অনুপমাদিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু সারারাত আমার ঘুম হলো না। সুব্রত প্রচণ্ড অভিমান আর দুঃখ নিয়ে কোথায় চলে গেল। আমরা পাস করে যাব, আর সুব্রত পাশ করবে না একি ভাবা যায়! শেষ পর্যন্ত সুব্রত রেললাইনে গিয়ে গলা দেবে না তো?

সকালবেলাতেই অনুপমাদি আর অন্য বোনরা এসে হাজির। অনুপমাদি আমাকে এক ধমক দিয়ে বলল, তুই কাল বলিস নি যে সুবু পুরো পরীক্ষা দেয় নি?

আমি ঘাড় হেঁট করে রইলাম।

অনুপমাদির সব বোনেরাই বেশ স্মার্ট। কাল সারারাত ওরা কেউ ঘুমোয়নি। রাত তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ঐ সাহসিনী মেয়েরা পাড়ার এক গাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে ডেকে তুলে কলকাতার সমস্ত হাসপাতাল দেখে এসেছে। সুব্রত কোথাও নেই। আমার শুধু মনে হতে লাগল ইস, কেন সুব্রতর বদলে আমার টেস্ট টিউব ভাঙল না! আমি এক বছর ফেল করলেই বা কার কি আসে যায়? সেই ল্যাবরেটরির ডিমনস্ট্রেটার ভদ্রলোকটি কি হৃদয়হীন! একটি ছেলের টেস্ট টিউব ভেঙে গেলে তাকে আর একটা টেস্ট টিউব আর সল্ট দেবার ব্যবস্থা করা যেত না? তাঁর ঐটুকু গাফিলতির জন্য একটা সংসারে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। সুব্রতর মা সারারাত ধবে কেঁদেছেন।

তিনদিনের মধ্যে সুব্রতর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিন ননী এসে খবর দিল সুব্রত বিষ খেয়েছে। সে আছে টালিগঞ্জের এক হাসপাতালে।

ননী আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ক্লাস টেন পর্যন্ত এসে পড়া ছেড়ে দেয়। আমাদের খুব বন্ধু ছিল ননী। ওর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর কী একটা বিষয়-সম্পত্তির গোলমালে ওদের কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়, এরা চলে যায় ওদের মামাবাড়িতে বোড়াল গ্রামে। তারপর আর ননীর সঙ্গে বেশি দেখা হয়নি। সেই ননীর কাছে সুব্রত কেন গিয়েছিল কে জানে! হঠাৎ ননীর কথাই বা তার কেন মনে পড়ল? ননী তো জানে না যে সুব্রত বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে —তার ধারণা পরীক্ষার পর পুরোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে সুব্রত। তিনদিন তো সে ভালোই ছিল, কথাবার্তা তো ও চিরকালই কম বলে। তারপর কী ভাবে বিষ যোগাড় করল তা ননী জানে না।

অনুপমাদিকে নিয়ে আমরা ছুটলাম টালিগঞ্জে। সেটা একটা বিশ্রী হাসপাতাল —তাও সীট পাওয়া যায়নি বলে সুব্রতকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। তাকে দেখলেই ভয় করে। এর মধ্যেই কী রকম রোগা শুকনো হয়ে গেছে চেহারা, মুখখানা নীলচে ধরনের, প্রাণ আছে কিনা বোঝা যায় না। তক্ষুনি ব্যবস্থা করে সুব্রতকে নিয়ে আসা হলো পি জি হাসপাতালে। অনুপমাদি তখন এম-এ ক্লাসের ছাত্রী, নিজেই সব ব্যবস্থা করলেন। সেখানে শোনা গেল, আরো চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে বলা যাবে না, সুব্রত বাঁচবে কিনা।

পি জি হাসপাতালের চত্বরে সারা রাত রইলাম আমরা। প্রত্যেকটি বন্ধু এসেছে, কেউ বাদ যায়নি। আমাদের দলের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ছেলে, সে-ই মুমূর্ষু হয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালে। কারণ, সে একটা টেস্ট টিউব ভেঙেছে। সে অন্য ডাকাবুকো ছেলেদের মতন টেবিল-চেয়ার ভাঙেনি, পরীক্ষার হলে গার্ডকে ছুরি

দেখায়নি। শুধু অসাবধানে একটা টেস্ট টিউব ফেলে দিয়েছিল, তবু কেউ তাকে একটু সহানুভূতি দেখাল না, কেউ একটু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না।

আমাদের কারুর মুখে একটি কথা নেই। ঘাড় হেঁট করে আমরা দশ-বারোজন সদ্য আই এস-সি পরীক্ষা দেওয়া ছেলে বসে আছি—একটু দূরে ঘাসের ওপরে অনুপমাদি আর তার এক বোন। অন্যসব বোনের সঙ্গে সুব্রতর মাকে একটু আগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জোর করে। আমাদের মনে হচ্ছে, এই রাতটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে লম্বা রাত, কিছুতেই যেন শেষ হবে না।

অনুপমাদি দারুণ সপ্রতিভ, এই ক'দিনে একটুও ভেঙে পড়েনি। বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই, তবু নিজেই সব দিক সামলে রেখেছে। হঠাৎ অনুপমাদি মুখ দিয়ে কী রকম যেন শব্দ করল। অনেকটা হেঁচকির মতন। আমরা চমকে তাকালাম। অনুপমাদি কি কাঁদছে? না তো। কিছুক্ষণ বাদে আবার একটা ঐ রকম শব্দ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনুপমাদি, জল খাবে? জল এনে দেব?

অনুপমাদি বলল, না।

তারপর অনুপমাদি গলা তুলে, দুটি স্থির চোখ মেলে আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, হ্যাঁ রে নীলু, যদি সুবু শেষ পর্যন্ত না বাঁচে, তা হলে কী হবে?

আমি একেবারে কেঁপে উঠলাম। এর আমি কি উত্তর দেব? আমি কি সব প্রশ্নের উত্তর জানি?

শেষপর্যন্ত অবশ্য বেঁচে উঠেছিল সুব্রত। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল, নেয়নি, পরের বছর আবার পরীক্ষা দিল। কিন্তু আগের থেকে ও আরো বেশি গম্ভীর হয়ে গেল, আমাদের সঙ্গেও আর মিশতে চাইত না।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। আমাদের মধ্যে কেউ ব্যাঙ্কের কেরানি, কেউ অধ্যাপক, কেউ ডবলু বি সি এস, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সুব্রতও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দুর্গাপুরে চাকরি করে। সকলেরই প্রায় কাছাকাছি অবস্থা। আই এস-সি পরীক্ষায় কে একটু ভালো রেজাল্ট করেছিল, কে একটু খারাপ—তাতে কিছু যায় আসেনি—বার বার জীবন নিজস্ব গতি নিয়েছে। একটা বছর নষ্ট হবার জন্যই বা কী এমন ক্ষতি হয়েছে সুব্রতর? এখন তো সে আর অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে নেই।

সেদিন দেখলাম গড়িয়াহাটার মোড়ে সুব্রত ওর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কালীপুজোর বাজি কিনছে। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। আমার মনে পড়ল, পি জি হাসপাতালের সেই রাতটা। আর দু-তিন

কণা বিষ বেশি খেলেই সুব্রত আর বাঁচত না। তা হলে এমন সুন্দর শিশুটিও জন্মাত না! কত সামান্য কারণে জীবনের ভারসাম্য টলে যায়। একটা টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য একটি সতেরো বছরের ছেলের জীবন মুচড়ে ভেঙে যেতে বসেছিল! অনেকদিন বাদে সুব্রতকে দেখে আমার সত্যি খুব আনন্দ হলো। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে বেঁচে থাকা।

৩

আমাদের পাশের বাড়িতে একজন বিখ্যাত গায়ক বেড়াতে এসেছেন শুনে আমি ছুটে গেলাম তাঁকে একটু দেখবার জন্য। গায়কটি আধুনিক, লোকসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান ইত্যাদি অনেক রকমের গানেই সুর দেন এবং নিজে গেয়ে থাকেন এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার আছে। এরকম একজন মানুষকে সামনাসামনি দেখতে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ঘটনা।

পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় রীতিমতন একটা ভিড় জমে গেছে। তারই মধ্যে ঠেলেঠুলে কোনোরকমে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু বাদে প্রতুলদা আমাকে দেখতে পেয়ে দয়া করে বললেন, এই নীলু, আয়, ভেতরে এসে বোস না! এমনকি প্রতুলদা গায়কটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন পর্যন্ত। যদিও আমার পরিচয় দেবার কিছুই নেই, প্রতুলদার পাশের বাড়িতে থাকি, এইমাত্র। প্রতুলদার বাংলা সিনেমা মহলে ঘোরাফেরা আছে জানতাম, সেই সুত্রেই নিশ্চয় গায়কটি এসেছেন তাঁর বাড়িতে।

তিনি বসে আছেন রাজার মতন, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ইজিচেয়ারে। তিনি এখন মধ্যবয়স্ক। মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু গায়ে একটা দারুণ উজ্জ্বল লাল রঙের জামা এবং তাঁর চোখের অচঞ্চল দৃষ্টি এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়, মানুষটি সাধারণ নন। বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখে নানা রকম প্রশ্ন করছে। তিনি খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন সংক্ষেপে।

তাঁর সামনে একটা প্লেটে কিছু মিষ্টি ও নোনতা খাবার, কিন্তু তিনি ওসব কিছুই খাবেন না। অনেক পেড়াপীড়িতেও রাজি হলেন না। তিনি শুধু এক কাপ কফি পান করবেন। তাঁর পাশেই চেয়ারে বসে আছে একটি মেয়ে। তিনি তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, রুমি, তুমি গাও না, তুমি লজ্জা করছ কেন?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। এমন রূপসী যুবতী

আমি বহুদিন দেখিনি। এমন কালো, এমন সুন্দর! বাঙালি মেয়েরা সাধারণত খাঁটি কালো হয় না। অনেক মেয়েকে দেখেছি যাদের গায়ের রং কালো হয় না। অনেক মেয়েকে দেখেছি যাদের গায়ের রং ময়লা কিংবা গাঢ় শ্যামবর্ণ, কিন্তু খাঁটি কুচকুচে কালো রঙের মেয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে চোখে পড়ে না। সে রকম হয় অরণ্যকন্যারা।

এই মেয়েটি শুধু যে কালো, তা-ই নয়, নিজের গায়ের রং আরো স্পষ্ট করবার জন্য সে পরে আছে ধপধপে সাদা শাড়ি। তার ঠোঁটে স্মিত হাসি, কোনো কথা বলতে গেলে সে আরো হাসে, তখন দেখা যায় তার ঝকঝকে দাঁতের উজ্জ্বল আলো। আর তার শরীরের গড়ন—ঠিক যেন কোনারকের মন্দির থেকে সুরসুন্দরীর মূর্তিটি তুলে এনে কেউ প্রাণবতী করেছে। মেয়েটি কিন্তু বড়ো লাজুক, বেশিরভাগ সময়েই সে নতমুখী হয়ে বসে আছে। অসাধারণ সারল্য সেই মুখে, যেন সে এ পৃথিবীর কোনো অন্যায় বা পাপের কথা জানে না। সে বসে আছে আমার থেকে মাত্র তিন চার হাত দূরে, অথচ মনে হচ্ছে যেন অনেক অনেক দূরে। সে সুন্দর, এত সুদূর?

ইতিমধ্যে গায়কটির কফি পান শেষ হয়েছে, সবাই তাঁকে গান শোনাবার জন্য অনুরোধ করছে। তিনি বিনীতভাবে আপত্তি জানাচ্ছেন, কিন্তু কেউ তা কানে তুলছে না। বিখ্যাত গায়কদের এই বিপদ তো আছেই। যে-কোনো নতুন জায়গায় গেলে তাঁদের মুড ভালো থাকুক বা না থাকুক, শরীর কিংবা গলা খারাপ হোক—তবু কেউ সেই সব ওজর মানতে চাইবে না।

অগত্যা গায়কটিকে মুখ খুলতেই হলো। কিন্তু বোঝা গেল সত্যিই তিনি ক্লান্ত এবং গান গাইবার মেজাজে নেই। দু'এক লাইন গেয়েই নিজের বিখ্যাত গানগুলিরও কথা ভুলে যাচ্ছেন। তখন তিনি সেই মেয়েটিকে বললেন, রুমি, তুমিও আমার সঙ্গে ধরো তো। মেয়েটি সেই গায়কের ভুলে-যাওয়া লাইনগুলো ধরিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু গানটা তবু জমছে না। এক সময় গায়কটি সেই মেয়েটিকে বললেন, তুমি উঠে দাঁড়াও, ভালো করে গাও!

তিনি প্রায় জোর করেই মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেজন্য আমি তৎক্ষণাৎ গায়কটিকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। এবার মেয়েটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখা গেল। সত্যিই যেন প্রাণপ্রাপ্তা সুরসুন্দরী। তার সাদা শাড়ির লাল পাড়টা চলে গেছে বুকের ওপর দিয়ে। মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কোনোরকম জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু মুখে মাখানো আছে একটা সহাস্য লজ্জা। সে বলল, আমি কোনটা গাইব? গায়কটি একটি গানের লাইন বললেন।

মেয়েটি গান ধরল, খুব নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে, হাত দুটো বুকের

কাছে জোড় করা, তাতে আস্তে আস্তে তাল দিচ্ছে। আস্তে আস্তে গাইলেও তার সুরেলা গলায় প্রতিটি উচ্চারণ স্পষ্ট এবং যেন তার শরীরটা গানের সঙ্গে দুলছে। আমি শিউরে উঠলাম। সহ্য করতে পারা যায় না। ব্যাপারটা এমন ভালো।

গানটা একটি নদী বিষয়ে। লোকসঙ্গীতের সুর, খুব দ্রুত নয়। আমার মনে হলো বহুদূরে কোথাও কোনো পাহাড়ী উপত্যকায় বয়ে চলেছে এক নদী, সেখানে সেই বিপুল নির্জনতার মধ্যে মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে গাইছে এই গান, তার সমস্ত শরীর ও রূপ দুই-ই গানের মধ্যে নিবেদিত। মেয়েটি যেন এখানে আর নেই। আমি আবার ভাবলাম হে সুন্দর, এত সুদূর।

আমার বুকের মধ্যে রীতিমতন কষ্ট হতে লাগল। এবং সেজন্য আমি অবাকও হয়ে গেলাম। কেন আমার কষ্ট হবে ? একজন বিখ্যাত গায়কের কোনো রূপসী সঙ্গিনী বা শিষ্যা যদি একটা ভালো গান শোনায়, তাতে তো আমার খুশি হবার কথা। কষ্টের কী আছে ? যখন কোনো সুন্দর ফুলের বাগান দেখি কিংবা বিখ্যাত কোনো ভাস্কর্য বা ছবি, তখন মুগ্ধ হয়ে যাই, কষ্ট তো পাই না! যারা অতি ধনী, তারা সেইসব সুন্দরকে কিনে নিয়ে বাড়ি সাজাতে চায়, আমার তেমন ইচ্ছে হয় না, আমার শুধু দেখাতেই সুখ। কিন্তু জীবন্ত সুন্দরের কথা বুঝি আলাদা। তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে, ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়, অন্তত দু'একটা কথা চোখে মুখে স্বীকৃতি। আমার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল, মেয়েটি একবার আমার চোখের সঙ্গে চোখ মেলাক। অথচ কেনই বা সে আমার দিকে সেরকমভাবে তাকাবে ? আমি কে, কেউ না! নিছক একজন পাশের বাড়ির লোক, ভিড়ের মধ্যে একজন। আমি তো জানিই, এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়। তবু মন এসব যুক্তি বোঝে না, মন কষ্ট পায়।

খানিকটা বাদে আসর ভাঙল। গায়কটি তাঁর দলবল নিয়ে উঠে পড়লেন প্রতুলদার গাড়িতে। মেয়েটি একবারও আমার চোখে তার স্থির দৃষ্টি রাখলে না। আমি মনখারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিখ্যাত লোকদের ঈর্ষা করা এক ধরনের হীনমন্যতা। ঐ গায়কটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর প্রতিভার জন্যই, বহুলোক তাঁকে স্তুতি করে, তিনি রূপসী নারীদের কাঁধে অনায়াসে হাত রাখতে পারেন। এমনকি আমিও তো ওঁর ভক্ত। তবু সেদিন বারবার মনে হতে লাগল, ইস, কেন আমার গলাটা এমন বেসুরো বেতাল! কেন একটু গাইবার চেষ্টা করলেই গলা দিয়ে মাটিতে টিন ঘষার মতন আওয়াজ বেরোয় ? যদি গাইতে পারতাম, যদি গান শিখতাম, তবে হয়ত ভাগ্যবলে একদিন এই প্রাণবতী সুরসুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা হতো।

কয়েকদিন মন খারাপ অবস্থাতে কাটল। আমার অবস্থা ঠিক কোনো ব্যর্থ

প্রেমিকের মতন। প্রেমে পড়া আমার রোগ। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটে যাওয়া কোনো মোটরগাড়ির জানলায় বসে থাকা এক নারীকে দেখেও আমি একবার এমন প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম যে তারপর সাতদিন আহারে রুচি ছিল না। বস্তুত আমার হাজার প্রেমিকাদের মধ্যে প্রায় কারুর সঙ্গেই জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হয়নি। আমি মনে রেখেছি, প্রতীক্ষায় থেকেছি, কিন্তু তারা ফিরে আসেনি কিংবা আমায় চিনতেই পারেনি।

সুতরাং এই জীবন্ত সুরসুন্দরীর সঙ্গে যে আমার আর দেখা হবে না, তা ধরেই রেখেছিলাম। মনখারাপ করাটা আমার একটা গোপন বিলাসিতা। তা নিজের বাড়িতে যদি একলা একলা মন খারাপ করে শুয়ে থাকি তাতে কারুর তো কোনো ক্ষতি নেই।

তবু দেখা হয়ে গেল আর একবার। খুব অবেলায়। খুব ভুল জায়গায়। চৌরঙ্গিতে, সন্ধ্যাকালীন ভিড়ের মধ্যে। সেই মেয়েটি আর একজন সমবয়স্কা যুবতীর সঙ্গে হেঁটে আসছিল। হাতে বেশ কিছু জিনিসপত্র। উল্টোদিক থেকে আসতে আসতে ওকে দেখেই আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল, আঙুলের ডগায় ও কানে গরম আঁচ টের পেলাম। মেয়েটি এবারও আমার দিকে তাকাল না। আমাকে চিনতে পারার তো কোনো কথাই নয়। আমি তো ভিড়ের মধ্যে একজন মানুষ। এক্ষুনি ও দূরে চলে যাবে, ওকে কোনোরকমে একটু থামানো যায় না? আর কোনো কারণে নয়, শুধু আর একটুক্ষণ চোখ ভরে দেখার জন্য! কিন্তু আমার যত লম্ফঝম্ফ, সবই মনে মনে। প্রকাশ্য রাস্তায় কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করার সাহস আমার নেই। তা ছাড়া আমি ওকে ডেকে কি বলব? আমার মধ্যে যে ব্যাকুলতাটা প্রকাশ পাচ্ছে, তার আসলে কোনো ভাষা নেই, যুক্তিও নেই।

এই সময় একটি গাড়ি এসে হঠাৎ দাঁড়াল, তিন চারজন লোক চেঁচিয়ে ডাকলেন, রুমি, রুমি! গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল একজন লোক, লোকটির গায়ে সিল্কের হাওয়াই শার্ট, হাতে ঘড়িতে সোনালী ব্যাণ্ড। মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির লোকরা তক্ষুনি ঐ রুমি নাম্নী মেয়েটিকে গাড়িতে তুলতে চায়। রুমি প্রথমে একটু একটু আপত্তি করল। কিন্তু গাড়ির লোকরা হল্লা করছে। ফিল্ম, প্লে ব্যাক, রেকর্ডিং—এইরকম টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা আমার কানে এল। জায়গাটায় ভুরভুর করছে হুইস্কির গন্ধ।

খানিকক্ষণ টালবাহানার পর মেয়েটি রাজি হলো। তার সঙ্গিনীর হাতে জিনিসগুলো দিয়ে সে উঠে পড়ল গাড়িতে। গাড়ির লোকগুলো একটা উল্লাসের ধ্বনি করল। ওরা সকলেই যে মত্ত অবস্থায় আছে তা বুঝতে ভুল হয় না। এবং সোনালী রঙের ঘড়ির ব্যাণ্ড দেখলে ওরা কী ধরনের মানুষ তা-ও বোঝা যায়।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেই বিখ্যাত গায়কটি ঐ দলে নেই।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমি কল্পনা করেছিলাম, কোনো এক পাহাড়ী উপত্যকায় নির্জন নদীতীরে ঐ জীবন্ত পাথরপ্রতিমা সর্বাঙ্গ নিবেদন করে নদীর উদ্দেশে গান গায়। কিন্তু এসব নিছক রোমান্টিক কল্পনা। মেয়েটি গায়িকা হতে চায়, ওর কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে প্লে ব্যাক, ফিল্ম, রেকর্ডিং—এ সবের সুযোগ নিতেই হবে। সেই প্রলোভনে নিজের বান্ধবীকে একলা ফেলে রেখেও ওকে চলে যেতে হলো কয়েকজন মাতালের সঙ্গে। এই সন্ধেবেলা কোথায় কিসের রেকর্ডিং হবে কে জানে।

এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়।

৪

কলকাতায় যখন খুব খুনোখুনি চলছে, তখন আমরা কয়েকজনে মিলে হঠাৎ ঠিক করলাম, একদিন ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দান করে আসব। 'রক্তের বদলে রক্ত চাই' বলে একটা কথা আছে, তারই অন্যরকম একটা ব্যাখ্যা আমাদের মনে এল। যখন মানুষের রক্ত রাস্তার ধুলো-কাদায় গড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে, সেই সময়েই আবার বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক দুরারোগ্য রুগী শুধু রক্তের অভাবে মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে, এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার না?

আমরা অনেকে মিলে একসঙ্গে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, অনেকেরই খুব জরুরি কাজ পড়ে গেছে কিংবা আটকে গেছে অন্য জায়গায়। শেষ পর্যন্ত জমায়েত হলাম আমরা চারজন মাত্র। মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে আমরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলাম যে আমরা অন্তত দশজন যাব, সেইজন্য ছুটির দিনেও তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন—কিন্তু মাত্র চারজনের ছোট্ট একটি দল নিয়ে যেতে আমাদের একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল। কিন্তু একেবারে না যাওয়ার চেয়ে চারজন যাওয়া ভালো, এই বিশ্বাসে আমরা এগিয়ে গেলাম।

রক্ত দান সম্পর্কে অনেকের অনেক রকম আশঙ্কা বা কুসংস্কার আছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে খুবই অকিঞ্চিৎকর। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহে যতটা রক্তের দরকার, থাকে তার দ্বিগুণ। সুতরাং শরীর থেকে এক-আধ লিটার রক্ত বেরিয়ে গেলে কোনোই ক্ষতি হয় না এবং শরীরই সেটা চট করে আবার পূরণ

করে নেয়। অনেক লোক নিয়মিত শরীরের রক্ত বেচে টাকা রোজগার করে। অনেক লোক শখ করেও নিয়মিত রক্ত দান করে শুনেছি। বিদেশে এমন অনেক লোক আছে, যারা বছরে তিন চারবার রক্ত দান করে, এমনকি তারা অন্য কোনো দেশে বেড়াতে গেলেও চট করে সেখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসে —বিভিন্ন দেশের সার্টিফিকেট জমানো তাদের নেশা।

আমারও অবশ্য একটু একটু ভয় ছিল, তবে সেটা অন্য কারণে। খুব বেশি লাগবে কিনা। ছেলেবেলা থেকেই ইঞ্জেকশান নিতে একটু ভয় ভয় করত। এখানে আবার কত বড়ো সূচ কে জানে। আমায় যখন কেউ মারধোর করার ভয় দেখিয়েছে, আমি বলেছি, ভাই যদি নিতান্ত মারতেই হয় তো গ্রীষ্মকালে মেরো, শীতকালে মেরো না। শীতকালে বড্ড লাগে।

যাই হোক, প্রথমে খাতায় নাম-টাম লিখিয়ে একটি ডেস্কের কাছে এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হাত দেখি।

একটা হাত বাড়িয়ে দিতেই তিনি মধ্যমে আঙুলটা ধরে খানিকক্ষণ টিপেটুপে দেখলেন। তারপর একটা ফাকা সিরিঞ্জ প্যাট করে ঢুকিয়ে দিলেন সেই আঙুলে। বেশ লেগেছিল, আর একটু হলেই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠতাম আর কি! আসলে কিন্তু বেশি লাগেনি, এরকম কত কেটে ছড়ে যায়, কত জায়গায় খোঁচা লাগে, তখন আমরা মোটেই তেমন ব্যথা পাই না। কিন্তু চোখের সামনে আঙুলে পিন ফোটাবার জনাই ব্যথার বোধটা বেশি হয়। যাই হোক, সেই আঙুলের ডগা থেকে এক ফোঁটা মোটে রক্ত বেরুল, সেই রক্তের ফোঁটাটা ফেলা হলো সবুজ রঙের কী একটা তরল পদার্থে ভরা গেলাসের মধ্যে। রক্তের ফোঁটাটা জমাট বেঁধে দুলতে দুলতে সেই সবুজ জিনিসের মধ্য দিয়ে নামতে লাগল। তাতে কী হলো, তা আমি বুঝলাম না. কিন্তু সেই লোকটি আমাকে বললেন, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমি পাস করে গেলাম।

এবার আমাকে নিয়ে শোওয়ানো হলো একটি অয়েল ক্লথ মোড়া খাটে। সেখানে একজন আর্দালি আর একজন লেডি ডাক্তার। এ পর্যন্ত পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই ভাববেন, এবারে আমি বানাতে শুরু করেছি। সব জায়গায় পুরুষ ডাক্তার থাকে, আর শুধু নীললোহিতের বেলাতেই লেডি ডাক্তার? কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি হলফ করে বলছি, সেদিন আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন ছিল, একজন লেডি ডাক্তারই উপস্থিত ছিল সেখানে। মনে হয় সদ্য পাস-করা, ফুটফুটে চেহারার একটি যুবতী, বেশ হাসিখুশি স্বভাবের। তার বাংলা উচ্চারণে একটা টান আছে, মনে হয় কোনো অবাঙালি চমৎকার বাংলা শিখেছে। আর্দালিটি প্রথমে আমার এক হাতের জামা-টামা গুটিয়ে সেখানে খুব করে কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে বেঁধে

দিলে। তারপর মহিলা ডাক্তারটি আমার করতল ধারণ করল।

এখন অন্য কোথাও যদি আমি এরকম একটি সুন্দরী অচেনা মেয়ের করতল ধারণের চেষ্টা করতাম, তা হলে নিশ্চয়ই মার খেতাম। কিন্তু এখানে মেয়েটি অবলীলাক্রমে আমার হাত ধরল। এবং আমরা কেউই অসুস্থ নই। সুতরাং একটু রোমাঞ্চ বোধ করলাম। মেয়েটি তারপর আমার হাতে একটা ধাতুর জিনিস দিয়ে বলল, এটা মুঠো করে ধরে রাখুন।

মাথার সামনে এনে একটা হরিণঘাটার দুধের বোতলের সাইজের বোতল রাখা হলো। তারপর আনা হলো সিরিঞ্জ। বেশ জাঁদরেল চেহারা। একটু বুক কেঁপে উঠল।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, লাগবে ?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, তা তো একটু লাগবেই।

কোনো সান্ত্বনা পেলাম না। তাই অমন সুন্দরী মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি মুখ ফেরালাম দেয়ালের দিকে। তারপর এক সময় অনুভব করলাম, আমার হাতে সূচ ফোঁড়া হলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এবার তো মোটেই ব্যথা লাগল না। যদিও অতবড়ো সিরিঞ্জ, কিন্তু ব্যথাবোধ প্রায় নেই বললেই চলে। বরং আঙুলের ডগায় পিন ফোটানোতে যেন এর চেয়ে বেশি লেগেছিল। সম্ভবত হাতটা পট্টি মুড়ে শক্ত করে বেঁধে দেবার জন্যেই ব্যথাবোধ চলে গেছে।

ভরসা করে আবার মুখ ফেরালাম। মেয়ে ডাক্তারটি আবার হেসে জিজ্ঞেস করল, কি, খুব বেশি লেগেছে ?

আমি বললাম, মোটেই তো লাগেনি। আপনি ভয় দেখালেন কেন ?

মেয়েটি বলল, যদি বলতাম লাগবে না, তাহলে কিন্তু আপনার ঠিকই লাগত। বেশি লাগবার ভয় পেয়েছিলেন বলেই কম লাগাটা টের পেলেন না।

রবারের নল দিয়ে আমার রক্ত গিয়ে শিশিটাতে ভর্তি হচ্ছে। আমি সেদিকে চেয়ে আছি দেখে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমার নাম কি, আমি কোথায় থাকি, আমি কোন কোন বই পড়তে ভালোবাসি, আমার পাহাড় ভালো লাগে, না সমুদ্র ইত্যাদি। বুঝলাম, মায়েরা যেমন ছোট ছেলেদের ওষুধ খাওয়াবার সময় নানান গল্প বলে মন ভোলায়, মেয়েটিও সেই রকম কিছু চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ও হয়ত ভেবেছে, আমি নিজের রক্ত বেরিয়ে যাওয়া স্বচক্ষে দেখে ঘাবড়ে যেতে পারি। কিন্তু সেরকম কিছু বোধই হলো না, বরং একটু যেন আরাম লাগতে লাগল। শরীরটা বেশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট বাদে রক্ত নেওয়া শেষ হলো। মেয়েটি বলল, একটু বসে বিশ্রাম করে নিন, এক্ষুনি নামবেন না।

. কিন্তু তার কোনো দরকার বোধ করলাম না। টপ করে নেমে দাঁড়ালাম। একটু মাথাও ঘুরল না। পা-ও টলল না—অন্য বন্ধুরা তখন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমি বললাম, চল।

আমার এই রচনা পড়ে যদি কারুর রক্ত দান করার আগ্রহ হয়, তাহলে আমি আর একবার তাকে জানিয়ে রাখি যে, রক্ত দেবার সময় মোটেও বেশি ব্যথা লাগে না, শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সেই রক্তের জন্য পরে অন্য কারুর প্রাণ বেঁচে যেতে পারে, এই চিন্তায় বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। পৃথিবীতে যে, সমস্ত সুখ বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, এটাই বোধহয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমি অবশ্য পরেও নানা কারণে কয়েকবার রক্ত দিয়েছি, ব্যাপারটা এখন আমার কাছে খুবই সাধারণ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সব সময়েই রোমাঞ্চকর হয় এবং সেটাই বেশি মনে থাকে।

সেদিন আমরা ভলান্টারি ডোনার বলেই হয়ত আমাদের জন্য খাতির করে খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সন্দেশ, কলা, চা, বিস্কুট ইত্যাদি। অন্যান্য খাদ্যে আমার রুচি নেই, শুধু চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের রক্ত সংরক্ষণের ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাইলেন। জায়গার অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব—এসব তো আছেই, কিন্তু আন্তরিকতার খুব একটা অভাব আছে বলে মনে হয় না ওখানে। আর একটা জিনিস দেখেও মজা লাগে। রক্ত জিনিসটা ঠিক যেন দুধের মতন। গোরুর দুধ সরলভাবে গোরুর বাঁট থেকে মানুষের পেটে যায় না, তাই নিয়ে মাঝখানে কত কাণ্ডই না চলে। টোনড মিল্ক, স্কিমড—এসব ব্যাপারগুলোও ভালো করে আজও বুঝি না। আবার দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো করে টিনে ভর্তি করাও হয়। বিদেশে দেখেছি দুধের সঙ্গে আরো প্রোটিন ফোর্টিফায়েড করে তারপর পান করার রীতি। আমাদের গয়লারাও দেয় টিউবওয়েলের জল ফোর্টিফায়েড করা দুধ।

পরিশ্রমে রক্ত জলকরা কথাটার মর্ম এতদিনে বুঝলাম। রক্তের মধ্যে বেশির ভাগই নাকি জল। সেই জল সরিয়ে রক্তের আসল জিনিসটুকু, অর্থাৎ প্লাজমাকে আলাদা করে শুকিয়ে গুঁড়ো করা যায়। কিন্তু পাউডারের মতন সেই ব্লাড পাউডার জমা থাকে হিমঘরে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল, দুধে ভেজাল দেবার মতন রক্তে ভেজাল দেবারও কোনো উপায় বেরিয়েছে কিনা কে জানে।

টাকা না নিয়ে রক্ত দান করলে পাওয়া যায় উপহার হিসেবে একটা ধাতুর তৈরি ব্যাজ বা বোতাম আর একটা কার্ড। সেই কার্ড দেখিয়ে এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হলে এক বোতল রক্ত পাওয়া যাবে।

সেইসব নিয়ে তো বেরিয়ে এলাম। তারপর মাসের পর মাস যায়, এর মধ্যে

আমার নিজের তো দূরের কথা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কারুরই এমন কোনো অসুখ হয় না, যাতে রক্তের দরকার। আমি পরোপকার করবার জন্য মুখিয়ে আছি, অথচ তা গ্রহণ করবার কেউ নেই।

বেশ কিছুদিন পর একদিন সকালবেলা এক বন্ধু টেলিফোনে জানতে চাইল, আমার রক্ত কোন গ্রুপের। তা তো আমার মনে নেই। কেন?

সে বলল, তাদের পাড়ার একটি মেয়ে কাল গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল, শেষ মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাঁচবে কিনা এখনো ঠিক নেই, রক্ত দিতে হবে, শুনেছিলাম তুই একবার—

সঙ্গে সঙ্গে আমি নার্ভাস হয়ে গেলাম। আমার যা এলোমেলো স্বভাব, সেই কার্ডখানা এখন খুঁজে পাব কিনা সন্দেহ। মুহূর্তের মধ্যে টেবিলের ড্রয়ার সব লণ্ডভণ্ড করে ফেললাম। এবং কার্ডটি পাওয়া গেল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্লাড গ্রুপও মিলে গেল। বন্ধুটিকে সে কথা জানাতেই সে বলল, আমি লোক পাঠিয়ে তোর কার্ডটা আনিয়ে নিচ্ছি, তারপর যদি আরো রক্তের দরকার হয়, তোকে ডাকব—।

আমার আর ডাক পড়েনি অবশ্য। শুনেছি, দুদিন যমের সঙ্গে লড়াই করার পরে মেয়েটি বেঁচে গেছে, আবার সে সুস্থ জীবনে ফিরে গেছে।

কোনো বৃদ্ধ বা শিশুর জন্যও প্রয়োজন হলে আমি আমার কার্ডটা দিতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু যেহেতু একটি মেয়ের জন্য, তাই আমার কল্পনা নানারকম ডালপালা মেলতে থাকে।

সেই মেয়েটিকে আমি চিনি না, কখনো চোখেও দেখিনি, তবু আমার কল্পনা করতে আরাম হয় যে তার ধমনীর মধ্যে আমার রক্ত খেলা করে বেড়াচ্ছে। যদিও জানি, আমার সেই রক্ত শুকিয়ে গুঁড়ো করে করে লাগানো হয়েছে অন্য কাজে —আমার কার্ডের বদলে তারা পেয়েছে নিরপেক্ষ এক বোতল রক্ত; তবু আমার ভাবতে ভালো লাগে, যেন আমারই রক্ত কলকল করে ছুটছে তার শরীরে। এই মুহূর্তে আমি মরে গেলেও আমার সেই রক্তটুকু বেঁচে থাকবে। এই চিন্তায় আমার অতিরিক্ত সুখ হয়।

৫

এই ট্রামটিতে শুধু দু'দিকের দেয়ালঘেঁষা লম্বা টানা সীট। গেট দিয়ে উঠেই সামনে খানিকটা জায়গা পেয়ে বসতে গেছি কণ্ডাক্টর চোখের ইশারায় নিষেধ করলেন। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, কণ্ডাক্টর কাছে এসে বললেন, লেডিজ!

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। সম্প্রতি মিনিবাসে চড়া অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে বলে আলাদা লেডিজ সীটের কথা ভুলে যেতে বসেছিলুম। মিনি বাস বা ডিলুক্স বাসে ছেলেরা-মেয়েরা স্বচ্ছন্দে এখনো পাশাপাশি বসে। কিন্তু যেগুলি কুড়ি পয়সার গরীবদের ট্রাম-বাস, সেখানে নারীপুরুষের দ্বিজাতিতত্ত্ব এখনো অব্যাহত হয়ে গেছে।

আর তেমন জায়গা নেই তাই হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কণ্ডাক্টর ভদ্রলোক আমার উপকারই করেছেন, হঠাৎ কোনো মেয়ে এসে ভুরু কুঁচকে আমাকে উঠতে বললে আমার খুবই খারাপ লাগত। মেয়েদের ভ্রু-কুঞ্চন দেখলে আমি মর্মাহত হই।

ওপাশের দু'জন ভদ্রলোক একটু চেপে-চুপে বসে সহৃদয়ভাবে আমাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। এরকমভাবে বসাটা খুবই অস্বস্তিকর, তবু নিজের চেহারাটা যত দূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে বসে পড়লাম। পরের স্টপেই তিনটি মেয়ে উঠল।

এরপর কাহিনীটি এইভাবে এগোতে পারত। ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, আরে, মুকুলিকা যে! মেয়েটিও চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, তুমি, তুমি নীলুদা না? কতদিন পর দেখা!

দুঃখের বিষয় সেরকম কিছুই ঘটল না। মেয়ে তিনটিকে আমি একদম চিনি না। তারা আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখল না। অবিলম্বে নিজেদের মধ্যে অফিস-বিষয়ক আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল।

আমার পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ট্রাম রাইটার্স বিল্ডিংস যাবে?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

একটু পরে কণ্ডাক্টর আমার টিকিট কাটার পর সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে টিকিট চাইলেন। তিনি প্রথমে বুক পকেট, তারপর পাশের দু পকেট তারপর আবার বুক পকেট দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে অনেক কাগজপত্র বার করে খুঁজলেন। টাকাপয়সার কোনো চিহ্ন নেই।

তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, যাঃ!

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। মুখে-চোখে কোনো রকম কৌতূহলের চিহ্ন নেই।

বৃদ্ধ আবার বললেন, গেছে! পকেটমার হয়ে গেছে। একটাও পয়সা রাখেনি!

পকেটমারির কথাটাও অনেক দিন শুনিনি। মিনিবাস বা ডিলুক্স বাসে পকেটমারির সুযোগ নেই। সেখানে সবাই সীটে বসে যায়, না দাঁড়ালে পকেটমাররা হাত চালাবার সুবিধে পায় না। এই ট্রামটা কিন্তু সদ্য হাওড়া থেকে ছেড়েছে, এখনো তেমন ভিড় নেই।

বাসের সমস্ত যাত্রী নীরব। আমরা এক ধরনের ব্রিটিশ ভদ্রতায় রপ্ত হয়ে গেছি। অচেনা লোকের কোনো ব্যাপারে মুখ খুলি না। অনেক যাত্রীই আড়চোখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে লক্ষ করছে, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দাড়ি-না-কামানো মুখ, পোশাকও সম্ভ্রান্ত নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, লোকটি ভাড়া ফাঁকি দেবার মতলব করছে। ট্রামে-বাস তো এরকম কত রকম চরিত্রই ওঠে।

বৃদ্ধ লোকটি আবার পকেট উল্টে বললেন, সাড়ে তিনটে টাকা ছিল, কিছুই রাখেনি। তারপর কণ্ডাক্টরকে বললেন, পয়সা নেই বাবা। নেমে যাচ্ছি। হেঁটেই যাব রাইটার্স বিল্ডিংস।

দুটি কারণে বৃদ্ধকে আমার প্রতারক মনে হলো না। প্রথম যাঃ বলে উনি হেসে উঠেছিলেন এবং ওঁর মাত্র সাড়ে তিন টাকা চুরি গেছে। এটা কোনো পাকা অভিনেতার কাজ নয়।

আমি মৃদু স্বরে কণ্ডাক্টরকে বললুম, ওঁকে বসতে বলুন, ওঁর টিকিটটা আমি কেটে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ আবার বসে পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি দাদা আমার টিকিট কাটলে কেন?

এই সব ক্ষেত্রে লোকে যা করে আমিও সেইভাবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্য বললাম, ও কিছু না।

—বুঝলে দাদা, ব্যাটারা বড্ড চালাক। টাকাটা বুক পকেটে না রেখে মনের ভুলে পাশ পকেটে রেখেছি, অমনি ঠিক তুলে নিয়েছে। ট্রেনেই নিয়েছে।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—আসছি তো চন্দননগর থেকে। রাইটার্স বিল্ডিংসে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে একখানা দরখাস্ত দেব—তা ফেরার ট্রেন ভাড়া, আর দুপুরে যদি কিছু খেতে হয় এই বাবদ সাড়ে তিন টাকা এনেছিলাম। হিসেব করে...

বৃদ্ধ বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। কাছাকাছির যাত্রীরা সবাই শুনছেন।

এবার আর একজন যাত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবার চন্দননগরে ফিরবেন কি করে?

বৃদ্ধ বললেন, সে একটা কিছু হয়ে যাবে। ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই তো হবে!

—রাইটার্স বিল্ডিংসে কেউ চেনা নেই?

—না। এখন আর কাউকে চিনি না। এককালে চিনতাম। একসময় আমি জেল খেটেছি, সুভাষ বোস, গান্ধীজীর কাছে কাছে ঘুরেছি, ওনাদের ফুটফরমাস খেটেছি, এই দেখো না দাদারা, একটা দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছি।

উনি বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। কয়েকজন ঝুঁকে দেখল। কথাটা মিথ্যে নয়। বৃদ্ধটি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সেই মর্মে একজন এম এল এ-র সার্টিফিকেটও আছে, উনি দুশো টাকা সরকারি বৃত্তিও পান, এখন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য কিছু সাহায্যের আবেদন করতে যাচ্ছেন। এরকম সাহায্য দেওয়া হবে বলে লোকমুখে শুনেছেন।

বৃদ্ধদের একটু বেশি কথা বলা অভ্যেস থাকে সাধারণত। উনি অনেক কথা বলতে লাগলেন। তার মধ্যেই অন্য পাশের সহযাত্রীটি একটি দু' টাকার নোট বার করে খুব বিনীতভাবে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। টাকাটার দিকে চেয়ে বললেন, কেন দাদা, এটা আমাকে দিচ্ছ কেন?

ভদ্রলোক আরো নীচু গলায় বললেন, এ তো কিছু না সামান্য, আপনার কাছে রাখুন, আপনারটা চুরি গেছে, ট্রেন ভাড়া লাগবে—

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, টাকাটা হয়তো তোমার কাজে লাগত, আমি হাত পেতে তোমার কাছ থেকে পয়সা নেব—বরং আমার কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত, মাথার ওপরে ভগবান আছেন যখন—

পাশের যাত্রীটি সেই দু' টাকার নোটটি তাঁর বুকপকেটে গুঁজে দিলেন।

এবার লেডিজ সীট থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে তার হাতব্যাগ খুলে একটি এক টাকার নোট নিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাদু এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধটি এবার প্রবল আপত্তি তুললেন। না না মা, তোমার টাকা আমি কিছুতেই নেব না। তোমার কত কাজে লাগবে, আমার এইতে হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। সে বিনয় না করে বেশ জোর দিয়ে বলল, এটা আপনাকে নিতেই হবে। আমার দিতে ইচ্ছে করছে আপনাকে, আপনি কেন নেবেন না?

খানিকক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ হলো, শেষপর্যন্ত বৃদ্ধটিই হেরে গেলেন। টাকাটা

নিতেই হলো তাঁকে। তিনি সেটা কপালে ছুঁয়ে বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতন মা, তোমার কাছ থেকে নিলে এমন কিছু দোষ নেই।

সেই মেয়েটি ফিরে গিয়ে সীট বসার পর তার পাশের মেয়েটি ভাবল, তারও কিছু একটা করা দরকার। অনেক মেয়ে আছে যারা নিজের থেকে কিছু করার উৎসাহ পায় না, অন্যের দেখাদেখি অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু এ মেয়েটি তেমন সপ্রতিভ নয়, তাছাড়া বৃদ্ধটি একেবারে চ্যাচামেচি শুরু করে বললেন, আর একটা পয়সাও আমার দরকার নেই, আর কিছু আমি নেব না, আর কেউ কিছু দিতে চাইলে আমি ট্রাম থেকে নেবে যাব—।

ব্যাপারটা এখানে শেষ হলে বেশ মধুর হতো। কিন্তু বৃদ্ধ এর পরে অন্তহীন কথা শুরু করলেন। প্রথমে তো সকলকে ধন্যবাদ জানালেন প্রায় পনেরো কুড়ি বার করে। তারপর শুরু করলেন নিজের দুঃখের কাহিনী। চন্দননগরে এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন, বাড়িওয়ালা বেশি ভাড়ার লোভে তুলে দিতে চায়, বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ছোট ছেলেটা স্কুল ফাইনালে ফেল করেছে, টাকার অভাবে আর এক বছর পড়ানো যাচ্ছে না—গান্ধীজীর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ডাক শুনে বেয়াল্লিশ সালে জেলে গেছি, কত কষ্ট সহ্য করেছি, এখন একটা যদি নিজের বাড়ি থাকত—হ্যাঁ সদাশয় সরকার দুশো টাকা করে দিচ্ছেন তাতে অনেকখানি সাহায্য হয়, তবু আবার গিয়ে বলব, আর একটু দয়া করুন। আপনারা দয়া না করলে...

আমার প্রথমে লজ্জা, তারপর অসম্ভব রাগ হতে লাগল। এক একবার ইচ্ছে হলো, বৃদ্ধের মুখ চেপে ধরে কথা বন্ধ করে দিই। এসব কথা ওঁকে একদম মানায় না। ট্রামে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ে অনেক আছে, তারা ওর কথা শুনলে ভাববে, দেশের কাজ করতে গেলে বুঝি শেষ বয়সে এই পরিণতি হয়! না না, এসব মোটেই তাদের শোনা উচিত নয়। এই বৃদ্ধরা অল্প বয়েসে যখন দেশের কাজে নেমেছিলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন না যে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজ করবেন? কোনো রকম প্রতিদানের আশা করবেন না। আজকের এই দীনতা যেন সেদিনের সেই ত্যাগকে ম্লান করে দিচ্ছে।

৬

বউবাজারের কাছে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে দুজনে মন্থরভাবে হাঁটতে লাগলাম। দুপাশে অনেক মিষ্টির দোকান। বউবাজার পাড়ার

মিষ্টি সুবিখ্যাত। একটা দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কচুরি ভাজার গন্ধ নাকে এল। বন্ধুটির দিকে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দোকানটাতে ঢুকে পড়লে কেমন হয়, অনেকদিন কচুরি খাইনি।

বন্ধুটি আঁতকে উঠে বলল, তোর মাথা খারাপ? এগুলো তো একদম বিষ! এইসব কচুরি-সিঙ্গাড়া-তেলেভাজা এসব মানুষে জেনেশুনে খায়?

আমি ছেলেবেলা থেকে এসব অনেক খেয়েছি। তখন তো বিষ খাচ্ছি বলে টের পাইনি।

বন্ধুটি অনেকদিন বিদেশে ছিল। আধুনিক খাদ্যপ্রণালী সম্পর্কে তার বেশ স্পষ্ট মতামত আছে বোঝা গেল। সে বলল, এই দ্যাখ, এতগুলো মিষ্টির দোকান—অনেক ইয়ংম্যান সেগুলোয় বসে বসে খাচ্ছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে যুবকদের এরকম মিষ্টি খাওয়ার দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না।! সেই জন্যই আমাদের দেশের ছেলে-ছোকরাদের স্বাস্থ্য এত খারাপ, সেই জন্যই অলিম্পিক থেকে অপমানিত হয়ে খালি হাতে আমাদের দেশ ফিরে আসে।

অলিম্পিকের কথা শুনে একটু মনখারাপ হয়ে যায়। মুখ নীচু করে থাকি।

বন্ধুটি বলল, এই যে দ্যাখ, রাস্তায় বসে বেগুনি-ফুলুরি ভাজছে—ভেজাল তেল, রাস্তার ধুলো, পোকায় কাটা বেগুন—এইগুলোই তো লোকে খাবে! সামান্যতম খাদ্যমূল্য নেই এগুলোর, শুধু পেট ভরে আর লিভার খারাপ হয়।

আমি বললাম, কিন্তু স্বাদ বেশ ভালো। মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না।

বন্ধুটি রেগে গিয়ে বলল, দূর দূর! এই ভালো লাগাটা হচ্ছে ডায়াবিটিসের রুগির রসগোল্লা খাওয়ার লোভ কিংবা থ্রোট ক্যান্সারের রুগির লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার মতনই। উঠতি বয়সের ছেলেরা যখন এগুলো খায়, আমার কষ্ট হয়। এর বদলে যদি এরকম ছোট ছোট দোকানে মাংস ভাজা বিক্রি হতো—সেই খেয়ে ছেলেগুলোর স্বাস্থ্য ভালো হতে পারত।

—কিন্তু মাংসের যে অনেক দাম! সাধারণ লোকে কি খেতে পারে?

—বাজে কথা বলিস না। মাংসের মোটেই বেশি দাম নয়। বেশি দাম হচ্ছে আমাদের সংস্কারের। যে কোনো খেলার মাঠের বাইরে কী দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়? ঝালমুড়ি, ফুচকা, আলুকাবলিওয়ারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা দারুণ পরিশ্রম করে ক্ষুধার্ত ছেলেরা বাইরে এসে এগুলোই খায়। এর কোনোটার খাদ্যমূল্য নেই, বরং হজমশক্তিটা জখম করে দেয়। এইসব ছেলেদের আমরা অলিম্পিকে পাঠাব? এর বদলে এক টুকরো সেদ্ধ গরুর মাংস আর দু পীস পাঁউরুটিতে কত দাম পড়ে? একখণ্ড মাংস লার্ডে ভেজে নিলে স্বাদ আরো বাড়ে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। বিদেশফেরত বন্ধুটিকে এ ব্যাপার সহজে বোঝানো যাবে না। এ নিয়ে ঢের তর্কবিতর্ক আন্দোলন হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত এই, গো-মাংস এ দেশে সামাজিকভাবে গ্রহণীয় হবে না। কয়েকটি রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে আইন হয়ে গেছে। অন্য রাজ্যগুলিরও ঝোঁক সেই দিকে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই গরুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এবং গরুর এমন অযত্নও আর কোনো দেশে হয় না। রোগা, হাড় বার করা, করুণ চেহারা। গো-মড়ক যখন-তখন লাগে। যত গরুর গাড়ি, তার প্রত্যেকটি গরুর কাঁধে ঘা। তবু গরু এ দেশের একটি পবিত্র প্রাণী। মাতার সমান। অনেক জাতেরই এরকম দু'একটা হিপক্রিসি থাকে।

বন্ধুটি তবু আবেগের সঙ্গে বলে চলেছে, কলেজ জীবনে আমরা কলাবাগানে গিয়ে তিন আনায় এক প্লেট বীফ কারি আর এক আনায় দুটো হাতে গড়া রুটি দিয়ে চমৎকার টিফিন করতাম। এখনো অনেক মুসলমানের দোকানে দশ পয়সার একটা শিক কাবাব পাওয়া যায়। দুটো শিক কাবাব আর একটা রুটি তিরিশ পয়সা —তবু তুই বলবি প্রোটিন খেতে বেশি পয়সা লাগে?

আমি বললাম, বক্তৃতা দিয়ে তো লাভ নেই। মানুষের সংস্কার সহজে কাটানো যায় না। জোর করে কাটানো যায় না।

বেশ তো, গরু না হয় পবিত্র প্রাণী, কিন্তু মোষ? মোষ তো আর পবিত্র নয়! আমাদের দেশে এই কিছুদিন আগেও দুর্গাপূজায় মোষ বলি দেওয়া হতো, মোষের মাংস কেন বাজারে বিক্রি হয় না? পাঁঠা, মুরগির চেয়ে তা নিশ্চয়ই সস্তা হতো। শুনেছি কলকাতার হোটেল রেস্তোরাঁয় মাটন কারি বলে যা বিক্রি হয়, তার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই মোষের মাংস। আমরা চপ কাটলেটে মোষের মাংস ভেজাল দিতে পারি, কিন্তু বাজার থেকে সেই মাংস বাড়িতে কিনে এনে খেতে পারি না! শুয়োরও পবিত্র নয়। শুয়োরের মাংস খেতেই বা কি দোষ? শুয়োরের বাচ্চাগুলো পিলপিল করে বাড়ে—একটু যত্ন করে সাদা শুয়োরের চাষ করলে সারা দেশে অঢেল শুয়োরের মাংস পাওয়া যেতে পারত।

—এ দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো কোনো রকম মাছ-মাংসই খায় না। এটা অহিংসার দেশ।

—এ দেশে বেশি লোক কেন নিরামিষাশি, সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। আর্যরা ছিল ঘোরতর মাংসভোজী। তাদের বংশধর হয়ে আস্তে আস্তে আমরা কি করে নিরামিষাশি হয়ে গেলাম? পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এরকম নিরামিষ বাতিক নেই। শধু ভারতীয়রাই কেন এরকম? অহিংসা? এ দেশে মারামারি কাটাকাটি অন্য কোনো দেশের থেকে কম হয়? গৌতম বুদ্ধও মৃত্যুর আগে শুয়োরের মাংস খেয়েছিলেন।

—সে যাই হোক। কিন্তু অহিংসার প্রচারক সম্রাট অশোকও জীবহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেননি। অশোকের একটি ইনস্ক্রিপশনে আছে, যতদূর সম্ভব কম জীবহত্যা করবে। এমনকি রাজবাড়ির রন্ধনশালাতেও সপ্তাহে দু' দিনের বেশি ময়ূরের মাংস রান্না করার দরকার নেই! তার মানে, অশোক অন্তত দু'দিন মাংস খেতেন, কিংবা দু'দিন ময়ূরের মাংস, অন্যদিন অন্য মাংস!

কথায় কথা অনেক দূর গড়ল। অলিম্পিকে ভারতের লাস্ট হওয়ায় সে খুবই মর্মাহত হয়েছে। বারবার বলতে লাগল, উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদেব তেলেভাজা, ঘিয়েভাজা আর সন্দেশ-রসগোল্লা না খাইয়ে যে মাংস খাওয়ানো উচিত, এটা অনেকেই এখনো বোঝে না। বিশেষত যারা খেলাধুলো করে, তাদের রোজ মাংস না খাওয়ানো পাপ। নিশ্চয় পাপ!

বন্ধুটি বাসে উঠে গেল। আমার পর পর আর কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ট্রেনে একবার একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বয়েস তেইশ-চব্বিশ, উত্তরবঙ্গে কোথায় যেন একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ সময় কাটছিল। কৃষ্ণনগর স্টেশনে একটা বাচ্চা বাদামওয়ালার কাছ থেকে আমি চার আনার বাদাম কিনতে গেলাম, সে আমাকে গছিয়ে দিল আট আনার। অত বাদাম দিয়ে আর আমি কী করব! সহযাত্রী ছেলেটিকে বললাম, তুমিও নাও ভাই।

ছেলেটি প্রত্যাখ্যান করল।

আমি বললাম, লজ্জা পাচ্ছ নাকি? আরে নাও, নাও!

ছেলেটি মুখ বিকৃত করে বলল, নাঃ! চিনেবাদাম খেলে বড্ড অম্বল হয়!

আমি স্তম্ভিত। চিনেবাদামের খাদ্যপ্রাণের কথাই শুনেছি, অম্বলের কথা আগে কক্ষনো শুনিনি। আর এই ছেলেটির মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, এখনই অম্বলের ভয়? বাকি জীবনটা তা হলে কি ভাবে কাটাবে?

সেবারই ট্রেনে রাত্রে খাবার জন্য চিকেনকারি রাইস অর্ডার দিয়েছি। নিয়ে এল রেলের বিরাট থালা ভর্তি ভাত আর সামান্য দু' টুকরো মুরগি। ঝোলটা লাল টকটকে, ওপরে সর্ষের তেল ভাসছে—অর্থাৎ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর তেল দিয়ে জিনিসটার খাদ্যগুণ অনেকখানি নষ্ট করা হয়েছে, মাংসের টুকরো দুটিও দারুণ শক্ত। যাই হোক, আমি খানসামাকে বললাম, একঠো বর্তন হ্যায়? হিঁয়াসে ভাত উঠা লিজিয়ে। লোকটি জানাল, না, তার কাছে বর্তন নেই, হুজুর যেন সবটাই খেয়ে নেন। আমি বললাম, হাম তো রাক্ষস নেহি হ্যায় যে, ইতনা ভাত খায়েগা। শুধু শুধু নষ্ট করেগা কাঁহে? লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। সেই বিস্বাদ মুরগির ঝোল দিয়ে আমি সেই ভাতের এক-চতুর্থাংশ শেষ করতে পারলাম

না। বাকি ভাত সত্যিই নষ্ট হলো এবং এই অপচয়ের জন্য আমার গা করকর করতে লাগল। ভারতের সর্বত্রই ট্রেনে যে পরিমাণ ভাত বা রুটি দেয়, ততটা কোনো ভদ্রসন্তানের প্রয়োজন হয় না। সেই অনুপাতে মাছ বা মাংস বা তরকারি যৎসামান্য। অবশ্য আমি দেখলাম, আমার সঙ্গের ছেলেটি একটুকরো মাছের ঝোল দিয়েই পুরো ভাত সাবড়ে দিয়েছে। আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

আর একবার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সেবার আমি রাত্রে খাবার অর্ডার দিতে যেতেই ছেলে তিনটি বলল, না না, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন। আমাদের সঙ্গে বাড়ি থেকে তৈরি করা খাবার আছে, অনেক আছে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে খেতেই হবে। ছেলে তিনটির আন্তরিকতায় রাজি হতেই হলো।

যথা সময়ে ওরা টিফিন ক্যারিয়ার খুলল। তার মধ্যে ঠেসে ভর্তি করা লুচি ও শুকনো আলুর তরকারি। আমাকে ওরা জোর করে খানদশেক লুচি ও অনেকটা তরকারি দিয়ে দিল। দশখানা লুচি আমি জীবনে একসঙ্গে খাইনি। তা ছাড়া, ঠাণ্ডা লুচি ও আলুর তরকারি মোটেই আমার প্রিয়খাদ্য নয়। কয়েকটা লুচি ওদের ফিরিয়ে নিতে বললাম, ওরা কিছুতেই নেবে না, ভাবছে, আমি লজ্জা পাচ্ছি। ওরা দেখল, ওদের প্রত্যেকের ভাগেই দশখানা করে পড়েছে। সেই লুচি আর আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না। একটু একটু করে ছিঁড়ে মুখে দিই আর জল খাই। কোনো রকমে গোটা তিনেক খেলাম, তারপর ওদের অলক্ষ্যে এক একখানা ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম জানলা দিয়ে! ওরা কিন্তু পরম পরিতৃপ্তিতে সব কটা শেষ করল। ওরা বাইরের কেনা জিনিস খায় না। বাড়ির তৈরি খাঁটি জিনিস খায়। ওরা কিংবা ওদের বাড়ির লোক জানেই না, ঐ খাদ্যে খাদ্যমূল্য প্রায় কিছুই নেই। ট্রেনে মাছ-মাংস নিয়ে আসার অসুবিধে আছে। কিন্তু গোটা ছয়েক ডিমসেদ্ধ আনার কোনো অসুবিধে ছিল না। দেখে বোঝা যায় ওদের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। রাত্রে শোওয়ার সময় যখন জামা খুলল, দেখলাম, ওদের প্রত্যেকের গলায় মাদুলি। এই আমাদের দেশের যুবসমাজ। অথচ কী সরল, সুন্দর ওদের মুখ।

ট্রেন থেকে দেখা আর একটি দৃশ্য। কয়েকজন সাঁওতাল একটা মরা শুয়োর বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা জঙ্গল মতন, ওরা কোনো বুনো শুয়োর শিকার করেছে কিনা জানি না, অথবা নিজেদের শুয়োরই ঝলসাতে নিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। তখন মনে পড়ল, সাঁওতালদের মেঠো ইঁদুরও পুড়িয়ে খেতে দেখেছি। অনেকদিন আগে, ঘাটশীলায় দুর্গাপুজোয় পাঁঠা বলির সময় সাঁওতালরা এসে দাঁড়িয়ে থাকত—বলির পরে মাটিতে জমে থাকা থকথকে রক্ত তুলে নিয়ে যেত ওরা। শুনেছিলাম, ওরা নাকি জমাট রক্ত ভাজা করে খায়। রক্ত আবার কি করে

ভাজে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু পরে অনেকবার দেখেছি, খাদ্যের ব্যাপারে ওদের কোনো বাছ-বিচার নেই। এবং সাধারণভাবে সাঁওতাল পুরুষদের স্বাস্থ্য খুবই মজবুত। নাগাল্যাণ্ডে নাগারা শুনেছি একটা ফড়িং ধরলেও ডানা দুটো ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে—অর্থাৎ কোনো রকম প্রোটিন তারা নষ্ট করে না। এদের স্বাস্থ্যও ঈর্ষণীয়। সাঁওতাল বা নাগা বা অন্যান্য আদিবাসীদের কেউ কখনো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য তৈরি করার কথা ভেবেছে? আমেরিকায় নিগ্রোরা যতই অবহেলিত হোক, খেলার জগতে তাদের প্রাধান্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অলিম্পিকে আমি যতদূর জানি, তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাও আছে। সেখানে আমাদের কোনো সাঁওতাল বা নাগা তীরন্দাজদের কখনো পাঠিয়ে দেখার কথা আমরা চিন্তাও করি না!

এইসব এলোমেলো চিন্তাগুলিই লিখে ফেলছিলাম, এমন সময় আর এক বন্ধু এসে বলল, কী লিখছিস দেখি? পাতাগুলো তুলে চোখ বুলোতে বুলোতে বলল, তোর মাথায় আবার এসব ঢুকল কেন? টুকরো টুকরো গল্প লিখিস, সে-ই তো ভালো। অলিম্পিকে ভারত হেরেছে, তাতে এমন কি দোষের হয়েছে? বরং সেটাই আমাদের গৌরব। অলিম্পিকে এবার যে-সব ছোট ছোট দেশে অনেকগুলো প্রাইজ পেয়েছে, তারা খেলাধূলো ছাড়া আর কিছু জানে? সে-সব দেশের কোনো বড়ো লেখক, কবি বা শিল্পীর কেউ নাম শুনেছে আজকাল? অলিম্পিকে কবিতা লেখার কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যদি থাকত, দেখতি, ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালিদের সঙ্গে কেউ পারত না। ঐ এক ব্যাপারে বাঙালিরা চ্যাম্পিয়ান।

৭

রোজই রাত্তিরবেলা খুটখাট শব্দ শুনতে পাই। আমার ঘুম খুব পাতলা, একটু-আধটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়, খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকি। আর কিছু শোনা যায় না, আমার চোখের পাতা বুজলেই আর একবার শব্দ।

আমার ধারণা, রাত্রিবেলার একটা আলাদা জগৎ আছে। সে জগতের সবটুকু আমরা চিনি না। জীবনে বহুবার চেষ্টা করেও আমি ভূত দেখতে পাইনি, সুতরাং ভূত সম্পর্কে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। তবু কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটেই যায়। একদিন মাঝরাত্রে খুব বৃষ্টি, আমি বৃষ্টি দেখার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনের রাস্তায় কোনো লোকজন নেই, গাড়ি নেই, রাত প্রায় দুটো, শুধু অবিরাম

বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, কালো রঙের বৃষ্টি, আমার মনে হয় আকাশের সঙ্গে বুঝি এই পথটার একটা চুক্তি ছিল এই সময় বৃষ্টি হবার। তারপর আরো একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। সেই শুনশান রাত্তিরে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, একজন লোক রাস্তাটার ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটির গতিতে কোনো ব্যস্ততা নেই, বৃষ্টির জন্য ভ্রূক্ষেপ নেই, খুব প্রশান্ত তার ভঙ্গি। এই বৃষ্টির মধ্যে একটি লোক কেন ওরকমভাবে মধ্যরাত্রে হেঁটে যায়? লোকটিকে পাগল মনে হয় না। সে এমনভাবে হাঁটে যেন সমস্ত রাস্তাটাই তার। আমি মনে মনে লোকটির নাম দিয়েছিলাম পথের রাজা। এরপর আবার কখনো বৃষ্টি হলেই আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় দেখতে আসি। এ পর্যন্ত আর দেখিনি বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক আবার কোনো দিন ঐ লোকটিকে আমি দেখতে পাব অবিকল ওই রকমভাবে হাঁটতে।

কিন্তু মাঝরাত্রে আমার ঘরে খুটখাট আওয়াজ হবে কেন? এটা তো কোনো অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনো ইঁদুর। অনেকদিন আগে আমি একবার আমার মাথার কাছে জানলায় ঠকঠক আওয়াজ শুনেছিলাম গভীর রাত্রে। ঠিক যেন কেউ আমায় ডাকছে। প্রথমটায় বেশ চমকে উঠেছিলাম। তিনতলায় বাইরের দিকে জানলায় কে টোকা দেবে? কোনো চোর যাচাই করে দেখছে আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা? কিন্তু দেয়াল বেয়ে উঠবে কি করে? বিছানা ছেড়ে নেমে দেখেছিলাম, বাইরে কেউ নেই। অথচ টকটক শব্দ শুনেছিলাম ঠিকই। ব্যাপারটা সেই অবস্থায় ছেড়ে দিলে একটা রহস্যই থেকে যেত। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার শব্দ। এবার বোঝা গেল। একটা টিকটিকি, তার মুখে একটা জ্যান্ত আরশোলা। সেই আরশোলাটিকে মেরে ফেলার জন্য বারবার জানলার গায়ে ঝাপটা মারছে।

আজও খুটখাট শব্দ হবার পর বিছানা থেকে নামলাম। শীতের রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে ওঠা কি সোজা কথা! কিন্তু শব্দ হতে থাকলে ঘুমও আসবে না। অন্ধকারে হাঁটতে একটু ভয় ভয় করে। হঠাৎ ইঁদুরটার গায়ে পা পড়লেই সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। ইঁদুরে কামড়ালে নাকি প্লেগ হয়। তা প্লেগ হোক না হোক, ইঁদুরের কামড়ানো আমি মোটেই পছন্দ করব না। কোনোরকমে গিয়ে আলো জ্বাললাম।

কিন্তু আলোর মধ্যে কে কবে ইঁদুর দেখতে পায়? তবু এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে দেখলা[illegible] [illegible]হাস শব্দ করলাম কয়েকবার। ইঁদুরটা যেখানেই থাক, তাকে অন্তত বোঝানো গেল যে আমি জেগে উঠেছি, সে যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দু'মিনিট বাদে দরজার বাইরে জুতোর র‍্যাকে ঘটাঘট শব্দ হলো। এই রে, পরশুদিনই নতুন চটি কিনেছি। ইঁদুরে যদি সেটা কেটে দিয়ে যায়? এবার দৌড়ে

গিয়ে আলো জ্বেলে দরজা খুললাম। হ্যাঁ, জুতোগুলো একটু এলোমেলো হয়ে আছে, মূষিকপ্রবর নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল। অন্তত নতুন চটি জোড়া এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কোথায় রাখব? ঘরের মধ্যে এনে দরজা বন্ধ করে রাখা যায়। কিন্তু আমার ঘরের মধ্যেও খুটখাট শব্দ পাওয়া গেছে। ইঁদুরটা আমার ঘরের মধ্যে ঢোকে কি করে? মনে পড়ল ঘরের মধ্যে একটা নর্দমার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। নর্দমার মুখটা ঢেকে রাখা দরকার।

সে জায়গাটায় ঢাকা দেবার মতন উপযুক্ত কোনো জিনিস হাতের কাছে নেই। প্রথমেই মনে পড়ল একটা ইটের কথা। কিন্তু এত রাত্রে ইট পাব কোথায়? বই দিয়ে চাপা দেওয়া যায়। নর্দমার মুখে বই রাখব? সেরকম বাজে বই আমার শয়নকক্ষে থাকে না। আর আছে রেডিওটা। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। ইঁদুরটা খুব জ্বালাচ্ছে। একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করা দরকার।

ড্রয়ার থেকে টর্চটা বার করে সমস্ত ফ্ল্যাটটা খুঁজে দেখলাম। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আলো নিবিয়ে টর্চ হাতে করে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শীতে দাঁত ঠকঠক করছে। পাতলা জামা পরে বিছানা থেকে নেমে এসেছি।

একটু পরে রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে একটা কৌটো পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে টর্চের আলো। এবার মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম। ছোটখাটো ইঁদুর নয়। প্রায় একটা শুয়োরের বাচ্চার সাইজ। ধূসর রঙ, ধূর্তের মতন চোখ। টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইঁদুরটা পালাল না। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ভালো করে দেখে নিল, চোখাচোখি হলো দুজনের। সেই মুহূর্তে ও আমাকে বেশি ভয় পাচ্ছিল, না আমি ওকে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম, তা বলা শক্ত। পরের মুহূর্তে ডানদিকে একটা লাফ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এটা বাড়ির ইঁদুর নয়, রাস্তার ইঁদুর। বাড়িতে এত বড়ো ইঁদুর থাকে না। রাস্তার নোংরা থেকে একটা এত বড়ো ধেড়ে ইঁদুর তিনতলা বাড়ির ওপর উঠে এসেছে দেখে প্রথমে আমার বিস্ময়, তারপর ঘেন্নায় গা শিরশির করে। এটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মাঝরাত্রে ও পাড়া বেড়াতে বেরোয়, সুতরাং শুধু আজকের মতন তাড়ানোই যথেষ্ট নয়, ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এ বাড়িতে ওর প্রবেশ নিষেধ। কিংবা ওকে মেরে ফেললেই বা কী ক্ষতি? ও আমার কথা শুনবে না, মাঝে মাঝেই মাঝরাত্তিরে এসে আমার ঘুম ভাঙাবে।

যে দিকটায় বাইরের নর্দমা, সেদিকে টর্চের আলো ফেলে রেখে আমি এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গেলাম। তারপর আলনা থেকে একটা গরম জামা টেনে এনে পরে নিলাম তাড়াতাড়ি। এবার দরকার একটা লাঠি যোগাড় করা। লাঠিই

বা কোথায় পাই? বাড়িতে কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভ্যেসই করিনি। লাঠি ধরনের একমাত্র জিনিস আছে ঝুল-ঝাড়া। সেটা মোটামুটি শক্ত, কাজ চালানো যাবে। একটু বেশি লম্বা, তা হোক, যত দূর থেকে ইঁদুর নিধন করা যায় ততই ভালো।

ঝুল-ঝাড়াটা আছে বাইরের বারান্দায়। সেটা আনতে গেলে এই ফাঁকে যদি ইঁদুরটা পালিয়ে যায়। কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে। টর্চটা জ্বেলে মাটিতে শুইয়ে রেখে আমি ছুটে বারান্দা থেকে ঝুল-ঝাড়াটা আনতে গেলাম, তার ফলে অন্ধকারের মধ্যে আলমারির গায়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেলাম। ব্যথায় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সমস্ত রাগটা পড়ল ইঁদুরটার ওপর। জিঘাংসা বৃত্তি জেগে উঠল আমার মধ্যে। ইঁদুরটাকে আজ খুন করবই!

ঝুল-ঝাড়াটা নিয়ে এসে জুতোর র‍্যাকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ ইঁদুর মহারাজ এখনো সরে পড়েননি। কিন্তু আওয়াজ শুনে সেদিকে টর্চ ফেলি, কিছুই দেখতে পাই না। ইঁদুররা কি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হতে পারে? দিনেরবেলা পারে না নিশ্চয়ই, কিন্তু রাত্তিরবেলা সবই সম্ভব। বলেছি না, রাত্তিরের জগৎটাই আলাদা।

তখন আমার মনে হলো মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালানোই আমার অনুচিত হচ্ছে। আমার অবস্থান আমি শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার ভুল স্ট্র্যাটেজি। টর্চটা নিভিয়ে আমি একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক হাতে ঝুল-ঝাড়াটা উঁচু করে ধরা। ইঁদুরটাকে নর্দমার দিক দিয়ে পালাতে হলে জুতোর র‍্যাকের পাশ দিয়ে যেতেই হবে। ওখানে কয়েকটা কৌটো ছড়িয়ে রেখেছি, শব্দ হতে বাধ্য।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুটখাট শব্দ থেমে রইল। ইঁদুরটা কি দূর থেকে আমাকে লক্ষ করছে? ইঁদুর নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে পায়। আমি ওকে দেখছি না, ও আমাকে সরু চোখে দেখে যাচ্ছে—ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। শীতটা ক্রমশ জাঁকিয়ে আসছে, এ সময় একটা সিগারেট ধরালে বেশ হতো। কিন্তু সিগারেট জ্বাললেই ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

একটু পরে হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। একলা একলা হাসা একটা বোকা কিংবা পাগলের মতন ব্যাপার—কিংবা আমি ঐ দুটোই? শীতের রাতে আমি ঘরের বাইরে একটা ঝুল-ঝাড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই দৃশ্যের মজা আমি নিজেই উপভোগ করলুম।

আমার মনে হলো, আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছি, এটা আমার বাড়ি নয়, একটা গুহা। ঠিক সেকালের মতনই আমি গুহার বাইরে পাথরের মুগুর হাতে আমার শত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হাজার হাজার বছরেও এই

লড়াইয়ের ধরনটা একটুও বদলায়নি। বন্দুক, বোমা, কামান এমনকি অ্যাটম বোম দিয়েও এই ইঁদুরটাকে মারা সম্ভব নয়। একে মারতে হবে পিটিয়ে কিংবা বিষ খাইয়ে। তাও দিনের পর দিনের চেষ্টায়। একে মারলে আবার একটা আসবে। নর্দমার ঝাঁঝরি বন্ধ করলে ও আবার অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে নেবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার কত গুণ বেশি যেন ইঁদুরের সংখ্যা? লক্ষ লক্ষ টন ফসল ইঁদুরেই খেয়ে নষ্ট করে গুদামে। এতবড়ো দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ইঁদুর পুজো হয়।

অন্ধকারের মধ্যে শপাৎ শপাৎ করে কয়েকবার ঝুল-ঝাড়াটাকে পেটালাম মাটিতে। ছোটছেলেরা যেমনভাবে খেলা করে। এসব ব্যাপারকে খেলা হিসেবে নেওয়াই ভালো।

৮

আমার এক বন্ধু বলল, কত আর হাতে লিখে লিখে দরখাস্ত পাঠাবি, তার বদলে বরং কোনো প্রেস থেকে দরখাস্ত ছাপিয়ে নে। তাতে সস্তা পড়বে!

তখন আমার বেকার জীবনের তৃতীয় বৎসর চলছে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিনখানা করে দরখাস্ত পাঠাই। ওষুধের ডিপোর অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফরেস্ট গার্ড, ক্যানটিন ম্যানেজার, এল ডি ক্লার্ক, রেলের সিগন্যালার, স্কুল মাস্টারের কাজ—কিছুই বাদ দিই না। অধিকাংশ জায়গা থেকেই উত্তর আসে না, যেখান থেকে ডাক পড়ে, সেখানেও তিনটি পোস্টের জন্য তিন হাজার ছেলের পরীক্ষা, তার মধ্য থেকে কোন অলৌকিক উপায়ে তিনজনকে বেছে নেওয়া হয়, তা কখনো টের পাইনি। কখনো ইন্টারভিউ পর্যন্ত পৌঁছোলেও পাত্তা পাইনি। এক জায়গায়, আমার জামার একটি বোতাম খোলা ছিল বলে বকুনি খেয়েছিলাম। শুধু সেই দোষেই বোধহয়, চাকরিটা ফস্কে গেল।

প্রত্যেকবার দরখাস্ত পাঠানো মানেই পয়সা খরচ। অনেক জায়গায় পাঁচ টাকা বা দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার জুড়ে দেবার ব্যাপার থাকে। তা ছাড়া, দরখাস্তের সঙ্গে প্রতিবার পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট আর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট টাইপ করে দিতে হয়। নিজের বাড়িতে টাইপ রাইটার নেই, ফুটপাথের টাইপরাইটার-বাবুদের সামনে উঁচু হয়ে বসে সেগুলোও টাইপ করিয়ে নিতে হয়। তাতেও দু' আড়াই টাকা গচ্চা। বেকাররা এত টাকা পাবে কোথা থেকে, সে কথা কেউ বোঝে না। এর ওপর আবার আছে অ্যাটেস্ট করাবার জন্য গেজেটেড অফিসার খুঁজে

বেড়াবার ঝামেলা। বেকারের জীবন মানেই পদে পদে অপমান।

বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকি না, বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়াই। একটা দামড়া ছেলে, কোনো কাজ করে না, সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকে, এ দৃশ্য মোটেই সুখকর নয়। সকালের দিকে এ চায়ের দোকান, ও চায়ের দোকান, আর দুপুরের দিক কফি হাউস। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসই তখন আমাদের উপবন, গেলেই চেনাশুনো কারুকে না কারুকে পাওয়া যায়, হাফ কাপ কফিও ম্যানেজ হয়ে যায় ঠিকই। কিছু না খেয়েও টেবিলে বসে থাকলে বেয়ারারা কিছু বলতে সাহস পায় না, বেকার হলেও মেজাজটা তো কম নয়। কারুর সঙ্গে যে কোনো ছুতোয় একটা মারমারি বাধাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। সন্ধের দিকে একটা স্মার্ট মারামারি হলে শরীরটা বেশ টনকো তাজা মনে হতো।

যে দু'একজন ভাগ্যবান বন্ধু ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গেছে, মাঝে মাঝে হানা দিই তাদের অফিসে। তাদের ঘাড় ভেঙে কাটলেট বা মোগলাই পরোটা খাই, এবং নবাবের মতন হুকুম করি, কি রে, সিগারেট আনা! ভালো সিগারেট, কোয়ালিফায়েড! কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে, চলে আসার সময় ভুল করে তার সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ভরে নিই।

এইভাবে পর পর তিন বছর কেটে গেল। এখন সেই সব দিনের কথা ভাবলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কী চমৎকার দিন ছিল তখন! বেকারের জীবনের মতন এমন সুখের জীবন আর হয় না, এখন ভাবি!

যাই হোক, সেই সময় আর একটা জিনিস ছিল, খিদে। কী সাঙ্ঘাতিক সর্বগ্রাসী খিদে ছিল তখন, যেন পুরো পৃথিবীটাই খেয়ে ফেলতে পারি। দুপুরবেলা বাড়ি থেকে ভাতটাত খেয়ে বেরুলাম, আবার চারটে বাজতে না বাজতেই খিদে পেয়ে গেল! তখন কে খাওয়াবে? পকেটে হয়ত একটা নিঃসঙ্গ সিকি পড়ে আছে, সেটা রাখতে হয় ট্রাম-বাস ভাড়ার জন্য কিংবা রাত্তিরবেলা বাড়ি ফেরার সময় অন্তত দুটো সিগারেট তো কিনতেই হবে। খিদের জ্বালায় ছটফট করতাম সেই বিকেল থেকে। কখনো সামান্য কটা চিনেবাদাম, কখনো পরের পয়সায় এক কাপ চা বা কফি খেয়ে একটু খিদে চাপা পড়ে, আবার আধ ঘন্টা বাদেই পেট দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। রোজ প্রতিজ্ঞা করতাম, চাকরি পেলেই প্রথম দিন খুব ভালো করে মুরগির মাংস আর ফ্রায়েড রাইস সাঁটাতে হবে। বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে।

বেকারের পক্ষে প্রেম করা অপরাধ। তবু আমার মতন এমন হতভাগার জন্যও একটি মেয়ের খুব মমতা ছিল। দু'তিনদিন আমার সঙ্গে দেখা না হলেই সে অভিমান করত। মহাজ্বালা! তাকে নিয়ে আমি যাই কোথায়? বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে করে ধারের সব উৎস শুকিয়ে গেছে। কোনো হোটেল

রেস্টুরেন্টে ঢোকার উপায় নেই। হেঁটে হেঁটে ঘোরা যায় না। সব সময় অন্য কারুর দেখে ফেলার ভয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে আমার এক মাসতুতো দাদা তার প্রেমিকাকে নিয়ে যায়, ওখানে আমি যেতে পারি না। আমার ছোট কাকা ফুটবলের পোকা, যে-কোনো ছোটখাটো খেলা থাকলেও তার দেখতে যাওয়া চাই। সুতরাং, ময়দানের ওদিকটায় গেলে তার চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সেই জন্য সব অফিস ছুটির পর, ফাঁকা ডালহৌসি পাড়া দিয়ে হেঁটে হেঁটে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতাম।

সন্ধের পর নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং আগাগোড়া অন্ধকার। শুধু ছাদের একটা ঘরে আলো জ্বলে। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতাম, ঐ ঘরটা কার জানো? কেয়ারটেকারের। উনি শিগগির রিটায়ার করছেন। আমি ঐ পোস্টটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি, পেলেই যাব, প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে। তখন আমি ঐ ঘরটায় থাকব—কলকাতার বেস্ট ঘর, হুহু করছে হাওয়া, সামনে গঙ্গা—দারুণ হবে, না?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করত, তোমার সেই দার্জিলিং-এর চা-বাগানের চাকরিটার কি হলো?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিতাম, ওটা আর শেষপর্যন্ত নিলাম না। চা-বাগানের চাকরির মুশকিল কি জানো, ওরা টাকা অনেক দেয়, কিন্তু ওসব জায়গায় কোনো কালচারাল লাইফ নেই।

—তা হলে নাওনি ভালোই করেছো! আর নয়নপুরের রাজার সেক্রেটারির কাজটা?

—সেটা নিলাম না, কেন জানো? রাজার গায়ে দারুণ চুলকুনি আছে। তুমিই বলো, যার গায়ে চুলকুনি, তার সঙ্গে এক ঘরে বসে কাজ করা যায়?

তারপর আমাদের দুজনের হাসি মিশে যেত গঙ্গার বাতাসে। পেটে দারুণ খিদে, মনের মধ্যেও খিদে, তবু একটা তিরতিরে আনন্দ আছে।

এইভাবে তো তিন বছর কাটল, তারপর আমি ক্ষেপে উঠলাম। এইভাবে আর না, একটা চাকরি যোগাড় করতেই হবে। ততদিনে বুঝে গেছি যে, দরখাস্ত-ফরখাস্ত করে চাকরি পাবার আশা নেই, চাকরি পাবার একমাত্র উপায় ধরাধরি। কিন্তু সে রকম কোনো হোমরাচোমরা লোককে চিনিও না। একমাত্র ভরসা নবজীবন চৌধুরী। কী সূত্রে আমার সেজ মামার সঙ্গে যেন তাঁর খানিকটা পরিচয় আছে, সেজ মামা একবার আমাকে চিঠি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। নবজীবন চৌধুরী বিরাট লোক, চার-পাঁচটা কোম্পানির মালিক, তা ছাড়াও নানান কমিটি ও বোর্ডের মেম্বার, উঁচুমহলে খুব প্রতিপত্তি।

প্রথমবার দেখা করার পর উনি বলেছিলেন দু' মাস পরে আসতে। সেই দু' মাস পরে বলেছিলেন আরো চার মাস পরে। এরকমভাবে কয়েকবার ঘুরে ঘুরে আমি যাওয়া বন্ধ করেছিলাম, ওঁর সঙ্গে দেখা করাই বিরাট এক শক্ত কাজ। সব সময় ব্যস্ত, সব সময় অনেক মানুষ ওঁকে ঘিরে থাকে। আর সেই সব দামী দামী জামাকাপড় পরা লোকদের মাঝখানে আমার দীনের মতন বসে থাকতে লজ্জা করত।

তিন বছর কেটে যাবার পর মনে হলো, ঐ নবজীবন চৌধুরীই আমার শেষ অবলম্বন। উনি তো আমাকে নিরাশ করেননি, শুধু ঘুরিয়েছেন কয়েকবার। লেগে থাকতে পারলে ওঁর কাছ থেকেই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তখন যে-কোনো ছোটখাটো চাকরিতেই আমি রাজি। নতুন উদ্যমে আবার নবজীবন চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিই।

প্রথমবার গিয়ে শুনলাম, উনি কলকাতায় নেই, দিল্লিতে। তিন দিন বাদে ফিরবেন। চতুর্থ দিন গিয়ে শুনলাম, উনি কলকাতায় ফিরেই আবার ম্যাড্রাস চলে গেছেন। ফিরবেন দু'দিন বাদে। এই সব খবর শুনে কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। এঁরা যখন তখন দিল্লি-বোম্বাই-মাদ্রাজ যান। যদি যানই, তবু দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসেন কেন? বেড়াতে ইচ্ছে করে না? দিল্লি গিয়ে শুধু কাজ সেরে ফিরে এলুম, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। দিল্লির কাছাকাছি কত বেড়াবার জায়গা।

নবজীবন চৌধুরীদের মতন মানুষের বেড়াবার সময় নেই। সব সময় কাজ, সব সময় ব্যস্ত। ষাটের ওপরে বয়েস, তবু তিনি মাসের মধ্যে দু'তিনবার সারা ভারতে ওড়াউড়ি করে আসেন।

যখন উনি কলকাতায় থাকেন, তখনও ওঁকে ধরা শক্ত। সকালবেলা উনি দর্শনার্থীদের জন্য দু ঘন্টা সময় দেন। তা-ও ভিড়ের মধ্যে পেছনে বসে থাকতে হয় আমাকে, কথা বলার সুযোগ পাবার আগেই উনি ওপরে উঠে যান। একদিন শুধু ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আশ্চর্য ব্যাপার, এত ব্যস্ত মানুষ হয়েও উনি আমাকে চিনতে পারলেন, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো? আমি তারপরও কিছু বলতে গেলাম, উনি হাত তুলে বললেন, পরে শুনব, কাল এসো।

শেষপর্যন্ত আমি মরিয়া হয়ে গেলাম। সেদিনও ওঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পেয়ে, সব লোক চলে যাবার পর আমি আবার ফিরে এলাম। বসবার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, সেটা পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে চলে এলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছি, এমন সময় নবজীবন চৌধুরীর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা, আমি এতবার যাওয়া-আসা করছি বলে আমার মুখ ওঁর চেনা। উনি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

আমি কাকুতিমিনতি করে বললাম, আমার বিশেষ দরকার, একবার স্যারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, শুধু দু' মিনিট।

—কাল আসবেন!

—না। কাল নয় আজই। একেবারে জীবন-মরণের সমস্যা। যদি দয়া করে একটু ব্যবস্থা করে দেন।

ভদ্রলোকের সত্যি দয়া হলো। তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।

খানিকটা বাদে তিনি ফিরে এসে বললেন, আসুন!

তিনি নিয়ে এলেন খাবার ঘরে। বিরাট খাবার টেবিলে নবজীবন একা বসে আছেন। একজন ঠাকুর এসে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। নবজীবন চৌধুরী সদ্য স্নান করে এসেছেন, এখন খাবার টেবিলে চোখ বুজে কি একটা মন্ত্র পড়ছেন।

নবজীবন চৌধুরীর খাবার দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। এত বড়ো একজন মানুষের এই খাবার? হায়, হায়! শুধু দুখানা হাতে গড়া ছোট রুটি, একটুখানি পালং শাক, এক টুকরো মাছ আর একটা ছোট বাটি ভর্তি টক দই। যে-কোনো শিশুরও এতে পেট ভরবার কথা নয়! ওঁর ডায়াবিটিস আছে বলে ভাত খান না, হাই ব্লাড প্রেসার বলে বেশি মাছ-মাংস খাওয়াও নিষেধ। কত দাম এইটুকু খাবারের? বড়ো জোর দেড় টাকা দু' টাকা! এইটুকু ভোগের জন্য ওঁকে এত খাটতে হয়?

মানুষ কাজ করে তো আহার বাসস্থানের জন্য বিশেষত যে কাজের উদ্দেশ্য শুধু টাকা রোজগার। ওঁর সবই আছে, তবু এই বয়েসেও এত কাজ কেন? এমন কি খাবার সময়ে আপনজনও কেউ থাকে না। উনি বিপত্নীক। ওঁর এক ছেলে রানীগঞ্জে নিজস্ব কারখানা করেছে, সেখানেই থাকে—অন্য ছেলে বিলেতে মেম বিয়ে করে বিলেতেই সেটলড। একটি মাত্র মেয়ে কিছুদিন আগে ডিভোর্স করে বাবার কাছে ফিরে এসেছে বটে কিন্তু সে আবার সোস্যাল ওয়ার্ক করে বলে প্রায় সময়ই বাড়ি থাকে না।

নবজীবন চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, বলো?

কিন্তু আমি আর কি বলব? ততক্ষণে আমি ওঁকে করুণা করতে শুরু করেছি। আহা বেচারা! পেট ভরে খেতে পারে না, ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াতে পারে না। চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতন কে যেন ওঁর নাকে দড়ি দিয়ে সারাক্ষণ কাজের মধ্যে ঘোরাচ্ছে। সারাদিনে কোনো আপনজনের কাছ থেকে একটি স্নেহ ভালোবাসার কথাও শুনতে পায় না পর্যন্ত। ইস! ওর তুলনায় আমি কত সুস্থ, কত স্বাধীন। ওঁর কাছে আমার চাইবার কী আছে?

৯

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঙিন মানুষের শোভাযাত্রা দেখছিলাম। ঠিক পুজোর এই সময়টায় কলকাতার রাস্তায় অনেক রকম রঙ দেখা যায়। একেবারে টাটকা নতুন। কয়েকদিন আগে গড়িয়াহাট মোড়ে একটা দোকানের শো-কেসে সাজানো শাড়িগুলো দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে আমার শাড়ি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই, যতটা আছে শাড়ি পরিহিতাদের সম্পর্কে। কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর সব রং সেই সব শাড়ির, আমিই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম-- মেয়েরা যে এই সব শাড়ির দোকানে ঢুকে পাগল হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী!

পুজোর সময় কোনোবারই কলকাতায় থাকি না। সেবার ছিলাম। প্রত্যেকবারের মতনই, সেবারও কোথায় যেন বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম ঠিকঠাকই ছিল, হঠাৎ মহালয়ার দিন দুম করে জ্বর এসে গেল। এমনই জ্বরের দাপট যে কেউ বলে টাইফয়েড, কেউ বলল ম্যালেরিয়া। আমি গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি, শরীরে অসহ্য ব্যথা, চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না, কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। বেড়াতে যাবার প্রোগ্রামটা বাতিল করার পর যেমন দুম করে এসেছিল, তেমনি দুম করে জ্বর ছেড়েও গেল আবার। সপ্তমী পুজোর দিন আমি সিঙ্গি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম।

ক'দিনের জ্বরেই শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে, এখনো রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করার শক্তি নেই। বাড়ির সকলে বেরিয়ে গেলেও আমি বারান্দায় একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আপন মনে সময় কেটে যায়।

প্রতি বছরই এইরকম সময় কলকাতার রাস্তায় বেশ কিছু খোঁড়া ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক খোঁড়া নয়, খুঁড়িয়ে হাঁটে। কারণ, নতুন জুতোর ফোস্কা। ইস্কুলে পড়ার সময় আমারও ঠিক এইরকম হতো। বিশেষ কিছু এখনো বদলায় নি। মাঝে মাঝে দেখি, একসঙ্গে তিন-চারটি মেয়ে একই রঙের ফ্রক পরে যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা একই বাড়ির মেয়ে। সম্ভবত বোন। ছেলেবেলায় যখন অন্য পাড়ায় থাকতাম, ঘোষদের বাড়ির চার বোনকে প্রতিবার এইরকম এক রঙের ফ্রক পরে বেড়াতে যেতে দেখতাম। ওদের বাবা বড়বাজার থেকে এক থান কাপড় কিনে আনতেন, তাই দিয়ে সকলের জামা। ঠিক যেন কোনো খেলার দলের জার্সি। ব্যাপারটা ওদের খুব একটা মনঃপূত হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে, এখনো দু'একজন জেদি বাবা মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছে গ্রাহ্য করছেন না।

বাড়ির খুব কাছেই তিনটি পুজো প্যাণ্ডেল। তিনটেরই জাঁকজমক প্রায় সমান সমান। এবং বীরবিক্রমে তিনটি প্যাণ্ডেলের তিনটি মাইকে তিন রকম গান বাজে।

তাতে সে ঐকতান তৈরি হয়, সেটাকে একটা নতুন ধরনের সঙ্গীতই বলা উচিত। আমার বেশ লাগে। বিশেষত যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নবদ্বীপ হালদারের কমিক আর হিন্দী সিনেমার গান একসঙ্গে চলতে থাক, তখন বেশ একটা উচ্চাঙ্গের ডামাডোল তৈরি হয়, আমি খুবই উপভোগ করি। জ্বরে রোগা, দুর্বল শরীর নিয়ে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একা হাসি। হঠাৎ যদি কোনো কারণে মাইকগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এবং একসঙ্গেই বন্ধ হয়, তখন কিন্তু সেই উৎকট স্তব্ধতা রীতিমতন অস্বস্তিকর লাগে। যে-লোকের রাত্তিরবেলা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকে, তার নাক ডাকা যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন যেমন ভয় করে, মনে হয় লোকটা মরে গেল নাকি?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন পা ব্যথা হয়ে যায়, তখন ঘরের মধ্যে এসে বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। পুজো সংখ্যাগুলো এত আগে বেরোয় যে কবেই সব পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন আর নতুন পড়ার জিনিসও বেশি নেই। বাধ্য হয়ে একটা প্রবন্ধের বই-ই পড়ছিলাম, কিন্তু সপ্তমী পুজোর রাত্তিরে কারুর ঘরে শুয়ে প্রবন্ধ পড়তে ইচ্ছে করে? জ্বরটার ওপর এমন রাগ হচ্ছিল।

এই সময় হঠাৎ মনোযোগ অন্যদিকে গেল। কোনো কারণে দুটি প্যাণ্ডেলের মাইক সাময়িকভাবে বন্ধ, আর তৃতীয়টি থেকে একটি ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। একজন তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, আপনি যেখানেই থাকুন মল প্যাণ্ডেলের ডান পাশে আমাদের ভলান্টিয়ার্স রুমে এক্ষুণি চলে আসুন। আপনার বাড়ির লোকজন অপেক্ষা করছেন...লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র...

সন্ধের পর থেকেই মাঝে মাঝে এরকম হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। এটাও নতুন কিছু নয়। সেই আমাদের ছেলেবেলা থেকেই পুজো প্যাণ্ডেলে অনেকে হারিয়ে যায়। কেউ কেউ ভিড়ের চাপে ছিটকে পড়ে, কেউ ইচ্ছে করে হারায়। যদি কোনো পুটুরানীর বাড়ির লোকেরা খুব স্ট্রিকট হয়, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশতে না দেয়, তা হলে সে-পাড়ার গদাইদার সঙ্গে পুটুরানীর নিরিবিলিতে দেখা করার এই এক চমৎকার উপায়। পুটুরানী ভিড়ের মধ্যে ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়ে দেড় ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরলে কেউ বকবে না।

একটু বাদে আবার ঐ ঘোষণাটি শুনতে পেলাম। এবার ভাষাটি একটু অন্যরকম। এবার একজন কেউ গম্ভীর গলায় হুড়োহুড়ি করে বলল, লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, তুমি এক্ষুনি অফিস ঘরে চলে এসো, তোমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

আগের বার আপনি, এবার তুমি। লিপিকা মিত্রের বয়স কত? যদি বাচ্চা মেয়ে হয়? ছ'সাত বছরের একটি মেয়ে যদি বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে—তা হলে তো খুবই ভয়ের কথা! বহু লোকই অনেক দূর থেকে আসে

ঠাকুর দেখতে। মেয়েটি যদি বাড়ির ঠিকানা বলতে না পারে?

আর একটু পরে, লিপিকা মিত্রের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা গেল মাইকের ঘোষণায়। এবার বলা হলো : লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো। মা, দিদি ও কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছে, অনেকক্ষণ তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোনারপুর থেকে এসেছে, লিপিকা মিত্র—লাল রঙের শাড়ি পরা, অ্যাঁ কী বলছেন? লাল নয়, গোলাপী? লিপিকা মিত্র, গোলাপী রঙের শাড়ি পরা, বয়েস পনেবো—

এবার আমি বেশ চিন্তিত হয় পড়লাম। মেয়েটি সত্যিই হারিয়ে গেছে, কিংবা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল কেউ, নাকি ইচ্ছে করেই কারুর সঙ্গে গেল? পনেরো বছর বয়সটা যেমন সুন্দর, তেমনই সাঙ্ঘাতিক যে! ঐ বয়েসের অনেক মেয়েই হয় সরলতার মূর্তি, পৃথিবীর দিকে সুন্দর চোখ মেলে দেখে। আবার এই বয়সেরই অনেকের শরীরে জেগে ওঠে আঁচ, চিন্তাগুলি হঠাৎ হঠাৎ যুক্তিহীন হয়ে যায়। ভুল করারও নেশা জাগে। লিপিকা মিত্র কি ভুল করল।

ওর মা, দিদি আর কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা কবছে। বাবা নেই কেন? ওর মা কি বিধবা? এমনও হতে পারে, ওর বাবাকে যেতে হয়েছে কলকাতার বাইরে, কিংবা অফিসে ছুটি নেই, কিংবা তিনি অন্য কোনো পুজো প্যাণ্ডেলের পাণ্ডা, বাড়ির লোকদের নিয়ে বেড়াবার সময় নেই।

পরবর্তী ঘোষণাটি আরো মর্মান্তিক। লিপিকা মিত্র...কেউ যদি লিপিকা মিত্রকে দেখে থাকেন, এক্ষুনি খবর দিন, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, সোনারপুর থেকে লিপিকা মিত্র...

রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। ঘোষণাটি শুনছি আমি সাড়ে ন'টা থেকে। এই দু'ঘণ্টা লিপিকা মিত্রের মা পুজো কমিটির অফিস ঘরে অপেক্ষা করতে করতে আর থাকতে পারেননি। অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সোনারপুরের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে না এতক্ষণ? ওঁরা কি করে ফিরবেন? পুজো প্যাণ্ডেলে যতই ভিড় হোক, এই দু'ঘণ্টার খোঁজাখুঁজিতে নিশ্চয়ই একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েটি বোধ হয় খারাপ ধরনের নয়, কারণ বোঝাই যাচ্ছে, মেয়ের ওপর মায়ের খুব বিশ্বাস আছে, তিনি ঐ দু'ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় বসে আছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মেয়ে অন্য কোথাও যাবে না। এই মেয়েটি পাড়ার গদাইদার সঙ্গে নিভৃত আলাপ করার জন্য কোথাও চলে যাবে? আর, দু'ঘণ্টা ধরে কী এমন নিভৃত আলাপ থাকতে পারে? ওর বাড়ির লোকজন কেউ একজন সোনারপুরে গিয়ে খোঁজ করে আসছে না কেন? হয়তো সে নিজেই এতক্ষণে সেখানে ফিরে গেছে। পনেরো বছরের মেয়ের পক্ষে ট্রেনের টিকিট কেটে সোনারপুর যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়! এই তো কাছেই!

লিপিকা মিত্রের মায়ের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথাটা দু'তিনবার ঘোষণা করায় মনে হলো, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। ছেলে বা মেয়ে নিরুদ্দেশ হলেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে মা শয্যাশায়ী কিংবা পিতা মরণাপন্ন হয়, কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায়, মা বাড়িতে খানিকটা কান্নাকাটি করলেও বাবা লাঠি হাতে বসে থাকেন ছেলে বা মেয়ের ফেরার প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখানে বোধ হয় ব্যাপারটা তা নয়, লিপিকা মিত্রের মা নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে। পুজো কমিটির ঝানু মেম্বারদের হাত করা খুব কঠিন কাজ। হিন্দী গান বন্ধ রেখে তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যখন বার বার এই ঘোষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন ব্যাপারটা সহজ নয়।

এর পর আর একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। অন্য দুটি পুজো প্যাণ্ডেলে তাঁদেব নিজস্ব রুচির গান একযোগেই চলছিল। হঠাৎ সব থেমে গেল। এবং তিন জায়গা থেকেই তিন রকম কণ্ঠস্বরে ও তিন রকম আবেগে ঘোষণা হলো, লিপিকা মিত্র নামে একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন...তার বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সেখানে সে ফেরেনি, যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন...পাঁচকোনা পার্ক প্যাণ্ডেলে...লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো—

আমি শিহরিত হয়ে গেলাম। এই প্রথম বোধ হয় এ পাড়ার এই তিনটি পুজো প্যাণ্ডেল কোনো ব্যাপারে একমত হলো। এব আগে কখনো এ জিনিস দেখিনি।

আমার ইচ্ছে হলো পাঁচকোনা পার্ক প্যাণ্ডেলে গিয়ে লিপিকা মিত্রের মাকে একটু দেখে আসি। ওখানে নিশ্চয়ই একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটছে, আর আমি একা ঘরে বসে থাকব ? ঘর থেকে বেরিয়ে চটি পায় দিয়েও ফিরে এলাম। শরীর খুবই দুর্বল, ভিড়ের মধ্যে আমি নিজেই মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া, কোনো শোকার্ত মানুষের মুখ দেখতে আমার ভয় করে। সাধ করে আর কেন মনের মধ্যে আর একটা দুঃখিত মুখের ছবি জমিয়ে বাখা!

আবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইলাম। তিনটি মাইকেই এখন আবার তারস্বরে গান বাজছে তবু পরবর্তী ঘোষণার জন্য আমার উৎকণ্ঠা রয়ে গেল। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে। খাটে এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু জেগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আশ্চর্য আর কেউ লিপিকা মিত্র সম্পর্কে কোনো কথাই বলল না।

লিপিকা মিত্রকে কি পাওয়া গেছে ? সে কথাটাও তো জানানো উচিত ছিল! আমার মতন আরো অনেকেই নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় আছে। হারানোর বার্তা জানাবার পর কি প্রাপ্তি সংবাদও জানানো যায় না ? কিংবা, তাকে হয়তো এখনো পাওয়া যায়নি। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে! লিপিকা মিত্রের অজ্ঞান মাকে বোধ হয় পাঠিয়ে

দিয়েছে হাসপাতালে, তাতেই দায় মিটে গেছে সকলের। এখন আবার বিভিন্ন গানের চিৎকার প্রতিযোগিতা চলছে। প্যাণ্ডেলে এখন ঠাকুর দেখতে এসেছে নতুন মানুষ, তারা আগের কিছুই জানে না।

সারা রাত আমার ছটফট করে কাটল। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। আবছাভাবে দেখতে পাই, গোলাপী শাড়ি পরা পনেরো বছর বয়েসের একটি সরলমুখী মেয়ে কোন এক অনন্তের রাস্তা ধরে হাঁটছে, তার চোখে জল। হয়তো আজই সে পরেছে তাব জীবনের প্রথম শাড়ি, বার বার খুলে যাচ্ছে আঁচল, সে বিস্রস্ত, বিভ্রান্ত, একা, সে কোথায় যাবে তা জানে না—ধু-ধু করা রাস্তা, সামনে গাঢ় অন্ধকার।

আমার বুক কাঁপে, আমার কান্না এসে যায়।

১০

আমাদের এক বন্ধুর একটা বাড়ি ছিল মধুপুরে। এক সময় প্রায় প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় আমরা চার-পাঁচ বন্ধু মিলে সেখানে বেড়াতে যেতাম। বাড়িটা সারা বছর খালিই পড়ে থাকে, একজন মালি আছে দেখাশুনো করবার জন্য। বাড়ির পেছন দিকে মস্ত বড়ো বাগান, আম আর লিচু গাছে ভর্তি, সেই বাগানের ফলমূল সব মালিই ভোগ করে।

আমরা গেলে মালি খাতির-যত্ন করে খুব। তার রান্নার হাতটি চমৎকার, তার রান্না মুরগির মাংস খেলে আর কক্ষনো ভোলা যায় না। তার একটাই দোষ, তার হাতে টাকা দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে পাঠালে সে কিছুতেই খুচরো পয়সা ফেরত দেবে না। এমনকি পাঁচ টাকার নোট দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললেও বাকি টাকা লোপাট। প্রথম প্রথম আমরা লজ্জায় ভাঙানি ফেরত চাইতে পারতাম না। পরে চেয়ে দেখেছি, তাতে আরো বিপদ। চাইলে মুখ গোঁজ করে পয়সা ফেরত দেবে ঠিকই, কিন্তু সেদিন রান্নায় এমন ঝাল দেবে যে খাওয়ার পরে এক ঘন্টা ছটফট করতে হবে। এরপর থেকে, ছোটখাটো কিছু কেনার জন্য আমরা মালিকে না পাঠিয়ে নিজেরাই যাই, বাড়িটা শহর থেকে অনেকটা বাইরে, পালা করে আমাদের মধ্যে এক-একজনকে সাইকেল নিয়ে যেতে হয়।

সারাদিনে ঐটুকু পরিশ্রম করা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ নেই। প্রথম দু'এক বছর আমরা নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি—এক একদিন বেড়াতে গেছি এক এক জায়গায়—গিরিডির উশ্রী জলপ্রপাত, দেওঘর, শিমুলতলা—যেসব

জায়গায় সকলেই যায়। তারপর সব জায়গা দেখা হয়ে গেল, পুরোনো হয়ে গেল, তখন সারাদিন শুধু আড্ডা খাওয়া আর তাস। শরীরের জড়তা কাটাবার জন্য আমরা বিকেলের দিকে বাড়িটার বাগানের মধ্যেই হুটোপুটি করি।

আমাদের মধ্যে সুনন্দ খুব চমৎকার গান করে। তার গলার আওয়াজটা অনেকটা ফৈয়াজ খাঁর ধরনের। ওর সঙ্গে যদি আমরাও কোরাসে যোগ দিই, তাহলে সেই প্রচণ্ড শব্দ বোধহয় এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। কোজাগরী পূর্ণিমায় আমরা লিচু বাগানে বসে প্রাণের আনন্দে গান ধরি, সেই গান শুনে দূর থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে।

একবার অবশ্য আমরা অন্যরকম শ্রোতা পেয়ে গেলাম। গানের মাঝখানে ভাস্কর হঠাৎ আমার গা টিপে বলল, ঐ দ্যাখ! তার আঙুলের সোজাসুজি তাকিয়ে দেখলাম, বাগানের পাচিলের ওপাশে দুটি মুখ। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, দুটি মেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রথমটায় একটু শিউরে উঠলুম।

আমাদের যে বন্ধুটির বাড়ি, তার নাম নৃসিংহ। এরকম ভয়াবহ নাম হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু ভারি শান্ত ও লাজুক। এবং সে ভূতের গল্প খুব ভালোবাসে। এই বাড়িটা সম্পর্কেই সে বানিয়ে বানিয়ে অনেক ভূতের গল্প বলেছিল, আমরা যদিও ভূতের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাইনি। তবু জ্যোৎস্না রাত্রে পাঁচিলের পাশে দুটি মেয়ের মুখ দেখে আমি সামান্য ভয় পেয়েছিলাম। এ বাড়িটার কাছাকাছি আর কোনো বাড়িই নেই। সিকি মাইল দূরে অনেক গাছপালা দিয়ে ঢাকা আর একটা বাড়ি আছে, সেখানকার মানুষজন কিছুই দেখিনি, মাঝে মাঝে ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাই। শুনেছি, সে বাড়িটার মধ্যে একটি কালীমন্দির আছে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, অশরীরী নয়, সত্যিই দুটি যুবতী মেয়ে। বাইশ-তেইশের মতন বয়েস। আমরা গান থামাতেই মুখ দুটি সরে গেল। আমরা তখন মাথা নিচু করে দৌড়ে পাঁচিলের কাছে চলে এলাম। উঁকি মেরে দেখলাম খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে সেই মেয়ে দুটি হেঁটে যাচ্ছে। সেই কালীবাড়িটির দিকে।

পরদিন সন্ধেবেলা আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গান ধরলাম লিচু বাগানে। চিৎকারের চোটে গলা ফেটে যাবার মতন অবস্থা। কিন্তু সেদিন আর কোনো শ্রোতা পাওয়া গেল না। পরের দিনও না। মেয়ে দুটির আর দেখা নেই। এরপর থেকে আমরা গান গেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম এবং সেই বাগানঘেরা বাড়িটি, যার মধ্যে কালীমন্দির আছে, সেখানে সেই মেয়ে দুটির সন্ধান পাওয়া গেল। কখনো দূর থেকে তাদের সামান্য শাড়ির আভাস, দু'একটা টুকরো কথা বা চকিতে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে যাওয়ার দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবে

এটুকু বোঝা গেছে, মেয়ে দুটি বেশ সুন্দরী। সুতরাং আমাদের আড্ডা-ফাড্ডা একদম ঘুচে গেল। এত কাছাকাছি দুটি সুন্দরী মেয়ে, অথচ আমাদের সঙ্গে ভাব হবে না? বুকের মধ্যে দারুণ জলতেষ্টা পাবার মতন একটা ভাব, কখন ওদের সঙ্গে একটু দেখা হবে। আমরা ঐ বাড়িটার চারপাশে ঘুরঘুর করি। ভেতরে ঢোকার সাহস হয় না। বাগানে এক-এক সময় হাতে-গলায় মাদুলি-তাবিজ পরা একজন তাগড়া চেহারার প্রৌঢ়কে দেখি। উনিই বোধহয় কালী-পূজারী।

দু'একদিন পর এক দুপুরে আমাদের মালি একটা বিরাট পেতলের থালা ভর্তি অনেক সন্দেশ নারকোল নাড়ু, কাটা আম, লিচু ইত্যাদি নিয়ে এল। বলল, কালীবাড়ি থেকে ভটচার্যিবাবু আমাদের জন্য প্রসাদ পাঠিয়েছেন। আমরা অবাক! পর পর তিন বছর মধুপুরে এলাম, কোনোদিন তো আমাদের জন্য প্রসাদ আসেনি। তা-ও এতখানি! যাক, খেয়ে তো নেওয়া যাক!

বিকেলবেলা মালি নিয়ে এল একখানি চিঠি। ঐ ভটচার্যিবাবুই পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ডিয়ার ব্রাদার্স, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য আগ্রহী। সন্ধেবেলা আসুন না? আপনাদের কারুর কি তাস-টাস খেলা আসে? ব্রিজ? আমাদের এখানে একজন পার্টনার কম পড়েছে। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ খেলতে চান, খুশি হবো। ইতি দেবনাথ ভট্টাচার্য।'

আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলুম। আমরা ঐ বাড়িতে ঢোকার ছুতো খুঁজছিলুম। তার মধ্যে হঠাৎ এই সাদর আহ্বান।

আমরা পাঁচজনের মধ্যে চারজনই তাস খেলা জানি। সুনন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, এই, আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, আমি ওখানে তাস খেলতে বসব, তোরা কেউ নাক গলাবি না!

বিষ্ণু তাস খেলা জানে না। সে হেসে বলল, ঠিক আছে। তোরা তাস খেলার দিকে থাকিস, আমি ততক্ষণ মেয়ে দুটির সঙ্গে গল্প করব!

আমি বললাম, তুই একজনের সঙ্গে আর আমি আরেকজনের সঙ্গে।

সুনন্দ বলল, আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

ভাস্কর বলল, শোন, আমি একটা ভালো কথা বলছি, আমরা পাঁচজনে মিলেই যদি মেয়ে দুটির সঙ্গে হিড়িক দেবার চেষ্টা করি, তাহলে কেস খারাপ হয়ে যাবে। তার বদলে, একটু জমে ওঠার পর, আমরা লটারি করব। যে দু'জনের নাম উঠবে, তারা এগিয়ে যাবে, বাকি তিনজন পেছন থেকে মদৎ দেবে। উইদাউট জেলাসি!

কালীমন্দিরের পুরোহিত বলতে যে-রকম মানুষের কথা মনে আসে, দেবনাথ ভট্টাচার্য মোটেই সেরকম নয়। খুব আমুদে ও আড্ডাবাজ, কথার মধ্যে প্রায়ই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন। আমাদের খুব উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা করলেন। বসবার

ঘরটি বেশ সাজানো,মেঝেতে কার্পেট পাতা, আলমারিতে পুরো রবীন্দ্র-রচনাবলী।

আমাদের বসিয়ে রেখে তিনি পুজো করতে গেলেন, আধ ঘণ্টা বাদে ফিরে এসে বললেন, চা খাবেন, না কফি? আর যদি কারণবারি চলে, হে-হে-হে-হে, আমার কাছে হুইস্কিও আছে। দাঁড়ান, ফিস ফ্রাই ভেজে আনছি, আমার নিজের রান্নাবান্নার শখ আছে, একদিন আপনাদের ভিণ্ডালু খাওয়াবো, দেখবেন, কলকাতার কোনো হোটেলেও...

স্থানীয় পোস্ট মাস্টার এবং একজন রিটায়ার্ড রেলের ক্লার্ক এলেন একটু বাদে। এঁরা দেবনাথ ভট্টাচার্যির তাস খেলার নিত্য সঙ্গী। অপর পার্টনার, রেলের মালবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চার সেট তাস বেরুল, দারুণ দামী। প্লাস্টিক ফিনিস। বেশ বোঝা যায়, তাস খেলাটা এ বাড়িতে একটা প্রায় উৎসব।

আমরা বসে গেলাম। এবং প্রথম দিনই খেলা চলল রাত দুটো পর্যন্ত।

পরদিন থেকে আমরা সকাল-বিকেল ওবাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলাম। দেবনাথবাবু হয়ে গেলেন দেবুদা। আমাদের সবাইকে নাম ধরে তুমি করে ডাকতে লাগলেন। ওঁর সাঙ্ঘাতিক তাসের নেশা। সকালে আর সন্ধেবেলা কিছুক্ষণের জন্য পুজোয় বসেন, তারপর বাকি সব সময় তাস খেলা। দারুণ খাতির-যত্ন করতে লাগলেন আমাদের। আর সাঙ্ঘাতিক খাওয়া, নানারকম মাছ-মাংস, খাঁটি ঘিয়ের লুচি, পোলাও—আমাদের বাড়িতে খাওয়ার পাটই উঠে গেল। দেবুদা বেশ অবস্থাপন্ন, যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে, মন্দিরের উনি বাইরের লোকদের কাছ থেকে প্রণামীর টাকা নেন না। অর্থাৎ কালীমন্দির চালানো ওঁর ব্যাবসা নয়।

মেয়ে দুটির নাম কুহু আর কেকা। পিঠোপিঠি দুই বোন। আর একটি ছোট বোন আছে, তার নাম পিউ। ওদের সঙ্গেও খানিকটা ভাব হয়ে গেছে। আমাদের চা দিতে আসে, দু'একটা কথাও বলে। আমাদের সঙ্গে ওদের চোখে চোখ পড়লে ঠোঁটে পাতলা কুয়াশার মতন একটু হাসি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ আমাদের অপছন্দ করেনি। ওরা দু'জনেই সম্প্রতি পাটনা কলেজ থেকে বি-এ পাস করে এসেছে, বেশ সপ্রতিভ মেয়ে দুটি। একদিন দেবুদা বললেন, আমার মেয়েরা বলছিল, তোমরা গান জানো—তা একটু গান-টান শোনাও না। হারমোনিয়াম আছে, বার করব?

আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, গানের অনুরোধ এলে আমাদের মধ্যে কেউ একা গাইতে পারবে না। আমরা কোরাস গাইব। কারণ সুনন্দাটা খুব ভালো গান জানে, ও একা গাইলেই মেরে বেরিয়ে যাবে। হিরো হয়ে যাবে মেয়ে দুটির চোখে।

সেদিন অনেকক্ষণ গান-টান হলো। কুহু আর কেকাও গান শোনাল আমাদের।

বেশ ভাব জমে উঠেছে। দেবুদার স্ত্রী খুব শান্ত ও মৃদুভাষী। একটু বেশি মোটা এই যা, তিনি একপাশে বসে হাসিমুখে গান শুনলেন, আর মাঝে মাঝে অনুরোধ করলেন আর একটা গান গাইবার জন্য।

সেদিন বাড়ি ফিরে আমি বললাম, আর দেরি করে লাভ নেই ভাই, এবার লটারিটা করে ফেলা যাক।

কিন্তু লটারির আইডিয়া যার মাথায় এসেছিল, সেই ভাস্করই আমতা-আমতা করে বলল, আর বোধ হয় লটারি করে লাভ নেই। কুহু মেয়েটা বড্ড আমার দিকে ঝুঁকেছে। এখন যদি লটারিতে আমার নাম না ওঠে, সেটা খুব খারাপ হবে! মেয়েটার মনে দুঃখ দেওয়া হবে না?

আমরা সবাই রে-রে-রে-রে করে উঠলাম।

সুনন্দ বলল, ওসব চালাকি ছাড়ো, মানিক! কুহু তো আমার দিকেও আজ পাঁচবার আলাদাভাবে তাকিয়েছে। তাহলে ওর ওপর আমারও ক্লেম আছে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য আর লটারির প্রয়োজন হয়নি। সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভয়ের চোটে ওখান থেকে পালিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা হয়েছিল এইভাবে। দেবুদা তাস খেলায় প্রায় জাদুকর। সকলের হাতের তাস হিসেব করে এরকম নির্ভুল কল দিতে আমি আর কারুকে দেখিনি। সেই জন্যই একদিন বলেছিলাম, দেবুদা, আপনি এত ভালো খেলেন, কোনো কমপিটিশনে নাম দেন না কেন? আপনি তো ইচ্ছে করলে অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন!

দেবুদা হেসে বললেন, ওসব আমার ভাগ্যে নেই ভাই! তোমরা জানো, গত তিরিশ বছরের মধ্যে আমি একদিনও এ বাড়ির বাইরে কোথাও থাকিনি! একদিনও না। তিরিশ বচ্ছর কলকাতা দেখিনি।

—সে কি? কলকাতা তো কাছেই!

—তা হোক। কিন্তু একবেলার মধ্যে তো যাতায়াত করা যায় না! আমাকে যে সকাল-সন্ধে মায়ের পুজো করতে হয়।

—কিন্তু দু'একদিনের জন্য অন্য কেউ পুজো করতে পারে না?

—না। আমার শ্বশুরের উইল আছে, আমাদের ফ্যামিলির কারুকেই পুজো করতে হবে। আমি ছাড়া আর তো পুরুষ কেউ নেই। আমারও এমন কপাল, তিনটিই মেয়ে হলো, ছেলে হলো না। আমার অসুখ-বিসুখ হলে অন্য পুরুত আসতে পারে। কিন্তু সুস্থ থেকেও যদি পুজো না করি, সেটা পাপ হবে।

তিরিশ বছর একটা লোক এই জায়গার বাইরে কোথাও যায়নি। ভাবলেই কি রকম দম আটকে আসে। অথচ লোকটি আড্ডাবাজ, নানারকম শখও আছে,

নিছক ভক্ত টাইপ নয়।

দেবুদা বললেন, এ ঠাকুর হচ্ছেন আমার শ্বশুরের স্বপ্নে পাওয়া। স্বপ্নে মা বলেছিলেন, আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রোজ বাড়ির লোক দিয়ে পুজো করবি। আমার শ্বশুররা দুই ভাই ছিলেন, তাঁরা পালা করে পুজো করতেন। এখন আমি পড়ে গেছি একলা! আমি এখানে কী করে এলাম জানো! আমি নদীয় জেলার মানুষ। কলকাতার মীর্জাপুরের এক মেসে থেকে বি-কম পড়তাম। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে একদিন একটি মেয়েকে দেখে খুব ভালো লাগল। এমনই ভালো লাগল যে লাভে পড়ে গেলাম। রোজ মেয়েটিকে ফলো করি। একদিন একজন যণ্ডা মতন লোক আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার নাম-ধাম, বংশপরিচয় দাও। সব বললাম। উনি বললেন, তুমি এই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিয়েছ, তার মানে ওকে তোমার পছন্দ হয়েছে ? কেমন ? আমি মাথা নাড়লুম। উনি বললেন, তাহলে এই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে রাজি আছ ? ভেবে দ্যাখো, এমন প্রস্তাব, আমার হাত চেপে ধরে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ, রাজি। সেই লোকটিই আমার শ্বশুর। সেই মাসেই আমাদের বিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে এনে বসালেন। বিষয়সম্পত্তি আছে প্রচুর, সব দেবোত্তর করা। আমার এমনিতে অসুবিধে কিছু নেই, শুধু এই এক পুজো বন্ধ করে অন্য কোথাও যাওয়া চলে না। তাই তাস আর রান্নবান্না নিয়ে আছি। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আর অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতেই পারব না।

একটু থেমে বললেন, এখন আমারও তো বয়েস হচ্ছে। এবার মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে হবে। তোমাদের চেনাশুনো ভালো ব্রাহ্মণ পাত্র আছে নাকি ?

এই বলে, দেবুদা আমাদের মধ্যে বেছে বেছে শুধু বিষ্ণু আর আমার দিকেই পর্যায়ক্রমে খুব সস্নেহে তাকাতে লাগলেন। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে বিষ্ণু আর আমিই শুধু বামুন। দেবুদা বুঝি সেকথা জেনে ফেলেছেন—সেইজন্যই কি এত আদর-যত্ন, এত খাওয়া-দাওয়া।

শুকনো ভাবে দু'একটা কথা বলে সেদিন আমরা গুটিগুটি সরে পড়লুম। আর ও বাড়িমুখো হইনি। পরদিনই আমরা মধুপুর থেকে হাওয়া। বাবাঃ! জোর-জার করে বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি!

১১

মাইকেল মধুসূদনের দেড়শততম জন্মবার্ষিকীতে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম সাগরদাঁড়িতে। মাইকেল তাঁর এপিটাফে সাগরদাঁড়ি গ্রামটির নাম বহু স্মরণীয় করে গেছেন। 'যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে'—এই পরিচয় কে না জানে।

যশোর শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মূল সড়ক ছেড়ে কয়েক মাইল ধুলো-ওড়ানো কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম সাগরদাঁড়িতে। সেখানে দেখলাম রীতিমতন একটা মেলা বসে গেছে। পাঁপরভাজা, ভেঁপু, নাগরদোলা ইত্যাদি সবই আছে, দূর দূর গ্রাম থেকে মেয়ে-পুরুষরা এসেছে সেই মেলায়। তার নামই দেওয়া হয়েছে মাইকেল মেলা। একপাশে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এক বিশাল মঞ্চ, সেখানে থেকে মাইকে অবিশ্রান্তভাবে মাইকেলের কবিতা পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, তার এক বর্ণও সেই মেলা-দেখতে-আসা মানুষেরা বুঝতে পারছে কিনা সন্দেহ। তবু পরিবেশটা বেশ ভালো লাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ঠিক পরে পরেই উৎসাহ-উচ্ছ্বাস যখন বেশ প্রবল মাত্রায় ছিল, এটা সে সময়কার ঘটনা।

দত্ত কুলোদ্ভব কবির পৈতৃক ভিটা ভাঙাচুরো অবস্থায় এখনো কিছুটা টিকে আছে। একপাশে তৈরি হয়েছে নতুন গেস্ট হাউস ও লাইব্রেরি। একটা বুড়ো ধরনের জামরুল গাছের (কিংবা কদম গাছও হতে পারে, ঠিক মনে পড়ছে না) গুঁড়ি চারপাশ লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন ভলান্টিয়ার বলল, মাইকেল এখানে বসে বসে কবিতা লিখতেন।

প্রতিবাদ না করে ঠোঁট টিপে হাসলুম। খুব অল্প বয়সে মাইকেল হয়ত দু'একবার এখানে এসেও থাকতে পারেন, কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার পর যে রকম ঘূর্ণিঝড়ের মতন তাঁর জীবন কাটে, তাতে আর জন্মস্থানে আসার কোনো সময় ছিল না। গাছতলায় বসে কবিতা লেখা আর যাকেই মানাক, মাইকেলকে কিছুতেই মানায় না। তবু বিখ্যাত লোকদের নিয়ে এরকম কিছু গুজব চলতেই থাকে। আমাদের এক বন্ধু বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে একজন লোক তাকে একটি লোহার দোলনা দেখিয়ে বলেছিল, এই দোলনায় রাধাকৃষ্ণ দুলতেন। বন্ধুটি উঁকি মেরে দেখে সেই লোহার রডে টাটা কোম্পানির ছাপ মারা। সে তখন সবিস্ময়ে বলেছিল, টাটা কোম্পানি যে তিন চার হাজার বছরের পুরনো সে কথা তো জানতাম না!

অতিথি ভবনে বসে আমরা নানা রকমভাবে আপ্যায়িত হতে লাগলুম। ওখানে প্রচুর ডাব পাওয়া যায়। আমাদের জন্য গেলাসের পর গেলাস ডাবের জল আসতে লাগল। ডাবের জল দেখলেই আমার ইচ্ছে করে তার মধ্যে একটু জিন মিশিয়ে

দিতে। তাতে অতি উপাদেয় পানীয় তৈরি হয়।

দুপুরবেলা মিটিং শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশের কয়েকজন মন্ত্রী ও অধ্যাপক রয়েছেন। সভাপতি মনোজ বসু। সেই সময় আমাদের কয়েকজনের ইচ্ছে হলো কপোতাক্ষ নদীটা একবার দেখে আসার। খুব কাছেই। কপোতাক্ষ নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। নদীর এমন সুন্দর নাম কে রাখে? মাইকেল রাখেননি। বোধ হয় আগে এই নদীর নাম ছিল কবোদাক বা এই ধরনের কোনো অনার্য শব্দ। কেউ তাকে চমৎকারভাবে বদলে দিয়েছে। নদী প্রান্তে এসে কিন্তু মনটা বড্ড দমে গেল। এ কী চেহারা নদীর! এই নদীর কথা সতত মনে পড়ত মাইকেলের? (এতক্ষণ একটা ভুল করেছি, নদী নয় তো, কপোতাক্ষ একটি নদ। কোন নদী নারী হবে, আর কোনটা পুরুষ—এটা কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি ঠিক করে দিয়ে গেছেন, আমি আজও জানতে পারিনি।) কপোতাক্ষ আসলে একটা ছোট্ট খালের মতন, জল একদম ঘোলাটে। পৃথিবীর সব নদীই আস্তে আস্তে এমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এক সময় এই নদী দিয়েই নাকি স্টিমার চলত, অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। কে এখন দেখে বুঝবে সে কথা। এ যেন দান্তের বিয়েত্রিচে এখন আশি বছরের বুড়ি।

চেহারা যাই হোক, কাব্যে যে অমর হয়ে আছে, সেই নদীকে একটু উপভোগ করার লোভ আমরা সামলাতে পারলাম না। ভলান্টিয়ারদের নজর এড়িয়ে সন্তোষদা, ময়ূখ আর আমি একটা নৌকোয় চড়ে বসলুম। নৌকোর মাঝিটি অতি প্রাচীন। আমাদের নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার তেমন উৎসাহ নেই। আমরা পয়সা দিতে প্রস্তুত, তবু সে বারবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন? কোথাও যাব না। শুধু নদীর ওপরেই একটু ঘুরে বেড়াব—আমাদের এ প্রস্তাব সে বিশেষ পছন্দ করে না। অধিকাংশ মানুষই তাদের জীবন কয়েকটি প্রয়োজনের সীমানায় বেঁধে নেয়—অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজকেই তারা সন্দেহের চোখে দেখে। বোঝাই যায়, এ নদীতে এর আগে কেউ কখনো নৌকোয় চেপে বেড়ায়নি। আমরা মানুষ না হয়ে এক বোঝা খড় হলে বৃদ্ধ মাঝিটি খুশি হতো।

যাই হোক, আমরা উঠে যখন বসেছি, সহজে নামছি না। নৌকো চলল আস্তে আস্তে। একটু বাদেই বোঝা গেল, আমাদের তুলনায় নৌকোটি বেশ পলকা, আমরা একটু নড়াচড়া করলেই টলমল করে। এবং নদীটি চওড়ায় ছোট হলেও জল বেশ গভীর। তবু আমরা ভেসে গেলুম বেশ খানিকটা দূরে।

নৌকোর মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, মিঞা ভাই, মাইকেল কে ছিলেন, আপনি তা জানেন? যাঁর নামে এই মেলা হচ্ছে?

মাঝি উত্তর দিল, খুব বড়ো মানুষ ছিলেন।

—কিসে বড়ো মানুষ ?

—তা তো জানি না কর্তা। তবে ওনার নামে মেলা হতিছে যখন, তখন উনি বড়ো মানুষ ছেলেন তো বটেই।

অকাট্য যুক্তি। এ রকম সরলভাবে সব বোঝাই ভালো। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই মাইকেলবাবুর বাড়িতে যখন লোকজন ছিল, সেই সময়কার কথা আপনার মনে আছে ?

বৃদ্ধটি স্বল্পভাষী। খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, এক সময় দত্তবাবুদের বাড়িতে খুব বড়ো দুর্গা পূজা হতো।

খানিকটা দূর ভেসে যাবার পর ওপারের সবুজ মাঠ আমাদের আকর্ষণ করে। ইচ্ছে করে ওপারে নেমে একটু ঘুরে আসতে। সে কথা আমাদের মাঝিকে বলতেই সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না, ওপারে যাওয়া যাবে না!

আমরা অবাক। কেন, পয়সা দিয়ে নৌকো চাপছি, ওপারে নামতে পারব না কেন ? কিন্তু বৃদ্ধটি সে কথা শোনে না। সে বলে, ওপারে নামতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে। এখানে কাছাকাছি নামা যাবে না।

কাছেই দেখতে পাচ্ছি সবুজ ঘাসভরা মাঠ, তবু লোকটি কেন সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে চায় না, তা বোঝা গেল না কিছুতেই। বুড়োটি বড়ো জেদি তো! সন্তোষদার সব সময় হুকুম করার অভ্যেস, তিনি নদীবক্ষে সেই টলমল তরণীটিকে সংবাদপত্রের অফিস মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কেন যাবে না ? আমি জানতে চাই—

সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে নৌকোটি একদিকে কাৎ হয়ে পড়ল, সন্তোষদা ঝপাং করে জলে পড়ে গেলেন। এবং আমাদের দ্বিতীয়বার বিমূঢ় করে দিয়ে উনি পাক্কা খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে শুধু হাতের ভর দিয়ে চট করে উঠে এলেন নৌকায়। তাঁর অঙ্গে কোট-প্যান্ট ও মোজা-জুতো সমেত পরিপূর্ণ স্যুট, সমস্ত ভিজে জবজবে, সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে দিতে হলো, মানিব্যাগের অবস্থা করুণ।

কিন্তু আমরা সঙ্কল্প ছাড়লাম না, ওপারে যাবই। সিক্ত অবস্থাতেই সন্তোষদা হুকুম করে যেতে লাগলেন, নৌকো ওপারের কাছাকাছি ভিড়তেই আমি ডাঙার উদ্দেশ্যে লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোমর পর্যন্ত গেঁথে গেলাম কাদায়। তখন বুঝলাম, কেন মাঝিটি আমাদের ও পারে নামাতে আপত্তি করছিল। কিন্তু আমাকে সেই অবস্থায় দেখে সন্তোষদা আর ময়ূখের কি হাসি। এর আগে সন্তোষদা জলে পড়ে যাবার সময় আমরা ভয়ের চোটে হাসতে পারিনি—এখন ওঁরা দুজন আমার দুর্দশা দেখে হাততালি দিচ্ছেন। আমি সাহায্যের জন্য ময়ূখের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, তবু সে হাসি থামায় না!

ততক্ষণে নদীর ওপার থেকে ভলান্টিয়াররা আমাদের ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, আমাদের জন্য তারা চিন্তিত। আমরা অ্যাডভেঞ্চার সেরে কোনোমতে এ-পারে এসে পৌঁছোলাম। এদিকে মাইকে প্রধান অতিথি হিসেবে সন্তোষদার ভাষণের জন্য নাম ঘোষণা করা হচ্ছে বার বার। কিন্তু সন্তোষদার জামা-প্যান্ট পাল্টাবার কোনো উপায় নেই—আমাদের জামা-কাপড়ের সুটকেস রয়ে গেছে খুলনার সার্কিট হাউসে। শেষপর্যন্ত সেই পোশাকেই সন্তোষদা উঠে গেলেন মঞ্চে, সারা শরীর থেকে তখনও জল গড়াচ্ছে, শুধু পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে তিনি সেই অবস্থাতেই সপ্রতিভভাবে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। আমার প্যান্ট কাদায় প্লাস্টার করা, আমি আর সভার দিকে ঘেঁষলুমই না।

সন্ধের পর আমরা ফিরে এলাম খুলনার সার্কিট হাউসে। জামাকাপড় বদলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা বসলাম আড্ডায়। যোগ দিলেন আরো অনেকে। আমাদের দুপুরের নৌকোবিহার নিয়ে আবার অনেক হাসাহাসি হলো। তবে একথাও ঠিক, অনেক নদীর পাশ দিয়েই তো আমরা অনেকবার যাই, কিন্তু দুপুরের ঐ ছোট্ট ঘটনাটির জন্য কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে আমাদের সারাজীবনের পরিচয় হয়ে গেল।

সারাদিন মাইকেলের গুরুগম্ভীর কবিতা বিষয়ে অনেক গুরুগম্ভীরতর আলোচনা হয়েছিল, তাই রাত্রে আমরা চলে গেলাম কিছু লঘু বিষয়ে। যেমন, কথা উঠল, মাইকেল কতখানি মদ্যপান করতে পারতেন। মাইকেলের মদ্যপান বিষয়ে বহু গল্প আছে, বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে পর্যন্ত উনি নাকি মদের বোতল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, মদ খেয়ে খেয়ে জিভ নাকি এমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে স্পেনস'স হোটেলে থাকবার সময় উনি নাকি রোজ সকালে জিভে শুকনো লঙ্কা ঘষতেন। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রটি নাকি মাইকেলের আদলে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের এক তরুণ অধ্যাপক বললেন, উনি কোথায় যেন পড়েছেন যে মাইকেল গেলাস ব্যবহার করতেন না, বোতল থেকে চুমুক দিয়ে খেতেন। একবার নাকি এক চুমুকে পুরো এক বোতল বী-হাইভ ব্রাণ্ডি (গিরিশ ঘোষ এই ব্র্যাণ্ডি খেতেন) শেষ করে ফেলেছিলেন।

অনেকেই একথা বিশ্বাস করল না। কোনো জীবনীকার এরকম কিছু লেখেননি। সন্তোষদা বললেন, টলস্টয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এ আছে একজন সৈনিক তিনতলার খোলা জানলার ওপর দাঁড়িয়ে এক বোতল রাম এক চুমুকে শেষ করেছিল। কিন্তু ওটা উপন্যাসেই হয়, বাস্তবে নয়।

তখন আমার মনে পড়ে গেল, তারাপদ রায় কথিত একটি রসিকতা। আমি বললাম, একবার অযোধ্যা সিং নামে একটা লোক দু' চুমুকে পুরো দু' বোতল রাম খেয়েছিল।

সবাই বলল, যাঃ!

আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই। একবার অযোধ্যা সিং প্রথমে এক চুমুকে এক বোতল রাম শেষ করল। তারপর ঠোঁট মুছে বলল, এটা কী বিশ্ব রেকর্ড? তারপর সে আর এক চুমুকে আর এক বোতল রাম খেয়ে নিয়ে বলল, এটা নিশ্চয়ই চিরকালের রেকর্ড? এর পর সে মুচকি হেসে ধপাস করে পড়ে মরে গেল।

সবাই বলল, যাঃ। যত সব বাজে কথা।

আমি বললাম, মোটেই বাজে কথা নয়। কিন্তু এসব কি করে আর প্রমাণ করব বলুন? সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও আর নেই।

১২

ঘাটাল শহরের একটা চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। এখান থেকে বাস ধরব, কিন্তু একটু আগেই একটা বাস ছেড়ে গেছে, পরবর্তী বাস এক ঘণ্টা বাদে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তাই চায়ের দোকানটাই আশ্রয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরা আমাকে এক ঘণ্টাই এখানে বসে থাকতে দেবে কিনা। চায়ের দোকানে বেশিক্ষণ বসতে গেলে বেশি খেতে হয়। কিন্তু আপাতত আমার খিদে নেই এবং ঠাণ্ডা নিমকি সিঙাড়া এবং চিনিভর্তি দানাদার খাবার ইচ্ছেও নেই। একটি ওমলেট ও চা পনেরো মিনিটেই শেষ হয়ে গেল, তারপর আর দু'বার দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিলুম।

চা কিংবা খাবার-টাবার দিয়ে যাচ্ছে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, বেশ ছিপছিপে চেহারা, পাঞ্জাবীদের অনুকরণে সে ডান হাতে একটি স্টিলের বালা পরেছে। ক্যাশ কাউন্টার থেকে মালিক তাকে গোরা গোরা বলে ডাকছে। খালি কাপ তোলা কিংবা টেবিল মোছার ভার আর একটি বাচ্চা ছেলের ওপর, এর বয়েস দশ-এগারোর বেশি না। কালো তেল চকচকে মুখ দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটি বেশ দুষ্টু। এর নাম পচা। কেন যে এমন একটা সুন্দর ছেলের নাম পচা রাখা হয়েছে কে জানে।

বহু চায়ের দোকানেই এইটুকু বয়েসের ছেলেদের কাজ করতে দেখি, কখনো আমরা আশ্চর্য হই না। শিশুশ্রমিক বিষয়ে কি যেন একটা আইন আছে শুনেছি,

কিন্তু সে কথা ভেবেও লাভ নেই। সেসব আইন মানতে গেলে এইটুকু একটা ছেলেকে চাকরি দেওয়া যায় না, আর চাকরি না করলে এ ছেলেটি খেতে পাবে না, বিশেষত বাপ-মা যার নাম রেখেছে পচা।

পচা কিন্তু মোটেই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। এক টেবিলে তিন-চারটে কাপ থাকলে সে কিছুতেই সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে যাবে না। কাপগুলোকে খাড়াভাবে পর পর সাজাবে, তারপর এক হাতে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাবে। যেন একটা খেলা। অবশ্য পচার বয়েসী অন্য ছেলেরা ঠিক এই সময়টায় ইস্কুলের টিফিন পিরিয়ডে লুটোপুটি করে খেলা করে। অনেকক্ষণ ধরেই আমি পচাকে লক্ষ করছি। আর আমার একটু ভয় ভয় করছে। হঠাৎ হাত ফস্কে কাপ-টাপগুলো ভেঙে ফেলবে না তো!

শেষপর্যন্ত তা-ই হলো। আমার জন্য তৃতীয় কাপ চা নিয়ে আসছিল গোরা। সে সব সময় দৌড়োদৌড়ি করে আসে, তার স্বভাবটাই ছটফটে। দোকানের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গোরা এদিকে যখন আসছে, সেই সময়ই পচা এক হাতে তিনটে খালি কাপ ব্যালান্স করে নিয়ে যাচ্ছিল, দু'জনের ধাক্কা লাগল। তিনটে কাপই পড়ে গেল পচার হাত থেকে, সৌভাগ্যবশত দুটো ভাঙলো না, একটা একেবারে টুকরো টুকরো।

পাছে এই ব্যাপারে গোরার কোনো দোষ ধরা হয়, তাই সে আগেই চেঁচিয়ে উঠল, ভাঙলি তো ? কতবার বলেছি— ? তারপরই সে এক চড় কষালো পচার গালে।

গোরার হাতের চায়ের কাপে একটুও চা চলকায়নি, সেটা সে আমার টেবিলে রেখে আবার ফিরে গিয়ে পচাকে মারতে লাগল। দোকানের মালিক কাউন্টার থেকে স্থিরভাবে চেয়ে আছে, মুখে কোনো কথা নেই। মার খেয়েও কাঁদছে না পচা, দাঁড়িয়ে আছে গোঁজ হয়ে।

আর তিন-চারজন লোক রয়েছে দোকানে। তাদের মধ্যে একজন ভালোমানুষ চেহারার লোক বললেন, ওরে হয়েছে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর মারিস না। কাপ তো আর লোহা দিয়ে তৈরি নয়, একদিন না একদিন ভাঙবেই।

তারপর তিনি ওপরের দিকে মুখ তুলে উদাস গলায় বললেন, কোনো কিছুই চিরকাল থাকে না। মানুষের জীবনই হঠাৎ কখন চলে যায়...

মফঃস্বলের অনেক চায়ের দোকানেই এরকম এক-একজন দার্শনিক থাকে।

গোরা মার থামিয়ে ভেতরে চলে গেল। দোকানের মালিক এবার হুঙ্কার দিয়ে পচাকে বলল, সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কি ? ভাঙা টুকরোগুলো সাফ কর।

দেখব এখন আজ খাওয়ার সময়। দুটো বাজতে না বাজতেই খাওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক, এত নোলা...

বুঝলাম, পচার কপালে আজ আরো দুঃখ আছে। দুপুরে খেতেও পাবে না বোধ হয়। এ ব্যাপারে আমার কি কিছু করণীয় আছে? দোকানের মালিককে একটা কাপের দাম দিয়ে অনুরোধ করতে পারি, ছেলেটাকে আজ উপোস করাবেন না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এরকম উদার সাজতে আমার লজ্জা লাগে। তাছাড়া পচার জন্য আজকে এইটুকু শুধু আমি করতে পারি। কিন্তু আগামীকাল বা তারপরের কোনো দিন পচার দুর্ভোগের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করার সামর্থ্য আমার নেই।

পচার সঙ্গে দ'একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সে আর এদিকে এল না। রান্নাঘরে গিয়ে বসে আছে। কি জানি কাঁদছে কিনা। দোকান ফাঁকা হয়ে এসেছে, আমি ছাড়া আর কেউ বসে নেই। মালিকও উঠে বাইরে গেছে।

একটু বাদে গোরা এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় খদ্দের খুঁজছে। কিন্তু খাঁ খাঁ রোদ্দুরে রাস্তাঘাট ফাঁকা।

গোরা আমার দিকে ফিরে বলল, বাবু বুঝি বাস ধরবেন? কোথাকার, ঝাড়গ্রামের?

ছেলেটির বুদ্ধি আছে। কিন্তু আগে থেকেই আমি ওকে অপছন্দ করে ফেলেছি। আমি একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঐটুকু ছেলেকে অত জোরে মারলে কেন?

গোরা বলল, আপনি জানেন না বাবু, ও বড়ো তেঁড়েটে ছেলে! না মারলে কোনো কথা শোনে না। ওর জন্য আমি মালিকের কাছে বকুনি খাই। এরকম করলে চাকরি থাকে?

আমি বললাম, ও কি তোমার ভাই-টাই হয়? মুখের মিল আছে যেন খানিকটা।

গোরা হেসে বলল, না, বাবু ভাই কি করে হবে? আমি এখানকার লোকই না।

—ছেলেটা দুপুরে খেতে পাবে তো?

—কেন পাবে না? আমাদের মালিক লোক খারাপ নয়। মুখে বকুনি দেয়, কিন্তু পেটে মারে না।

একটা টাকা দিয়ে গোরাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললাম। সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে ও বলল, আজ ঝাড়গ্রামের বাস বোধ হয় একটু লেট করবে। আগে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার বাড়িও ঝাড়গ্রামের কাছেই। আমাদের গাঁয়ের নাম বীজপোঁতা।

আমি বললাম, অত দূর থেকে তুমি এখানে চাকরি করতে এসেছ ? ওদিকে কিছু কাজ পেলে না ?

—ও তল্লাটেই আমি থাকতে চাই না।

—কেন ?

—আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আর কোনোদিন যাব না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী। হয়ত দেখা যাবে এই গোরাই একদিন বিরাট একজন শিল্পপতি কিংবা মন্ত্রী হয়ে যাবে। অন্তত এরকম একটা চায়ের দোকানের মালিক হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নাম কি ভাই ?

—গোরাচাঁদ দলুই। পিতার নাম নিবারণচন্দ্র দলুই।

—কিন্তু গোরাচাঁদ, তুমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে, তোমার বাবা-মা দুঃখ পাবেন না ?

—বাবা পাবে না, মা একটু পেতে পারে। মা'র কষ্ট পাওয়াই ভালো।

—কেন, তোমার মা এমন কী দোষ করলেন, যাতে তাঁর কষ্ট পাওয়া দরকার।

—মা-ই তো জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।

কথাটা এমন আকস্মিক যে আমার বুকে প্রায় দুম করে লাগল। আমি ছেলেটির সর্বাঙ্গে আবার চোখ বোলালাম। এবং আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বয়েস কত ?

—এই শ্রাবণে ষোলোয় পা দিয়েছি।

আরো কথায় কথায় জানা গেল যে, আমাদের এই শ্রীমান গোরাচাঁদের বিয়ে হয়েছে দেড় বছর আগে, তার বউয়ের বয়েস এখন এগারো। মা তাঁর ছেলের বউকে বড্ড বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন, বউকে একদম বকেন না। গোরাচাঁদ বউকে অনেকবার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিন্তু মা রাজি হননি।

আমি বললুম, কেন, তুমি তোমার বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইতে কেন ? তুমি কি ইস্কুলে পড়তে ?

এবার আর একটি অপ্রত্যাশিত উত্তর এল। গোরাচাঁদ রীতিমতন রাগের সঙ্গে বলল, দেবো না ? ঐ মেয়ের বাপ আমাকে বিয়ের সময় একটা সাইকেল দেবে বলেছিল, সেটা দেয়নি! ঐ মেয়ে নিয়ে কেউ ঘর করে ?

একটু দম নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বউয়ের চেয়ে সাইকেল তোমার কাছে বড়ো হলো ?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি একটা অদ্ভুত কথা বলছি। বউ তো ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু একটা সাইকেল জোটানো কি অত সহজ।

—সাইকেল নিয়ে কি করতে তুমি?

—ঝাড়গ্রামে সাতদিন-ব্যাপী সাইকেল প্রতিযোগিতায় নাম দিতাম।

অন্য খদ্দের এসেছে, গোরাচাঁদ তাই চলে গেল। আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। কিন্তু এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে আমি একা একা হাসতে লাগলাম। মফঃস্বলের চায়ের দোকানে মাত্র এক ঘণ্টা বসে একটি বেশ সামাজিক চিত্র পাওয়া গেল। শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা— সব কিছুই বেশ হাসিখুশিভাবে চলছে। শুধু বীজপোঁতা গ্রামে একটি এগারো বছরের মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে কিনা কে জানে!

আমার মনে হলো, একটা কোনো শিকড় দরকার। যে শিকড়টা হাতের মুঠোয় এলেই আমার ইচ্ছাশক্তি এসে যাবে। সেটা নিয়ে আমি বলব, এক্ষুনি বৃষ্টি পড়ুক, অমনি সারা দেশ জুড়ে বৃষ্টি পড়বে। আমি বলব দেশের সমস্ত মাঠ ফসলে ভরে যাক, প্রত্যেকটি শিশুর জন্য স্কুল, প্রত্যেকের জন্য খেলার মাঠ, গ্রাম এবং শহরের লোক ঠিক একরকম খাবার খাবে।

ছোট ছেলেরা বাথরুমে বসে যে-রকম স্বপ্ন দেখে আমি সেইরকম স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম, এমন সময় গোরাচাঁদ এসে বলল, স্যার, আপনার ঝাড়গ্রামের বাস এসে গেছে।

ওঠবার সময় আমি হেসে বললাম, গোরাচাঁদ, আমি তোমাদের গ্রামে গিয়ে তোমার খবর জানিয়ে দেব কিন্তু!

গোরাচাঁদ বিশেষ ভড়কালো না। বলল, তাড়াতাড়ি যান। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।

বাসটায় প্রচণ্ড ভিড়। সারা গায়ে আবের মতন বাইরেও অনেক লোক ঝুলছে। তবু সেই ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো।

১৩

গাইড! গাইড। গাইড চাই স্যার? দুটি ছেলে দৌড়ে এল আমাদের দিকে। আমরা বিরক্ত হলাম। যে-রকমভাবে আমরা ভিখারি তাড়াই, হাতের সেই ভঙ্গিতে জানলাম, না, না যাঃ। যাঃ।

গাড়ি থেকে নামলাম আমরা চারজন। জুলাই মাসের গনগনে রোদ, অসহ্য গরম, সারা শরীরে ঘামের ঝর্না। এইসব সময় মন ভালো থাকে না।

তবু যদি যেতাম আগ্রায় কিংবা রাজস্থানে, নতুন কোনো বিস্ময় পাবার

আকর্ষণ থাকত, তাহলে না হয় শারীরিক কষ্ট বিস্মৃত হতে পারতাম। কিন্তু এসেছি মুর্শিদাবাদের কাটরার মসজিদে।

পশ্চিমবাংলা বড়োই অনৈতিহাসিক জায়গা। ভারতের অন্যত্র প্রাচীন ইতিহাসের যেসব নিদর্শন দেখে আমাদের শিহরণ জাগে, এখানে সে রকম কিছুই নেই। এমনকি, মুর্শিদাবাদের নবাবদের রাজত্বকাল, এই তো সেদিনকার ঘটনা, কিন্তু তার বিশেষ কোনো চিহ্নই নেই। শুনেছি, মুর্শিদাবাদ শহরটি নাকি এক সময় লণ্ডন শহরের চেয়েও বেশি ঐশ্বর্যময় ছিল, এখন সেসব মনে হয় গাঁজাখুরি কথা। এখানে ওখানে এক-আধটা কামান আর একটা নকল প্রাসাদ ছাড়া কিই-বা আছে।

তবু একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর অনুরোধে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদিকে। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ পড়ে তার রোমাঞ্চ জাগত, এখন একবার স্বচক্ষে সেই জায়গা দেখতে চায়।

কাটরার মসজিদও এখন প্রায় ভগ্নস্তূপ। এই মসজিদের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন, ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এখনো অক্ষত ও সুদৃশ্য মসজিদ সারা ভারতবর্ষে আরো অন্তত দশ পনেরোটা আছে। সুতরাং এই ভগ্নস্তূপ দেখার জন্য আবার গাইড। আমাদের বিরক্ত হবারই কথা। আমরা আগে দু'তিনবার এসেছি মুর্শিদাবাদে। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটিকে আমরা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। পাথরের চাতাল এত তেতে আছে যে, পা রাখা যায় না। আমাদের সফর যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে।

গাইড নামের বাচ্চা ছেলে দুটি আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আমরা ছাড়া আর কোনো ভ্রমণকারী নেই। এবং এই গরমে বিশেষ কেউ আসেও না মনে হয়। ছেলে দুটির মধ্যে একজনের বয়সে চোদ্দ-পনেরো, অন্য জনের নয়-দশ। কুচকুচে কালো রং, খালি গা, খালি পা। ওরা আমাদের পেছনে পেছনে আসতে আসতে অনবরত কি সব বকবক করে যাচ্ছিল।

আমরা আর একবার তাড়া দিলাম। তাতে বড়ো ছেলেটি নিরস্ত হয়ে একটু দূরে গিয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল, ছোট ছেলেটি তার কথা থামাল না।

সিগারেট ধরবার জন্য আমরাও একটু ছায়া খুঁজে দাঁড়িয়েছি, এই সময় সেই ছেলেটি অদূরে রৌদ্রালোকিত চাতালে ঠিক মঞ্চের ওপর একক অভিনেতার মতন হাত তুলে বলল, মনে করুন মহাশয়গণ, আপনাদের সামনে এই অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইতেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, তাঁহার দীর্ঘ দেহ, শুভ্র সস, সস, শ্মশ্রু তিনি সন্ধ্যাকালে...

বালকের রিনরিনে কণ্ঠে সেই শুদ্ধ ভাষার নাটকীয়তা আমাদের কৌতুক দেয়। আমরা চারজনেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটি বেশ বাংলা বোঝে।

ছেলেটি অনবরত বলে যাচ্ছে, তাহার পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি আলিবর্দি কহিলেন, শ্বেতী রোগীদের মতন যাহাদের গাত্রবর্ণ, তাহাদের কখনো বিশ্বাস করিতে নাই। যাহারা মাথায় টুপি পরে এবং নাকী সুরে কথা বলে, সেই ইংরাজেরা সর্প কিংবা কুম্ভীরের তুল্য। অতএব হে নাতি সিরাজ...

ততক্ষণে আমরা হো হো করে হাসতে শুরু করেছি। আমি ছেলেটিকে কাছে ডেকে এনে বললাম, এই, শোন। তোকে এসব কে শিখিয়েছে?

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে গা মোচড়াতে লাগল। মুখখানি সরল, টলটলে দুটো চোখ। মুখ নিচু করে বলল, শুনে শুনে শিখেছি।

কাটরার মসজিদের চেয়েও আমরা ঐ বালকটির সম্পর্কে বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়লাম।

কিন্তু গরীবের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার বিপদ আছে। কোথা থেকে যে দংশন আসে তা বোঝা যায় না। ছেলেটি আমাদের আঘাত করল ওর নির্লোভ সরলতায়। ও আমাদের কাছে পয়সা চেয়ে বিরক্ত করল না, শুধু বলল, আমরা যদি চা খাই, তা হলে যেন ওর দোকানে যাই।

তোর চায়ের দোকান আছে?

না, ওর দোকান নয়। পাশাপাশি দুটি দোকানের মধ্যে একটিতে ও বালক-ভৃত্য। ও যদি ওদের দোকানে খদ্দের নিয়ে যেতে পারে, তাহলে মালিক খুশি হয়। চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা মালিকের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটি দয়ালু ধরনের, তার এতই ছোট দোকান যে, কর্মচারী রাখার দরকার হয় না, তবু ছেলেটিকে রেখেছে, দু'বেলা খেতে দেয়।

আমার বন্ধু পার্থ জিজ্ঞেস করল, এই খোকা, তোর বাড়ি কোথায় রে?

ছেলেটি ফিক করে হেসে বলল, আমার বাড়িই নেই।

চায়ের দোকানের মালিক আমাদের জানাল, ছেলেটির বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছে। সংসারে কেউ নেই। বাড়িঘরও গেছে সব।

মানুষের দুঃখের গল্প শুনতে আর ভালো লাগে না। চতুর্দিকে এমন সব চলছে যে, মুখ ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঐ ছেলেটিও বাড়ি নেই বলে হাসল কেন? ওর মুখখানা কাঁদো কাঁদো করা উচিত ছিল না? আমাদের কাছে দয়া চাইতে পারত না? ন'বছরের ছেলে বাড়ি না থাকার কথা বলে হাসলে তা দেখে বুকের মধ্যে চড়াৎ করে ওঠে।

মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটি বলল, ছেলেটি সরল এবং বেশ বুদ্ধিমান। লেখাপড়ার সুযোগ পেলে...

বরুণ বলল, কি সুন্দর ওর উচ্চারণ। শক্ত শক্ত কথাগুলো কি রকম...

পার্থর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে ওর বয়সই সবচেয়ে কম, মনটা এখনও নরম আছে। ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, একে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায় না?

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা কিছুক্ষণ উতলা হয়ে উঠি। গাছের ছায়ায় সামান্য একটু শান্তি লাগে। আমরা ছেলেটির জন্য কিছু একটা করা উচিত ভেবে প্রত্যেকেই মনে মনে অল্প সময়ের জন্য মহৎ হয়ে যাই। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলি না। সকলেই জানি, এই মুহূর্তের সহানুভূতি সারা জীবনে ব্যাপক হবে না।

নারীর মতন কোমল ও লাবণ্যমাখা সেই বালকের মুখের দিকে আমরা মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টিপাত করি। ক্রমশ বিকেলের ছায়ার মতন অপরাধ বোধ আমাদের মাথার চারপাশে ঘিরে আসে।

শেষপর্যন্ত আমাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির দাম হয় দুটো টাকা।

১৪

কিছুদিন ধরেই মনটা পালাই পালাই করছে। মনে হচ্ছে, আমি একটা ভুল জায়গায় আছি, আমার অন্য কোথাও থাকার কথা ছিল।

এক-একদিন বন্ধুবান্ধব কেউ থাকে না। যারই বাড়িতে যাই, সে নেই। প্রত্যেকেরই সেদিন অন্য অন্য কাজ থাকে। আমার অভিমান হয়, কেউ একবার ভাবল না, আমি কী করে সন্ধেবেলা একা থাকব? সেই অভিমান থেকে মন খারাপ, তারপর মনটা একটা গুরুতর বোঝা হয়ে মাথার ওপর চেপে বসে, ক্রমশ নুয়ে পড়ে আমার মাথা। হারা-উদ্দেশ্যে ঘুরতে থাকি আর বার বার নিজেকে বলি, আমায় কেউ মনে রাখেনি, আমায় কেউ মনে রাখেনি। তারপর এক সময় পুরো ব্যাপারটাই যে একটা হাস্যকর ছেলেমানুষি, তা বুঝতে পেরে বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

স্যার আশুতোষ মুখার্জির বাড়ির সামনে থেকে দুটি মেয়ে মন্থরভাবে রাস্তা পার হয়। শীতকালীন মসৃণ মাধুর্য লেগে আছে তাদের মুখে, সেই রূপের ঝাপটা এসে আমার গায়ে লাগে। আমি মনে মনে বলি, ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমাকে কোনোদিন চিনবে না।

একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে একটি ভিখিরি পরিবার ক'দিন ধরে বাসা বেঁধেছে। অন্যদিন লক্ষ করি না, হঠাৎ একদিন দেখলাম, ভিখিরি-মা ইঁটের তোলা উনুনে মাটির হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপিয়েছে। অনেকখানি হলুদ মেশানো গাঢ় হলদে

রঙের খিচুড়িতে নানারকম ডাল। বাচ্চাগুলো উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসা —চকচক করছে তাদের চোখ। প্রত্যেকেই উদগ্রীব প্রতীক্ষার জ্যান্ত মূর্তি। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে কোথাও যেন দুঃখ-দারিদ্র্য নেই। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ঐ হলদে খিচুড়ি। আমার কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, আমি কেন ওদের আত্মীয় হতে পারলুম না? কেন আমি ওদের পাশে বসে এই রকম খিচুড়ি ভোগ পেতে পারি না?

জানলা দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলা আমার একটা বদ অভ্যেস। অনেকভাবে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করেছি। তবু মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যখনই মন খারাপ থাকে, তখনই মনের ওপর আর কোনো অধিকার থাকে না। সেই রকমই অনেকদিন বাদে, অন্য কী একটা কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেটের শেষ অংশ ছুঁড়ে দিয়েছি জানলা দিয়ে, তারপরই খেয়াল হলো। উঠে তাড়াতাড়ি দেখতে গেলাম। সর্বনাশ! পাশের বাড়ির ছাদে লেপ-তোষক রোদে দেওয়া হয়েছে, একটা লাল টুকটুকে লেপের ওপর পড়ছে আমার সিগারেটেব টুকরোটা, এবং ধোঁয়াচ্ছে। তুলোর আগুন অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক, কখনো দাউ দাউ করে জ্বলে না, ভেতরে ভেতরে ছারখার হয়।

প্রথমেই ভাবলাম, আমি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে কেটে পড়লে কে আর বুঝবে যে ঐ দুষ্কর্মটি আমার? অন্য যার ঘাড়ে দোষ পড়ে পড়ুক। পরমূহূর্তেই মনে হলো, এখনো চেষ্টা করলে লেপটাকে বাঁচানো যায়। ও-বাড়ির মেয়ে দোতলার জানলার কাছে রোদে বসে পার্ট টু পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল, আমি তাকে বললাম, এই শোনো শোনো!

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। কোনো দিন তার সঙ্গে ডেকে কথা বলিনি। আমি বললাম, শিগগির একবার ছাদে এসো তো, শিগগির! এক্ষুনি!

আমার ব্যগ্রতাকে মেয়েটি আগ্রহ্য করতে পারল না, বই মুড়ে রেখে মেয়েটি ওপরে উঠে এল। এর মধ্যেই সিগারেটের টুকরোটা টুপ করে খসে পড়ে গেল নিচে, লেপটার কিছুই ক্ষতি হয়নি, শুধু একটা ছোট কালো দাগ পড়েছে, হয়তো কারুর নজরই আসবে না। তাহলে আর শুধু শুধু নিজের দোষ স্বীকার করি কেন? পুরো ব্যাপারটা চেপে গেলেই তো হয়!

কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি ছাদে উঠে এসেছে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কি?

আমার আর একটা দোষ এই, আমি ঠিক দরকারের সময় মিথ্যে কথা বানাতে পারি না। আমি তো-তো করে বললাম, এই না, মানে, হঠাৎ মনে হলো...। মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি মানুষ নয়, অন্য কোনো অদ্ভুত প্রাণী।

পরীক্ষায় পড়া থেকে তুলে একটি মেয়েকে ছাদে ডেকে এনে যে কোনো কথা বলতে পারে না, সে কি মানুষ হতে পারে? জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমি নিজের কান মুলে বললাম, স্টুপিড, জীবনে আর যদি কক্ষনো সিগারেট খেয়ে...।

কিছুদিন ধরেই এই রকম সব ভুল ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে পরপর। নানা লোক টুকটাক অপনাম করে যাচ্ছে বিনা কারণে। এক-একটা সময় আসে এরকম, যখন দিনের পর দিন চলে গণ্ডগোলের মিছিল।

তারপর বাড়িতে শুরু হলো আর এক ঝামেলা। গৃহবাসের সবচেয়ে বিরক্তিকর সময় কোনটা? যখন ঘরবাড়ি চুনকাম হয়। সমস্ত ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে ফেলা না হলে ঘর চুনকাম হয় না। আলমারি-ফালমারিগুলোকে ঢেকে ফেলতে হয় ময়লা কাপড় দিয়ে, বইপত্র পোঁটলা বেঁধে রাখতে হয়, বাক্স-প্যাঁটরা টেনে জড়ো করা হয় ঘরের মাঝখানে, কোথাও একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত থাকে না।

আমার ঘরটা চুনকাম করা সদ্য শেষ হয়েছে, শুকোতে সময় লাগবে। ঘরের মাঝখানে খাটের পরে দু'তিনটে বাক্স আর সুটকেস। সেগুলোকেই সিংহাসনের মতন ব্যবহার করে, তার ওপর উঠে বসে একটা বই পড়ছিলাম, এমন সময় কয়েকটা কথা কানে গেল.

কে একজন বলল, এখান থেকে যদি পড়ে যাই, তাহলে কী হবে?

আর একজন বলল, পড়ে গেলে মরে যাবি?

প্রথম জন আবার বলল, 'মরে গেলে কী হবে?'

দ্বিতীয় জন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'মরে গেলে ফুরিয়ে যাবি, আর কি হবে'।

প্রথমে আমি বুঝতেই পারলুম না, কারা এই সব কথা বলছে। যেন শূন্য থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। তবে কি কোনো দার্শনিকের আত্মা?

একটু পরেই বোঝা গেল। কথাগুলো আসছে আমার ঘরের বাইরের দেয়াল থেকে। বাইরে ভাবা বেঁধে দেয়াল রং করছে দু'জন মিস্ত্রী। এই সংলাপ তাদের। বই বন্ধ করে আমি মন দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলুম।

একজন বলল, তোকে যদি কেউ পাঁচ হাজার টাকা দেয়, তুই এখান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবি?

আর একজন বলল, পাঁচ হাজার কেন, কেউ এক হাজার টাকা দিলে আমি এক্ষুনি এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে পারি।

—এক হাজার টাকার জন্য মরে যাবি? কি হবে সেই এক হাজার টাকা দিয়ে?

—যাদের জন্য খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলছি, সেই বিধবা মা, বৌ আর

ছেলেপুলেগুলোনকে বলব, এই নাও, তোমাদের হাতে নগদ্দানগদি এক হাজার টাকা তুলে দিচ্ছি, এবার আমায় নিসকির্তি দাও, আমি শান্তিতে চোখ বুজি।

—শালা, যতই খাটি, কিছুতেই শান্তি নেই, বাড়িতে ঢুকলেই খ্যাচখ্যাচ, তার ঠেঙে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

—এই তো, এখান থেকে একটু পা আলগা করলেই সব জ্বালা যন্তোন্না জুড়োয়।

একটুক্ষণ নীরবতা। দেয়ালের গায়ে রং দেবার ছপছপ শব্দ। আবার কথা শুরু হলো।

—তুই যদি রাস্তায় এক হাজার টাকা কুড়িয়ে পাস, কি করবি ?

—সাত দিন টেনে ঘুমোবো, শালা!

—শুধু ঘুমোবি ?

—তবে নাতো কি ? কতদিন রাত্তিরে ঘুম হয় না ভালো করে। রোজই এক চিন্তা, কাল কাজ পাব কি পাব না। পেলেও, হাপ রোজ না ফুল রোজ ? হাপ রোজ যেদিন পাই সেদিন গা জ্বলে যায়। এদিক আনতে সেদিক কুলোয় না।

—রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পাওয়া কি আর আমাদের ভাগ্যে হবে কোনো দিন ?

—দূর দূর, কোনো দিন না। কেউ এসে বলবেও না, এই নাও এক হাজার টাকা, লাফাও এখান থেকে! এমনিই পা পিছলে মরব একদিন, যেমন শুকুল মিঞা গেল, বাড়ির লোকদের যেমন অভাব, তেমনই অভাব থাকবে।

পাছে কথাবার্তায় অন্যমনস্ক হয়ে ওদের কেউ তখনই বিনা টাকায় পা পিছলে পড়ে যায়, তাই আমি দু'বার গলা খাঁকারি দিলাম। জানলার কাছে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মিস্তিরি, আর কতটা বাকি ?

ওদের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। আগে কখনো ভালোভাবে নজর করে দেখিনি। কী অসম্ভব শুকনো দুটি মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ, থুতনিতে রুখু দাড়ি। যেন দুটি কঙ্কাল। সংসারে ওদের সুখ নেই, তবু সংসারের চাকায় বাঁধা।

ভয় পেয়ে গেলাম আমি। সংসারের চেহারা এরকম ? ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। এখান থেকে পালানো যায় না ?

গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে চির বিদায় নেবার সাহস আমার নেই, তবু মাঝে মাঝে ছুটি তো নিতে পারি। ঠিক করলাম, আজই বেরিয়ে পড়ব, এক্ষুনি! ব্যাগ গুছোতে বসে গেলাম। কোথায় যাব জানি না, তবু কোথাও যেতে হবে।

১৫

ধানবাদ থেকে ঝরিয়া পার হয়ে সিন্ধি যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে চাসনালা খনি। খনিটির মালিক ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি। গেট দিয়ে খনি এলাকায় ঢুকলেই চোখে পড়ে এদিক সেদিক ছড়ানো বিস্তর পুলিশ। এত সব পুলিশ কার জন্য প্রথমটা বোঝা যায় না। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটা শুরু করার একটু বাদেই মনে পড়ে, আমাদেরই পায়ের নিচে, অনেক নিচে, এই শীতের মধ্যে, আরো শীতল হয়ে রয়েছে প্রায় হাজার ফুট কালো নোংরা জল। সেই জলে ডুবে রয়েছে অন্তত ৩৭২ জন কিংবা ৩৭৪ কিংবা ৩৭৫ কিংবা তারও বেশি জন মানুষ। ক্রমশ আরো বেশি পুলিশ, খনিশ্রমিক, টিণ্ডাল এনজিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও আমলাদের দেখা যায়। এখানে প্রচুর লোক, বড়ো বেশি লোক, কেন এত লোক তা বোঝা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জায়গাটা একটা পিকনিক এলাকা। নোংরা, ধুলো ওড়া প্রান্তরের এই ভিড়ের মধ্যে বেশি করে চোখে পড়ে বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে এবং তাদের মাথায় গাঢ় নীল বা গাঢ় খয়েরি রঙের লোহার টুপি। আমাদের দেশের খনি শ্রমিকদের টুপির রং সাদা। ওই শ্বেতাঙ্গরা রাশিয়ান এবং পোলিশ, ওঁরা ত্রাণকার্যে সহায়তা করতে এসেছেন। বড়ো ছোট আকারেব প্রচুর লোহার পাইপ, হোস পাইপ মাটিতে ছড়ানো, তার ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে এসে পৌঁছোতে হয় খনির দুটি প্রধান প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ অর্থাৎ শ্যাফটস-এর কাছে। এখানে কিছু দিশি ও বিদেশী পাম্প ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে জলের মধ্যে, পাইপ বেয়ে সেই নোংরা এবং সম্ভবত বিষাক্ত জল গিয়ে পড়ছে দামোদর নদীতে।

সারা দেশব্যাপী এখনো এরকম একটা ধারণা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যে, খনির মধ্যে ওই জলের নিচে এখনো কোথাও বন্ধ হয়ে আছে বাতাস, সেখানে টিকেও থাকতে পারে কয়েকটি প্রাণ। কারণ, বড়াধেমো কালিয়ারিতে এইরকমই একটা দুর্ঘটনার পরও ১৭ জন শ্রমিক বেঁচে ফিরে এসেছিল। কিন্তু চাসনালায় প্রকৃত ত্রাণকার্যে যারা ব্যস্ত, দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত পরিশ্রমে যাঁদের চোখের কোণে কালি, তাঁদের উদ্দীপনা এখনো একটুও না কমলেও তাঁদের চলাফেলার মধ্যে সেই তড়িৎগতি নেই, অন্য মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেমন থাকে। আমার মনে হলো, ওঁরা সম্ভবত কেউই বিশ্বাস করেন না যে, সলিল সমাধি থেকে কেউ জীবিত ফিরে আসবে।

কেন ফিরে আসবে না ?

একথা এখন সকলেরই জানা যে, হেমন্তকুমার নাগ নামে এক বাঙালি ভদ্রলোক ঝরিয়ার রাজাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে প্রথম এই খনিটি চালাবার

করেন। বছর কয়েক আপ্রাণ চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে, তিনি ইস্তফা দেন। সে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। মাত্র বছর দশেক আগে ইসকো কিনে নেয় খনিটি, প্রচুর টাকা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা লাগে এটার মধ্যে। এর মধ্যে আছে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন ইঙ্গ, ফরাসি, জারমান কোম্পানির স্বার্থ ও দেখাশোনা। অন্যান্য খনির তুলনায় এটি রীতিমতন একটা শক্ত খনি, এখানে কয়লার স্তর ৪৫ ডিগ্রি বাঁকা অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে এবং গ্যাস ছড়ানো। তবু এত কাঠখড় পুড়িয়ে খনিটিকে চালু করার কারণ এখানকার কয়লার জাত ভালো। কয়লার খনি বলতেই ওপরে একটা গোল ঢাকা লাগানো কালো লোহার ত্রিভুজের যে ছবিটা আমাদের চোখে ভাসে, চাসনালায় তা দেখতে পাওয়া যাবে না। শ্যাফট দুটির মুখে সুন্দর রং করা বিরাট বিরাট দুটি ইস্পাতের খাঁচা। এখানে মজুররা গাঁইতি হাতে নিচে নামে না। অধিকাংশ কাজই চলে যন্ত্রপাতিতে। বেশ সাহেব-সাহেব ব্যাপার।

হেমন্তকুমার নাগের আমলে এরকম সুযোগ-সুবিধে ছিল না। তিনি মাটিতে গর্ত করে ঢালু রাস্তা বানিয়ে খনির ভেতরে নামবার ও কয়লা তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে অংশটা থেকে কয়লা তুলতেন, সেই খনি অংশটি পরিত্যক্ত হবার পর, কোনো এক সময় ভেতরে আগুন ধরে যায়। খনির আগুন যে কি জেদি, তা খনি এলাকার লোকই জানে। কিছু চেষ্টা হয়েছিল বালি দিয়ে আগুন নেভাবার, কিন্তু সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় ছিল খাদগুলো জলে ভরে দেওয়া। ১৩ কোটি গ্যালন জল সেই খাদে ভরে দেওয়া হয়েছিল।

মাথার ওপরে অতখানি জল নিয়ে নতুন চাসনালা খনির কাজ শুরু হয়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে সেই জল রয়ে গেছে। পুরোনো জল কাজে লাগে। সেই খাদের মধ্যেই পাম্প বসিয়ে জল টেনে পরিস্রুত করে সেই জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো খনি-কলোনিতে। চাসনালার কোলিয়ারি শ্রমিকরা যে জল পান করে এতদিন বেঁচেছিল, সেই জলই তাদের ডুবিয়ে মারল।

জলে ভরা খাদ এবং নতুন খাদের মধ্যে ছিল একটি আশি ফুট চওড়া দেয়াল। সেই দেয়ালের কোন্ জায়গায় কী ভাবে ফাটল ধরল সেটা জানতে আরো বহুদিন লেগে যাবে। অনেকে বলছেন, কেন মাত্র আশি ফুট দেয়াল ছিল, কেন দুশো ফুট ছেড়ে রাখা হয়নি। বিশেষজ্ঞরাই এ বিষয়ে ভালো জানেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, আশি ফুট কি কম নাকি ? প্রায় আমাদের মনুমেনটের আধখানা —অতখানি চওড়া দেয়াল ভেঙে জল আসার সম্ভাবনা কি সহজে মাথায় আসে ? মনে হয়, এটা একটা অঙ্কের সমস্যা! অবশ্য আশি ফুট দেয়ালই ছিল শেষপর্যন্ত কিংবা আরো কমিয়ে ফেলা হয়েছিল, তা বিচার করবেন তদন্ত কমিশন। মাত্র

দিন সাতেক আগেই ডিরেকটরেট জেনারেল অব মাইন সেফটির লোকজন খনির অভ্যন্তর পরীক্ষা করে কাজ চালিয়ে আবার সবুজ সঙ্কেত দিয়ে গিয়েছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর দুপুর একটা পঁয়তিরিশ মিনিটে যখন প্রথম শিফটের কর্মীরা ভেতরে কাজ করছেন, সেই সময় হঠাৎ একটা বিরাট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এল একটা গুঁড়ো কয়লার ঝড় ও ধোঁয়া, মুহূর্তের মধ্যে সেই ঝড় থেমে গেল, ভেতরে হুড়হুড় করে ঢুকতে লাগল জল। কী সাংঘাতিক সেই জলের তোড় যে মাত্র চার পাচ মিনিটের মধ্যেই ১৩ কোটি গ্যালন জল এসে ভরিয়ে দিল খনি গর্ভ! বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগে খনির তরুণ ম্যানেজার দৈবাৎ উঠে এসেছেন ওপরে। শব্দ পেয়েই তিনি ফিরে এসে মরীয়া হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেতরে নেমে যেতে চান। ততক্ষণে জলের উচ্চতা হুহু করে বাড়ছে, অন্যরা তাঁকে টেনে সরিয়ে আনে। আচম্বিত ঘটনায় তাঁর প্রায় একটা ঘোর লাগার মতন অবস্থা, শুনেছি, দ্বিতীয়বার ওপরে উঠে এসে তিনি অসংলগ্নভাবে হ্যামলেটের লাইন উচ্চারণ করেন।

খনিতে জলবন্দী হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এতখানি জলে এত বড়ো একটি খনি ডুবিয়ে দিয়ে এতগুলি মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা অভূতপূর্ব।

শ্যাফটের পাঁচ শো ফিট গভীরে কয়লা কাটার প্রথম সুড়ঙ্গ বা খনির ভাষায় 'হরাইজন'—সেখানে কাজ করছিল ৮০/৯০ জন শ্রমিক। তার অনেক উঁচুতে জল এসে গেছে, সুতরাং সেখানকার শ্রমিকরা জলের অনেক তলায়। দ্বিতীয় হরাইজন হাজার ফুট নিচে, সেখানে ছিল বাকি শ্রমিকরা—সবশুদ্ধ চার শো জনের কাছাকাছি, এর মধ্যে জনা তিরিশেক যে-কোনো কারণেই হোক আগে উঠে এসেছে।

ভূগর্ভে জল ও বাতাসের সহাবস্থান চলে না। ওই বিপুল পরিমাণ জল এসে ভেতরের বাতাসকে তাড়িয়েছে ওপরে। তবে, যেহেতু জল এসেছে দারুণ দ্রুতবেগে, তাই অতিগভীর সুড়ঙ্গের কোনো এলাকার বাতাস হয়তো বেরুবার পথ না পেতে পারে, সেখানকার বাতাস জলকে জায়গা দেবে না। সেই এলাকা টুকুতে কয়েকজন শ্রমিকের ঘাপটি মেরে বসে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে বহু ঘোষিত 'এয়ার পকেট।' এরকম কোনো এয়ার পকেট তৈরি হয়েছে কিনা কেউ জানে না, এবং তৈরি হলেও, সেখানে বাতাসের চাপ এত বেশি হতে পারে যে যে-কোনো মানুষেরই ফুসফুস ফেটে যাবে। উদ্ধারকর্মীদের মধ্যে এইসব চিন্তার কালো ছায়া রয়েছে বলেই তাঁদের গতি-ভঙ্গির মধ্যে সেই বিশ্বাসের তড়িৎ নেই। তাছাড়া, পাম্পগুলো চালু রাখা ছাড়া আর কোনো লম্ফঝম্ফও এখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক। নিছক নাটক করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাটক অবশ্য এখানে কিছু কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই কর্মীদের কিছু ক্রুদ্ধ আত্মীয়স্বজন এবং বাইরের লোক ভেতরে ঢুকে এসে মারপিট শুরু করে দেয়। তখন এখানে কোনো পুলিশ ছিল না। এখন প্রায় হাজার খানেক পুলিশ। তার মধ্যেও দল বেঁধে বহু দূর দূর থেকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকে চাসনালা দেখতে এসেছে। নিস্তরঙ্গ ভারতীয় জীবনে বিশেষ কোনো ঘটনাই তো ঘটে না। এখানে মৃত্যুও দর্শনীয়। এখানে মৃতের শোভাযাত্রা দেখেও লোকে প্রণাম করে। ওরা এসেছিল সেই মৃত্যুর চেহারা দেখতে। এসে দেখেছে অবশ্য কিছু পাম্প, কিছু ঝকঝকে জেনারেটার, প্রচুর জীবিত মানুষ এবং সাহেব।

বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব এসেছে। পোল্যানড ও রাশিয়া থেকে উড়ে এসেছেন অভিজ্ঞ খনিকর্মীরা। কিছু পোলিশ কর্মী অবশ্য আগে থেকেই কাছাকাছি ছিলেন। রাশিয়ানদের বড়ো আকারের পাম্পগুলি চালু করার মধ্যেও অনেক নাটক। মাঝে মাঝেই রটে যায় এই বুঝি পাম্প চালু হলো, কিন্তু হয় না, সময় পিছিয়ে যায়। তারপর দুপুরে পাম্প চালু হলো, সকলের বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা স্বস্তির নিশ্বাস, ঠিক সেই সময় জলমগ্নদের কথা কারুরই মনে থাকে না—যেন পাম্প চালু হবে কি হবে না এটাই যেন বিরাট এক সম্মানের প্রশ্ন। দুপুরের পাম্প বিকেলে আবার বিকল হয়ে যায়। আবার হতাশা।

এরই মধ্যে দেখা যায় উদ্যমী শ্বেতাঙ্গরা একবারও হতাশ হয় না। মিনি রকেটের আকারে লম্বা সাব মারসিভ পাম্পগুলি। তোলা ও নামানোর সময় তারা আঠার মতন লেগে থাকে, তারা অপরকে কোনো নির্দেশ দেয় না, নিজের হাতে তেল কাদা মাখা যন্ত্রগুলি নিয়ে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তলায় কাঠের পাল্লা দেওয়া কিংবা কপিকলে চেন লাগানোর জন্য তাদের সাহায্য করে কিছু ভারতীয় খনিশ্রমিক, তাদের যথারীতি মলিন পোশাকে। আমাদের ইনজিনিয়াররা কোনো যন্ত্রে নিজের হাত লাগান না, দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা দোভাষীকে নির্দেশ দেন। বোধ হয় এটাই প্রটোকল। পৌনে চারশো মানুষ যখন জলের তলায়, তারই মধ্যে ইসকো অফিসে ম্যাপ আঁকা হয় শ্মশান ও সমাধিক্ষেত্রের, পুরুত মোল্লা ও পাদ্রীদের ঠিক করে রাখা হচ্ছে। তার পাশেই মেয়েরা সার বেঁধে এসে দাঁড়াচ্ছে আর একটি ঘরের জানলায়, সেখানে থেকে তাদের দেওয়া হচ্ছে কমপেনসেসনের টাকা। অনেক টাকা। অত টাকা পাওয়ার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো।

'ক্ষতিপূরণ' কথাটা অনেক সময় অদ্ভুত কিংবা হাস্যকর শোনায়। একজন শক্ত সমর্থ জোয়ান মরদ মারা গেছে, তার স্ত্রীকে আমরা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে পারি ? টাকা ? একটি মানুষের প্রাণের দাম ঠিক কত টাকা ? সেই জন্যই সিঁথিতে তখনও জ্বলজ্বল সিঁদুর লাগিয়ে শোকে ক্রুদ্ধা এক রমণী চাসনালায় এক কেন্দ্রীয়

মন্ত্রীকে বলেছিল, আমি কিছু শুনতে চাই না, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন!

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দুর্ঘটনার কারণ যাই হোক না কেন, দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনো রকম ব্যবস্থা নিয়ে যদি ডুবন্ত মানুষগুলোকে বাঁচানো সম্ভব হতো, তাহলে, সে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। অবশ্য কত তাড়াতাড়ি? ভারত কোকিং কোলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শর্মা খবর পেয়েই অভুক্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই অকুস্থলে হাজির হন। প্রায় সামরিক প্রস্তুতির মতন দ্রুততায় রাত্তিরের মধ্যেই আশেপাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে দক্ষ কর্মী ও প্রযুক্তিবিদ এবং যতদূর সম্ভব সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেলেন। দিশি পাম্পগুলো জল ছেঁচার কাজে লেগে যায় পরদিন সকালে। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি ঘণ্টা বাদে। এবং জল বার হচ্ছিলও বেশ গরিব পরিমাণে। কুড়ি ঘণ্টা বাদে এই ব্যবস্থায় অতগুলো জলে ডোবা লোককে বাঁচাবার আশা পাগলেও করে না। কিংবা পাগলেই করে। অত জল চট করে শুকিয়ে ফেলার জন্য দরকার ছিল একজন অগস্ত্যের।

প্রতি বছর কয়েক হাজার লোক সাপের কামড়ে মরে, বাঘের পেটে যায়, পথ-দুর্ঘটনার বলি হয়। তাছাড়া আছে বন্যা কিংবা খরা। মৃত্যু আবার এদেশে নতুন কথা কি! তবু এক সঙ্গে প্রায় পৌনে চারশো লোক হঠাৎ খনির মধ্যে চাপা পড়ে যায়, তখন সারা দেশের হৃৎপিণ্ডে একটা ঝাঁকুনি লাগে। একটু অপরাধবোধও হয়, মনে হয়, ঐ লোকগুলো আমাদের জন্য কাজ করছিল, সারা দেশের প্রয়োজনে কয়লা তুলছিল, ওদের মৃত্যুর কিছুটা দায়ভাগ আমাদের ওপরেও বর্তায়।

হেমন্তকুমার নাগের আমলে পুরোনো কায়দায় যে-খনি থেকে কয়লা তোলা হতো—মাটির নিচে ঢুকে পড়া ঢালু সুড়ঙ্গ, এখানকার ভাষায় যার নাম ইনক্লাইন—সেই জায়গা দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে দিশি পাম্প চলছে বলে তেমন ভিড় নেই। বেশির ভাগ ভিড় শ্যাফটের কাছে, যেখানে বিদেশী পাম্প এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন—কর্তাব্যক্তি ও নিষ্কর্মা দর্শকদের সেখানেই আনাগোনা। এখানে এই ইনক্লাইনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গা ছমছম করে, গোল অন্ধকারের মধ্যে কত নিচে নেমে গেছে শ্রমিকরা, ওপর থেকে টেলিফোনে কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। যারা ঐ নিচে গিয়ে পাম্প চালাচ্ছে, তাদেরই ভাই, বন্ধু ও সহকর্মীরা বিশ বাঁও জলের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ওখানে গেলেই বোঝা যায়, খনির কাজ কত বিপজ্জনক, ভূগর্ভে গিয়ে খনিজ কেটে তুলে আনা আসলে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, রীতিমতন লড়াই, আকস্মিক মৃত্যু এখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এত বড়ো দুর্ঘটনায় সারা দেশকে শুধু দুঃখিত থাকলেই হয় না, বিপদগ্রস্ত

পরিবারগুলির জন্য কিছু করাও দরকার। টাকা দেওয়া ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে। টাকা এবং সহানুভূতি। টাকা জিনিসটা আসলে খারাপ কিছু নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অতি উত্তম শোক-নিবারক ওষুধ।

প্রতিটি পরিবার কত টাকা পাবে, তার পাকা হিসেব এখনো হয়নি। মোটামুটি একটা হিসেব নেওয়া যায়। খনিটির মালিক ইসকোর কাছ থেকে পরিবার পিছু এক হাজার, বিহার সরকার পাঁচশো, খনিশ্রমিক-কল্যাণ দফতর থেকে আড়াই শো, এছাড়া প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দান ও চাঁদা, সারা ভারতের খনিশ্রমিকদের এক দিনের মাইনে এবং দুর্ঘটনায় জীবননাশে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ প্রায় দশ হাজার টাকা। পরিবার পিছু ইতিমধ্যেই মোটামুটি পঁচিশ হাজার টাকার হিসেব পাওয়া যেতে পারে। আরো উঠবে। এছাড়া বিহার সরকার প্রতি পরিবারকে কিছু জমি দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। টাকাটা কে পাবে ? বিলিতি আইন অনুযায়ী স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিলিতি কেতা অনুযায়ী আমাদের শ্রমিক-মজুরদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। বুড়ো বাপ-মা ছেলের আয়ের ওপরেই নির্ভর করে, অনেক সংসারে শাশুড়িই গৃহকর্ত্রী। এখন সুস্থ সমর্থ ছেলে হঠাৎ হারিয়ে যাবার পর, ছেলের বউ কি শ্বশুর শাশুড়িকে এর পরেও অনেকদিন দেখবে ? বিদ্যাসাগর মশায়ের অনেক আগে থেকেই এ দেশের সমাজের নিচের তলায় বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন আছে। বিধবা স্ত্রী যদি কিছুদিন পর আরেকজনকে বিয়ে করে চলে যায় এবং যেতেই পারে, তার সে নৈতিক অধিকারও আছে, তখন বুড়ো-বুড়িদের কী হবে ? আইন এসব ক্ষেত্রে বধির ও অন্ধ।

যেখানে হঠাৎ টাকা, সেখানেই শকুন। একদিকে যেমন আতঙ্ক, শোক ও ত্রাণকার্যের ব্যস্ততা, অপরদিকে তেমনি এই সব সন্তপ্ত পরিবারকে ঘিরে কাক-চিল-শকুনের ওড়াউড়ি শুরু হয়েছিল। এটাই জীবনের নিয়ম। ওদের হাত থেকে ছোঁ মেরে টাকা কেড়ে নেবার জন্য শ্যেন দৃষ্টির অভাব ছিল না। সেইজন্যই এখন কর্তৃপক্ষ কাঁচা টাকা হাতে না দিয়ে প্রত্যেক উত্তরাধিকারিণীর নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছেন।

মরদরা বেঁচে থাকলে একসঙ্গে যত টাকা তারা চোখেও দেখত না—সেই টাকার সম্ভাবনায় তাদের স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়রা বিহুল হয়ে পড়তেই পারে। দূর থেকে অনেকের মনে হতে পারে, শ্রমিক কলোনিতে বুঝি এখনও শোক ও কান্নার ঝড় বইছে। আসলে তা নয়, সেখানে একটা থমথমে ভাব। নিচু স্বরে কথা এবং একটু টাকা টাকা গন্ধও পাওয়া যায়। এই নিয়তিবাদী জাতের যে-কোনো পরিবারের হঠাৎ মৃত্যুর চেয়ে হঠাৎ অর্থ-বৃষ্টি অনেক বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু তারা জানে না,

এই টাকার ব্যবহার। এবং এইসব ধনী বিধবাদের প্রলুব্ধ করার জন্য কিছু কিছু রোমান্টিক প্রেমিকও উপস্থিত হয়েছে। শুনেছি, কয়েকটি মেয়ের ইতিমধ্যেই আবার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অন্তত বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। এটাও জীবনের নিয়ম।

আজকাল শ্রমিক ও কৃষকদের যথাক্রমে শ্রমিকভাই ও কৃষকভাই বলে ডাকার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। এ আমাদের ভারতীয় চরিত্রের একটা দুর্মর ন্যাকামি। ওদের কাছাকাছি যাওয়ার, ওদের ভাই বলে গ্রহণ করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের এখনো হয়নি। সেই জন্যই ওদের টাকা দেওয়া যত সহজ, ওদের সহানুভূতি জানানো তত সহজ নয়। সেই সহানুভূতির ভাষা আমাদের জানা নেই। তাই দলে দলে বিখ্যাত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বড়ো বড়ো কর্ণধার যখন শ্রমিক কলোনিতে সহানুভূতি জানাতে আসেনি, তখন ব্যাপারটা শুধু দৃষ্টিকটু নয়, বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই দুঃখিত, যথেষ্ট ব্যথিত, কেউ কেউ চোখের জল সামলাতে পারেননি— কিন্তু একই বাড়ির সামনে যদি পনেরো দিন ধরে এমন অনেক ব্যক্তি, অসংখ্য লোক ও পুলিশ পরিবৃত হয়ে দাঁড়ান, একই রকম কথা বলেন ঐসব পরিবারগুলিকে সেটার মধ্যে আর যাই থাক, শোকের কোনো চিহ্ন থাকে না। কোনো শিশু স্পোর্টসে ফার্স্ট হলে বিখ্যাত ব্যক্তিরা তার গাল টিপে আদর করে হাতে কমলালেবু তুলে দেন। কোনো শিশুর বাবা মারা গেলে তারও গাল টিপে হাতে কমলালেবু দেবার একই ব্যবস্থা।

খনি দুর্ঘটনার কথা শুনলে আমাদের শুধু শ্রমিকদের কথাই মনে পড়ে। দূর থেকে আমাদের চোখে ভাসে কয়লার গুঁড়ো লাগা পোশাকে কালো কালো মানুষ। কিন্তু প্রত্যেক খনিতেই থাকে কিছু বাবু, ইনজিনিয়ার, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজার ইত্যাদি অর্থাৎ যাঁরা অফিসার। চাসনালার মতন একটি আধুনিক সরঞ্জামসম্পন্ন খনিতে এরকম অফিসারের সংখ্যাও কম নয়। দুর্ঘটনার একটু পরেই এখানে যে বাইরের কিছু লোক এসে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, তাদের প্রধান আক্রোশ ছিল এই যে, বাবুশ্রেণীর কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই এতগুলি শ্রমিকের প্রাণ নষ্ট হলো! তাদের ইট-পাটকেল ছোঁড়া অনেকটা থেমে ছিল এই কথা শুনে যে, শুধু শ্রমিক নয়, অন্তত তিরিশজন অফিসারও জলে ডুবে আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, দুর্ঘটনা ঠিক কোন কারণে ঘটেছিল, সম্পূর্ণ জল-কাদা পরিষ্কার হওয়ার আগে তা নির্ণয় করা শিবের বাবারও অসাধ্য। বিশেষজ্ঞরা খনিগর্ভে নেমে স্বচক্ষে দেখে তবেই বুঝতে পারবেন—এখন যে-যা বলছেন, সবই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া। এবং এ কথাও ঠিক, অন্তত তিনজন অফিসার সেদিন নোংরা জলে দমবন্ধ হয়ে মরেছেন, যাঁরা সেদিন ঐ সময়ে খনির মধ্যে না থাকতেও পারতেন।

সেই রকমই এক অফিসারের একটি চার বছরের ছেলের ধারণা, তার ড্যাডি খুব ভালো সাঁতার জানে। সে শুনেছে, খনির ভেতরে জল ঢুকে গেছে। তার ধারণা তার ড্যাডি সেই জল সাঁতরে পার হচ্ছে। সে বারবার প্রশ্ন করে, এত দেরি হচ্ছে কেন? বাবার এত দেরি হচ্ছে কেন, মা? কে এই শিশুকে উত্তর দেবে?

অনেককেই চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করতে শুনি, সত্যিই কি ৩৭২, না—? যে-কোনো বড়ো দুর্ঘটনার পরই কর্তৃপক্ষের প্রচারিত সংখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহের ভাব থাকে। এটা চলে আসছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। দাঙ্গা, বন্যা, পুলিশের গুলিচালনা কিংবা গ্রেফতার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যে তথ্য দিতেন, সাধারণ মানুষ কোনোদিন তা বিশ্বাস করেনি। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে নানা মতান্তর এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ।

যে-কোনো দুর্ঘটনার পরই, এক ধরনের লোক নিহতের সংখ্যা খুব বাড়িয়ে বলতে, কিংবা ভাবতে, ভালোবাসে। যেন, চারশোর বদলে এক হাজার লোক মারা গেলে ট্র্যাজেডিটা আরো বিরাট হয়। কোনো কোনো বিদেশী রাষ্ট্র, যারা ভারতের প্রতি তেমন বন্ধুভাবাপন্ন নয়, তারা নাকি বেতারে চাসনালায় ডুবে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলেছে। তাদের কোনোই নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই। আবার কোনো কোনো মহল থেকে যে প্রকৃত সংখ্যা থেকেও কিছু কমিয়ে বলার উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

ঠিকঠাক সংখ্যাটা জানার উপায় কী? প্রথম দিনের হাঙ্গামার পর হাজিরা খাতাটা কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে যায়। পরে পুলিশ শ্রমিক কলোনিতে খানাতল্লাস করে খাতাটি উদ্ধার করে। এর মধ্যে খাতাটি কোনোরকম জখম হয়েছে কিনা তা আমি জানি না। খাতাটি এখন কোনো গোপন সুদূর জায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রথম শিফট বা খনির ভাষায় 'এ' শিফটে চারশোর কিছু বেশি খনিশ্রমিক ও অফিসার নিচে নেমেছিল, এরকম জানানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিরিশ জন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওপরে উঠে আসে। সেই হিসেবে হতভাগ্যের সংখ্যা ৩৭২, এর মধ্যেও আবার জনৈক ভাগ্যবান কয়েকদিন পরে (কেন কয়েক দিন পরে কে জানে?) এসে জানায় যে, সে বেঁচে আছে। নিয়মিত শ্রমিক ছাড়াও ঠিকাদাররা কিছু কিছু ঠিকে শ্রমিক কখনো কখনো নামায়, সেদিন ঠিক কজন ছিল তা জানার ব্যবস্থা এখনো হয়নি। এ পর্যন্ত তিনজনের উল্লেখ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত সংখ্যার মধ্যেই একজন দুজনের গরমিল কেউ গায়েই মাখছে না। যেন, এত ডামাডোলের মধ্যে আরো একটা দুটো লোক মরল কি

বাঁচল, তাতে কী যায় আসে? যদিও বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজিডিগুলি একজন বা দুজন লোককে নিয়েই।

খাতায় যতজন লোকের নাম থাকে, তারা সকলেই যে সত্যিই খনিতে নেমেছে, তা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন না। মাথা গুণতি হয় টুপি আর লণ্ঠন দিয়ে। নিচে নামবার আগে খনিশ্রমিকরা অফিসবাবুদের কাছ থেকে একটা করে টুপি আর লণ্ঠন নিয়ে যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, সেই টুপি আর লণ্ঠনের ঘরটি হবে শ্যাফটের মুখেই—যাতে সেই ঘরে ঢুকে মাথায় টুপি পরে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে শ্রমিকরা সরাসরি অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে যাবে। সেইরকমই বেরিয়ে আসবার সময় সেই ঘরে টুপি লণ্ঠন জমা দিয়ে বেরিয়ে এলেই বোঝা যাবে, সেদিনের মতন জীবিকা অর্জন করে বেঁচে ফিরে এল।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ব্যবস্থাটি মোটেই সেরকম নয়। টুপি লণ্ঠন ঘরটি শ্যাফট থেকে বেশ দূরে। অনেক সময় একজন শ্রমিক গিয়ে তার গ্যাংয়ের অন্য সকলের টুপি-লণ্ঠন একসঙ্গে চেয়ে নিয়ে আসে এবং তারা সকলেই নিচে নামে কিনা, তা কে দেখছে? যে-কোনো খনিতেই মাটির ওপরে লণ্ঠন হাতে নিয়ে টুপি পরিহিত দু-চারজন শ্রমিককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, এমন কি দিনের বেলাতে। মাটির অভ্যন্তরে যাদের ডিউটি, তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে কখনো মাটির ওপরে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, যা হয়তো ঠিক খনিসংক্রান্ত কাজই নয়। ম্যানেজারের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর পচলে তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করার জন্য চার-পাঁচজন লোক জুটে যায় ঠিকই। জানি, এরকম ব্যাপার সব জায়গাতেই, যে-কোনো চাকরির জগতেই একটু আধটু হয়—কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঢুকে পড়লেই হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়। যদি চাসনালা দুর্ঘটনায় প্রথম ঘোষণা অনুযায়ী ডুবন্তের সংখ্যা ৩৭২-ই সত্যি বলে মেনে নিই, তবু স্বীকার করতে হবে, এই সংখ্যাটিকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার মতন সত্যের জোর কারুর নেই। আমি নিজেই একটু আগে লিখেছি ভেতরে নেমেছিল চারশোর কিছু বেশি, আধ ঘণ্টা আগে উঠে এসেছিল প্রায় ত্রিশ জন—এই 'কিছু বেশি' আর 'প্রায়ের' মধ্যেও টুপটাপ করে দুটো একটা প্রাণ খসে পড়তে পারে।

জল সেচে ফেলার পর...সে কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। এই রকম জলমগ্ন খনিতেই আগে ত্রাণকার্য করেছেন, এরকম কর্মীর বুক থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। এ পর্যন্ত কত মিলিয়ান গ্যালন জল তোলা হলো, তার একটা হিসেব আমরা ঠিকঠাক পেয়ে যাচ্ছি। রোমাঞ্চ-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের মতন, যেন ১৩০ মিলিয়ান গ্যালন জল পাম্প করে বেরুবার পরই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে, আসল সমস্যা শুরু

হবে তার পরই। যে-প্রাণান্তকর পরিশ্রমে সমস্ত শ্রেণীর কর্মী জল তোলার কাজে ব্যস্ত, তাতে এক এক সময় ভয় হয়, এই অতিরিক্ত স্নায়ুর চাপে এদের মধ্যেই কেউ না মারা যায়। একটি ইনক্লাইনের প্রবেশ মুখের বাইরে একটি নোটিস চোখে পড়ে। ত্রাণ কর্মীদের কী সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে, তার নির্দেশ। তার মধ্যে একটি এই—পাখির খাঁচা সঙ্গে নিয়ে যেতে যেন কেউ না ভোলে। সুড়ঙ্গ পথে যারা পায়ে হেঁটে নেমে গেছে, তাদের সঙ্গে আছে খাঁচায় ভর্তি মুনিয়া পাখি, বিষাক্ত কারবন মনোকসাইড-এর সামান্য চিহ্নেই ঐ পাখিগুলি ঢলে পড়বে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, মানুষের প্রাণকেও কেউ কেউ প্রাণপাখি বলেছে, এ দেহটা একটা খাঁচা। এইরকম অনেক পাখি অনেক বড়ো বড়ো খাঁচার মধ্যে ডুবে আছে ঐ জলের তলায়।

সেই খাঁচাগুলিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জল নিঃশেষ হয়ে যাবার পর থেকে যাবে বালি আর কয়লার গুঁড়ো মিশ্রিত গভীর নোংরা পাঁক। সেখানে কোনো যন্ত্রের জারিজুরি চলবে না। সেই পাঁকের মধ্যে আবার নামিয়ে দিতে হবে কিছু জীবিত মানুষকে। তারা নিজের হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে পচাগলা মাংসের মধ্য থেকে তুলে আনবে দু-একটা হাড়।

খনি এলাকার মধ্যে এখন শিশু বা নারীদের দেখা যায় না। জল তোলা শেষ হয়ে যাবার পর হয়ত তারা দলে দলে ছুটে আসবে, যদি না রক্ষীরা তাদের আটকায়। তারা আসবে তাদের প্রিয়জনদের শেষবার এক ঝলক দেখবার জন্য, কিংবা শনাক্ত করার জন্য। তারা দেখবে কিছু মাথার খুলি কিছু ভাঙা হাড়—যেগুলি সবই একরকম দেখতে। প্রচুর আয়োজনে জল ছেঁচে ফেলার যে উত্তেজনা, তা এই মূল্যবান খনিটিকে আবার চালু করার জন্য যতখানি প্রয়োজনীয়, ততখানি নয় ওই ৩৭২টি দেহ উদ্ধারের জন্য।

নানারকম পাম্প, হোস, লোহার পাইপ ইত্যাদি পেরিয়ে খনি এলাকা থেকে বেরিয়ে এলে, শ্রমিক কলোনির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, চোখে পড়ে, উঠোনে খাটিয়ায় বসে রোদ পোহাচ্ছে কোনো বৃদ্ধ, ঈষৎ ফোলা-চোখ কোনো রমণী হেঁটে যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, ধুলো-ওড়া মাঠে দাগ কেটে ছককা নওলা খেলেছে কয়েকটি বালিকা। আরো একটু এগিয়ে এসে, বড়ো রাস্তায় পড়লে দেখা যায় চীনাবাদামওয়ালা বসে আছে, তার পাশেই একজন বিক্রি করছে গুলাবি রেউড়ি, তাদের সামনে ভিড় করে আছে কয়েকটি শিশু। দূরে কোথায় যেন মাইক্রোফোনে কাওয়ালি গান ভাসছে।

জীবন থেমে থাকে না।

১৬

পৃথিবীর প্রতি সাতজন মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। এটা আমাদের একটা গর্বের বিষয় হতে পারত। কিন্তু পৃথিবীর বাকি ছ'জন মানুষেরা ভারতীয়দের কোনো সম্মান করে না। তাদের চোখে ভারত একটা ভিড়ে গিসগিস করা দেশ, সেখানকার মানুষ গরীব। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যাকে লোকবল বলা যায় না, বরং এটাই যেন দেশের বোঝা।

ভারতের থেকে একমাত্র বেশি জনবহুল দেশ চীন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা যোগ করলে, অর্থাৎ প্রাক্তন মূল ভারত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা চীনকেও ছাপিয়ে যায়। এবং অঙ্কের নিয়মেই, প্রতি বছর মানুষ-বৃদ্ধির গতিও বাড়ছে।

পৃথিবীর মধ্যে, ভারতেই সরকারিভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাজ প্রথম শুরু হয়। বাইশ-তেইশ বছর ধরেই অক্লান্ত চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু ফল বিশেষ পাওয়া যায়নি। অনেকভাবে প্রচার করা হয়েছে। অনেক পুরস্কারের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ বা শহরের অসচ্ছল মানুষ ব্যাপারটা ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি। এ বছরেই প্রথম আর একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে, এবার জোর করে বা আইন করে সন্তান জন্ম নির্দিষ্ট করা যায় কিনা।

এই শতাব্দীতে যে কটি নতুন চিন্তার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে, আমার মতে সবচেয়ে নতুন এবং মৌলিক চিন্তা হচ্ছে জন্ম নিরোধ। চন্দ্র-অভিযান দেশে মৌলিক চিন্তা নয়, মানুষ আগেই যেতে চেয়েছিল, এখন পেরেছে। কিন্তু চেষ্টা করে, কিংবা কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিয়ে মানুষের জন্ম রোধ, শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কলঙ্ক বা বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য নয়, সামাজিকভাবে এবং শাসককুলের প্রশ্রয়ে—এ জিনিস মানুষ আগে স্বপ্নেও ভাবেনি। জীবিত মানুষ সবাসরি কাটাকাটি করে মরেছে কিন্তু অনাগতকে হত্যা যেন একটা নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা। তাহলে তো দেবকী কিংবা বসুদেবকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে রাজা কংস সব ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতে পারত।

অনেক পুরোনো ধারণাই বদলায়। এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ একটি বাস্তব সত্য। তবু অনেকের মনের মধ্যেই একটা খচখচ ভাব আসে। খ্রিষ্টান মিশনারিরা যখন বলেন, মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা একটা পাপ, তখন অনেকেরই মনে হয় ওঁরা ঠিকই বলছেন। মানবিকতা মানে মানবের জন্ম-মৃত্যুর স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে এটা একটা ফাঁপা, অবাস্তব কথা। একটা ছেলের জন্ম দিয়ে, তারপর তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে, তারপর তাকে অকারণ যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেলাই বা কি ধরনের মানবিকতা? এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে খ্রিষ্টান

ও বৌদ্ধরাই এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো যুদ্ধগুলো বাধিয়েছে এবং বাধাচ্ছে ? কোনো সামরিক সেনাপতি যখন ভজনালয়ে যায়, কেউ কি তাকে হত্যাকারী বলে ধিক্কার দেয় ? জীবিত মানুষের নিধন কিংবা অনাদরের চেয়ে অনাগতকে হত্যা করা অনেক সুস্থ চিন্তা।

ডেসমণ্ড মরিস নামে একজন রাগী লেখক বলেছেন যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে, তারাই আসলে এক নম্বরের যুদ্ধবাজ। তারা যুদ্ধ চায়। কেননা, নির্বিচারে এভাবে জনসংখ্যা বাড়লে অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীটা মানুষের ভিড়ে গিসগিস করবে, বাসযোগ্য প্রতিটি ইঞ্চি জমি ভরে যাবে, মানুষের দাঁড়াবারও জায়গা থাকবে না, তখন মারামারি কাটাকাটি করা ছাড়া উপায় কি ? এটা একটা অঙ্কের সত্য, যা কিছুতেই ওল্টানো যায় না! পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন চার শো কোটি। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বাড়লে আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকেই পৃথিবীর সংখ্যা হবে সাত শো সত্তর কোটি। অর্থাৎ এখন আমরা মায়া দয়া দেখিয়ে যে শিশুদের জন্ম দিয়ে যাচ্ছি, তাদের জন্য আমরা কিন্তু খাদ্য ও বাসস্থান রেখে যেতে পারব না—এটা কী ধরনের মানবিকতা ? একটা গোপন কথা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করলে অনেকের খারাপ লাগে। সত্যিই তো, মানুষের যেটা সবচেয়ে গোপন ব্যাপার—সেটা নিয়ে আজকাল এত আলোচনা, বিবৃতি। কিন্তু উপায় কি ? যখন দেখি চার-পাঁচটা লাংটো নোংরা ছেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর তাদের গর্ভবতী মা তাদেরই একজনকে ধরে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটাচ্ছে, তখন ধীর স্বরে বলতে ইচ্ছে হয়, প্রত্যেক মানুষই ভগবান, তবে আর ভগবানের সংখ্যা বাড়িয়ে দরকার নেই।

যে জনসংখ্যা নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, সেই জনসংখ্যা আজ থাকলে, আজকের খাদ্য ও অন্য জিনিসপত্রের উৎপাদনে ভারত স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং রীতিমতন একটি সচ্ছল দেশ হতে পারত! কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্গে আমাদের অন্য উৎপাদন পাল্লা দিতে পারছে না। পারবেও না কোনোদিন। কারণ শস্যের উৎপাদন ঠিক দ্বিগুণ করে যাওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু আর পঞ্চাশ বৎসর বাদে আপনি আপনিই মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর দ্বিগুণ হতে থাকবে। সুতরাং এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে মানুষের সংখ্যার সীমা বেঁধে দিতেই হবে।

এটা প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এতদিন। কিন্তু পরিবার বলতে আমরা শহুরে শিক্ষিত পরিবার বুঝি। আজকাল সেসব পরিবারে একটি-দুটির বেশি বাচ্চা হয় না, কারণ তার বেশি সন্তানের ইংরিজি ইস্কুলে পড়াবার খরচ চালাতে পারবে না। কিন্তু কফি হাউসের সামনে যে মেয়েটি আমার কাছে ভিক্ষে চায়, তার নাম আইমা, তার বাবা থাকে বসিরহাটে. ওবা

চোদ্দ ভাইবোন, এর মধ্যে ছটি ছোট ছেলেমেয়ে সমেত ওর মাকে ওর বাবা বছরে চার মাস খেদিয়ে দেয়—তখন ওরা শহরে ভিক্ষে করে। ফুটপাথে শোয়। আবার ফসল উঠলে ওরা বাড়ি গিয়ে বাড়ির ভাত খেতে পায়। আইমা এবং তার ভাইবোনদের আমি বছর তিনেক ধরে দেখছি, আইমার মুখখানা অনেকটা অড্রে হেপবার্ণের মতন। তার বয়স এখন তেরো-চোদ্দর বেশি হবে না, মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে কলেজ স্কোয়ারের রেলিং-এর পাশে আবার দেখলাম গর্ভবতী। এই আইমা নামের মেয়েটিকে কিংবা বসিরহাটে তার বাবাকে আমরা কোন 'নিজস্ব বিবেচনা'র ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

*

সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতাও জড়িত, এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। যে-কারণে হিজড়েদের সমাজে স্থান দেওয়া হয় না। হিজড়েদের প্রজনন ক্ষমতা নেই বলেই তারা কখনো সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন করতে পারবে না। এরকম মনে করা হয়। অবশ্য এর কতখানি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, আমার জানা নেই। আমাদের সমাজে প্যান্ট কোট বা সুদৃশ্য পোশাকের আড়ালে যে এখনো কিছু হিজড়ে লুকিয়ে নেই, তা কি আমরা জোর করে বলতে পারি? তারা সমাজের ভারসাম্য টলিয়ে দেয়নি।

তা ছাড়া, সন্তান-সৃষ্টি ক্ষমতা বা যৌনক্ষমতা না থাকলেও যে কেউ কেউ নিজ শিল্পকার্যে বিখ্যাত হতে পারে, এমন উদাহরণ আছে। যেমন, কবি বোদলেয়ার। পশ্চিমের অতি সভ্যদেশগুলিতে হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামীর সংখ্যা শতকরা ছ'জন বা তার বেশি। পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে সমকামীদের তালিকা রীতিমতন সুদীর্ঘ। এসম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি নেবার ব্যাপারেও আজকাল কোনো গ্লানি নেই। যে অপরাধে অস্কার ওয়াইল্ডের চরম হেনস্তা হয়েছিল, আজকাল বহু দেশেই সেটা অপরাধ বলেই গণ্য নয়। সমকামীদের সঙ্গে প্রজননের কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও শিল্পে বা প্রশাসনে তাদের দাপট যথেষ্ট। এই সঙ্গে চিরকুমার বা ব্রহ্মচারীদের কথাও এসে পড়ে। দেশসেবা সংক্রান্ত কাজে এরাই যোগ্যতর এইরকমই প্রচলিত মত। কিংবা অপুত্রক দম্পতিও কোনোকালেই কোনো দেশে কোনো কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত হননি।

এইসব কথা মনে আসার কারণ আছে। সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি রাজ্যে দুটি সন্তানের পর জন্ম-শাসন বাধ্যতামূলক করার জন্য আইনের কথা চিন্তা করা

হচ্ছে। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম কথাও উঠেছে। সম্প্রতি আমি গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। আজকাল অনেক এঁদো গ্রামেও কুঁড়েঘরের মাটির দেওয়ালে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবারের' লাল ত্রিকোণ আঁকা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে প্রচার কম চালানো হয়নি। জন্ম-শাসনের জন্য কৃত্রিম বস্তুগুলি সস্তায় বা বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে। নির্বীজকরণের জন্য আর্থিক পুরস্কার, এমনকি রেডিও উপহার দেবার প্রলোভন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তবু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এজন্য ভিড় হয় না। নানা লোককে প্রশ্ন করে কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমি ভিড়ের মধ্যে মিশে কান খাড়া করে অপরের আলাপচারি শুনি, চোখ খোলা রেখে অন্যদের ব্যবহার দেখি। চার-পাঁচটির বেশি বাচ্চা হয়ে গেলে এমন চাষী বা মজুরকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ধরে আনে দালালরা, কারণ তারাও কিছু পায়। সকলের মুখেই কেমন একটা ভীতু-ভীতু ভাব। যদিও অপরেশানটি অতি সাধারণ, ব্যথা-ট্যাথা বেশি লাগে না বলেই জানা গেল। আর একটা অদ্ভুত কথাও শোনা গেল সেখানে। কিছু কিছু বয়স্ক পুরুষমানুষ যারা সংসারের চাপে বাধ্য হয়ে কিংবা উচিত জেনেই প্রজনন ক্ষমতা বিসর্জন দিয়েছে—তারা নাকি এখন দুপুর রোদ্দুরে মাঠে পাশে উবু হয়ে বসে থাকে, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কোনো কাজে উৎসাহ পায় না। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, এমনটিই তো হবার কথা! যে মানুষের পুরুষত্ব নেই, সে আবার মানুষ নাকি ? আমার মনে হলো অনেকেই অনেক কিছু জানে। কিংবা না জেনেও গম্ভীরভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। মন্তব্যকারীদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বৃদ্ধ, তাঁদের বর্তমান পুরুষত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচালক বা কর্মীকে বলতে শুনেছি যে, অপারেশানের পর এরকম প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শারীরিক বা মানসিক কোনোরকম পরিবর্তনই এর ফলে আসার কথা নয়। তবু যে মানসিক পরিবর্তন ঘটছে তার কারণ অশিক্ষা। কিংবা আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, মানসিক দারিদ্র্য। যৌনক্ষমতা বা যৌন ব্যবহারে কোনো বাধার সৃষ্টি হলে মানুষ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সেখানে তার স্বাধীনতা একেবারে চূড়ান্ত হওয়া দরকার কিংবা শুধু মাত্র সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একাধিক সন্তানের জন্ম দেবার পর, আরো বেশি সন্তানের জন্য দিতে না-পারার জন্য মনোবেদনা জাগা নিতান্ত ভিত্তিহীন বা সৌখিন বেদনা মাত্র। বর্তমান পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সৌখিনতাটুকু অনায়াসে বর্জন করা যায়।

হুগলীর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমি এক প্রৌঢ়া রমণীর কান্না শুনতে পাই। এই

রমণীর নাম যোগোবালা নয়, কিন্তু আমরা তাই বলব। যোগোবালা সবসমেত ন'টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, এর মধ্যে বেঁচে আছে সাতটি। যোগোবালা তার বাড়ির পুরুষকে না জানিয়েই চলে এসেছিল, সে আর সন্তান চায় না, সে নিষ্কৃতি চায়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তার স্বামী চলে এসেছে, জোর করে তাকে নিয়ে যাবে। সে এ-সব কৃত্রিম উপায় পছন্দ করে না, এ যেন ভগবানের ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া, তাছাড়া কোনো পুরুষ ডাক্তার তার স্ত্রীকে স্পর্শই করতে পারবে না। তার রাগী চেহারা আমি দেখতে পাই। তার চেহারা খুব সুন্দর, অর্থাৎ ঠিক গ্রাম্য চাষীর মতন, একটুও অন্যরকম নয়—তার রাগও সুন্দর। এই রাগকে নিশ্চিত সম্মান জানান উচিত। যদিও আমি জানি, একে জেলের ভয় দেখালে এর রাগ নিমেষে উপে যাবে।

এই লোকটি পৃথিবীব কোনো খবর রাখে না, দেশ সম্পর্কেও খুব কম জানে —জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের কি দুর্দশা হচ্ছে না হচ্ছে, সে তার ধার ধারে না। সে শুধু জানে নিজের পরিবারটুকুর কথা। কিন্তু নিজের একগুঁয়েমির জন্য সে তার পরিবারটিরও যে ক্ষতি করছে সে তা বুঝবে না। মানুষের সব ব্যাপারেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর ওপরে অত্যাচার করার স্বাধীনতাও কি কারুর থাকবে? কিংবা কে তাকে বাধা দেবে? এই গূঢ় প্রশ্নটির উত্তর আমি চট করে খুঁজে পাই না। অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো লোক যদি তার শিশুপুত্রকে আছড়ে মারে তাহলেও বিচারক তাকে ছাড়বেন না। তখন এ যুক্তি খাটবে না যে আমার ছেলেকে নিয়ে আমি যা খুশি করেছি। তার নামে হত্যার অভিযোগ আসবে। কিন্তু হত্যা করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, সে যদি তার ছেলেমেয়েকে খেতে না দেয়, তাদের লেখাপড়া না শেখায় এবং বছর বছর নতুন সন্তানের জন্ম দেয়—তাহলে কিন্তু কোনো বিচারকই তাকে শাস্তি দিতে যাবে না। এইসব ক্ষেত্রে, সন্তানকে হত্যা করা কিংবা নতুন সন্তানের জন্ম দেওয়া—এর মধ্যে কোনটা বেশি পাপ? যোগোবালা তার স্বামীর নামে মামলা করতে যাবে না কোনোদিন। স্বামীর ঘর ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও তার অন্ন নেই। সে যদি বছর বছর সন্তানধারণের গ্লানি আর সহ্য করতে না চায় কিংবা তার জ্যান্ত সাতটি সন্তানকেই ভালোভাবে খাওয়া-পরা দিতে চায়, তবে তার উপায় কি? উপায় না থাকলে এইরকম কান্না। শেষপর্যন্ত যোগোবালাকে তার গোঁয়ার স্বামী টানতে টানতে নিয়েই গেল।

তার স্বামীকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। একমাত্র আইনের হাতই তাকে বাধা দিতে পারত। আমার মনে হলো, আজ না হোক কাল, কিংবা দু'দশ বছর বাদে এইরকম আইনই পৃথিবীর নিয়তি। যদি মানুষকে বাঁচতে হয়।

এই পৃথিবীতে বাবা ও মায়ের স্থান নেবে তাদের দুটি সন্তান তার বেশি আর জায়গা নেই। অনেকে আরো একটি সন্তানের পক্ষপাতী, যদি একজন অকালে ঝরে যায়—এই কারণে। শিশুমৃত্যুর হার এই ভারতবর্ষেও এখন এক-তৃতীয়াংশের কম। ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন ওষুধ আসবে যাতে প্রতিটি শিশুর জীবনই হয়ত নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু যে জন্মে গেছে, তাকে মেরে ফেলার কোনো ওষুধ যেন কোনো দিন আবিষ্কৃত না হয়।

বহু সন্তানের পক্ষেও কম যুক্তি নেই। সেকালের নারীরা বহু সন্তানবতী হয়েও সুখে থাকতেন। সেকালে শিশুমৃত্যু বা সূতিকা রোগে জননীর মৃত্যু যেমন খুবই সাধারণ ছিল, তেমনি অনেক পরিবারে বহু সন্তান বেঁচেবর্তেও থাকত। তারা এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে, অষ্টম বা একুশতম গর্ভের সন্তানও দারুণ প্রতিভাবান হয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এখন অনেক বদলে গেছে। মানুষকে বাঁচতে হয় বর্তমান নিয়ে। কোনো প্রতিভাবানের জন্য প্রতীক্ষা করার কি দিন আছে আর? দুটি বৃহৎ দেশে যত আণবিক অস্ত্র জড়ো করা আছে তা হঠাৎ একদিনে ফাটলে মানুষের যাবতীয় প্রতিভা-ফ্রতিভা ফুঁ হয়ে যাবে।

ফেরার পথে যোগোবালা এবং তার স্বামীর বাড়ির সামনে দিয়েই আসতে হয়। তখনও বাড়ির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি পুরো মাত্রায় চলছে। একটি মাত্র ঘর, উঠোনের উল্টোদিকে জীর্ণ দেওয়াল। উঠোনে ঘুরঘুর করছে কয়েকটি মুরগি আর ধুলোমেখে খেলা করছে তিনটি শিশু। তাদের খেলার কোনো সরঞ্জাম নেই, গায়ে নেই জামা, নাক দিয়ে গড়াচ্ছে সিক্নি, মাটি খুঁড়ে মেখে কাদায় তাল বানিয়ে তাই নিয়েই মহানন্দে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে, এখনো উনুনে আঁচ পড়েনি। হঠাৎ বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। মনে হয় এ পৃথিবীতে সবাই বেঁচে থাক। এই দুঃখ কষ্ট অপমানের পৃথিবীতেও সবাই বেঁচে থাকুক অন্তত। মৃত্যুর থেকে বেঁচে থাকা সব সময়ই ভালো। তবে, এই দুঃখকষ্টের ভাগ দেবার জন্য আরো বেশি অনাগতদের ডেকে আনা বোধহয় স্বার্থপরতা।

১৭

এক গ্রামে তিন জমিদার। আসলে একই জমিদারির তিন শরিক, যদিও রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় নয়। এদের মধ্যে একজন সংসার-অনভিজ্ঞ যুবা, একজন অতিসংসারী মধ্যবয়স্ক এবং আরেকজন, একটি সুন্দরী বালবিধবা। পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়ই, এই রমেশ, বেণী ঘোষাল আর রমাকে নিয়েই শরৎচন্দ্রের

'পল্লীসমাজ' উপন্যাস। গ্রামের নাম 'কুঁয়াপুর'। এই কুঁয়াপুর গ্রামটা কোথায়?

শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ উপন্যাসই বাংলার গ্রামকে কেন্দ্র করে। এছাড়া, কলকাতা, বার্মা ও ভাগলপুর তাঁর কিছু রচনায় স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে, শেষ জীবন কাটিয়েছেন হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে ভাগলপুরে, তার পরের অনেকখানি অংশ বর্মা মুলুকে। সাহিত্যিক খ্যাতি নিয়ে দেশে ফিরে আসার পর তাঁর বাসাবাড়ি ছিল হাওড়ার কাছে শিবপুরে। বাংলার দূর-দূরান্তের গ্রাম, অর্থাৎ যাকে বলে এঁদো পাড়াগা—তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি বলেই মনে হয়। তবু তিনি গ্রামের সঠিক চরিত্রটি ধরতে পেরেছিলেন।

কুঁয়াপুর নামে গ্রাম কোথায় আছে কিনা আমি জানি না। না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তিনি এই গ্রামটির কোনো বর্ণনা দেননি, এর থানা সদরের কোনো পরিচয় দেননি। শুধু একটা কথা জানা যায়, এই জায়গাটা তারকেশ্বর থেকে খুব বেশি দূর নয়। কারণ, এখানেই একদিন সকালবেলা দুধপুকুরের সিঁড়িতে সিক্তবসনা রমার সঙ্গে রমেশের আবার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের নানা উপন্যাসে গ্রামের নামগুলো একটু অদ্ভুত। গোলাগাঁ, লালতাগাঁ, তালসোনাপুর—এই ধরনের শুনলেই মনে হয় যেন প্রায় বাস্তব-ঘেঁষা বানানো বানানো। লেখকরা এরকম বানিয়ে থাকেন। তবে, শরৎচন্দ্র আর একটি উপন্যাসে 'হরিপাল' গ্রামের নাম করেছিলেন, যে-নামে সত্যিই একটি বেশ প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। আর একটি উপন্যাসে একটি গ্রামের নাম পেয়েছি ভাঁড়ারহাটি। হরিপালের ঠিক উল্টো দিকেই ভাণ্ডারহাটি নামে আর একটি বেশ বড়ো গ্রাম আছে। এবং যেহেতু সেই দুটি গ্রামই তারকেশ্বরের কাছ, তাই অনুমান করা যায়, তারকেশ্বরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে হয়ত শরৎচন্দ্রের এক সময় যাতায়াত ছিল, ওখান থেকেই পেয়েছেন গ্রামের কিছু অভিজ্ঞতা।

কুঁয়াপুর গ্রামটি কোনো বাস্তব গ্রাম না হলেও চলে, কারণ এর মধ্যে দিয়ে সাধারণভাবে সমগ্র বাংলার পল্লী অঞ্চলের একটি ছবিই তিনি ফোটাতে চেয়েছেন। এখানে জমিদার, প্রজা, চাষী, সম্পত্তির ঝগড়া, ব্যর্থপ্রেম ছাড়াও আর একটা জিনিস রয়ে গেছে, যার নাম 'সমাজ'। সেটা অবশ্য একটা অদ্ভুত ধোঁয়াটে জিনিস।

বর্ণাশ্রম ধর্মের বিকারের যাবতীয় ফল ভোগ করেছে সেই সময়কার মানুষ। যে-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাজ ছিল শাস্ত্রালোচনা ও শুভাশুভের নির্দেশ দান—সেই ব্রাহ্মণরাই এ যুগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পঙ্কে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তাঁদের পার্থিব সমস্ত অধিকার চলে গেলেও বিধি-নিষেধের ফতোয়া দেওয়ার অধিকারটুকু আঁকড়ে ধরে রেখেছেন প্রাণপণে। সেই জোরে, তাঁরা কুলাঙ্গার জমিদারপুত্রের সমস্ত পাপ

গঙ্গার জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে দেন, কিন্তু গরীব বিধবাকে সামান্য ত্রুটিতে বা বিনা দোষে শাস্তি পেতে হয়। এই রকম যে সমাজ, শরৎচন্দ্র তার ওপর বড্ড রেগে উঠেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত কুঁদুলে, কুচুটে, গরীব, মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ। এবং কথায় কথায় ছোঁট জাতকে গালাগাল। 'ছোট জাতের মুখে আগুন'—এ-কথা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অহরহ পাওয়া যায়। বাংলার ব্রাহ্মণদের অপকীর্তি প্রকাশের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন বা শাণিত কলম ধরেছেন, সুখের বিষয় ব্রাহ্মণরাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত।

সেই ব্রাহ্মণদের এখন কী দশা? উত্তর কলকাতায় একটি দোকানের নাম 'ভট্টাচার্য স্ টোরস' দেখে একদিন অনেকের চোখ কপালে উঠেছিল, আজ সব কিছুই গা-সহা হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় ব্রাহ্মণদের আলাদা করে চেনা যায় না, বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নের ভিয়েনে কিংবা পুজো-শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়াবার প্রয়োজনে ছাড়া।

অনেক গ্রামেই অবশ্য আলাদা করে এখনো বামুনপাড়া বা ভট্টাচার্যপাড়া রয়ে গেছে। যেমন আছে হরিপাল গ্রামে। এরকম আরো কয়েকটি গ্রাম আমি সম্প্রতি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রথম শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল একটা মজার ঘটনায়।

মূল রাস্তা ছেড়ে এসে একটা সরু গ্রাম্য রাস্তা। দু'পাশে যথারীতি গাছগাছালি ও কিছু ভাঙা বাড়ি। আসার পথে যে দু'চারটি ছেলেছোকরাকে দেখেছি, তারা সবাই প্যান্ট-শার্ট পরা, ধুতি জিনিসটা গ্রাম থেকেও প্রায় উঠেই যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরাও অনেকদিন সেমিজ পরা ছেড়েছে, শহরের মতো একই রকম সায়া ব্লাউজ ও কুঁচি দিয়ে পরা শাড়ি। এ-সব দেখে শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ার কথা নয়।

পথের পাশে একটা ছাগলছানা তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। গলায় একটা দড়ি বাঁধা। সেই দড়িটা আবার বাঁধা রয়েছে মাটিতে গাঁথা একটা খুঁটিতে। রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছে, দড়িটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে, আমরাও সে-রকমই এসেছি, হঠাৎ পেছনে শুনলাম এক বয়স্কা মহিলা একটি বাচ্চা মেয়েকে বললেন, এই শিখা, ঐ দড়িটা ডিঙোস না। এখানে আবার ছাগলটা কে বেঁধে গেল?

বাচ্চা মেয়েটি বলল, কেন পিসিমা, দড়ি ডিঙোলে কী হয়?

মহিলা বললেন, কী হয় তা জানি না বাবা! শুনেছি তো শনি মঙ্গলবার ছাগল-দড়ি ডিঙোতে নেই!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে টংটং শব্দ হতে লাগল। কী যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা। এরকম একটা কিছু যেন আমি আগে শুনেছি।

তারপর মনে পড়ল। শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের আরম্ভে ঠিক যেন এ-রকমই কিছু কথা আছে। তখন অবশ্য উপন্যাসের নামটা মনে পড়েনি, পরে মিলিয়ে দেখেছি, 'বামুনের মেয়ে'।

সেই উপন্যাসের আরম্ভে ছাগল দড়ি ডিঙোনো নিয়ে অনেক কথা আছে। আজও বাংলাদেশের গ্রামে সেই কথাই শোনা যায় ? কুসংস্কারের আয়ু কত বছর ? গ্রামের চেহারা বাইরের দিকে এতটা বদলে গেলেও সংস্কার বদলায় নি ?

আসলে বদলেছে। বানুনের মেয়ে উপন্যাসের দিদিমা ছিলেন উগ্রচণ্ডী, তাঁর জিভের ধার সাঙ্ঘাতিক। তাঁর নাতনীর বয়স ন'দশ বছর হলেও, তাকে তিনি 'বামুনের ঘরের বুড়োধাড়ি মেয়ে' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এবং তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, শনি-মঙ্গলবারে ছাগল-দড়ি ডিঙোনো খুবই একটা গর্হিত কাজ।

সেই তুলনায় এখনকার গ্রামের এই মহিলার কণ্ঠস্বর অনেক নরম এবং তিনি ঠিক নিশ্চিত জানেন না যে, দড়ি-ডিঙোলে কী পাপ হয়। কথাটা কোথায় যেন শুনেছেন, তাই মেনে চলেন। উনি কি আমারই মতন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়েই জেনেছেন? কিন্তু শরৎচন্দ্রের তো উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার দূর করা, তার প্রচার-বৃদ্ধি তো নয়! তারপরই আমার ঝোঁক চাপলো গ্রামের এখনকার অবস্থার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বর্ণনা যতদূর সম্ভব মিলিয়ে দেখতে।

সেই গ্রামে একজনের সঙ্গে আমার আগে থেকে চেনা ছিল। তাঁকে খুঁজে বার করলাম। গ্রামের পথে অচেনা লোকের গোয়েন্দাগিরি আজকাল কেউ সুনজরে দেখে না। তাই কোনো চেনা লোকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান আমার পক্ষে সুবিধেজনক।

আমার চেনা ব্যক্তিটি নিজে ব্রাহ্মণ, থাকেন বামুনপাড়ায়, কিছুদূরের একটি কলেজে ফিজিক্যাল ইনসট্রাকটর। অর্থাৎ মোটামুটি শিক্ষকতার ধারাটি বজায় রেখেছেন।

তাঁর কাছে গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, শুনুন, একটু আগে একটা মজার ব্যাপার দেখেছি। একটু আগে যখন বৃষ্টি পড়ছিল, আমি শুয়েছিলাম খাটে, জানলা দিয়ে পুকুরের ওপারটা দেখা যায়। বৃষ্টি শুরু হতেই পুকুরের ওপাশে একটা বাড়ির উঠোনে একজন মাঝবয়েসী লোক ছুটে এল। মহাব্যস্ত হয়ে প্রায় নাচানাচি করতে লাগল। উঠোনে শুকোচ্ছিল কিছু ঘুঁটে। পাখির মা তার বাচ্চাদের সামলাবার জন্য যে রকম ছটফট করে, সেই লোকটিও প্রায় সেই রকমভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুঁটেগুলোর ওপরে, যাতে বৃষ্টিতে না ভেজে! বুঝলেন?

সত্যিকথা বলতে কী, গল্পটার মধ্যে খুব একটা মজা আমি খুঁজে পেলাম না।

আমার চোখের ভাব দেখেই ভদ্রলোক বুঝলেন। তিনি বললেন, জিনিসটা আপনার কাছে পরিষ্কার হলো না তো? এই জানলা দিয়ে দেখুন। আমাদের পাড়াটা বামুনপাড়া। আর পুকুরের ঐ ধারে হচ্ছে বিদ্যালঙ্কার পাড়া। এক হিসেবে ওরা আমাদের চেয়েও উঁচু, কারণ ওখানে শুধু বিদ্যার চর্চা হতো, অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত জন্মেছে ও পাড়ায়। আজ তার অবস্থা দেখুন। যে লোকটির কথা বললাম, এখনো তার পদবী বিদ্যালঙ্কার, কিন্তু সে ঘুঁটে বিক্রি করে। এবং সে নিরক্ষর।

ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য নতুন কিছু নয়। তার পেশা বদলও এখন অনেকটা জানা হয়ে গেছে। বাজারে যারা মাংস বিক্রি করে, তাদের মধ্যেও যে কেউ ব্রাহ্মণ নেই, এমন কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার থেকেও বেশি হারিয়েছে তার ফতোয়া দেবার অধিকার। যে-কোনো অপরাধেই, কারুকে প্রায়শ্চিত্ত করবার বা কারুর ধোপা-নাপিত বন্ধ করে একঘরে করবার অধিকার আর ব্রাহ্মণের নেই। রেল স্টেশনে নেমেই গ্রামেব পথে দুটি ডায়িং ক্লিনিং ও সেলুন দেখে এসেছি। তারা খদ্দেরের জাত জিজ্ঞেস করে না নিশ্চিত। শরৎচন্দ্রের বর্ণনা থেকে এখনকার অবস্থা এই দিক থেকে অন্তত অনেক বদলে গেছে। অবশ্য এমন অনেক গ্রাম এখনো আছে, যেখানে সেলুন-ডায়িং ক্লিনিং নেই, এমনকি ব্রাহ্মণও নেই। আসলে জমিদারি প্রথা বন্ধ হবার পর আমাদের গ্রাম্য-কাঠামোয় যে বিরাট বদল এসেছে, তা আমরা এখনো সবটা বুঝতে পারি না। জমিদারের বদলে জোতদার বলে নতুন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে কয়েক বছর, কিন্তু সেই জোতদারদের কথা সাহিত্যে ঠিক মতন ফোটেনি এখনো। ওদিকে কয়েক শো বছরের জমিদারির গাঢ় ছবি দেগে গেছে সাহিত্যে। অত্যাচারী জমিদারদের যেমন পেয়েছি, তেমনি অনেক আদর্শবাদী কিংবা ট্রাজিক নায়কও এসেছে জমিদার শ্রেণী থেকে।

জমিদার শ্রেণীর অনেক পরগাছা ছিল। বস্তুত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল কোনো-না-কোনোভাবে জমিদারদেরই আশ্রিত। জমিদারির ভগ্নদশার ফলে তাদেরও দিন শেষ হয়ে গেছে।

অধিকাংশ জমিদারের পদবীই রায় বা চৌধুরীই হতো। পরিচিত ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী সঙ্গে গেলাম রায়পাড়া দেখতে। সন্ধে হয়ে এসেছে, ঝুপঝুপ করে নামছে অন্ধকার, একদিকে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ শোনা গেলেও দূরে কোথাও তারস্বরে বাজছে মাইক।

রায় পাড়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি কয়েকটা বিশাল বাড়ি। কারুকার্য করা সিংহদ্বার। উঁচু উঁচু খিলান দেওয়া মস্ত ঠাকুরদালান। সামনে প্রশস্ত বাঁধানো গজিয়েছে। সব গৃহই শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। হতশ্রী, ভগ্নমনোরথ

জমিদাররা শহরে পলাতক। এখন তাদের খাজাঞ্চিখানায় শিয়াল ঢোকে, অন্দর-মহলে বসে সমাজবিরোধীদের জুয়ার আসর।

পরিত্যক্ত অট্টালিকার একটা অন্যরকম রূপ আছে। সেই অন্ধকার চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার গা একটু ছমছম করে ওঠে।

*

যে-সব প্রাক্তন জমিদাররা শহরে পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে দু-চারজন কেউকেটা হয়েছে বটে, বাকিরা ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তারা কেউ কেরানি বা ঠিকেদার এমনকি শেয়ার বাজারের দালাল হলেই বা তাদের কে চিনছে। বাধ্য হয়েই জমিদার বংশের যে-সব উত্তরাধিকারীকে গ্রামে থেকে যেতে হয়েছে, তাদের অবস্থা সত্যিই করুণ। এককালের অনেক রাজপুরী এখন প্রায় পোড়ো বাড়ি, তারই দু-একটি ঘরে তাদের বাস। তাদের চেহারায় এখনো কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ, কিন্তু তাদের বাড়ির বৌ-ঝিরা পুকুর পার থেকে চুপি চুপি কলমি শাক তুলে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। জমিদারদের শেষ দশা শরৎচন্দ্র দেখে যাননি। তাদের বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত পর্ব নিয়ে তারাশঙ্কর কিছু লিখে গেছেন, তাদের এখনকার আঁধার-পর্ব কোনো সাহিত্যিকের লেখনীর অপেক্ষায় আছে।

জমিদারপাড়া ছেড়ে কুমোরপাড়ার পাশ দিয়ে আসছিলাম বাজারের দিকে। বিশাল বটগাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকার—এ জায়গাটা শ্মশান, না সান্ধ্য আড্ডাখানা? চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা এখন গ্রাম থেকে উঠে গেছে, চাকুরিজীবী যুবকরা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, বেশি রাত্রে ফিরে আর আড্ডার সময় পায় না, কিন্তু বুড়োদের গুলতানি এবং পরনিন্দা-পরচর্চার একটা জায়গা থাকবে না? বটগাছের তলায় একটা বাঁধানো বেদি দেখে সেই সন্দেহ দূর হয়।

রাস্তার ওপরে কয়েক হাত অন্তর অন্তর জল-কাদা। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাড্ডা। পথপ্রদর্শক খুব বিবেচনার সঙ্গে টর্চ দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা হুমড়ি খেয়ে না পড়ি। গ্রামের রাস্তায় জলকাদা থাকবে না, এ আবার একটা কথা নাকি? তাও তো এখন শীত, বর্ষাকাল নয়।

'পল্লী সমাজ'-এর এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।... কোনো বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোনো

বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনোমতে তাহার সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙিয়া, ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টা মাত্র করে নাই।" রমেশ চেষ্টা করেছিল চাঁদা তুলে রাস্তাটা সারাতে। কিন্তু কেউ এক পয়সা চাঁদা দেয়নি, সকলে বলেছে, রমেশের গরজই বেশি, সে জুতো পায়ে মশমশিয়ে হাঁটতে চায় কিনা।

প্রায় সেই রকমই একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি মুচকি হাসতে লাগলাম। এই অংশটিতে অন্তত শরৎচন্দ্রের রচনা কালজয়ী। পঞ্চাশ-ষাট বছরেও অবস্থা একই রকম। গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে কোথাও রাস্তা সারাবে, এটা অকল্পনীয়। কেনই বা সারাবে ? শহরের লোকেরাই কি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে রাস্তা সারায় ?

তবে, পাণ্ডুয়া স্টেশনে নেমে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি হাতিপোতায় গোরুরগাড়ি করে পৌঁছোতে দেবদাসের টানা দু'দিন লেগেছিল। এখন পাণ্ডুয়া স্টেশন তো দূরের কথা, পশ্চিম বাংলায় যে-কোনো রেল স্টেশন থেকেই যে-কোনো গ্রামে যেতে গোরুর গাড়িতে চেপেও দু'দিন লাগতে পারে না। সেই তুলনায় রাস্তা অনেক বেশি তৈরি হয়েছে, অধিকাংশ গ্রামের পাশ দিয়েই বাস চলে। পাণ্ডুয়া থেকে বাসে চেপে এখন যে-কোনো দেবদাস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাতিপোতায় পৌঁছে যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র গ্রামের সমস্যাগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে একটি কুমারী মেয়ের কী করে বা কার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেটাই প্রধান সমস্যা, তবু এর পাশাপাশি চলেছে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদের বিষ, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীকে শোষণ।

জাতিভেদের ব্যাপারটা প্রকট করার জন্য তিনি এতদূর গেছেন যে নায়ক-নায়িকা দুজনেই বামুন হওয়া সত্ত্বেও কে বড়ো বামুন কে ছোট বামুন সেই বিচার করে ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে গেছে! 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের নায়িকা সন্ধ্যা অরুণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে যে, 'আমি তো ভুলতে পারিনে, আমি কত বড়ো বামুনের মেয়ে।'

অরুণ হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আমি ?'

সন্ধ্যা বলল, 'তুমিও আমার স্বজাত,—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা ?'

কল্লোল যুগের লেখকদের আমল থেকে দেখা যাচ্ছে জাতের অমিল সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকা দুজনেই বিয়েতে আগ্রহী, কিন্তু যত বাধার সৃষ্টি করেছে তাদের

বাবা-মায়েরা। শরৎচন্দ্রের সময় পর্যন্ত, নায়ক-নায়িকারাই এই সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, তাদের মধ্যে অন্তত একজন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা, মনে করেছে, এটা পাপ। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অক্লান্ত চেষ্টা এবং আইনের সাহায্য থাকা সত্ত্বেও শরৎ-সাহিত্যের কোনো বালবিধবা আবার বিয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি, প্রেমের উন্মেষেও তারা অপরাধিনী বোধ করেছে।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের অরুণ আবার বিলেত-ফেরত। সেজন্য সে তো আরো ম্লেচ্ছ, তাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দেওয়া হয়। এখনকার কোনো বিলেত-ফেরত অবশ্য গ্রামে গিয়ে স্থায়ী হয় না। যদি বা ক্বচিৎ তারা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়, হিরের টুকরো ছেলে হিসেবে তারা সকলের আদর পায় এবং ঘরে ঘরে গিয়ে চা-সন্দেশ খায়।

জাতিভেদ আর ছোঁওয়াছুঁয়ি গ্রামদেশে কতটা কমেছে, তা দু-একদিন গ্রামে ঘুরলে বোঝা যায় না, তবে, দুলে বাগদীর ছোঁয়া লাগলে আশা করি এখন আর কেউ এমনকি কোনো কট্টর বামুনও শীতের সন্ধেবেলায় স্নান করে না মনে হয়। ট্রেনে কিংবা বাসে এই ছোঁয়া বাঁচাবার তো কোনো উপায়ই নেই। তবু, জাতির পাঁতি আর ছুঁৎমার্গ যে এখনো ভিতরে ভিতরে বহুদূর শিকড় চালিয়ে রয়ে গেছে, সে-সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। একটি গ্রামে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আমরা কয়েকজন একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর মায়ের চেহারা অবিকল মা-মা ধরনের। শুভ্র পরিচ্ছন্ন বসনে তাঁকে মহিমাময়ী মনে হয়েছিল। বন্ধুর দেখাদেখি আমিও তাঁর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি একেবারে আঁতকে উঠলেন। ওঁরা কায়স্থ আর আমি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ হয়ে আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে নাকি ওঁকে মহাপাতকী করেছি। তিনি উল্টে আমার পায়ে হাত দিতে আসতেই আমি চোঁচা দৌড় মেরে পালালুম।

শরৎচন্দ্র একজায়গায় লিখেছেন, 'জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্ছে ? তারা করচে কি ? মানা করে দে—মানা করে দে,—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।'

শরৎচন্দ্রের গ্রাম্য নায়িকারা ইস্কুলে যায় না, বাড়িতে থেকে কোনোমতে চিঠি লেখার মতো বিদ্যে (বেশ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন) আয়ত্ত করে। তাতেই এই আপত্তি। এই অবস্থা এখন অনেক বদলেছে। এখন গ্রামের উচ্চবর্ণের মেয়েরা স্কুলে পড়তে যায়—তাতে কোনো সামাজিক আপত্তি নেই। এমনকি, বিস্ময়ের কথা, অনেক স্কুলই কো-এডুকেশনাল, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। আলাদা করে বালিকা বিদ্যালয় যেখানে খোলা সম্ভব হয়নি, সেখানেই এই ব্যবস্থা। বেশ দূর দূর গ্রামে আমি এমন শিক্ষাব্যবস্থা দেখেছি, কোনো সমাজপতি সেখানে

আপত্তি তোলেন না। বরং কলকাতায়, বা কোনো শহরেই এখনো কো-এডুকেশনাল স্কুল নেই।

গ্রামে গ্রামে ঘুরলে একটা কথাই বার বার মনে হয়, আমাদের আগেকার সাহিত্যে যে ছবি ফুটেছে, সেরকম খাঁটি গ্রাম এখন আর কোথাও নেই। শরৎচন্দ্রের কোনো গ্রামে বিদ্যুৎ কিংবা যন্ত্র ছিল না। এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার শুভ উদ্যম দেখা দিয়েছে। যে-সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, সেখানেই পৌঁছবে মাইক্রোফোন। যে-কোনো উৎসবেই সেখানে তারস্বরে হিন্দী গান বাজে। কোনো একটি অঞ্চলের সব উৎসবে আগাগোড়া অন্য একটি ভাষার সঙ্গীত নিয়ে আমোদ করা হয়—এ রকম উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না।

গ্রামগুলি দেখলে মনে হয়, সবই যেন পরিবর্ধিত শহরতলি। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে জীবনযাপনে শহরেরই অনুকরণ এখন। গ্রামের মধ্যে এরকমভাবে শহর ঢুকে গেলেও শহর থেকে কিন্তু এখনো গ্রাম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি। গ্রাম মানে ব্যবহারের গ্রাম্যতা। কলকাতার মতন বড়ো শহরেও গ্রাম্যতার উদাহরণ ভূরি ভূরি। কিন্তু সে তো অন্য গল্প।

১৮

নদীটি ছোট ছিল। কিন্তু একটুখানি নেমেই দেখলুম জল অসম্ভব ঠাণ্ডা, নতুন ছুরির মতন চকচকে এবং ধারালো, মনে হয় পা কেটে নিয়ে যাবে—তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। সম্পূর্ণ নদীটিই স্বচ্ছ, একে বলা যায় নগ্ন নদী। প্রতিটি পাথরের নুড়ি আলাদা করে চেনা যায়। পায়রার ডিমের মতন রং; মাঝে মাঝে চিড়িক চিড়িক করে ছুটে পালাচ্ছে খুব ছোট ছোট এক ধরনের মাছ। ঐ মাছগুলোর কপালের ওপর চোখ আঁকা থাকে, আমি ওদের বলি সূর্যপোনা, জানি না, ঠিক নাম কিনা।

ওপাশে খানিকটা সর্ষের খেত। সামান্য বাতাসেই মাঠের মধ্যে যেন একটা হলদে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি সর্ষে ফুল কখনো খুব কাছ থেকে দেখিনি। আর একটু দূরেই পাহাড়, মেঘের সঙ্গে মেঘ হয়ে মিশে থাকা। সর্ষে খেতের মধ্যে কয়েকজন নারী ও পুরুষ কোমর নুইয়ে ঝুঁকে আছে। একজন নারীর আঁচলটা উড়ছে পতাকার মতন। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, দূর থেকে সেই শব্দকেই মনে হয় অভিমানের গান।

আবার জলে পা দিয়ে ঠাণ্ডাটা একটু সইয়ে নিই। সমস্ত শরীরটায় একটা

ঝাঁকুনি লাগে। দ্বিতীয় পা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। এবার যেতেই হবে। জুতো হাতে ছিল, সে দুটো খুব জোরে ছুঁড়ে দিলাম, ওপারের কিনারা ঘেঁষে পড়ল। নদীটা মাত্র তিন মানুষ চওড়া। প্যান্ট গুটিয়ে লাভ নেই, কারণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, নদীর মাঝখানের জল আমার কোমর ছাড়িয়ে যাবে। তবু কেন এই নদীটা পার হচ্ছি কে জানে!

টি ট্রিউ টিট্রিউ করে দুটো পাখি উড়ে গেল এলোমেলোভাবে। যেন একজন অন্যজনকে তাড়া করছে। পাখি দুটোর চেহারা ঠিক স্কুলের ক্লাস থ্রির ছেলেদের মতন। কী পাখি, তা জানি না। কত গাছেরও নাম জানি না। কত কিছু অজানা রয়ে গেল। যদি এই মুহূর্তে মরে যাই, একজন অসমাপ্ত অপূর্ণ মানুষ হিসেবে মরব।

মাঝখানে বেশ স্রোত। এই সময় আমার সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। মূল সিগারেটটা ভাসতে থাকে, গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই সরলরেখায় ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামে। তলা পর্যন্ত দেখা যায়। কেন আমি এই নদীর জল নোংরা করলাম? চারপাশে মুখ ঘোরালাম। আমার এই অপরাধ কেউ দেখেনি। শুধু নদী দেখেছে। ক্ষমা করবে না?

এপারের মাটি নরম। সামান্য কাদা, পা একটু ডুবে যায়। তবু উঠে এলাম ঠিকঠাক। জুতো দুটো খুঁজতে গিয়ে সামান্য শিউরে উঠলাম। জুতো দুটো গিয়ে পড়েছে একটা হাড়ের খাঁচার মধ্যে। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো অতিকায় জন্তুর হাড়। তা নয়, মাথা দেখে চেনা যায়, গোরু বা মোষের। পাঁচ ছ' দিনের পুরোনো, কুকুর বা শেয়ালে মাংসগুলো খেয়ে গেছে। পাহাড়ের পটভূমিকায় আমি সেই মোটা মোটা অস্থি-পাঁজরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি, স্থির দৃষ্টিতে, যেন আমার কিছু মনে পড়বার কথা। মনে পড়ে না। সাবধানে জুতো জোড়া তুলে নিই।

সর্ষের খেত থেকে এক জোড়া নারী পুরুষ এদিকে আসে। আমি পাহাড়ের প্রান্তেব বাড়ি-ঘরের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করি, ওটা কি গ্রাম? ওরা দুজনেই একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে পরস্পরের দিকে চোখ ফেরায়। কোনো উত্তর দেয় না। জলে নেমে বেশ দ্রুত ছপছপিয়ে ওপারে চলে যায়। হয়তো ওরা আমার ভাষা বোঝেনি। আমি অনেক পাখি ও গাছের নাম জানি না, একটা গ্রামের নাম জেনেই বা আমার লাভ কী?

পুরো প্যান্ট ও জামার কিছু অংশ ভিজেছে। এইরকম ভাবেও যাওয়া যায়। অথবা বসে থাকলেও ক্ষতি নেই। কাছেই একটা বড়ো গাছ। সৌভাগ্যবশত এই গাছটি চিনি, জারুল। তলার অনেকখানি ফর্সা জমি। তবু গাছের কোটরে সাপখোপের বাসা আছে কিনা ঘুরে ফিরে দেখে নিই। নেই বলেই তো মনে হয়।

শুয়ে পড়ি মাটিতে প্রথমে কনুইতে হেলান দিয়ে কাৎ হয়ে, তারপর সরাসরি চিৎ। ওপরে পাতায় ফাঁক দিয়ে আকাশ। শীতের রোদ ঠিক মুর্শিদাবাদী সিল্কের মতন। জারুলের অনেক পাতা খসে গেছে। জারুল গাছ বড়ো একলা হয়। যেন এক বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় আকাশের দিকে মেলে আছে হাত। আঃ, কতদিন এরকম চিৎ হয়ে আকাশ দেখিনি। চোখ জুড়িয়ে আসে। যেন ঠিক আজকের দিনটিতেই, সকাল এগারোটা দশে পাহাড়ের কাছাকাছি এই জারুল গাছের নিচে এসে আমার শুয়ে থাকার কথা ছিল। কথা রাখতে পেরেছি বলে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ হয়। স্নায়ুর মধ্যে আর কোনো কলরব শুনতে পাই না।

১৯

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই শুনলাম, রেবাদের বাড়িতে আমাদের সকলের রাত্তিরের নেমন্তন্ন। অবাক হয়ে গেলাম। সকালেও শুনিনি একথা, অন্তত তিন-চার দিন আগে নেমন্তন্ন না করলে সেখানে কেউ যায় নাকি ? কিসেব এমন জরুরি নেমন্তন্ন! রেবার ছোট ভাইয়ের মুখে-ভাত।

বাড়িতে সবাই খুব হাসাহাসি করছে ব্যাপারটা নিয়ে। রেবাদের সঙ্গে আমাদের কোনো আত্মীয়তা নেই, পাড়ার মেয়ে—ওদের বাড়ির কারুর সঙ্গেও আমাদের চেনাশুনো নেই। আমার বোনকে ও মায়াদি বলে ডাকে, সারা দুপুরটা আমাদের বাড়িতেই থাকে—বারো-তেরো বছর বয়েস রেবার, ভারী সরল আর মিষ্টি মেয়ে, আমাদের বাড়ির সবাই ওকে ভালোবাসে। আমাকে যে কেন ও সেজদা বলে, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি, অনেক দিন বলেছি, এই তুই আমাকে সেজদা বলিস কেন—তা হলে মেজদা কিংবা বড়দা কে ? আমার তো আর কোনো ভাই নেই। রেবা তবু বলবে, আমার সেজদা ডাকতেই ভালো লাগে, বেশ করব সেজদা বলব, তোমার তাতে কি ?

আজ দুপুরে রেবার মা এবং বাবা দু'জনেই এসেছিলেন, হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেছেন। সে এক হাস্যকর অবস্থা! আমার বোন মায়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, জানিস্ দাদা, ওর বাবা-মার পাশে রেবাও দাঁড়িয়ে ছিল—চোখ দুটো লাল আর ফুলো ফুলো, বোঝাই যায় ওর বাবা-মা'র কাছে কেঁদেকেটে আমাদের জন্য নেমন্তন্ন আদায় করেছে—ওরা আগে নিশ্চয়ই রাজি হয় নি—হবেই বা কেন—আমাদের সঙ্গে কি আর সম্পর্ক—এদিকে আমরা যে এটা বুঝতে পেরেছি, সে ভাবও দেখানো যায় না...

কেউই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে না গেলে রেবা খুব আঘাত পাবে, তাই মা আর মায়া গেল শুধু—আমি তো অচেনা বাড়িতে কোনোদিনই নেমন্তন্ন খেতে যাই না। দূর থেকে শুনতে পেলাম রেবাদের বাড়িতে সানাই বাজছে।

বেশ রাত করে ফিরে আমার বোন বলল, জানিস দাদা, সে এক এলাহী-কাণ্ড! প্রায় হাজারখানেক লোককে নেমন্তন্ন করেছে বোধহয়—বিরাট প্যাণ্ডেল, সারা বাড়িটা একেবারে আলো দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। আর খাইয়েছে কি! দারুণ! লুচি-পোলাও, দু রকম মাছ, মাংস, তিন রকম মিষ্টি, দই।

আমি খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, তা খাওয়াবে না কেন! রেবার বাবাটা তো এক নম্বরের চোর! চুরি করা টাকায়—

মা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, ভারি বিচ্ছিরি ধরনের কথা! লোকের নামে ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। আসলে চার মেয়ের পর এই একমাত্র ছেলে তো —তাই খুব ধুমধাম করেছে।

রেবাদের বাড়িটাকে পাড়ার লোকে বলে চোরের বাড়ি। আমারও অনেকটা সেই ধারণা। রেবার বাবাকে দেখলে অবশ্য ওরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক, চেহারাটাও সুন্দর—লম্বা, ফর্সা, অনেকটা ঘিয়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মহাদেব-মহাদেব ভাব। কারুকে কোনোদিন ঠকাননি, দোকান থেকে ধারে জিনিস কিনে টাকা মেরে দেননি। রেবার বাবা হরপ্রসাদ সরকার—কলকাতায় থাকেনও খুব কম, পাকিস্তানের বর্ডারের কাছে কোন একটা থানার ও.সি. তিনি। পুলিসের দারোগা হলেই যে অসৎ হবে—তার কোনো মানে নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু রেবার বাবা ঐ বর্ডারের কাছে থানায় বদলি হবার পরই রেবাদের বাড়ি যেন রাতারাতি বদলে গেল। হরপ্রসাদবাবু গুপ্তধন পাননি, ডারবির লটারি জেতেননি, তবু ওঁদের একতলা ছোট্ট বাড়িটা রাতারাতি তিনতলা হয়ে গেল, পাশের বস্তিটা কিনে নিয়ে তিনি সেখানে ফ্ল্যাট বাড়ি তুললেন। এসব কি করে হয়—ম্যাজিকে? আমারও বিশ্বাস হয় না। শুধু দারোগার চাকরির মাইনেতে যে এসব হয় না, তা অন্ধতেও বোঝে। ছেলের অন্নপ্রাশনে এক হাজার লোককে ওরকম খাওয়ানো কি সোজা কথা।

আমি মায়াকে বললুম, তোদের ঐ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে না যাওয়াই উচিত ছিল!

—কেন, যাব না কেন?

—ঐ চোরের টাকায় খাওয়াটাও অন্যায়!

—আহা-হা, রেবা ঐটুকু মেয়ে, অমন করে বলেছে, না গেলে ওর মনে আঘাত

লাগত না? কার বাবা কি রকম কে তার খোঁজ নিতে যাচ্ছে!

রেবার মনে সামান্য মালিন্যও নেই। সবসময় প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সব সময় ছটফট করে, আমাদের বাড়িতে থাকতে যে ওর কেন অত ভালো লাগে, তা জানি না! মায়ার কাছে ও পড়াশুনোও দেখে নেয়, ওর মা প্রস্তাব দিয়েছিল মায়াকে রেবার জন্য মাস্টারনী রাখতে—মায়া অবশ্য তাতে রাজি হয়নি, সে বলেছে—না, না, তার দরকার নেই, রেবা এমনিই আমার কাছে পড়ে যাবে। সারা দুপুর রেবা আমাদের বাড়িতে বসে কাটায়, মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করে, কোনো কোনোদিন ছুটির বিকেলে দেখি রেবাই আমার জন্য চা নিয়ে আসছে। আমার সঙ্গে এসে খুনসুটি করে, ছেলেমানুষি প্রশ্ন করে, আমার তখন মেজাজ যে-রকমই হোক—রেবার সঙ্গে দেখা হলে না হেসে উপায় নেই! রেবাদের বড়লোকের বাড়ি, ওদের বাড়িতে কত রকম খাবার—কিন্তু আমাদের বাড়িতে মুড়ি আর চানাচুর ও পরম আহ্লাদে খায়। এক-একদিন আমার কাছে আব্দার করে, সেজদা, ফুচকা খাওয়াবে? খাওয়াও না। ঐ যে ফুচকাওয়ালা যাচ্ছে—

একদিন রেবার জন্য আমি দারুণ অপমানিত হলুম। গলির মোড়ে একটা সাইকেলের দোকান—সেখানে কতগুলো লোফারের আড্ডা, দিনরাত হৈ-হট্টগোল করে, মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য ওরা কোথায় উধাও হয়ে যায়—আবার ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে হৈহৈ করে। ছেলেগুলোর জন্য পাড়ার অনেকেই সন্ত্রস্ত, আমি ওদের এড়িয়ে যাই।

গোটা তিন চারেক ছেলে আমাকে ঘিরে ধরে বলল, নীলুদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব। প্রাইভেট কথা!

আমি অবাক হয়ে বললুম, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, দাদা, একটু ইয়ে মানে, একটু বিপদে পড়ে—

—বিপদে পড়ে আমার কাছে? মজার ব্যাপার তো!

—আপনি ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন! মানে বুঝলেন, পাড়ার লোক যদি পাড়ার লোককে না দেখে।

—খুলে বলুন তো ভাই!

—আমাদের ঘণ্টে, চেনেন তো, নীল গেঞ্জি পরে ঐ যে সাইকেলের দোকানে বসে থাকত—সে মানে, ইয়ে, একটা বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, আপনাকে একটু উদ্ধার করে দিতে হবে।

—বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে মানে!

—থানায় ধরা পড়েছে, ওর কোনো দোষ নেই।

—থানায় ধরা পড়েছে তো পাড়ার এম.এল.এ'র কাছে যাও! আমি কি করব—

—এখানে নয়। বনগাঁয় ধরা পড়েছে।

—বনগাঁয়? স্মাগলিং করতে গিয়েছিল বুঝি?

— না, না। একজন চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে—

—সে যাই হোক, বনগাঁতে ধরা পড়েছে তো আমার কি করার আছে?

—আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। ওখানকার ও. সি. হলেন গিয়ে হরপ্রসাদ সরকার—ওর মেয়ে তো আপনাদের বাড়িতে আসে। আপনাদের সঙ্গে ওদের খুব চেনাজানা—আপনি যদি একটু বলেকয়ে ঘণ্টেকে ছাড়িয়ে দেন—

—আমি? একজন স্মাগলার...কি বলতে চাও কি?

রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি বাড়ি ফিরে এলুম। ছি ছি, এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে অকারণে জড়িয়ে পড়ার কোনো মানে হয়। দোতলায় উঠেই আমার বোন মায়াকে দেখতে পেয়ে আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, এই, তোকে বলে দিচ্ছি—তুই রেবাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দিবি! খবর্দার যেন আর কোনোদিন ও এ বাড়িতে না ঢোকে! একটা চোরের মেয়ে—লোকে ভাবছে আমরাও বুঝি ঐ দলের—

—দাদা, তুই কি বলছিস? রেবার কি দোষ!

—তর্ক করিস না! কোনো কথা শুনতে চাই না! যা বলছি শুনে রাখ। রেবা যেন কোনোদিন আর এ বাড়িতে না আসে!

—আমি একথা বলতে পারব না।

—তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হলে আমিই বলে দেব—

ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে রেবা বেরিয়ে এল। জানতুম না, ও এ বাড়িতে আছে। তার সরল মুখখানা বিহ্বল হয়ে গেছে, দু'চোখে টলটল করছে জল, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, সেজদা, আমি আর এ বাড়িতে আসব না? আর আসব না?

রেবা হুহু করে কেঁদে ফেলল। আমি ঠিক সেই মুহূর্তে কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার চোখ জ্বালা করে উঠল। ঐ কচি মেয়েটাকে ওরকম বিষম আঘাত দেবার অধিকার আমার আছে কিনা সে কথা আমাকে কে বলে দেবে?

২০

বৃষ্টি হলে কলকাতার রাস্তায় জল জমবে এ আর নতুন কথা কী? আর ক'দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হলে তো সব কাজকর্ম থেমে থাকতে পারে না? বিশেষ কাজে যাবার দরকার টালিগঞ্জ আর বেহালায়। বাসগুলোর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে একটা গাড়ি যোগাড় করে ফেললাম। গাড়িটি খুব পুরানো আমলের আর ছোট্টখাট্ট হলেও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জাতের গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটার উঁচুতে থাকে বলে এক কোমর জলের মধ্যেও ঝিকঝিক করে বেরিয়ে যায়। কলকাতার কাছেই আজকাল তৈরি হয় যেসব অ্যামবাসেডর, সেগুলি সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতার রাস্তায় অচল।

যেতে হবে গড়িয়া-নাকতলা অঞ্চলে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ির কাছাকাছি। গড়িয়াহাট থেকে যাদবপুরের দিক দিয়ে যাব ঠিক করলাম। ঢাকুরিয়া ব্রীজ পেরিয়ে খানিকটা যাবার পরই মনে উদয় হলো সেই চিরন্তন প্রশ্ন: কেন এ পথে এলাম? এ তো পথ বা রাস্তা কিছুই নয়। এ তো কামানের গোলায় আহত ভূমির ভগ্নাংশ! অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমে এদিককার রাস্তা চওড়া করা হয়েছিল। তার দু-পাশ এখনো উঁচু নিচু হয়ে আছে, হঠাৎ হঠাৎ ওপরে উঠতে হয়, আবার নিচে নামতে হয়, কখনো শুকনো রাস্তায়, কখনো নোংরা কাদায়। একটু পরেই শেষ হয়ে যায় এই চওড়া রাস্তার খামখেয়াল, যাদবপুর থেকেই পথ আবার প্রাচীনপন্থী, দু-পাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে সাইকেল-রিকশা, গোরুর গাড়ি, লরি, বাসের ফাঁকে ফাঁকে চোর-চোর খেলার মতন হেঁটে যাচ্ছে মানুষজন, প্রত্যেকের ভুরু কুঁচকানো। কৃষ্ণা গ্লাস থেকে পদ্মশ্রী পর্যন্ত হাঁটু জল আর বিরাট বিরাট খানা-খন্দ। এক একটা গর্তে গাড়ির চাকা পড়ে লাফিয়ে ওঠে, গীয়ার পাল্টে অ্যাকসিলেটারে জোর চাপ দিতে হয়। আর প্রত্যেকবারই মনে হয় চাকাটা আর উঠবে না! এক এক সময় মনে হয়, না উঠলেই বাঁচি, এখানেই চুপ করে বসে থাকি। এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই, যখন-তখন জ্যাম বেঁধে যাচ্ছে, এখানে গাড়ির ইউ টার্ন করা প্রায় অসম্ভব।

দুটি ছেলেমেয়ে নিবিড়ভাব গল্পে মশগুল হয়ে হাঁটছিল, ছিটকে জল-কাদা লাগল তাদের গায়েতে। চট করে মুখটা নিচু করে ফেললাম। তাড়তাড়ি যে পালাব তার উপায় নেই, সামনে একটা বিরাট গর্ত। ওরা দুজন আমার দিকে তাকিয়ে কী গালাগাল দিল কে জানে! এ রকম অবস্থা আমারও অনেকবার হয়েছে। যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি তখন গাড়িওয়ালাদের ওপর দারুণ রাগ হয়। আর যখন গাড়ি চড়ে যাই, তখন মনে হয় রাস্তার লোকগুলো ঠিকঠাক ফুটপাথ ধরে হাঁটতে পারে

না? এখানে অবশ্য ফুটপাথ বলে কিছুই নেই। পথ পথিকের জন্য—একথাটা কলকাতা শহরে মিথ্যে।

গড়িয়া বাসস্ট্যাণ্ডের ধারটা বহুদিনের পুরোনো কাদায় নরক-সদৃশ্য। দ্রুত ডাইনে বেঁকে খানিকটা বেশ ফর্সা রাস্তা পাওয়া গেল।

সেই ভরসায় ফেরার সময় টালিগঞ্জের দিক দিয়ে এলাম। হায়, ক্ষণপ্রভা যেমন আঁধার আরো বাড়িয়ে দেয়, তেমনি একটুখানি ভালো রাস্তার মোহ আরো বিপদ ডেকে আনে। বিপদ শুরু হয়ে গেল রাণীকুঠি থেকে। চণ্ডীতলায় বেঁচে গেলাম ধাককা খেতে খেতে। পর পর এত গর্তে পড়লে স্টিয়ারিং কনট্রোল থাকে না। তাছাড়া, আমি আবার কাঁচা ড্রাইভার।

ট্রাম লাইন এসে পড়ায় বিপদ আরো বাড়ল। ট্রামের পথ আর গাড়ির পথে কিছুতেই সহাবস্থান হয় না। এদিকেও নতুন তৈরি করা রাস্তার পীচ ভেঙে গিয়ে হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। একজন ঝাড়ুদারকে দেখলাম, ট্রাম লাইন থেকে পাথর সরিয়ে দিচ্ছে, তারপর যেতে পারছে ট্রাম। আনোয়ার শা' রোডের মোড় থেকে বিরাট জ্যাম। এখানে রাস্তা সরু এবং অসম্ভব বিতিকিচ্ছিরি। ভিড়ে ভর্তি বাসগুলো দু-দিকে এমন শরীর দোলাচ্ছে যে, ভয় হয়, যে কোনো মুহূর্তে কাৎ হয়ে পড়ে যাবে। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে বেঁকে গেলাম নিউ আলিপুরের দিকে।

কোনো রকমে টালিগঞ্জ ব্রীজ পার হবার পর খানিকটা স্বস্তি এল। নিউ আলিপুর ধনীপাড়া, এদিকের রাস্তা ভালো থাকাই স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক? পুরসভা কি পাড়া অনুযায়ী রাস্তা সারায়? সব রাস্তার সমান মূল্য নয়? তবু তো এ রকম বৈষম্য থাকে দেখেছি! এই প্রথম চতুর্থ গীয়ারে গাড়ি চালানো গেল। কিন্তু মসৃণ রাস্তাতেও মাঝে মাঝে চোরা গর্ত রয়ে গিয়েছে, হঠাৎ হঠাৎ খানিকটা করে জায়গা কাটা। ইলেকট্রিক বা টেলিফোন কোম্পানি হয়তো খুঁড়ে গেছে। তারপর আর কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

তারাতলাব মোড়ের কাছে জল জমে আছে। বেশি জল নয়, তাই বিশেষ কিছু আশঙ্কা করিনি। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা লরি যেতেই পচাং করে নোংরা জল ছিটে এল আমার গায়ে। ডান দিকের কাঁচ খোলা ছিল। রাগ করতে গিয়েও চেপে গেলাম। শোধবোধ—সেই যে দুজনের গায়ে খানিকটা আগে আমি জল ছিটিয়ে ছিলাম। ওরা বোধহয় জানে না যে গাড়ির আরোহীদেরও মাঝেমাঝে কাদা-জল খেতে হয়।

অন্যমনস্ক হয়েছিলাম একটু, ঠিক ট্রাম লাইনের মুখটায় একটা বিরাট গর্তে পড়ে গেলাম ঝপাং করে! গর্তটা গাড়ির আয়তনের চেয়েও বড়ো। এবার পুরোনো

গাড়ির ইঞ্জিন হার স্বীকার করল। অনেক গোঁ গোঁ শব্দ করেও উঠতে পারল না। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সাহায্যকারীর অভাব নেই। তিন-চার জন ছুটে এল ঠেলতে। অতিকষ্টে তোলা গেল গাড়িটা। একবার বেহালার দিকের ট্রাম রাস্তার দিকে তাকালাম। সেই পর পর গর্ত আর ভাঙা পাথর, গাড়িগুলো দুলতে দুলতে এগোচ্ছে কচ্ছপ গতিতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কাজ নেই বেহালায় গিয়ে। শেষ পর্যন্ত কি গাড়ির অ্যাকসেল ভাঙব? দেখলাম, কাছেই একটি ট্যাক্সি অ্যাকসেল ভেঙে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। আমি সোজা বাড়ির দিকে চম্পট দিলাম। খুব সোজা অবশ্য হলো না কাজটা, কারণ ভয়াবহ মাঝেরহাট ব্রীজটি পেরুতে হলো।

দিনচারেক আগে আমি বসিরহাটের একটি গ্রাম থেকে ফিরছিলাম কলকাতায়, বাসে চেপে। তখন দেখেছি, পুরো উত্তর কলকাতা, আশ্চর্য, বসিরহাট, বারাসত, মধ্যমগ্রামের দিকে রাস্তা ততটা খারাপ নয়, কিন্তু নাগেরবাজারের পর থেকে যেই শুরু হলো শহরের পথ, সেটা সম্পূর্ণ বিপথ। দমদম রোডের ওপর, সেভেন ট্যাঙ্কসের কাছাকাছি, রাস্তার জল, নর্দমার জল মিলমিশে একাকার, সেই জল ঢুকে পড়েছে দু'পাশের বাড়িগুলিতে। একটি সুসজ্জিতা তরুণী দাঁড়িয়ে আছে একটা ইঁটের পাঁজার ওপর। সেই ইঁটের পাঁজাটা একটা দ্বীপ। আমাদের সামনের মিনিবাসটা জলের মধ্যে দিয়েই খুব জোরে ছোটায় একটা ঢেউ উঠল, সেই ঢেউতে ডুবে গেল দ্বীপটি, ভিজে গেল মেয়েটির শাড়ি। সেই মুহূর্তে মেয়েটির মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম!

পৃথিবীর অনেক শহর দেখেছি। কিন্তু আমার প্রিয় কলকাতার মতন এমন কদর্য এবং ব্যবস্থাহীন শহর আর একটাও দেখিনি। এত নোংরা এত জোচ্চুরি দেখে দেখে সকলেরই মন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এই বীভৎস অবস্থার মধ্যেই হাঁটা চলা করছে মানুষ, একবার যেন মনেও পড়ে না যে এ জীবন অন্য রকম হবার কথা ছিল। ভাবতে গেলে মনখারাপ লাগে। বড্ড মনখারাপ লাগে।

২১

টিকিট কেটে গ্যালিফ স্ট্রিটের ব্রিজের কাছে স্টীমারে চেপে বসলুম। মাত্র তিন মাস কলকাতার বাইরে ছিলুম, এর মধ্যে কলকাতার বদল হয়ে গেছে, চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

স্টীমার মারহাট্টা ডিচ ধরে চলল পুব দিকে। টলটল করছে জল, আগাগোড়া দু'পাশ বাঁধানো, পাড়ের এখানে ওখানে দু'একটা গাছের নিচে ফরাসি কায়দার চায়ের দোকান। স্টীমার চলছে রাজহংসীর মতন অহংকারের সঙ্গে। জলে আরো অনেক নীল-হলুদ-লাল রঙের নৌকো, সেগুলোও মানুষে ভরতি, শুনলাম ওরাও অফিসযাত্রী। কী করে এমন বদল হলো? অথচ, কয়েক দিন আগেও দেখে গেছি —এই মারহাট্টার খাল কী নোংরা, কুৎসিত, আশেপাশের লোকের সাধারণ বাথরুম ছিল এটা, দু'চারটে খড়ের গাদা নৌকো ছাড়া আর কিছু দেখিনি। হঠাৎ কি করে ম্যাজিকে বদলে গেল সব?

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা এ স্টীমারটা কদ্দূর পর্যন্ত যাবে? আমি তো কিছু না জেনেই টিকিট কেটে উঠে পড়লুম।

ভদ্রলোক অবাক—গোল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন, বাঙাল নাকি আপনি? কলকাতার খবর কিছুই রাখেন না? এ স্টীমার এদিক দিয়ে একেবারে নারকোলডাঙা দিয়ে চলে যাবে শেয়ালদার পেছন পর্যন্ত। আর উল্টোদিকে যেটা যাচ্ছে, সেটা বাগবাজারের দিকে গঙ্গায় পড়ে বাঁ দিকে বেঁকে থামবে ডালহাউসির কাছে। অফিসে যাচ্ছি এখন মহা আরামে। দেখবেন না, এরপর কলকাতার সঙ্গে লোকে ভেনিসের তুলনা করবে!

আমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, দেখুন, আমি বাঙাল ঠিকই। অনেক খবর রাখি না। এই রকম একটা চমৎকার কাণ্ড কি করে এই ক'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল বলুন তো?

লোকটি রহস্যময় ভাবে হেসে বলল, দৈবে তো বিশ্বাস করেন না? এখনো দৈবে অনেক কিছু ঘটে। এই নতুন পরিকল্পনাটা হঠাৎ একসঙ্গে কয়েকজনের মাথায় খেলে যায়, আর তারপর তাদের মতেরও মিল হয়ে গেল—সেটা দৈব নয়? মুখ্যমন্ত্রী, স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী, মেয়র, সি এম পি ও'র কর্তারা, কংগ্রেসের নেতা এমনকি বিরোধী দলগুলোর নেতারাও একসঙ্গে মিটিং-এ বসে পরিকল্পনাটা নিয়ে ফেললেন একমত হয়ে। তারপর বিনা পয়সায় কাজ হয়ে গেল।

—বিনা পয়সায়? চক্র রেল, ভূগর্ভ রেল নিয়ে এত নয়-ছয় চলছে, আর স্টীমার পথ হয়ে গেল বিনা পয়সায়?

—হ্যাঁ মশাই! বিরোধীদলগুলো যেমন ধর্মঘটের ডাক দেয়, সেইরকমই একদিন ডাক দিলো ধর্মকর্মের। গত ২-রা আর ৩-রা জুলাই সমস্ত দলের নেতাদের ডাকে রাইটারস বিলডিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সরকারি আর বে-সরকারি অফিসের কর্মচারীরা আর কলেজ-ইউনিভারসিটি-মেডিক্যাল-এর ছাত্রছাত্রীরা

অফিসে বা কলেজে না গিয়ে, আর ময়দানেও না গিয়ে সোজা চলে এসেছিল এই খালপাড়ে। তারপর কাজে লেগে গেল—করপোরেসান সাপ্লাই দিয়েছিল খন্তা-কোদাল আর ঝুড়ি। ব্যস, লাখ পাঁচেক লোক হাত লাগালে—এইটুকু কাজ আর কতক্ষণ লাগে মশাই! দু'দিনেই এত বড়ো খালটা মেরামত হয়ে গেল, পোরট কমিশনের লোকেরা ড্রেজার দিয়ে চড়া পরিষ্কার করে দিয়েছে, সাত দিনের মধ্যে লাইসেন্স ইসু—এখন দেখছেন তো কি সুন্দর নৌকো আর স্টীমার চলছে। শুনেছি, দক্ষিণ কলকাতাতেও এরকম একটা কাটা হবে।

আমি বললুম, চমৎকার! এত ভালো লাগছে! অফিসে যাওয়ার সুবিধে ছাড়াও শহরের পাশ দিয়ে স্টীমারে চড়ে বেড়াবার এমন সুযোগ! ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, আপনি বিয়ে করেছেন?

—আজ্ঞে না, এখনও, মানে—

—শুনুন, আপনাকে তা হলে একটা টিপস দিই। শহরেব কর্তারা তরুণ-তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য রোমান্স করারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এই স্টীমারের ছাদের ওপর যে সুন্দর সীটগুলো আছে, সন্ধে ছ'টার পর ওখানে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। শুধু একজন তরুণ আর একজন তরুণী—এইরকম জোড় বেঁধে এলে—বিবাহিত হোক বা না হোক—সেইসব কাপ্‌লদের জন্যই ওপরের টিকিট দেওয়া হয় তখন।

—ওপরে তখন টিকিটের দাম বেশি নাকি?

—না, সাধারণ দিনে, প্রতি টিকিট ৫০ পয়সা। কিন্তু ঠিক পূর্ণিমা আর অমাবস্যার দিন দাম বেশি—ঐ দিন বেশি ভিড় হয় তো—ঐ দু'দিন প্রতি টিকিট এক টাকা। চলুন, ঘন্টা দিয়েছে, শিয়ালদা পৌঁছে গেছি।

অবশ্য, এই রচনাটির নাম হওয়া উচিত 'যদি'। বাগবাজারের নোংরা খালপাড়ে দাঁড়িয়ে আমি এই স্বপ্নটা দেখলাম।

২২

রাসবিহারী এভিনিউর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা একটি তরুণী একটি তিনতলা বাড়ি ওপরের জানলার দিকে মুখ করে ডাকছিল, কৌশিক, কৌশিক? অবিলম্বে জানলা খুলে গেঞ্জিপরা একটি স্বাস্থ্যবান যুবক মুখ বাড়িয়ে বলল, কে। ঝুমা? ওপরে আয়! মেয়েটি বলল, ওপরে আর যাব না, একটা শুধু দরকারি কথা আছে।

যুবকটি নিচে নেমে এল, এবং শুধু একটি মাত্র দরকারি কথা নয়, অনেক দরকারি কথা হতে থাকে, পাশের সিগারেটের দোকান থেকে আমি যে দু-এক টুকরো শুনতে পাই, তাতে বুঝতে পারি এরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার রোমাঞ্চ হয়।

আমাদের ছাত্রজীবনে, খুব বেশিদিন আগের কথাও নয়, আমরা কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে খুব সহজে দেখা করতে পারতাম না, অনেক ছলছুতো খুঁজতে হতো। মেয়েদের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। গ্রীষ্মের ছুটির দীর্ঘ ব্যবধানে অতিষ্ঠ হয়ে একবার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তার ব্যায়ামবীর দাদার কাছে আধঘণ্টা ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল এবং টেবিলের তলায় আমার পা দুটো কাঁপছিল ঠকঠক করে। আর ছেলেদের বাড়িতে কোনো মেয়ের ডাকতে যাওয়া প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। আমাদের বাড়িতে কোনো অনাত্মীয় মেয়ের আগমন পাড়া-প্রতিবেশীদের উঁকিঝুঁকি দেওয়ার মতন ঘটনা। মাত্র কয়েক বছরে এত বদলে গেছে? এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা তাদের সহপাঠীদের বাড়িতে এসে নাম ধরে সহজভাবে চেঁচিয়ে ডাকতে পারে। এটাই তো সবচেয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জিনিস। ঐ তরুণ-তরুণীর প্রতি আমার একটুও হিংসে হয় না, বরং আমার ওদের আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে হয়।

কলকাতা এরকম হঠাৎ হঠাৎ ভাবে বদলায়।

একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে যে বয়েসে বৃদ্ধ বলা হয়, সেই বয়েসটা একটা গীর্জার পক্ষে কিছুই না। তেমনি পৃথিবীর বনেদী শহরগুলি, যেমন বাগদাদ, জেরুজালেম বা বারাণসী, এদের তুলনায় দুশো ছিয়াশি বছরের কলকাতা নিতান্তই নাবালক। কলকাতার কোনো পূর্বস্মৃতি নেই, কোনো ঐতিহ্য নেই। এই হিসেবে কলকাতার নাগরিকরা দায়মুক্ত, এখানকার নিয়ম রীতি আপনাআপনি তৈরি হয়ে উঠছে।

কলকাতা সব সময় জীবন্ত। হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজনার ঝড় ওঠে। কখনো প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে পড়ে, কিন্তু কলকাতা কখনোই ঝিমিয়ে থাকে না। দিল্লির ছাত্ররা যখন ব্রাহ্মণ-হরিজনে বিবাহ নিয়ে বিক্ষোভ জানায়, কলকাতার ছাত্ররা তখন বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ভিয়েৎনাম বা কিউবার ঘটনা নিয়ে যখন কলকাতার ছাত্ররা অস্থির, তখন বোম্বাই-মাদ্রাজ দিল্লির কামপাস শান্ত নিস্তরঙ্গ। এক সময় কলকাতার ছাত্ররা সুরেন বাঁড়ুজ্যের ঘোড়ার গাড়ি ঘোড়া খুলে নিজেরা টেনে এনেছিল। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে বাংলার ছাত্ররা বহুকাল জড়িত। অবশ্য রাজনীতি থাকলে দলাদলি

থাকবেই। এক সময় রাজপুতদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য থাকলেও বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি হবার কারণে তারা পরাধীন হয়ে যায়। কলকাতার ছাত্ররাও রাজনৈতিক দলাদলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এবং দলাদলির ফলে মাঝে মাঝে মারামারি। আমাদের ছাত্র বয়েসে নিজেদের মধ্যে মারামারিটা ঘুষোঘুষি বা ইটোইটিতেই থেমে থাকত, দৈবাৎ দু'একজন ছুরিও বার করেছে—কিন্তু বোমা-পাইপগান নিয়ে কোনো সহপাঠীকে একদম খুন করে ফেলার ব্যাপারটা কেউ দেখেনি। মাঝখানের কয়েক বছর এই নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ব্যাপারটি ঘটছিল, সুখের কথা, ছাত্ররা এখন আর খুনী হতে চায় না। যতদিন ছাত্র থাকবে, ততদিন মারামারি থাকবেই, সে খেলার রেজাল্ট নিয়েই হোক বা রাজনীতি নিয়েই হোক—কিন্তু সে মারামারি ঘুষোঘুষিতে নিবদ্ধ থাকলেই ভালো। কলকাতার ছাত্রদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা এই, এরা কোনোদিনই ভাষা, প্রদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্বে মাতেনি। সেদিক থেকে এখানকার ছাত্রসমাজ অনেক মুক্ত, অনেক রুচিশীল।

কলকাতার যৌবন দুরন্ত, কিন্তু অশালীন না। দিল্লিতে কোনো কলেজের ছাত্র সাইকেলে চেপে যেতে যেতে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ কোনো তরুণীর বেণী ধরে টান মারল আর মেয়েটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, এই বীভৎস দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। কলকাতার যুবসমাজ কোনো পথযাত্রিণীর রূপ যৌবন সম্পর্কে দু চারটে মধুর উক্তি করে নিশ্চয়ই, কখনো কখনো তাদের ভাষা কলেজ বাথরুমের দেয়ালের ভাষার পর্যায়েও নেমে যায় বটে, কিন্তু কখনো কোনো অচেনা নারীর সম্ভ্রমহানি করে না, শারীরিকভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক। তাছাড়াও কলকাতা ছাড়া এখনও ভারতের আর কোথাও ট্রামে বাসে মহিলাদের দেখে পুরুষরা জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না।

সিটি—বঙ্গবাসী—বিদ্যাসাগর—সেন্ট পলস—স্কটিশচার্চ আর প্রেসিডেন্সি এই সব অতিকায় কলেজগুলি মোটামুটি কাছাকাছি হওয়ায়, এর মধ্যস্থল কলেজ স্ট্রিট কলকাতার ছাত্রদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কলেজ স্ট্রিটে কতবার কতরকম ঝড় বয়ে গেছে। এখানকার কফি হাউস যুবসমাজের একটি প্রাণের জায়গা। দু'পাঁচ বছর পর পর আড্ডাধারীরা বদলে যায়, কিন্তু আড্ডার স্রোত অব্যাহত থাকে। এখন এক-একদিন কফি হাউসে গেলে একটাও চেনা মুখ দেখি না, কিন্তু একসময় আমার বন্ধুবান্ধবরাই ছিল এখানকার রাজন্যবর্গ। এবং এখনো দেখতে পাই, ঠিক আমাদের মতনই একদল অবিকল সেই একই ভঙ্গিতে তর্কে মেতে টেবিল ফাটাচ্ছে।

বিভিন্ন টেবিলে বিভিন্ন গোষ্ঠী। সাধারণত ছাত্রনীতিই সব জায়গার আলোচনায় প্রাধান্য পায় বটে, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যেন কবি ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ স্থান আছে। কফি হাউসে যে-কেউ গিয়ে এক কাপ কফি কিনে খেতে পারে, তবু কেন যেন রটে যায়, যারা কফি হাউসে যায়, তারাই ইনটেলেকচুয়েল। কফি হাউসের অনেক টেবিলই অনেক সাহিত্য পত্রিকার আজ অফিসিয়াল অফিস। আড্ডাধারীদের পকেট থেকে বেরোয় টাকার বদলে ভাঁজ করা কবিতা। অনেকেই জানে না, কলকাতা গোপনে গোপনে কবিদেরই শহর।

বারোয়ারি পুজো এবং খেলার মাঠে কলকাতার যৌবন বেশি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেব ম্যাচের পর বিশাল এক যৌবনস্রোত ময়দান ছেয়ে ফেলে, বন্যার মতন ক্রমশ তা রেড রোড পেরিয়ে ধেয়ে আসে এসপ্লানেডের দিকে। কত রকমের জামা আর কত রকমের চুলের বাহার। রাস্তায় গাড়ি-টাড়ির গা ধমাধম করে পিটিয়ে উল্লাস জানায়, বাসের জানলা দিয়ে ঝুলে কিংবা ছাদে চড়ে প্রাণ বিপন্ন করে হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরে। এই সব যুবকদেব সামান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারেব সমালোচনা যখন করেন কেউ, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এ আর কি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার। এর চেয়ে কত গুণ বেশি উচ্ছৃঙ্খল তারা হতে পারত, হবার কথা ছিল। যে-রকম অসহ্য কষ্ট সহ্য করে তারা খেলা দেখে, তিনদিন ধরে লাইনের দাঁড়িয়েও টিকিট পায় না, অথচ ঠিকই টিকিট পেয়ে যায় পেটমোটা লোকেরা, তাদের যাতায়াত ব্যবস্থার এত দুর্ভোগ—এর ফলে কোনোদিন যে তারা ফেটে পড়েনি, সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়নি, সেটাই আশ্চর্য নয়? এক লক্ষ যুবক এক সঙ্গে হলে কী না করতে পারে!

বারোয়ারি পুজোয় ছেলেরা একটু চাঁদার টাকায় ফুর্তি-টুর্তি করে। কীভাবে যেন রটে গেছে, দুর্গাপুজো করে পাড়ার ভালো ছেলেরা আর কালীপুজো করে পাড়ার মস্তানরা। নিশ্চয়ই এটা সত্যি নয়—তবু এরকম একটা রটনা চলছে। যারাই যে পুজো করুক না, কিন্তু খানিকটা আনন্দ-টানন্দ তারা তো কববেই। যে শহরে খেলার মাঠের সংখ্যা নগণ্য, ভালো বেড়াবার জায়গা নেই, বিশ্রী কতকগুলো সিনেমা ছাড়া সময় কাটাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেখানে যুবকরা বছরে দু'বার অন্তত আনন্দ করার সুযোগ নেবে না? তারা শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে? যে দেশের যুবসমাজ শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী—সে দেশের সর্বনাশ হতে আর দেরি থাকে না।

কলকাতার যৌবনের একটা ভারি করুণ দিক আছে। বিকেল বেলা নানান পথের মোড়ে মোড়ে যুবকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায়, পা বদলে নেয় মাঝে মাঝে। এই দৃশ্য দেখে আমার কষ্ট হয়, বুক টনটন

করে। এরা বেকার, এদের আর কোনো যাবার জায়গা নেই। স্বাস্থ্যবান, সুসজ্জিত সব যুবা। চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—এর থেকে অর্থহীন আর কি হতে পরে? এরা কাজ করতে অরাজি নয়, কিন্তু কেউ এদের কাজ দিতে পারে না। শুধু চাকরি দেওয়াই নয়—এক সঙ্গে কোনো একটা বড়ো কাজে নামবার জন্য এদের কেউ কখনো ডাকেনি। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, কোনো একদিন কলকাতার দু'তিন লক্ষ যুবক এক সঙ্গে শাবল গাঁইতি হাতে নিয়ে কোনো একটা রাস্তা তৈরি করা, বা বাঁধ বাঁধা কিংবা বাগবাজারের খালটিকে গভীরভাবে কেটে, নাব্য করে, দু'পাশে সুদৃশ্য রাস্তা গড়ে কলকাতাকে আর একটি সুদৃশ্য জিনিস উপহার দিয়েছে।

নিজের চোখে দেখা

কমল দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাত্রি দেড়টার সময় আমি দাঁড়িয়েছিলুম সাগরমেলার কাছে সেই একটিমাত্র সেতুর ওপর, যে সেতু ছাড়া সাগরদ্বীপে প্রবেশের অন্য কোনো রাস্তা নেই। অন্তত সেদিন ছিল না। শনিবার, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেই সমস্ত যাত্রী সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছতে চায়।

রাত্রি দেড়টায় সাগরদ্বীপ একটি হোগলা নগরী। হোগলা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি অসংখ্য ছোট ছোট ঘর ও চালা, তার ভেতর থেকেও মানুষ উপচে পড়েছে, বাইরে খোলা মাঠে অগুনতি মানুষ, রাস্তার দু'পাশে মানুষের ক্ষণস্থায়ী ডেরা। যারা আগেই পৌঁছেছে তারা এখন ঘুমের আবিল্লিতে ঢুলছে, যারা এইমাত্র পৌঁছলো, কোনোক্রমে পেয়েছে একটু বসবার জায়গা—তারা চুল্লি জ্বালিয়ে চাল ফোটাতে বসেছে। সেই সব অনেক চুল্লির আগুনের আভাও মৃত শালিকের ডানার মতন বিবর্ণ—কারণ সাগরমেলা এবার বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে।

ব্রীজের মাঝখানে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়েছে আসা-যাওয়ার জন্য। এখন কেউ যাবে না, সবাই আসছে, রাত দুপুরেও স্রোতের মতন আসছে—অতি বৃদ্ধ, অশক্ত বৃদ্ধা, জোয়ান সন্ন্যাসী ও শিশু। সারা দিনে এই সেতুটা ভেঙে পড়ার গুজব উঠেছিল চার-পাঁচ বার। ভেঙে যে পড়েনি সেটাই মিবাকল। একটা সরু কাঠের সেতুর ওপর এক সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের ট্র্যাফিক জ্যাম অসংখ্যবার ঘটেছে। হুড়োহুড়িতে মানুষের পায়ের তলায় মানুষ পিষ্ট হবার ঘটনাও ঘটেছে—এবং সেতু পার হতে না পেরে বেশ কিছু নারী-পুরুষ পাশের খালে নেমে বুক জল ঠেলে এপারে এসেছে—তা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এরা কেন আসে? কেন পাগলের মতন এত কষ্ট সহ্য করে, এত দুর্গম পথ পার হয়ে এরা ছুটে আসে? সেটাই আমি জানতে চাইছিলুম। ভূতে পাওয়া মানুষের মতন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বুড়ো-বুড়ি হুড়োহুড়ি করে এসে এই সাগরসঙ্গমে কি পেতে চায়?

এবার পৌঁছনোর কষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পুণ্যস্নানের আগের দিন সকাল থেকেই হঠাৎ দখিনা পবন বইতে শুরু করে। দখিনা পবন শুনতে বেশ ভালো হলেও সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অতি বিপজ্জনক। কোনো নৌকো বা মোটর লঞ্চ সাগরদ্বীপে যেতে সাহস পায় না। তা ছাড়া খবর এল, সাগরদ্বীপে পানীয় জল

ফুরিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। সরকারি প্রচারযন্ত্রে এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ ঘোষণা করা হচ্ছে বারবার। নামখানায় মানুষে মানুষে ধূল পরিমাণ। যারা উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল বা কাশ্মীর থেকে এসেছে—তারা কি এতদূর এসেও সঙ্গমে ডুব না দিয়ে ফিরে যাবে? এরা মরবে, তবু ফিরে যাবে না। সুতরাং চিমাগুড়ি নামে একটা অখ্যাত জায়গায় কোনোপ্রকারে যানবাহনে পৌঁছেই তারপর সাত-আট মাইল পায় হাঁটা পথ। শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, গড্ডালিক প্রবাহের মতন মানুষের দীর্ঘ যাত্রা। রাত-দুপুরেও সেই প্রবাহের বিরাম নেই।

কেন এরা আসে?

ব্রীজের ফাঁকা দিকটায় দাঁড়িয়ে আমি ওদের দেখছিলাম। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, শুনিয়ে জী, আপনি কতদূর থেকে আসছেন?

বৃদ্ধ আসছেন অযোধ্যা থেকে। সঙ্গে আছেন বৃদ্ধা ও পুত্রবধূ, এবং নাতি। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে পুটুলী। পথকষ্ট সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। তীর্থযাত্রায় কষ্ট হলে পুণ্য বাড়ে—এরকম ওদের বিশ্বাস। কিন্তু আমি তো তীর্থ বিশ্বাস করি না, তাই প্রশ্ন করি, পণ্ডিতজী, এটা কি তীর্থ? এখানে এলে কি হয়? কী এর মাহাত্ম্য?

বৃদ্ধ তা জানেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। আমি তাকে নমস্কার করে বিদায় দিই।

আবার আর একজনকে জিজ্ঞেস করি। সেও কিছু জানে না। সে বললে, সবাই আসে, তাই আসি।

আমার জেদ চেপে যায়। আমি একটা উত্তর চাই। প্রায় পঞ্চাশ জনকে থামিয়ে আমি একই রকম প্রশ্ন করি। তাদের মধ্যে বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, পাঞ্জাবি, হরিয়ানানিবাসী, ওড়িয়া কত রকমের লোক, বাঙালির সংখ্যা কম হলেও চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের মাত্র একজনকে দেখেছিলাম। কেউ কোনো উত্তর দিতে পারে না। কেউ কেউ বলে বংশ পরম্পরায় এরকমই চলে আসছে। অনেকেই কপিল মুনির নাম পর্যন্ত শোনেনি। যারা বা শুনেছে, তাদের আমি জেরার ছলে বলি, কপিল মুনি তো শুনেছি নাস্তিক ছিলেন, তাকে তোমরা কপিল ভগবান বলো কেন? তখন তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

হিন্দুদের মতন এমন ধর্মপাগল অথচ ধর্ম-সম্পর্কে অজ্ঞ জাত বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। ধর্মের কোনো তত্ত্ব কিংবা শাস্ত্র সম্পর্কে এ জাতির অধিকাংশ মানুষেরই কোনো জিজ্ঞাসা নেই, শুধু কিছু লোকাচার ও সংস্কার দিয়ে আবদ্ধ। পরমার্থ সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান নেই বলেই তীর্থক্ষেত্রে টাকা খরচ করে পুণ্য অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক দেবালয়ে কিংবা তীর্থস্থানে এসে যার যা সাধ্য টাকা-

পয়সা কিংবা স্বর্ণালঙ্কার ছুঁড়ে দেয়, তাতেই সব পাপ খণ্ডন হবে। নিজেরা না খেয়ে, পায়ে হেঁটে আসে ঠাকুরের পায়ে পয়সা দেবার জন্য। বেচারা কপিল মুনি—মানুষের সংশ্রব ছেড়ে এই পাতালপুরীর দ্বারের কাছাকাছি এসে আশ্রম বানিয়েছিলেন—কোন এক কিম্ভূত কিমাকার গল্পের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে তাঁর নামে বানানো মন্দিরে পয়সা ছোড়ে। সেই সব পয়সা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় দূরদেশী পাণ্ডা-মোহান্তরা। তা প্রায় তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকা হবে।

পয়সার লোভে আসে আরো অনেকে। একজন মানুষকে পেলাম, সে এসেছে গয়া জেলা থেকে। প্রতি বছরই আসে। তার সঙ্গে একটি বাছুর। না, বাছুরটাকে সে গয়া থেকে সঙ্গে আনেনি। বাছুরটিকে স্থানীয় পল্লী থেকে ভাড়া করেছে আঠাশ টাকায়। বাছুরের ল্যাজ ধরে মন্ত্র পড়ার একটি রেওয়াজ আছে এই মেলায়। স্বামী-স্ত্রী মিলে একবিন্দুও অর্থ না বুঝে কিছু সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে যায়, কিছু পয়সা দক্ষিণা দেয়, দরদাম করে যতটা কম দেওয়া যায়। ভগীরথ পিতৃবংশ উদ্ধার করেছিলেন বলে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে এখানে শ্রাদ্ধ করার নিয়ম হয়েছে। বাছুরের ল্যাজ ধরে কেন? পাঁচ-সাত রকমের বাজে গল্প শোনা যাবে। যাই হোক, বাছুর-ব্যবসায়ীর এতে দু'-তিন শো টাকা লাভ হয়। পকেটমার, ঠগ, জোচ্চোর এবং মেয়ে-লোভী ঘুরঘুর করে আশে-পাশে।

ওঃ, জীবনে আমি এক সঙ্গে এত বুড়ো-বুড়ি দেখিনি। যতটা সহ্য করা যায় তার চেয়ে একটু বেশিমাত্রার বুড়ো-বুড়ি। তারা খোলা আকাশের নীচে, এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। তাল তাল মাংসপিণ্ডের মতন মানুষ। কিংবা আলুর বস্তা খালি করার মতন কেউ যেন এখানে হুড়হুড় করে মানুষ ঢেলে দিয়েছে। দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি অনুভূতিগুলো এখানে এলে ভোঁতা হয়ে যায়। এক-আধজন মানুষের দুঃখ দেখলে দয়া হয়—যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অমানুষিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে—সেখানে দয়া খরচ করার প্রশ্ন ওঠে না।

সাংবাদিকরা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বারবার খোঁজ নিচ্ছেন, কোথাও কেউ মারা গেছে কিনা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা। সেরকম ঘটনা ঘটলেই খবর হয়। বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এক্ষুনি কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু সংবাদ শুনলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে-কোনো জায়গায় আগুন লাগতে পারে, পুকুরের পচা জল খেয়ে যে-কোনো সময় মড়ক লাগতে পারে, এলাহাবাদের কুম্ভমেলার মতন ভয়াবহ ঘটনা যে-কোনো বছরেই সংঘটিত হতে পারে গঙ্গাসাগরে। প্রত্যেক বছরেই যে সে ঘটনা ঘটে না তার একমাত্র কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো জেদী—সহজে খাঁচা ছাড়া হতে চায় না।

তা, এত লক্ষ মানুষের মধ্যে কয়েক হাজার বুড়ো-বুড়ি যদি মারা যায়, তাতে

ক্ষতি কি? এরা গরীব, এরা মূর্খ, এরা তো মৃত্যু শিয়রে নিয়ে সব সময় বসে আছে। শুধু মেলা প্রাঙ্গণে এসে মরলে সরকারি ব্যবস্থাকে একটু বিব্রত করা হবে। বিদেশী সংবাদপত্রগুলি হৈ হৈ করে উঠবে। মেলায় সরকারি অব্যবস্থা নিয়ে অনেকে বলাবলি করছিলেন। আসলে ব্যবস্থাটুকুই এত সামান্য যে অব্যবস্থা আর বেশি কি হবে! কত লোক আসবে, তারা কীভাবে আসবে, কোথায় থাকবে, কী খাবে—এ নিয়ে কোনো বিশদ পরিকল্পনাই নেই। সবকিছুই জোড়াতালি। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীরা প্রাণান্তভাবে খাটছেন দেখলাম—কিন্তু তাঁদের রসদ যে নগণ্য। এইসব দরিদ্র মানুষ ও সাধু সন্ন্যাসীর বদলে যদি ধোপদুরস্ত পোশাক পরা উচ্চশ্রেণীর সামাজিক মানুষের সংখ্যাধিক্য হতো—তাহলে সব ব্যবস্থাই আরো ভালো হতো, অনেক সুসজ্জিত দোকানপাট খুলত—এ তো বলাই বাহুল্য।

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা যারা গেছে—তাদের জন্য ভালো ব্যবস্থাও আছে। তারা একালের কুলীন সরকারি অফিসারবৃন্দ—এবং তাদের আত্মীয়স্বজন। যে পথে লক্ষ লক্ষ মানুষ হেঁটে আসছে—সে পথে কদাচিৎ একটি দুটি জিপ বা রেড ক্রসের গাড়ি দেখা যায়—তাতে ভর্তি সরকারি অফিসারদের গৃহিণী ও মাসি-পিসি। অফিসাররা গেছেন ডিউটিতে—গৃহিণী পুত্র-কলত্র ঠিক বেড়াতে যায়নি—এখানে আছে পুণ্যের লোভ। এদের জন্য আছে বাসস্থান এবং পুলিস বা স্বেচ্ছাসেবক পাহারায় ভিড় সামলে স্নানের ব্যবস্থা ও মন্দির দর্শন। মেলার মধ্যে সুদৃশ্য সাদা রঙের তাঁবুতে থেকেছেন মন্ত্রীরা। যেমন আগেকার দিনে নেটিভদের এড়িয়ে সাহেবরা থাকতেন। আমার কাছে এসব কিছুই বিসদৃশ মনে হলো না—এ সবই তো স্বাভাবিক। সবাই আরাম চায়। মুখে কিংবা বক্তৃতায় নানারকম কথা বলতেই হয়, কিন্তু নিজস্ব আরামের ব্যবস্থা তেমন কেউই ছাড়তে চায় না—যার ক্ষমতা আছে, হুকুম তামিল করার লোক আছে। মন্ত্রীরা এলেন দেখলেন, বাণী দিলেন, চলে গেলেন।

এখানে নদীর পরপার দেখা যায় না, বাঁ দিকে তাকালে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। শান্ত নিরুত্তাপ সকালে এই নদীর দৃশ্য বড়ো মনোরম। দিগন্তের দিকে তাকাবার সময় নেই কারুর, কাদামাখা পায়ে সবাই ছুটে যাচ্ছে স্নান করতে। এই নদী বড়ো পবিত্র, পতিতকে উদ্ধার করে গঙ্গা। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু এত পবিত্র নদীকূলও পুরীষে ভর্তি করে দিতে কারুর বিবেকে আটকায় না। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, এত মানুষের পাপ ধুয়ে দিচ্ছে—নদীর জল নিশ্চয়ই এখন পাপে থিক থিক করছে। বহতা নদী আর রমতা সাধুকে নাকি কোনো মালিন্য স্পর্শ করে না। কিন্তু কত রমতা সাধু, নগ্ন ইন্দ্রিয়জয়ী—তবু তো দেখলুম পয়সা লোভী, আর বহতা নদীর জলেও এখন

অনেক আবর্জনা।

আমি স্নান করিনি, কারণ আমি নিজেকে পাপী মনে করি না। তা হলে গিয়েছিলুম কেন? আমার উত্তর বঙ্কিমবাবু অনেকদিন আগে কপালকুণ্ডলার নবকুমারের মুখে বসিয়েছেন। পুনরুক্তি ভয়ে আর উল্লেখ করলাম না।

২

সব কলেজেই ছাত্রদের দেওয়াল পত্রিকা থাকে। আমাদের কলেজে যে তিনটি দেওয়াল পত্রিকা ছিল তার মধ্যে দুটি দুই রাজনৈতিক দলের মুখপত্র। খুব গরম গরম কথা থাকত তাতে। এবং সেই দুটোকে ঘিরেই ভিড় থাকত বেশি। আর একটি দেওয়াল পত্রিকা একটু কোণের দিকে অন্ধকারে ঝুলে থাকত—সেটিতে শুধু গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ। গল্প ও কবিতাগুলি খুবই ব্যক্তিগত আর প্রবন্ধগুলো 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' কিংবা চরিত্রহীন উপন্যাসে কে চরিত্রহীন এই জাতীয়। ঐ পত্রিকাটা প্রকাশ করত অংশুমান, সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি ও পাজামা পরত —এবং খুবই গর্বিত ভাব দেখাত সব সময়।

একদিন গণেশ কেবিনে অংশুমানকে একা একা চা খেতে দেখে আমি ওর পাশে বসলাম এবং দরাজ গলায় অর্ডার দিলাম, দেখি, দুটো মটন কাটলেট, দু' প্লেটে।

অংশুমান মুখে কিছু না বলে ভুরু দুটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন করে রাখল।

আমি চুপি চুপি বললাম, তোর পত্রিকায় আমার একটা গল্প নিবি?

অংশুমান অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, গল্প লিখবি! তুই?

আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। অন্যরা শুনে ফেলছে। একটু আস্তে বললেও তো পারত।

অংশুমান এরপর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বলল গল্প, লেখা কি অত সোজা? ইচ্ছে করলেই লিখে ফেলা যায়? আগে লিখেছিস কখনো?

আমি বাংলাতে বরাবরই কাঁচা। সব পরীক্ষাতেই বাংলায় কম নম্বর পেয়েছি, তবু লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কবিতা লেখার বদরোগ ছিল। কারুকে কখনো দেখাইনি। হঠাৎ গল্প লেখার ইচ্ছে জাগার একটা কারণ ছিল। কলেজে সন্ধ্যাশ্রী নামের একটি মেয়ে আমাকে অপমান করেছিল। সন্ধ্যাশ্রীর বড়ো রূপের গর্ব, আমাকে সে গ্রাহ্যই করে না। একদিন এক বাস স্টপে দুজনে দাঁড়িয়েছিলাম— সন্ধ্যাশ্রী বাদাম ভেঙে ভেঙে কুটকুট করে খাচ্ছিল—এমন সময় থার্ড ইয়ারের

সূর্যদা এসে দাঁড়াল। সূর্যদার খাঁটি হীরো হীরো চেহারা। ক্লার্ক গেবল-এর মতন চওড়া কাঁধ, যেমন অহংকারী, তেমন দয়ালু। সূর্যদা আসতেই সন্ধ্যাশ্রী হাতের মুঠো থেকে কয়েকটা বাদাম সূর্যদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খাবেন!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যাঃ সব ফুরিয়ে গেল যে। সূর্যদা তাঁর হাতের চারটি বাদামের মধ্যে থেকে দুটি দিলেন আমাকে।

যার রক্তমাংসের শরীর, তার এই সময় রাগে জ্বলে যাবার কথা নয়? ফুরিয়ে গেল, মানে কি! এতক্ষণ যে কুটকুট করে বাদাম খাচ্ছিলে তখন আমাকে দেবার কথা মনে পড়েনি। সূর্যদাকে দেখেই অমনি—। আমার সঙ্গে একই বাসে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু সূর্যদার সঙ্গে সে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল। পৃথিবীর সন্ধ্যাশ্রীরা চিরকাল এইভাবে সূর্যদাদের সঙ্গেই চলে যায়।

আমি ঠিক করে রাখলুম, সন্ধ্যাশ্রীকে এর একটা জবাব দিতেই হবে। কিন্তু কোন উপায়ে। ওর মুখের ওপর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঠিক জন্মের সময় ধাইমা আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, দেখিস, মেয়েদের সঙ্গে যেন কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করিস না। কিন্তু খারাপ ব্যবহার না করা মানেই তো আর সব অপমান সহ্য করে যাওয়া নয়।

তখনই দেওয়াল পত্রিকার ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। দেওয়াল পত্রিকায় কিছু বেরুলেই দু-একদিনের মধ্যে কলেজের সব ছাত্রদের মুখে মুখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যায়। ওর নামটা বদলে দিলেও ওর চরিত্রটা ঠিক ফুটে উঠবে। এবং এই ব্যাপারটা কবিতায় ঠিক জমাতে পারব না বলেই গল্প লেখার ইচ্ছেটা জাগে।

কিন্তু অংশুমান আমার যোগ্যতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রথম প্রথম কথাটা উড়িয়ে দেয়। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, আচ্ছা দিস, দেখব যদি চালান যায়।

চার-পাঁচবার কপি করার পর শেষ পর্যন্ত গল্পটা দিলাম অংশুমানকে। কিন্তু ওর আর পড়ে দেখার সময়ই হয় না। যখনই জিজ্ঞেস করি, অংশুমান উত্তর দেয়, হাতে অনেক লেখা জমে আছে, আগেরগুলো তো আগে দিতে হবে। চায়ের দোকানে ওর সঙ্গে দেখা হলে ও আর পকেট থেকে পয়সা বার করে না। ধরে নিয়েছে এখন থেকে ওর খাবারের দাম আমিই দেব।

লেখাটা টাটকা টাটকা বেরুলেই সন্ধ্যাশ্রীর অপমানের ঠিক মতন জবাব দেওয়া যেত। তা আর হলোই না। এখন সন্ধ্যাশ্রীকে দেখলে দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তবে একটা ব্যাপারে আরাম পেয়েছি, সন্ধ্যাশ্রী সূর্যদার কাছে পাত্তা পায়নি। সূর্যদা যখন নবনীতার জন্য পাগল।

এর কয়েক মাস বাদে কলেজের ইউনিয়ন থেকে একটি গল্প-প্রতিযোগিতা

ডাকা হলো। বাইরের সাহিত্যিকরা বিচার করবেন। পুরস্কৃত তিনটি গল্প ছাপা হবে কলেজ ম্যাগাজিনে। কারুকে কিছু না বলে আমার গল্পটা পাঠিয়ে দিলাম সেখানে।

তারপর আবার দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা। মাসের পর মাস কেটে যায় প্রতিযোগিতার ফলাফল আর বেরোয় না। শুনলাম একশ পঁচাত্তরটা গল্প জমা পড়েছে—বিখ্যাত সাহিত্যিক সেগুলি দেখে ওঠার সময় পাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত কলেজ ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে বেরুল। পরীক্ষার মাত্র কয়েক দিন আগে। তখন ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ ম্যাগাজিনে কি ছাপা হলো না হলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। আমার গল্পটা ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি পেয়েছি থার্ড প্রাইজ। থার্ড হওয়ার মতন অপমানজনক কি আব কিছু আছে? এর চেয়ে আমার গল্পটা ছাপা না হলেও কত ভালো ছিল, কেউ জানতে পারত না। এখন প্রত্যেকে নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে হাসছে। একটা সামান্য গল্প প্রতিযোগিতাতেও থার্ড। এর চেয়ে অযোগ্যতা আর কি আছে? রাস্তায় একদিন অংশুমানকে দেখে তাড়াতাড়ি আমি লজ্জায় অন্য ফুটপাথ বদল করলাম।

পরীক্ষার পড়াটড়া আমার মাথায় উঠে গেল। সব সময় ঐ অপমান কাঁটার মতন বেঁধে। সন্ধ্যাশ্রীর কাছে আমি মনে মনে খুব অপরাধী হয়ে রইলাম। গল্প লেখার ক্ষমতাই যখন আমার নেই, তখন কেন লিখতে গেলাম ওকে নিয়ে? সমুদ্র, নদী, পাহাড়, আকাশ তাজমহল—এই সব নিয়ে কি কেউ ঠাট্টা করে?

পরীক্ষার সময় ঠিক মনে হলো, এই রকম অবস্থা চললে আমি পরীক্ষায় গাড্ডু পাব। আজ রাত থেকে পড়াশুনো না করলে আর নিস্তার নেই। বিকেলবেলা কলেজ ম্যাগাজিনটা অন্য কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম গঙ্গার ধারে। নিরালায় দাঁড়িয়ে নিজের গল্পের পাতাটা খুললাম। এর আগে অন্তত তিরিশবার পড়েছি। একত্রিশতমবারেও মনে হলো, কি খারাপ লেখা! একটা বাঁদরের হাতে কলম দিলেও বোধহয় সে এর চেয়ে ভালো গল্প লিখতে পারবে।

ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। দু-এক পলকের মধ্যেই সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল। বিদায়, আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কে নেই। আর কোনোদিন ওকে মনে স্থান দেব না।

আমাদের কলকাতার গঙ্গার ধারের সূর্যাস্ত—পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্যগুলির অন্যতম। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশের একটা দিক গনগনে লাল—শেষ রশ্মিগুলি আলাদা-আলাদা হয়ে পড়েছে জলে—হঠাৎ একটা স্টীমারের ভোঁ বেজে ওঠে। সব কিছু বিষণ্ণ মনে হয়। কিংবা আমিই শুধু বিষণ্ণ। এই

সৌন্দর্যরাশির মধ্যে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, যে থার্ড হয়েছে। থার্ড। যার নিজের যোগ্যতা বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। যারা থার্ড হয়, তাদের জীবনে আর কিছুই হয় না।

সেই সময়কার আকাশের দিকে তাকালে সন্ধ্যাশ্রী আর সূর্যদার নাম মনে পড়বেই। আর এক বিকেলে সন্ধ্যাশ্রীর বাদাম খাওয়া আর সূর্যদার আগমন—সেই উপলক্ষ করেই তো আমার এই অধঃপাত। সন্ধ্যাশ্রী কিংবা সূর্যদার সামনাসামনি গিয়ে কোনোদিন হয়তো ক্ষমা চাইতে পারব না—তাই সন্ধ্যাকালীন আকাশের দিকে তাকিয়েই আমি বলে, সন্ধ্যাশ্রী তুমি আমায় ক্ষমা করো। মরীচিমালি সূর্যের উদ্দেশ্যে আমি বলি, সূর্যদা ক্ষমা করবেন আমাকে।

মানুষের বদলে প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এক ধরনের চমৎকার সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অন্তত আমি সেদিন পেয়েছিলাম। তাই ঘটনাটা মনে আছে।

৩

নিশানাথ রায় একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবা। অধুনা তিনি পাঁচ বৎসর বিলাতে প্রবাসী। 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' বা বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট নামক বিদ্যা অধ্যয়নে ব্যস্ত। এখানে তাঁর লেখা তিনটি চিঠি উদ্ধৃত করা হলো। অপরের চিঠি পাঠ করা গর্হিত কাজ কিন্তু আমরা পাঠকদের অনুমতি দিলাম।

অভিভাবককে চিঠি

শ্রদ্ধেয় মামাবাবু,

কয়েক সপ্তাহ আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমার শরীর ভালোই আছে, কোনো রকম চিন্তা করবেন না সেজন্য। সম্প্রতি আমি বাসা বদল করেছি, সেইজন্য কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম।

আমার নতুন বাসা আমার কলেজের খুব কাছেই। এই কয়েকদিনেই ল্যাণ্ডলেডি আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। সত্যি ভদ্রমহিলার তুলনা হয় না, ঠিক আমার মায়ের মতো, এখানে উনি আমার মায়ের অভাব পূরণ করলেন। ওঁর নাম মিসেস কুক, বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কোনো সন্তান নেই। মিসেস কুকের কোনো অর্থের অভাব ছিল না, শুধু নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যই বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রাখছেন, এখন পর্যন্ত আমিই একমাত্র। আমাকে পেয়ে ওঁরও

নাকি সন্তানের অভাব ঘুচেছে। উনি বলেন, আমার মতো ছেলে নাকি উনি কখনো দেখেননি। আমি প্রত্যেক সন্ধেবেলা বাড়িতে থাকি, বন্ধুবান্ধব এসে হৈ-হুল্লা করে না, কারুর সঙ্গে বিশেষ আড্ডা মারি না, নিজের ঘরে চুপচাপ বসে পড়াশুনা করি—এতে উনি খুব অবাক হয়ে যান। আমি এখনো বিলিতি আদবকায়দা রপ্ত করিনি, এখন পর্যন্ত গোমাংস খাইনি—এসব দেখে আমার প্রতি ওঁর স্নেহ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। উনি সব সময় আমাকে এমন যত্ন করেন যে, আমি কোনোরকম অভাব বোধ করিনি এখানে।

আপনারা সব কেমন আছেন? মা কেমন আছে? মাকে এবার পূজার সময় আমার নাম করে একটি ভালো গরদের শাড়ি কিনে দেবেন। আমি এখান থেকে মায়ের জন্য কিছু পাঠালাম না—কারণ এখানকার বিলিতি কাপড়-চোপড় কোনোটাই হিন্দু বিধবার উপযুক্ত নয়। সুতরাং আপনি মাকে একটা গরদের শাড়ি কিনে দেবেন। আমি আপনার জন্য এবং মামীমা, শম্ভু, নিতু, রুমি ওদের জন্য জামাকাপড় পরে পাঠাব। এখন আমাব একটু টাকার টানাটানি যাচ্ছে।

পড়াশুনো নিয়ে এখন খুবই ব্যস্ত আছি। এবার যে-ভাবেই হোক পরীক্ষাটা শেষ করে দিতে হবে। পরীক্ষার জন্য ঠিক ভাবে পড়তে হলে আর অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না। আপনি লিখেছেন, পাঁচ বছর কেটে গেল—হয়তো আমার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। কিন্তু মামাবাবু, যেখানেই যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকি, নিজেব দেশের মতন আর কি আছে? আমি যে এখানে এসেছি, সে কি শুধু নিজের জন্য না দেশের গৌরব বাড়াতে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। এখানে সব সময়ই দেশের সম্মানের কথা মনে থাকে। এখন যদি পরীক্ষা না পাস করেই ফিরে যাই, তবে সেটা আমার দেশেবই অপমান। ইংরেজদের দেখাতে চাই—আমাদের দেশের লোকেরও সবকিছু করার যোগ্যতা আছে।

পরীক্ষা পাস করার পর আমার আর এ দেশে এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু পরীক্ষা পাস করতে হলে আমার আর অন্য কিছু কাজ করার কথা ভাবলে চলবে না এখন। অথচ টাকারও খুব টানাটানি। ইচ্ছে করলেই চাকরি পেতে পারি—কিন্তু চাকরি করে এ দেশে পরীক্ষা পাস করা যায় না। সুতরাং আপনি কিছু টাকা পাঠাতে পারবেন কি? অন্তত হাজার তিনেক। আপনার নিজের কাছে যদি টাকা এখন না থাকে—তবে মাকে বলবেন আমাদের বেহালার বাড়িটা যেন বিক্রি করে দেন। মা তো আপনার কাছেই আছেন—সুতরাং ও বাড়ি থেকে লাভ কি? আমি ফিরে গিয়ে ওর চেয়ে ঢের ভালো বাড়ি বানিয়ে দেব। টাকাটা পাঠাবার জন্য যদি ফরেন এক্সচেনজ না পান, তা হলে অন্য উপায় আছে। সেটা আগামীবার জানাব। মোটকথা টাকার আমার খুবই দরকার।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম নেবেন। ছোটদের আশীর্বাদ।

ইতি

আপনাদের স্নেহের নিশি

বন্ধুকে চিঠি

রবি,

তোর চাকরির উন্নতি হবার খবর জানিয়ে চিঠি দিয়েছিস। মনে হলো, এই উন্নতিতে তুই খুব আনন্দিত। রাসকেল, তোর লজ্জা করল না? আহ্লাদে ডগমগো হয়ে তুই আবার এ কথা আমাকে লিখেছিস! আগে পেতিস চারশো বিশ, এখন পাবি পাঁচশো বিশ—এর নাম উন্নতি? তোর মতো একটা ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া এনজিনিয়ার দুর্গাপুরের গরমে পচে মরছে। কতবার তোকে বলেছি, এদেশে চলে আয়! আমার মতো ছেলেও এখানে করে খাচ্ছে, আর তুই একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, ইস্কুলে-কলেজে তুই ছিলি আগাগোড়া ফার্স্ট বয়, আর তোর কিনা এই দশা। পাঁচশো কুড়ি টাকার নাম উন্নতি! আরে, ও টাকা তো আমি এক সপ্তাহে খরচ করি।

কি করবি ওখানে পড়ে থেকে? দেশের সেবা? ওসব বড়ো বড়ো কথা ঢের শুনেছি। আমি বাবা সার বুঝেছি, যে লাইফটাকে এনজয় করতে হবে। তার জন্য এরকম জায়গা আর হয় না। খাও-দাও স্ফূর্তি করো। ইচ্ছে হলে বেড়াতে যাও, প্যারিসে—প্লেনে চাপলে মাত্র এক ঘণ্টা জার্নি—সেখানে তো আনন্দের ফোয়ারা। আমি এখানে এসে দেড় বছরের মধ্যেই পরীক্ষায় পাস করে ডিগ্রি পেয়ে গেছি, খুব সোজা এখানে পাস করা। এখন একটা চাকরি ধরছি আর ছাড়ছি। এখন পাচ্ছি উইকে আটচল্লিশ পাউণ্ড—অঙ্ক তো ভালো জানিস—কত টাকা হয় মাসে, হিসেব করে দেখ। আমি আর দেশে ফিরছি না।

তুই জিজ্ঞেস করেছিস, আমি গোপনে বিয়ে করেছি কিনা! এখানে এসে বিয়ে করে কোন গর্ধব! অবশ্য, সে রকম গর্ধব অনেক আছে। আর যদি বিয়েই করি তবে গোপনে কেন? কাকে তোয়াক্কা করি আমি? তবে করিনি এখনো বিয়ে, ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন করতে পারি। এখন বুঝলি না, হাঃ হাঃ...এ নিউ লাভ ইন এভ্‌রি উইক এন্‌ড...আমার ল্যান্ডলেডির মেয়েটা অবশ্য বিয়ে করার জন্য খুব ফাঁদ পেতেছে—বুড়ি ল্যান্ডলেডিটা নানান ছুতোয় ঘন ঘন ওর মেয়েকে আমার ঘরে পাঠায়, কিন্তু ও ঘুরছে ডালে ডালে আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। মুখে ভাব দেখাচ্ছি যেন আমি একেবারে ধরা পড়ে গেছি—এদিকে বাড়ি বদলাবার তালে আছি গোপনে। কেন জানি না, এখানকার সব মেয়েরাই আমাকে খুব পছন্দ করে।

আমার গায়ের রঙের জন্য তোরা আমাকে বলতিস কালোমানিক। অথচ, এখানে সবাই বলে, লাভলি। আমি চমৎকার আছি ভাই। তুই যদি ঐ দুর্গাপুরের গরমেই সারা জীবন পচতে চাস—তো তাই থাক। ভাবছি, সামনের বছর একবার আমেরিকাটা ঘুরে আসব। ওখান থেকেও একটা চাকরির অফার পেয়েছি। দেখা যাক। মাঝে মাঝে চিঠি দিস।

ইতি—
তোর নিশি

বন্ধুর দাদাকে চিঠি

অরুণদা,

আপনি আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন না। আপনার ছোট ভাই তরুণ আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে আমি দেওঘরের বিদ্যাপিঠে কয়েক বছর পড়েছি। তরুণ এখন জেনেভায় আছে। কিছুদিন আগে লন্ডনে ওর সঙ্গে দেখা হলো, ওর মুখেই শুনলুম, আপনি আমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিন বছরের জন্য শিশু মনস্তত্ত্বের গবেষক নিযুক্ত হয়েছেন এবং গত বছর থেকে ওখানেই আছেন।

আপনাকে আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠি লিখছি। আমি গত পাঁচ বছর ধরে ইংলণ্ডে আছি, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স নিয়েছিলাম, কিন্তু প্রথমবার পাস করতে পারিনি। তারপর থেকে আমার আর ক্লাশে ভর্তি হওয়াই হয়নি। আমার ফরেন এক্সচেনজ ফুরিয়ে যায়, বাড়ি থেকে টাকা আসাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে চাকরি নিতে হয়। এবং আপনি তো জানেন চাকবি করতে করতে পরীক্ষা পাস করা কত শক্ত। বিশেষত ভদ্রগোছের চাকরিও আমি পাইনি—গোড়ার দিকে দু' একটি হোটেল রেস্টুরেন্টে বয়ের চাকরি করতাম এখন একটি লাইব্রেরিতে কাজ করি, খুব পরিশ্রম করতে হয়, লাইব্রেরিয়ানের সমস্ত কাজই করতে হয় আমাকে —কিন্তু মাইনে পাই পিয়নের সমান। এখানে চাকরির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভারতীয়দের এরা নিগ্রোদের সমানই ঘৃণা করতে শুরু করেছে আজকাল। টেকনিক্যাল লাইন ছেড়ে—আর যে কোনো ভদ্রগোছের পথ একেবারেই বন্ধ। এখন এক বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে অতি কষ্টে আছি। দিন চলা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সেদিন প্যাডিংটন রেল স্টেশনে কয়েকটি ইংরেজ ছেলে হঠাৎ পায়ে পা লাগিয়েই যেন ইচ্ছে করেই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। আমার বন্ধুটির

চোখে এমন ঘুষি মেরেছে যে ও এখন হাসপাতালে, একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায় কিনা ঠিক নেই। অন্য সকলে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল—কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছিল, নিগারস গো হোম! রাগে অপমানে সর্ব শরীর জ্বলছিল আমার। ইচ্ছে করছিল এক্ষুনি এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। অথচ যাই বা কি করে?

অরুণদা, আপনাকে একটা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েই এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি আমেরিকাতে আমার জন্য কোনোরকম একটা কাজ ঠিক করে দিতে পারেন, তবে আমি যে-কোনো উপায়ে ওখানে চলে যেতে পারি। আপনি না বলতে পারবেন না। এটা আপনাকে করে দিতেই হবে। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। আপনি হয়তো বলবেন দেশে ফিরে যাচ্ছি না কেন? কোন মুখ নিয়ে যাব বলুন? বিলেতে এলাম একটা কোনো ডিগ্রি না নিয়ে কি ফেরা যায়? তাহলে যে আমাকে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হবে। আমি পড়াশুনোয় খুব খারাপ ছেলে নই, আরেকবার পড়ার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই পাস করতে পারতুম। কিন্তু প্রথমবার অবহেলা করে এখন আমি এক চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি, চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো করতে গেলে আমি খেতে পাব না। আর পড়াশুনো না করলে—এই সামান্য চাকরিতেই কি জীবন কাটবে? অরুণদা, আপনি দয়া করে আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখবেন। আপনি যে-কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিলে আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় দিন গুনব। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—

নিশানাথ রায়

এই তিনখানি চিঠি একই সন্ধেবেলা লেখা।

৪

জানলাটা দিয়ে আগে প্রকৃতির শোভা দেখেছিলাম খানিকক্ষণ। সেই জানলাটা পরে বেশ কাজে লাগল।

জানলাটার পাশে কিছু আগাছার জঙ্গল, তারপর বাঁশবন, তারপর কতকগুলো বড়ো বড়ো আমগাছ। বাঁশবাগানের মাথার ওপর—না চাঁদ ওঠেনি তখন, কারণ সময়টা সকাল, তবে সূর্যের ঝিকিমিকি মুখ দেখেছিলাম। বাঁকুড়ার খুব ভেতরের দিকে একটা গ্রাম। আমার এক বন্ধুর পিসিমার বাড়ি।

মুড়ি, ডিম ভাজা আর চা দিয়ে চমৎকার জলখাবার খেয়েছি, সঙ্গে বাড়ির

উঠোনের গাছ থেকে সদ্য তুলে আনা কাঁচা লঙ্কা। বস্তুত এত উপাদেয় জলখাবার কলকাতায় রোজ সকালে আমার জোটে না। কিন্তু বন্ধুর পিসিমা আমাকে খাতির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতার ছেলে তো তারা রোজ সকালেই সন্দেশ রসগোল্লা খায়! গ্রামে চট করে রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া মুশকিল, তবু তিনি আমাকে মিষ্টি খাওয়াবেনই, তিনি তিলের নাড়ু তৈরি করতে শুরু করলেন।

রসগোল্লা সন্দেশজাতীয় বস্তুগুলো কোনোদিনই আমার প্রিয় নয়, হয়তো আঁতুড় ঘরে আমার ঠোঁটে মধু দেওয়া হয়নি বলে, কোনো মিষ্টি জিনিসই ভালো লাগে না। অন্য অনেক কিছুই আমার ঠোঁটে মিষ্টি লাগে কিন্তু মিষ্টি জিনিস নয়।

—এ কি পিসিমা এত?

—খাও বাবা, খেয়ে দ্যাখো!

পিসিমা আমার সামনে একটা ঝকঝকে কাঁসার থালায় রাজভোগ সাইজের ছ'টি তিলের নাড়ু রেখেছেন। বন্ধুটি তখন গেছে গ্রামের অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ সেরে আসতে, আমি একা। আমি যতই বলি, পিসিমা, আমি এত খেতে পারব না—তিনি বলতে লাগলেন, খেয়ে দ্যাখো বাবা, গ্রামের টাটকা জিনিস—এ আর তোমাদের শহুরে দোকানের ভ্যাজাল নয়—পিসির হাতে তৈরি করা—

শহুরের ছেলে হয়ে গ্রামের জিনিস অবজ্ঞা করতে নেই! তা ছাড়া বন্ধুর পিসিমা সত্যিই খুব ভালো মানুষ, এত আন্তরিকভাবে বলছেন। এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

একটা তিলের নাড়ু মুখে দিয়েই আমার প্রায় বাপরে মারে বলে চেঁচিয়ে ওঠার অবস্থা। এরকম বাঘা মিষ্টি আমি সারা জীবনে খাইনি। মানুষ অনেক করতে পারে, ব্যথা সহ্য করাও অসম্ভব নয়, কিন্তু অপ্রিয় খাদ্য গলাধঃকরণ করা অসম্ভব, বমি এসে যায়।

পিসি রান্নাঘরে গেছেন, একটা নাড়ু হাতে করে সেই জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আধখানাও শেষ করতে পারিনি। হঠাৎ বমি করে ফেললে পিসিমা ভাববেন কি? কখনো কখনো স্নেহ বা সততা থেকেও কি বিপদ ঘনিয়ে আসে!

জানলাটার বাইরে কতকগুলো কাক কি নিয়ে যেন খুব ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। জানলাটা বেশ উঁচু, বাইরের গাছপালাই চোখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না। কি অনুপ্রেরণা এসে গেল আমার মধ্যে, নাড়ুটা আমি ছুঁড়ে দিলাম বাইরে। কাকগুলো প্রথম উড়ে পালাল, তারপর আবার ফিরে এল আস্তে আস্তে, প্রথমে একটা এসে নাড়ুটাকে শুঁকে দেখল বোধহয়। তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে আবার ঐ নাড়ুটাকে নিয়েই ঝগড়া বাধিয়ে দিল।

আমি ভালো করে দেখে নিলাম। পিসিমা ধারে কাছে আছেন কিনা। পিসিমা রান্নাঘরে। আমি নাড়ুগুলোর সদগতি করলাম, একটার পর একটা ছুঁড়ে দিলাম বাঁশবাগানের দিকে। কাকগুলোকে খাটাবার জন্য আমি এক একটা ছুঁড়তে লাগলাম এক এক দিকে। তারপর এক গ্লাস জল খেয়ে সত্যিকারের তৃপ্তি।

খানিকটা বাদে পিসিমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, খেয়েছ? কেমন লাগল?

কি উত্তর দেওয়া উচিত আমার? শহরের ছেলে হয়ে কি গ্রামের জিনিস নিন্দে করা উচিত? আমি বললাম, চমৎকার হয়েছে পিসিমা। অপূর্ব। অনেকদিন এসব খাইনি।

পিসিমা আমার শূন্য রেকাবির দিকে তাকালেন। যে ছেলে একটু আগে ছ'টা নাড়ু দেখে ইস, এতগুলো বলে আঁতকে উঠেছিল, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ক'টা শেষ করে ফেলেছে। তা হলে সে নিশ্চয়ই নকল-বিনয়ী! ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় সবগুলো কাককে খাইয়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি, দু-একটা রেখে দেওয়া উচিত ছিল রেকাবিতে!

পিসিমা একমুখ হেসে বললেন, ভালো লেগেছে, তাহলে আর দুটো খাও!

—না, না, পিসিমা আর খাওয়া অসম্ভব।

—আর দুটো খাও, আমি অনেক বানিয়েছি।

—সত্যি, ভীষণ পেট ভরে গেছে, কিছুতেই আর পারব না।

আমি তখন পিসিমার পা ধরতেও রাজী ছিলুম। কিন্তু পিসিমা কিছুতেই শুনলেন না। যে পাঁচ মিনিটে সব শেষ করে ফেলেছে, সে আর খাবে না, বললেই হলো। পিসিমা বললেন, তোমার পিসেমশাই তো এ রকম দশ-পনেরোটা নাড়ু গল্প করতে করতে খেয়ে ফেলেন, আর তুমি জোয়ান ছেলে পারবে না?

পিসিমা আবার চারখানা নাড়ু নিয়ে এলেন। আমি বিমর্ষ মুখে বললাম, পিসিমা, আর এক গেলাস জল লাগবে। পিসিমা জল নিয়ে আসবার আগেই আমি একটা নাড়ু জানলা দিয়ে বাইরে চালান দিয়ে দিলুম। এইটুকু সময়ের মধ্যে চার চারটে নাড়ু খতম করে দেওয়া বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই আরো এক ডজন দেবেনই।

জল নিয়ে এসে পিসিমা আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, এতক্ষণ তিনি রান্নাঘরে ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি—আফশোস করলেন সে জন্য।

আমি কথা বলতে বলতে নাড়ুগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। ভয়ে ভয়ে একটু একটু মুখে তুলে আরো অসহ্য মিষ্টি বলে মনে হলো। তিলের থেকে গুড়ের ভাগই বেশি—এবং বাড়িতে তৈরি গুড় যে এত মিষ্টি হয় আমার ধারণাই ছিল

না। এর আস্ত একটা নাড়ু খেয়ে ফেললে আমার বমি হওয়া কে আটকায়!

কথায় কথায় বুঝতে পারলুম, পিসিমার নিজের হাতে তৈরি খাবার-টাবারের ওপর বেশ দুর্বলতা আছে। তাঁর হাতের খাবার খেয়ে কার কিরকম লাগল—সেই দিয়েই তিনি মানুষের ভালোমন্দ পছন্দ করেন। অনেক লোক যেমন ঝাল খেতে পারে না একেবারেই তেমনি অনেক লোক যে মিষ্টিও খেতে পারে না এটা পিসিমার কল্পনার বাইরে। বেশ একটু ভালো মানুষ, সাধু প্রকৃতির লোকরাই মিষ্টি বেশি খায়—আমি রজঃগুণসম্পন্ন লোক—ঝাল-টালই আমার পছন্দ।

আমি হঠাৎ প্রকৃতি-প্রেমিক হয়ে বললাম, পিসিমা কি সুন্দর আপনাদের বাড়িটা। চারদিকে কত গাছপালা।

পিসিমা বললেন, ঐ গাছপালাই তো আছে। আর কি আছে এই পাড়াগাঁয়ে। কিছু পাওয়া যায় না, একটা কথা বলার মানুষ নেই।

—আমাদের কিন্তু বেশ ভালো লাগে এখানে এসে। যাই, একটু আপনাদের বাড়ির চার পাশটা ঘুরে দেখে আসি।

পিসিমার চোখের আড়াল হবার এই সুযোগ পেয়ে আমি রেকাবি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা গিয়েই এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিলাম নাড়ুগুলো।

মনে মনে একটু অপরাধবোধ জেগে উঠল। কিন্তু উপায় কি? আমি অনেকবার না বলেছিলাম, পিসিমা শোনেননি। ওঁর হাতের তৈরি করা জিনিস কেউ না খেলে উনি খুব দুঃখিত হন—অথচ এত মিষ্টি খাওয়া আমার পক্ষে শারীরিকভাবেই সম্ভব নয়।

পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো দুপুরবেলা খেতে বসে। একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমার বন্ধুটি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ গ্রামের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করল, আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না, তাই যোগ না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। একটু বাদে পিসেমশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, কেমন লাগছে আমাদের গ্রাম?

আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু পিসেমশাই বাধা দিয়ে বললেন, না, না, ও শহর থেকে এক দিনের জন্য বেড়াতে এসে ভালো লাগে। কিন্তু গ্রামের আছে কি? গ্রামগুলো সব ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে!

তারপর তিনি গ্রামের একটা বাস্তব করুণ ছবি তুলে ধরলেন আমার সামনে। অনেক সমস্যা, অনেক জটিল রাজনীতি। একটুক্ষণ বাদে বললেন, এখানে খাবার-দাবারও কিছু পাওয়া যায় না। তোমার নিশ্চয়ই খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, না, না, কষ্ট কি বলছেন? এমন টাটকা মাছ, তরিতরকারির স্বাদ—

—গ্রামে টাটকা মাছ বা ভালো তরিতরকারিও কিচ্ছু পাওয়া যায় না। একদিন গ্রামের বাজারে গিয়ে দেখো! ওসব ভুল ধারণা, সব ভালো জিনিস পাইকাররা নিয়ে যায় শহরের বাজারে। আমি একদিন গড়িয়াহাট বাজারে গিয়ে দেখেছিলাম, বেশ বড়ো বড়ো পোনা মাছ জলের মধ্যে জ্যান্ত রাখা আছে। গ্রামের বাজারে ওরকম মাছ বহুদিন ওঠেনি। কলকাতার লোকই বেশি টাটকা জিনিস খেতে পায়।

দুপুরের আহার্য দ্রব্য আমার সত্যি খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু পিসেমশাই কিছুতেই সেগুলোকে সুখাদ্য বলে মানতে চান না। তাঁর দৃঢ় ধারণা, শহরের লোকই ভালো ভালো খাবার খায়। তখন আমি মরীয়া হয়ে বললুম, কিন্তু সকালে যে পিসিমার তৈরি তিলের নাড়ু খেলাম, শহরে কি এসব পাওয়া যায়? বহুদিন এমন চমৎকার জিনিস খাইনি।

পিসিমা কাছেই বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলেন। তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু মিথ্যে কথা বলে কারুকে যদি এমন খুশি করা যায় সেটা কি অপরাধ?

সন্ধেবেলা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। পিসিমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর যাবার পর বন্ধু বলল, নাড়ুগুলো এত জোর ছুঁড়ছিলি, আর একটু হলে আমার কপাল ফেটে যেত!

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বন্ধুটি বলল, আমি আর পিসেমশাই বাঁশবাগানে বসেছিলাম, পিসেমশাই বাঁশগুলো বিক্রি করবেন—সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি পটাপট করে নাড়ু বৃষ্টি হচ্ছে! একটা তো আমার বুকে এসেই লাগল। অত জোরে কেউ ছোঁড়ে?

আমার তখন ধরণী দ্বিধা হও গোছের মনের অবস্থা। বন্ধুটি আমার কাঁধ চাপড়ে বলল, চল, লজ্জার কিছু নেই! ওরকম হয়। বালিগঞ্জে এক বাড়িতে আমাকেও একদিন এমন অখাদ্য চা দিয়েছিল যে, আমি অন্যের অলক্ষ্যে সবটা চা ফ্লাওয়ার ভাসে ঢেলে দিয়েছিলাম!

৫

কোনো এক প্রাজ্ঞব্যক্তি, মনে নেই, ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে মানুষ জাতির একমাত্র পোশাক হবে প্যান্ট-সার্ট-কোট এবং সকলের বোধগম্য একমাত্র ভাষা হবে ইংরেজি। ঐ ভবিষ্যৎবাণীটি আমি পাঠ করেছিলাম বছর দশেক আগে একটি বিদেশী পত্রিকায়। এখন আমার মনে

হচ্ছে, পঞ্চাশ বছরের দরকার নেই, সেই রকম অবস্থা এর মধ্যেই অনেকটা এসে গেছে। এখন একজন জাপানী কিংবা একজন আফ্রিকান প্লেনে পাশাপাশি সীটে বসে থাকার সময় প্যান্ট সার্ট পরেই থাকে এবং তারা ইংরেজিতে কথা বলে। একজন বেদুইন যখন সামান্য আলোকপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লেখাপড়া শেখে—সে আলখাল্লা ছেড়ে অমনি প্যান্ট-সার্ট বেছে নেয় এবং ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করে। এ রকম একজন বেদুইনকে আমি সত্যিই দেখেছি। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা (এখন যাঁদের বলে ইলজান) শুধু হলিউডের সিনেমার শুটিং-এর সময় পালকের মুকুট-টুকুট সমেত তাদের নিজস্ব পোশাক পরে নেয়, অন্য সব সময়ে তারা প্যান্ট-সার্টেই সজ্জিত।

আমাদের দেশে আজকাল ধুতি ক'জন পরে? আমার থেকে যারা বয়েসে বড়ো, তাদের মধ্যে অনেককে এখনও ধুতি পরতে দেখি বটে কিন্তু আমার চেয়ে কমবয়েসীদের মধ্যে ধুতি-পরা ছেলে প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। অল্পবয়েসী কারুকে হঠাৎ একদিন ধুতি পরতে দেখলেই আমরা জিজ্ঞেস করি, কি আজ নেমন্তন্ন আছে বুঝি?

সামাজিক নেমন্তন্নতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাওয়া এই সেদিন পর্যন্ত রেওয়াজ ছিল। যে-সব বাঙালিবাবু অফিসের বড়ো সাহেব, তাঁরাও ঐ সব নেমন্তন্নর দিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সুট-টাই খুলে ধুতি-ফুতি পরে নিতেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ধুতিটা অনেকটা বাধ্যতামূলক ছিল। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে প্যান্ট পরা গায়ককে দেখা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। আমার বেশ মনে আছে, শতবার্ষিকীর বছরে মহাজাতি সদনের এক অনুষ্ঠানে কয়েকজন আধুনিক কবি যেই কবিতা পাঠ করতে মঞ্চে এলেন অমনি হৈ হৈ করে উঠলেন দর্শকরা। কয়েকজন নাকি ঐ কবিদের মারতেও চেয়েছিলেন। অপরাধ? কবিগুরুর অনুষ্ঠানে ওরা প্যান্ট পরে এসে কবিগুরুকে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

এখন অতটা কড়াকড়ি নেই। প্যান্ট পরা গায়ক এখনো দেখা না গেলেও প্যান্ট পরা কবিতা-পাঠক অহরহ দেখা যায়। বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নতে প্যান্ট পরে গেলে কেউ আর ছি ছি করে না। কি করব, সোজা অফিস থেকে চলে আসতে হলো--এইটুকু কেউ কেউ বলে, অনেকে বলে না। অনেকে ধুতি পরতে একেবারেই শেখেনি। আমার এক বন্ধু, বিয়ের সময় তাকে ধুতি পরাবার জন্য, আগে থেকে তিনজন লোককে ঠিক করে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সে সিল্কের পাঞ্জাবির নিচে ধুতির ওপর কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে ভুল করেনি। হ্যাঁ, বিয়ের সময় ছেলেদের এইভাবে ধুতি পরতেই হয়—এর ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে দেখিনি। এদিক থেকে বিহারীরা এক ধাপ এগিয়ে আছেন। ওখানকার কোনো

কোনো বিয়েতে বর নতুন সুট বুটজুতো এবং মাথায় পাগড়ি বেঁধে যান।

যাই হোক ধুতির সপক্ষে কোনো ওকালতি করার কারণ আমি দেখি না। ধুতি যেতে বসেছে, যাক। প্রত্যেকদিন সাদা ধুতি পরা একটা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই না। ট্রামে-বাসে যাতায়াত, এমনকি পথে হাঁটার সময়ও ধুতির চেয়ে প্যান্ট অনেক বেশি সুবিধাজনক। এবং ধুতির চেয়ে প্যান্ট অনেক সস্তা। অনেকের ধারণা থাকতে পারে যে শুধু শহরের লোকেরাই প্যান্ট পরে, গ্রামে এখনো ধুতির প্রচলন আছে। ধারণাটা ভুল। প্রকৃত গ্রাম বলতেই এখন কিছু নেই। গ্রামের ছেলেছোকরারাও আজকাল প্যান্ট-সার্টই পরে। আর যারা প্যান্ট পরে না, তারা ধুতিও পরে না, তারা পরে নেংটি। এদের ধুতি কিংবা প্যান্ট কোনোটাই কেনার সামর্থ্য নেই।

'একদিন আমার বাড়ির বারান্দা থেকে সকালবেলা একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম। কয়েকজন প্যান্ট-সার্ট পরা যুবক একটা রবারের চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিক কোম্পানির। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেরা বুঝি গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। পরের দিন সেই একই দৃশ্য দেখে আমি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। গোলমাল কিছুই হয়নি। কোম্পানির লোকেরাই গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আগে যাদের রাস্তা খোঁড়াখুড়ি করে এই সব মেরামতের কাজ করতে দেখতাম, তাদের পরনে থাকত নেংটি। এখন তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায়, তারা ধুতি ধরেনি প্যান্ট-সার্ট কিনেছে। খুব ভালো করেছে। পোশাকগুলো কোম্পানির দেওয়া নয়, কারণ নানা রকম।

প্যান্ট-সার্টের মতন ইংরেজি ভাষাকেও আমাদের মেনে নিতেই হবে। ইংরেজি শুধু যে ক্রমশ পৃথিবীর একমাত্র যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠেছে, তাই-ই নয়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা শুধু ইংরেজি। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকে নিয়ে যে যতই মাতামাতি করুক ইংরেজিকে কেউ ছাড়তে চায়নি। বরং ইংরেজির ইজ্জৎ দিন দিন বাড়ছে। সাহেবরা চলে যাবার পর এদেশে সাহেবের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। এখনো প্রত্যেকটি অফিসেই বড়োবাবুর চেয়ে বড়ো সাহেবের পদমর্যাদা অনেক বেশি, তা না বললেও চলে।

সুতরাং ইংরেজি যখন শিখতেই হবে, তখন ভালো করে শেখবার আকাঙ্ক্ষা জাগবেই। সেই কারণেই মিশনারি স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার জন্য আধুনিক মা-বাবাদের যত আকুলি-বিকুলি। এই স্কুলগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়, সেই জন্যই এই সব জায়গায় ভর্তির সময় যেসব করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা হাস্যরসেরও যথেষ্ট খোরাক যোগাতে পারে।'

যাই হোক, ইংরেজি শিখতে গেলে কষ্ট করতেই তো হবে। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে, ইংরেজি শেখা মানেই কি বিলেত আমেরিকার সংস্কৃতি গ্রহণ করা? একটা দেশের আসল সাংস্কৃতিক রূপটি বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। বাইরে থেকে শুধু চোখে পড়ে চটকদার চোখ ধাঁধানো দিকটি, জামাকাপড়ের কায়দা, কাঁধ ঝাঁকানো কিংবা গানের সঙ্গে নাচ। এই ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? ইংরেজি শিখতে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা নিজের দেশের সংস্কৃতিও হারাচ্ছে আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও পুরোপুরি শিখতে পারছে না। তার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব চিন্তাশক্তি।

মিশনারি স্কুলগুলিতে শিক্ষা-পদ্ধতি খুব ভালো। নিয়মানুবর্তিতা আছে। কিন্তু সেখানে একেবারে অতি নিচু ক্লাসের ছেলেও যখন প্রথম ইংরেজি শব্দ শিখতে আরম্ভ করে—তখনই তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। পুলিসম্যান শব্দটি শিখে সে দেখে তার পড়ার বইতে লণ্ডনের পুলিসম্যানের ছবি। পিয়ন বলতে সে শেখে বিলেতে আমেরিকার মেইলম্যান বা পোস্টম্যান। একটা গ্রামের বর্ণনা পড়তে গিয়ে তাকে পড়তে হয় স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামের কথা। এখান থেকেই মগজ ধোলাই শুরু হয়ে যায়। কিছু ছেলেমেয়ে হয়তো এর আওতা থেকে পরবর্তী জীবনে বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু বেশি সংখ্যককে নিয়েই তো সমস্যা।

এই নিয়ে দুঃখ করারও অবশ্য কিছু নেই। সংরক্ষিত অরণ্য করেও যেমন বাঘ-সিংহ-হরিণদের আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, তেমনি চেষ্টা করেও ধুতি কিংবা সংস্কৃতি বাঁচানো যাবে না। সময়ের নিয়মে যা যাবার তা যাবেই।

আসলে আমি লিখতে চেয়েছিলাম হিন্দী সিনেমা সম্পর্কে। বোম্বাইয়ের ছবিগুলো যে একটা অদ্ভুত নির্বোধ এবং ফাঁকা জীবন চিত্রিত করে যাচ্ছে আর আমাদের এখানকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও পয়সা খরচ করে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে নিয়মিত সেগুলো দেখতে যাচ্ছে—এটাই আমার কাছে বিস্ময়কর লাগে। কষ্টও লাগে।

৬

ঠিক গল্পের বইতে যে-রকম থাকে, সেই রকমভাবে মাঝপথে আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। বেশ চলছিল গাড়িটা, হঠাৎ একটা বিসদৃশ আওয়াজ করল তারপর একটুখানি গড়িয়ে গিয়েই থেমে গেল। এর পরেই একেবারে নিঃশব্দ জড়পদার্থ।

যদিও গহন অরণ্য বা মরুভূমি বা মধ্যরাত্রি নয়—ব্যাপারটা ঘটল বিকালবেলা এবং একটি বড়ো রাস্তায়, কলকাতা থেকে মাত্র মাইল পঞ্চাশেক দূরে তবু আমরা বেশ বেকায়দায় পড়লুম।

গল্পের বইতে যখন তখন গাড়ি থামে বটে কিন্তু আমরা গল্পের চরিত্র নয়। নেহাৎই পাঁচ বন্ধু দেড়দিনের জন্য বেড়াতে বেরিয়ে তারপর কলকাতায় ফিরছিলাম। নারী চরিত্র ছাড়া কোনো গল্প জমে না, আমাদের দলে কোনো মেয়ে নেই এমনকি বন্ধুপত্নীও না। সুতরাং গল্পের মতন রোমাঞ্চিত হবার বদলে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠলুম বেশ খানিকটা।

হুগলী জেলায় এক গ্রামে আমাদের এক বন্ধুর পৈতৃক বাড়ি। সেখানে আমরা মাঝে মাঝে যাই। লোকাল ট্রেন বা বাসে চেপে সেখানে যাতায়াত করার বিড়ম্বনা অনেক—সেইজন্যই কোনো বন্ধু যদি একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারে, তাহলেই আমাদের ঐ গ্রামে বেড়াবার উৎসাহটা বেড়ে ওঠে। একটু ফাঁকা হাওয়ার নিঃশ্বাস, চাঁদের আলোয় এলোমেলো গ্রাম, নিজেদের মধ্যে কিছু লঘু উৎসব আর বড়ো জোর পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা—এইটুকুই আমাদের আকর্ষণ, আর কিছু না। কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে দেড় দিনের জন্য একটু সরে থাকা।

জানি, গ্রামে আছে অনেক সমস্যা, অনেক অনাচার ও দারিদ্র্য ; সেদিকে আমরা কখনো মাথা ঘামাইনি। শৌখিন দেশোদ্ধারকারীর ভূমিকা আমাদের কারুরই পছন্দ নয়!

আজকালকার দিশি মোটর গাড়ি যেখানে সেখানে যখন তখন খারাপ হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার কিছুই নয়—কিন্তু গাড়ি যদি মাঝ রাস্তাতেই খারাপ হবে, তাহলে কোনো গল্প ঘটবে না কেন? আমাদের সন্ধে পেরোতেই কলকাতায় ফেরার কথা, পরদিন সকালে প্রত্যেকেরই নানা রকম কাজ—রুটিন বাঁধা জীবন, এক চুল এদিক-ওদিক হলে চলে না। একমাত্র কোনো গল্পের মতন ঘটনা ঘটলেই রুটিনটা একটু বদলানো যেতে পারে।

গাড়ির বনেট তুলে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া হলো। বন্ধুরা সবাই ব্যস্ত। আমি গাড়ির কলকব্জা বিষয়ে কিছুই বুঝি না, সুতরাং আমার কোনো ভূমিকা নেই। ভেতরে বসে বসে পা দোলাতে লাগলুম। আর সিগারেট টানতে লাগলুম। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যে-কোনো মুহূর্তেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করবে। এরকম হয়। আমি দেখেছি। গাড়ির মতিগতির কোনো ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ বাদে বন্ধুরা আবিষ্কার করল যে কারবুরেটারের মধ্যে কি একটা ছোট স্প্রিং-এর যন্ত্র ভেঙে গেছে। সেই যন্ত্রটা নিয়ে এসে না লাগালে গাড়ি আর চলবেই না। খুবই দুঃসংবাদ।

যে রাস্তার ওপর আমরা আছি, সেটা একটা মর-রাস্তা। অনেক রাস্তা এরকম মরে যায়। এক সময় এটা বেশ ব্যস্ত-রাস্তা ছিল, অনবরত গাড়ির আনাগোনা এবং দু' পাশে দোকানপাট ছিল। এখন এর ছ' মাইল দূরেই তৈরি হয়েছে ছ' নম্বর জাতীয় সড়ক, দোকানপাট সেখানেই উঠে গেছে—বেশির ভাগ গাড়িই সে রাস্তায় যায়।

আমরা পথ সংক্ষেপ করার জন্য এ রাস্তা ধরেছিলাম। এদিকে ক্বচিৎ গাড়ি যায়। তবু কয়েকটা গাড়িকে থামিয়ে সাহায্য চাইলাম। কারুর কাছেই ঐ স্প্রিং-এর যন্ত্রটা অতিরিক্ত নেই। তবে, দু-মাইল দূরে জাতীয় সড়কে পৌঁছতে পারলে, আরো দু-মাইল দূরে গ্যারাজ আছে।

একটি উপায় আছে, গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আট মাইল গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। আট মাইল রাস্তা শুধু হাঁটতে তো আমরা ভুলে গেছি। তখন আর একটি উপায় বার করতে হলো। আমাদের মধ্যে দু'জন অন্য গাড়ি থামিয়ে লিফট চেয়ে জাতীয় সড়কে চলে যাবে। তারপর গ্যারাজ থেকে ঐ যন্ত্র এবং মিস্ত্রি ধরে আনবে।

দু'জনের বদলে ওরা তিনজনই চলে গেল। অন্য একটা চলন্ত গাড়িতে উঠে ওরা বলল, যদি ঐ পার্টসটা এখানে না পাই কিংবা মিস্ত্রি না পাই—তাহলে আমরা এখানে আর ফিরব না। তোরা গাড়িটা পাহারা দিস?

—আমরা রাত্তিরে কোথায় থাকব?

—কেন, গাড়ির মধ্যে।

এইরকম সময় রসিকতাও সত্যি বলে মনে হয়। যদি ওরা সত্যিই না ফেরে? বাঘ-ভাল্লুক ভরা হিংস্র জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু হুগলী জেলার মাঠের মধ্যে রাত কাটাতে যাব কোন দুঃখে?

হুগলী জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্যও এমন কিছু বিখ্যাত নয়। আমরা যেখানে আছি, তার দু-পাশেই বিস্তৃত মাঠ। বাড়ি ঘর বিশেষ নেই। কিছু দূরে একটি চৌকো অট্টালিকা। দেখলেই চিনতে পারা যায়, কোল্ড স্টোরেজ। বাংলার অনেক নিভৃত গ্রামেও আজকাল এরকম কোল্ড স্টোরেজ চোখে পড়ে। শুনতে পাই, রাজস্থান, পাঞ্জাব বা গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এই সব কোল্ড স্টোরেজ খুলে বসেছে।

আমি আর হেমকান্তি কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখলাম। এই রকম সময় প্রকৃতিও একঘেয়ে লাগে। হেমকান্তি হাই তুলে বলল, যা বাবা? সিগারেটের প্যাকেটটা ওরা নিয়ে গেল?

আমি বললাম, আমার কাছে দু'তিনটে আছে।

—তারপর? এগুলো ফুরিয়ে গেলে?

আমি তখন ডান দিকের মাঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। হেমকান্তি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হুঁ!

আমাদের কাহিনীতে এতক্ষণে একজন নায়িকার আবির্ভাব হয়েছে। দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে লাল শাড়ি পরে কেউ একজন হেঁটে আসছে। সে বালিকা না যুবতী না বৃদ্ধা তা এখনো বোঝা যায় না, তবে তার ঐত টকটকে লাল রঙের শাড়ি দেখে যুবতী হিসেবে কল্পনা করতেই ইচ্ছে হয়।

আমরা দু'জনেই ঐ চলমান লাল আগুনের শিখার মতন মূর্তিটির দিকে চেয়ে রইলাম। খুব বেশিক্ষণ মাঠ-ঘাট-আকাশ ইত্যাদি প্রকৃতি দেখার চেয়ে একটি জীবন্ত মেয়েকে দেখা যে অনেক স্বাস্থ্যকর, তা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের শাস্ত্রেও তো নারীকে প্রকৃতি বলেছে, তাই না?

প্রথমে ভেবেছিলাম, মেয়েটি আমাদের দিক থেকে উল্টো দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাতে একটু একটু নিরাশ বোধ করছিলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, না—সে আমাদের দিকেই আসছে। তাহলে ব্যাপারটা বেশ জমে উঠবে মনে হচ্ছে। হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়ার ঘটনাটা বৃথা যাবে না।

কাছে আসবার পর বুঝতে পারলাম, যুবতী বা বৃদ্ধা নয়—মেয়েটিকে এখনো কিশোরীই বলা যায়। ষোলো-সতেরোর বেশি বয়েস হবে না। পিঠের ওপর চুলগুলো খোলা, বিস্তীর্ণ মাঠের পটভূমিকায় তাকে বেশ সুশ্রী দেখাচ্ছে। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় হয়তো তার চেহারার থেকেও বেশি সুন্দর দেখায় তাকে।

মেয়েটি মাঠ থেকে উঠে এল রাস্তায়। আমাদের গাড়ির খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বেশ সপ্রতিভ কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে রইল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, আমাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা!

মেয়েটি এরপর একটা অবাক করা কথা বলল। আমাদের চমকে দিয়ে সে বেশ জোরে বলে উঠল, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে! তারপরই মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল হনহন করে।

আমি আর হেমকান্তি হো-হো করে হেসে উঠলাম। হেমকান্তি বলল, ওরে বাবা, কি তেজী মেয়েরে, একেবারে ধানী লঙ্কার মতন!

আমি বললাম, জানিস, আজকাল অনেক গ্রামের মেয়েরা কো-এডুকেশনাল স্কুলে পড়ে? তারা অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে।

—মেয়েটা চলে গেল? আলাপ করতে পারলে বেশ হতো, সময়টা কাটত।

—আমি এখনো আলাপ করতে পারি।

—যাঃ যাঃ! পাঁচ টাকা বাজি।

আমি বললাম, পাঁচ টাকায় হবে না। উৎসাহের চোটে হেমকান্তি কুড়ি টাকায়

উঠল। আমি তখন গাড়ি থেকে নামলাম।

আগে লক্ষ করিনি—একটু দূরে, রাস্তার পাশে একটা ছোট পুকুর, পুকুর পাড়ে খেজুর গাছ ও বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে কয়েকটা বাড়ি। মেয়েটি সেই পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে।

আমি সেখানে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দু-একটি কথা বলে ফিরে এলুম। মেয়েটি পুকুরের অন্য পারে চলে গেল।

হেমকান্তি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হলো? মেয়েটা চলে গেল যে।

আমি উত্তর না দিয়ে হাসলুম। হেমকান্তি একটু ভয় পেয়ে গেছে। মেয়েটা যে-রকম তেজী যদি ওর বাড়ির লোকদের ডেকে এনে আমাদের মার খাওয়ায়, যে-কোনো একটা মিথ্যে কথা বললেই তো হলো।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেও কোনো লোক আমাদের মারতে এল না। তখন হেমকান্তি বলল, তুই বাজি হেরে গেছিস! দে, টাকা দে।

—দাঁড়া, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

একটু বাদেই দেখা গেল, মেয়েটি আবার ফিরে আসছে। একা। হাতে একটা পাত্র। আমাদের দিকেই যে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার আমি হেমকান্তিকে বললাম, নে, টাকা বার কর। কে হেরেছে দেখলি?

হেমকান্তি খানিকটা মুষড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই কি বললি রে?

আমি বললাম, সত্যি কথার বলা তো বিপদ নেই। যা সত্যি কথা তাই ওকে বলেছি। আমার জল তেষ্টা পেয়েছিল, মেয়েটাকে গিয়ে বললাম, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবেন? বাংলাদেশের গ্রামের অবস্থা এখনও এমন হয়নি, যাতে কোনো মেয়ের কাছে জল খেতে চাইলে সে আপত্তি করবে। আর, বাচ্চা মেয়েদের খুশি করার জন্য তাদের আপনি বলতে হয়।

মেয়েটি রাস্তার কাছে এসে বলল, এই যে নিন।

হেমকান্তি আর আমি ছুটে গেলাম। সোনার মতন উজ্জ্বল কাঁসার ঘটিতে সে জল এনেছে, সঙ্গে একটা গেলাস। কি ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ জল, উৎসাহের চোটে আমরা দু' গেলাস করে খেয়ে ফেললাম।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করল আপনি তখন বললেন কেন, বেশ হয়েছে?

মেয়েটি বলল, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই বলেছি। গাড়ি করে কেউ যখন বেড়াতে আসে, তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে আমার খুব আনন্দ হয়।

আমি বললুম, গাড়ি যদি না ঠিক হয়, তা হলে আমরা আজ রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে থাকব কিন্তু! ভাত খাওয়াতে হবে। আমি একদম খিদে সহ্য করতে পারি না।

পাঠক বুঝি ভাবছেন, এরপর আরো অনেক কিছু ঘটবে। আবার কি হবে? এ তো গল্প নয়। মিস্তিরি নিয়ে আমাদের বন্ধুরা অবিলম্বে চলে এল। দু' মিনিটে ঠিক হয়ে গেল গাড়ি। আমরা জল খেলাম, মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিলাম, চলে এলাম।

৭

আমেরিকার একটা খুব ছোট শহরে আমি কিছুদিন ছিলাম। আমার ঘরের জানলা দিয়ে পাশের একতলা বাড়িটার বারান্দা দেখা যেত। প্রত্যেকদিনই সন্ধেবেলা দেখতাম তিনটি বারো-তেরো বছর বয়সের মেয়ে এবং একটি প্রায় ঐ বয়েসী ছেলে ঐ বারান্দায় খেলা করছে। তখন গ্রীষ্মকাল, জানলা খোলা না রাখলে ঘরের মধ্যে দগ্ধে মরার সম্ভাবনা, জানলার পাশেই আমার পড়ার টেবিল, জানলা দিয়ে প্রায়ই আমার চোখ বাইরে চলে যেত, আমার পড়াশুনোয় বিঘ্ন ঘটাত। দেখতাম, ওদের খেলার মধ্যে কি যেন একটা নিয়ম রয়েছে, কিছুক্ষণ হুটোপুটি করার পরই ছেলেটি এক-একবার এক-একটি মেয়েকে চুমু খাচ্ছে।

ওদেশে কোনো ছেলেমেয়েরই স্বাস্থ্য খারাপ নয়, যেমন সুন্দর গায়ের রং, তেমনি গড়ন, মাথা ভর্তি কোঁকড়া সোনালি চুল, ছেলেমেয়ে কটিকে দেখতে ভারী ভালো লাগে, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ওরা—সেই সরল সজীবতাও রয়েছে ওদের কণ্ঠস্বরে, এর সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়ার দৃশ্যটা সব সময় মেলাতে পারিনি। কোনো রকম ভয় বা আড়ষ্টতা নেই, গোপনতার চেষ্টা নেই, যেন ওটা সত্যিই একটা খেলা, গুরুজনরা মাঝে মাঝে যাতায়াত করছেন বারান্দা দিয়ে —তাঁদের দেখে ওরাও ছিটকে সরে যাচ্ছে না, তাঁরাও কোনো মন্তব্য করছেন না।

কোনো সন্দেহ নেই, সব দেশের ছেলেমেয়েরাই ঐ বয়েসে পরস্পরের রহস্য জানার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বাবা-মা'র কঠোর শাসনের আচরণ ভেদ করেও প্রায় সব ঐ বয়েসী ছেলেমেয়েই পরস্পরের শরীর একটু ছোঁয়াছুঁয়ি করে নেয়। তার সঙ্গে ওদের তফাৎ শুধু এই—ওরা জিনিসটাকে অন্যায় কিংবা গোপন করার কথা ভাবছে না, অন্যদের সামনেই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারছে—এবং অভিভাবকরাও প্রকাশ্যে অন্তত ও নিয়ে কোনো মাথা ঘামাচ্ছে না। জিনিসটার মধ্যে আমিও কোনোরকম অন্যায় দেখতে পাইনি—তবুও কিছুতেই যেন সমর্থন করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল, এতটা স্পষ্টতা না থাকলেই বোধহয় ভালো

ছিল—আমরা ছেলেবেলায় যেমন করেছি, লুকিয়ে-চুরিয়ে শুধু একটু দেখা করার রোমাঞ্চ, আঙুলে-আঙুল ছোঁয়া, গোপনে চিঠি চালাচালি ও সব সময় না-পাওয়ার আশঙ্কা বা দুঃখ—তার মধ্যে রহস্য ছিল অনেকখানি—এরা সেই রহস্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জৈবিক তৃপ্তি আর কতখানি, শরীরের রহস্যটাই তো আসল।

মাস দেড়েক বাদে দেখলুম, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই বারান্দায় সেই ছেলেটির সঙ্গে শুধু একটি মেয়ে—পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তারা যেভাবে নিবিড় চুম্বনে রত, সেটাকে আর কোনোক্রমেই খেলা বলা চলে না। ঝটাপটি করতে করতে ছেলেটি মেয়েটির বুকে মুখ গুজলো। আমাদের দেশে কোনো প্রতিবেশীর চোখে এরকম দৃশ্য পড়লে—তখুনি ছুটে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে নালিশ, পাড়াময় কেচ্ছা, ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রচুর ধমক, কিল চড় কিংবা খাওয়া বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা চলত। ওদেশে এসব চলে না, তাছাড়া আমি তো বিদেশী, আমার পক্ষে কিছু বলা মানায় না। আমি একটা অজানা আশঙ্কা বোধ করতে লাগলুম। ওরা নির্ভুল পথে এগুতে লাগল ক্রমশ, প্রতিদিন টেলিভিশানে, সিনেমায় যে-সব দৃশ্য দেখছে, তার থেকে শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছে. সুতরাং একদিন মেয়েটির মা ও বাবা পার্টিতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল—সেদিন ছেলেটি-মেয়েটি চুম্বনাদি করতে করতে যে-রকম উন্মত্তের মতন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, তাতে পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। আমি শিউরে উঠলুম।

অবশ্য, নিজেকে আমি প্রশ্ন করেছি, কেন আমার অস্বস্তি ও আশঙ্কা। একি এক ধরনের সংস্কার ও গোঁড়ামি নয়? তের-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শারীরিক মিলন মোটেই অস্বাভাবিক বা অবৈজ্ঞানিক নয়, তাহলে প্রকৃতি তাদের শরীরকে প্রস্তুত করেছে কেন? আমাদের ঠাকুর্দার বাবারা তো ও বয়সে বিয়ে করে দিব্যি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন—সুতরাং নিছক 'বিবাহ' নামের প্রতিষ্ঠানটিকেই কি একমাত্র গুরুত্ব দিতে হবে? আমেরিকাতে, অনেক ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেকে বিবাহিত ও পিতা হিসেবে দেখেছি। অনেকের নানা পার্থিব কারণে বিবাহিত হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়া সম্ভব হয় না, তাই বলে বছরের পর বছর শরীরের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত রাখতে হবে? এর নৈতিক মূল্য থাকতে পারে—কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এটা অস্বাভাবিক, সুতরাং ছেলেমেয়ে দুটির ওপর আমি রাগ করতে পারলুম না।

এরপর মাঝখানে কি ঘটেছিল জানি না, একদিন সকালে সেই মেয়েটির মৃতদেহ নদীর জলে ভাসতে দেখা গেল। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। ফুলের মতন সুন্দর একটি বাচ্চা মেয়ে স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছে প্রাণ। সেদিন আমি খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। আমার মনে হয়েছিল, এইভাবেই আমেরিকার ধ্বংস আসবে।

মানুষের যে-স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা এত উদগ্রীব, সেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপই আত্মধ্বংস ডেকে আনবে। সেই স্বাধীনতার নামে ভয়াবহ জায়গায় পৌঁচেছে আজকের পশ্চিমী সভ্যতা—আত্মধ্বংস ছাড়া তার আর নিষ্কৃতি নেই।

বলাই বাহুল্য, ঐ ছেলেমেয়ে দুটির ব্যবহারকে পূর্ণ সমর্থন করা যেমন যুক্তিহীন, তেমনি এদের মৃত্যুর মতই পশ্চিমী সভ্যতার মৃত্যু আসন্ন বলাও অতিশয়োক্তি। যৌন-স্বাধীনতার ভালো এবং খারাপ দুটি দিকই অন্ধ না হলে, নজরে পড়ে।

আজকাল অনেকেই বলেন. লালসা, ব্যভিচার ও নোংরামি চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার ফলেই যেমন রোমের বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতার পতন হয়েছিল, এখানকার পশ্চিমী সভ্যতারও সেইভাবে ধ্বংস ঘটবে। সেইজন্যই এখনকার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে এত যৌনতার বাড়াবাড়ি। ব্রিটেনের ম্যালকম ম্যাগারিজ কথাটাকে এইভাবে সাজিয়ে বলছেন, "It is the inevitable mark of decadence in our society. As our vitality ebbs, people reach out for vicarious excitement, like the current sex mania in pop songs and the popular press. At the decline and fall of the Roman Empire, the works of Sappho, Catallus and Ovid were celebrated. There is an analogy in that for us." এই যৌন ব্যভিচার ও বল্গাহীন লালসা পশ্চিম জগতে কতখানি গেছে, তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়।

কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে দোকানে কনট্রাসেপটিভ পিল ও কনডোম বিক্রি করতে হবে এবং মেয়েদের হোস্টেলে ছাত্রদের দিনে-রাত্রে যে-কোনো সময় যাওয়ার অধিকার থাকবে, ছাত্রদের এই দাবির জন্য ম্যালকম ম্যাগারিজ নিজে পদত্যাগ করেছিলেন। পশ্চিম জার্মানিতে স্কুল-কলেজের অবিবাহিত ছাত্রীদের মধ্যে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার ছাত্রী গর্ভবতী হয়। সেইজন্যই অনেকেই মনে করেন, এরকম যখন হচ্ছেই, তখন তাদের কনট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে দেওয়া বরং ভালো। আমেরিকায় আজকাল অনেক পরিবারেই মায়েরা প্রতিদিন সকালে চা ও টোস্টের সঙ্গে একটি করে কনট্রাসেপটিভ পিলও খেতে দেন নিজের অবিবাহিত মেয়েকে। ফরাসী অভিনেত্রী ক্যাথরীন ড্যানিয়ুবের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে —তিনি বিয়ে করেননি, এবং প্রকাশ্যে ছেলেটিকে নিয়ে আছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি বিয়ে করা পছন্দ করেন না। সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য ফরাসী যুবতী বিয়ে না করেই মা হয়ে ফ্যাশনেবল হতে চাইছেন। সুইডেনে কনট্রাক্ট ম্যারেজের মতনই অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে না করে যতদিন খুশি একসঙ্গে থাকে, তারপর ইচ্ছে মতন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—এ নিয়ে সমাজও কোনো উচ্চবাচ্য করে না।

ইওরোপ আমেরিকায় প্রায় প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই কতগুলো প্রাইভেট ক্লাব আছে। সেখানকার সব মেম্বাররাই বিবাহিত, মাসে একদিন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সেই ক্লাবে আসেন, পান-আহারের পর আলো নিবিয়ে সদস্যরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্ত্রীদের বদলাবদলি করে উপভোগ করেন। এই রকম ক্লাবের নানা রূপান্তর আছে, উদ্দেশ্য একই। কোনো রকম শিল্পের চিহ্নহীন স্ট্রিপটিজ ক্লাবের ছড়াছড়ি সর্বত্র। কোনো কোনো দেশে আইন আছে যে স্ট্রিপটিজের সময় নারীদেহের উর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন করা গেলেও নিম্নাঙ্গের সব পোশাক খোলা চলবে না। এই আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য অনেক ক্লাবে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের একটি সেলোফেন কাগজের তৈরি নিম্নবাস পরিয়ে রাখা হয়। এতেও তো তৃপ্তি নেই —স্ট্রিপটিজ ক্লাবেও আর আজকাল ভিড় হয় না বলে, লস এঞ্জেলেসেব অনেক জায়গায় স্ট্রিপটিজেব সঙ্গে একটা কোনো নাম করা ফিল্মাও ঘুষ দেওয়া হয়। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম শহরকে বলা হচ্ছে সমকামীদের স্বর্গ। ওখানে পুরুষ বেশ্যার ছড়াছড়ি, অনেক হোটেলেই অল্পবয়েসী বালক জুটিয়ে দেবার বন্দোবস্ত আছে। সারা পৃথিবী থেকেই দ' জাতের সমকামীরা আমস্টার্ডামে ভিড় করে। হল্যাণ্ডের সরকার এ সম্পর্কে অবহিত হবার পর পুলিশী কড়াকড়ি শুরু হয়। কিন্তু তারপরই ওদেশে টুরিস্টের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়ায়—সরকার আবার চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ঢিলে দিতে শুরু করেন। এখন পুলিশ ওসব ব্যাপার দেখেও দেখে না।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। কমুনিস্ট দেশগুলোতে এসব কুৎসিত কাণ্ড কতদূর হয় জানি না। ওসব দেশের সব খবর জানতেও পারা যায় না। তবে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কমুনিস্ট দেশগুলিতে সরকারি কড়াকড়ির জন্য এসব ব্যাপার খুবই কম। আমার এক পুলিশ বন্ধুর মুখে শুনেছি, ওয়ারস-তে তাঁর বাড়ির অদূরেই এক মধ্যবয়স্কা অবিবাহিত মহিলা হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তিনি সন্তানকে নষ্ট না করে যত্ন করে মানুষ করছেন। এ জন্য সমাজ তাঁকে কোনো দণ্ড দেয়নি, পাড়ার লোক ছি-ছি করে না—এবং চাকরি পেতেও কোনো অসুবিধে হয় না।

পশ্চিম দেশগুলির এই বাড়াবাড়ি ও যৌন স্বাধীনতার বীভৎস রূপ যে তাদের সভ্যতার অনেক ক্ষতি করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শরীরের সব রহস্য নষ্ট করে এরা অতি শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। প্রকাশ্যে নারী শরীর নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি ও যখন তখন সহবাসের ফলে—জীবন সম্পর্কে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা মানুষের শরীর ও মনের যে স্বাধীনতার কথা বলেন, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নকল শিল্পী ও নকল লেখকরা উৎকট শব্দে লাম্পট্যের দৃশ্যে শিল্প-সাহিত্য ভরিয়ে ফেলছে। ফিল্মে, থিয়েটারে নগ্নতা ও মৈথুনের দৃশ্য একটা বিরক্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এমনও শুরু হয়েছে, কোনো

কোনো ফিল্মে মাঝামাঝি কোথাও নগ্ন দৃশ্য শুরু হলেই দর্শকরা বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যায়। 'আমেরিকা হুররা' নামে একটি নাটকে নারী-পুরুষের সঙ্গমকে হাস্যকর করে দেখানোর জন্য প্রমাণ-সাইজের পুতুলকে দিয়ে মঞ্চের ওপর সঙ্গম করানো হয়েছে। অবাধ যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য মানুষের পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, বাড়ির প্রতি মানুষের আর কোনো আকর্ষণ নেই—'গৃহশান্তি' জিনিসটা অবলুপ্ত, সেইজন্য মানুষ সব সময় অস্থির, ছন্নছাড়া—মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পরিণতি নেই। যৌন ভোগের চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছে বলেই আজ এর প্রতি একটা বিতৃষ্ণাও দেখা দিচ্ছে, এর স্থান গ্রহণ করছে নানারকম মাদকের নেশা। আমেরিকার কলেজের ছেলেমেয়েরা ঝোপের আড়ালে বসে এখন আর চুম্বন-আলিঙ্গন করে না, তার বদলে গাঁজা খায় কিংবা এল এস ডি খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। এই নেশার ঝোঁক যদি কাটে, তবে হয়তো আবার তারা সুস্থ জীবন ফিরে পাবে, নইলে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই তাদের নিয়তি।

কিন্তু, আমাদের দেশে বসে বসে ওদের শুধু নিন্দা করারও কোনো যুক্তি নেই। ঐ রকম বিকৃত স্বাধীনতার দিকে না-গিয়েও আমাদের অনেক স্বাধীনতা এখনো পাওয়া দরকার। অনেক সংস্কার ভেঙে, ট্যাবু থেকে মুক্ত হয়ে পশ্চিমী সভ্যতার অনেক লাভও হয়েছে। যৌন স্বাধীনতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স বা আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা যেমন যৌনতার সব বিধিনিষেধ ভেঙেছে, তেমনি তারা ছাত্র আন্দোলন কিংবা বিপ্লব বাধাতেও জানে, যুদ্ধে তারা হয় শ্রেষ্ঠ সৈনিক, কলকারখানায় কাজ করার সময় তারা কঠোর শ্রমিক। একজন রাশিয়ান শ্রমিকের তুলনায় একজন জার্মান শ্রমিকের শ্রম-উৎপাদন বেশি। আমাদের দেশে অধিকাংশ যুবক-যুবতীর মধ্যে অবরুদ্ধ যৌনবাসনা—তাই তারা কোলকুঁজো, মিনমিনে ও অলস।

এবং যথার্থ নারী স্বাধীনতাও তারা আয়ত্ত করেছে। আমাদের দেশে আমরা নারী স্বাধীনতার রূপ এখনো একটুও দেখিনি। একজন দৈবাৎ কোনো পরপুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হলেই তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে না—শুধুমাত্র এই সংস্কারটুকু কাটিয়ে উঠলেই মেয়েদের কর্মক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত হয়ে যেতে পারে। ইটালিতে পাহাড়ী এলাকায় একটি নির্জন টিলার ওপরে একটি পোস্ট অফিসে এসে একজন মহিলাকে কাজ করতে দেখেছি—দেখে মনে হয়েছে তিনি নিজের জীবন ও মানসম্মানের দায়িত্ব একা নিতে জানেন—একেই বলে স্বাধীনতা। যৌন সংস্কার ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রায় সব কটিই অবৈধ সন্তান জন্মের ভয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিবাহিত, দায়িত্ববদ্ধ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো হিসেবে সন্তানের জন্ম হলেই তা উত্তরাধিকার প্রথা, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমগ্র

সমাজকে বিব্রত করে তুলতে পারে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের অবাধ প্রচলন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণাও অনেক পাল্টাতে বাধ্য। পশ্চিমী সভ্যতার উন্নতির প্রথম ধাপ ছিল এই, দু'জন পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ—তারা কিভাবে জীবনযাপন করবে, বিবাহ করবে কি করবে না, কতদূর যৌন-সম্ভোগে রত হবে, তা নির্ধারণ করবে, শুধু তারা দুজনেই। অন্য কেউ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদেব দেশে সেইটুকুও এখনো আয়ত্ত হয়নি।

৮

আটলাণ্টিকের উপরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, রাত্রি আবার বিকেল হলো। জেট প্লেনের জানলা দিয়ে নিচে কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার, আকাশে বহুক্ষণ সূর্যাস্তের দৃশ্য ছিল, তারপর আকাশ ও সমুদ্র উভয়েই অন্ধকারের সমুদ্র হলো। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমেরিকা।

আমি জানলার পাশেই বসেছিলাম, আমার পাশে বসা সহযাত্রীর বোধহয় ঈর্ষা হচ্ছিল, বারবার উঁকি মেরে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো ভদ্রতা করে আমি ওকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বদলে নিতে পারতাম, কিন্তু কি রকম যেন মনখারাপ লাগছিল খুব, আর মনখারাপেব সময় ভদ্রতা দেখানোর কথা মনে আসে না। একটু পরেই আমেরিকায় পৌঁছুব, কত উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, উদ্দীপনা জাগার বুঝি কথা ছিল। অথচ কি রকম যেন ঠাণ্ডা মনখারাপ। প্রচুর খাদ্য দিয়ে যাওয়া হলো সামনে, একটা জিনিস প্রায়ই লক্ষ্য করেছি, প্লেন যখনই সমুদ্রের উপর দিয়ে যায়, তখনই বার বার নানান পানীয় ও সুখাদ্য পরিবেশন করে যায় সুন্দরী এয়ার হোস্টেসরা। লোকের মন ভোলাবার জন্য, সমুদ্র পার হবার সময় অধিকাংশ প্লেন-যাত্রীদেরই নাকি ভয় ভয় করে। পেট ভরলেই মন ভালো হবে কিংবা ঘুম পাবে। আর এ তো সব সমুদ্রের মধ্যে কুখ্যাত, আটলাণ্টিক-এর উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে যাওয়া।

আমি একটিও সুখাদ্যের অপব্যবহার করিনি। তবু মন ভরল না। কি রকম একা, উদাস, শূন্য। প্লেন উড়ে চলেছে প্রায় ৪৫ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে, এত উঁচুতে উঠলে মন বোধহয় স্বভাবতই শূন্য হয়ে আসে। আর মন শূন্য হলে বাইরের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। আমি সহযাত্রীকে জানলার পাশের আসন ছেড়ে দিইনি।

লোকটি অনেকক্ষণ উসুখুসু করতে লাগল। কড়া পানীয়ের অর্ডার দিতে লাগল মাঝে মাঝে। আমি একটি কথা বলিনি। হঠাৎ লোকটি গলা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো শব্দ করল। আমি শূন্য চোখে তাকালাম। মধ্যবয়স্ক, মোটাসোটা চেহারার লোক, দেখলেই মনে হয় হাসি-খুশি, অর্থাৎ যে-সব লোক জীবনটা উপভোগ করতে হবে, সব সময় আনন্দ পেতে হবে এই ভেবে প্রচুর কষ্ট করে। বুঝতে পারলুম লোকটি আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করতে চায়, অর্থাৎ সেই ধরনের মানুষ যারা বেশিক্ষণ একা চুপ করে বসে থাকতে শেখেনি, আবার কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়তেও ভালোবাসে না।

—কী তুমি চুপচাপ বসে আছ, বইও পড়ছ না—কী, ফিলিং হোম সিক?

আমি শুকনো হেসে বললাম, না, আমি বাড়ি ছেড়েছি মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে। এরই মধ্যে বাড়ির জন্য মন কেমন করবে কেন?

—তুমি কি জাত? ইজিপশিয়ান?

—না, আমি—

—জাপানী?

—না, আমি—

—আরব?

—না।

—স্প্যানীশ?

—না, আমি—

—তবে কি নিগ্রো, ও আ আম সরি, আফরিকান?

লোকটির জ্ঞানের বহর দেখে আমার মজাই লাগল। জাপানী থেকে স্প্যানীশ থেকে আফরিকান যে এক নিঃশ্বাসে বলতে পারে—তার প্রতি আমার তৎক্ষণাৎ কৌতূহল হলো। অথবা কি লোকটি সুরেশ্বরীর কৃপায়—আমি বিনীতভাবে আমার নিজের দেশের নাম জানালুম?

—ভারতবর্ষ? ওব্ বাবা, সে যে অনেক দূর! তাই না?

—হ্যাঁ, দূর। কিন্তু জাপানের থেকে কাছে!

—আমি কখনো কোনো ভারতীয় দেখিনি। আচ্ছা, তোমরা তো গরুকে পুজো করো, তাই না?

লোকটিকে আমার খুব ভালো লাগল। এমন সরল মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। যে-দেশ সম্পর্কে যেটুকু সামান্য জ্ঞান আছে, তা সঙ্গে সঙ্গে জানাতে আর দ্বিধা করে না। আস্তে আস্তে আলাপ হবার পর জানতে পারলুম, লোকটি আমেরিকার একজন মাঝারি ব্যবসায়ী, এক সপ্তাহ ছুটি কাটাতে প্যারিসে এসেছিলেন। জীবনে

কখনো ভারতীয় দেখেননি, 'কেন আমেরিকায় তো অনেক ভারতীয় আছে?' —আমার এ-কথার উত্তরে, তিনি জানালেন যে, তা হয়তো আছে, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিনতে পারেননি, জীবনে একমাত্র সত্যিকারের খাঁটি বিদেশী দেখেছেন একজন ইজিপশিয়ানকে, ওঁর কোম্পানিতে চাকরি করেন। ভারতীয়রা গরুকে পুজো করে, একথা উনি কোথায় গুজব শুনেছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমে গেল। খুব আন্তরিক ব্যবহার। কোনোরকম কৃত্রিম আদব-কায়দার ধার ধারেন না। ওরই ফাঁকে আমাকে শুনিয়ে দিলেন, ওর এক মেয়ে লেখাপড়ায় খুব ভালো, ওঁর ছেলেটা বাউণ্ডুলে—ঐ যে বীটনিক না কি-যেন বলে, তাই হয়ে গেছে। একটা জিনিস লক্ষ করলুম, লোকটির সঙ্গে আমার কথা বলতে খুব ভালো লাগল—আসলে আমিও বোধ হয় চাইছিলাম কথাবার্তা বলতে, বহুক্ষণ কথাবার্তা না বলতে পেরেই আমার মনখারাপ লাগছিল।

এক সময় আকাশ ঘোর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আবার দেখি আলো ফুটছে। সকাল নয়, বিকেলের আলো। প্যারিস থেকে প্লেন ছেড়েছে বিকেল চারটের সময়, নিউ ইয়র্কের আইডলওয়াইল্ড (এখন কেনেডি) বিমান বন্দরে পৌঁছুবে বিকেল সাড়ে ছটায়। একদিনে দুবার সন্ধ্যা (বাংলা সন্ধ্যা, সংস্কৃত অর্থে নয়) দেখার সৌভাগ্য জীবনে আমার ঐ একবার মাত্র।

প্লেন বিমান বন্দরের আকাশে ঘুরছে, আমার সহযাত্রী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ঐ দেখো, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আর ঐ যে দেখছ চূড়ার মতো খানিকটা আবছা হয়ে গেছে—ঐটা হচ্ছে এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং, আর ঐ যে—

আমার ওসব দেখার খুব আগ্রহ ছিল না। ওসব তো পরে কোনো সময়ে দেখবই। আমি দেখছিলাম হর্ম্যসারির আলোর রেখা, দেখছিলাম এই অতিকায় শহর আমাকে গ্রহণ করবে কিনা। কোনো যুক্তি নেই, তবু বার বার আমার মনে হচ্ছিল, এ শহর হয়তো আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে—আমাকে এয়ার পোর্ট পেরুতেই দেবে না, বলবে, যাও, তুমি পরের গাড়িতেই ফিরে যাও। তোমার তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিল না। হয়তো বলবে, তোমার চুল কেন ওরকম করে ছাঁটা, অথবা তোমার চোখ কেন ওরকম, কাস্টমসের অটো কর্মচারী বলবে, কেন মাথা ভরা দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছ, যাও ফিরে যাও!

প্লেন নিশ্চল, সিঁড়ি লাগাল। ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে নেমে এলাম—আমার সহযাত্রীর সঙ্গে। তোমার আর আমার কাস্টমসের ঘর আলাদা। আমরা দুজনে দুদিকে যাব। আমি বললুম, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশি হলাম, বিদায়।

ততক্ষণে সিঁড়ি থেকে নেমে আমি আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছি, সহযাত্রী হাত বাড়িয়ে বললেন, আমেরিকার মাটিতে তোমাকে স্বাগতম জানাবার প্রথম সৌভাগ্য আমাকে দাও! ওয়েলকাম টু আমেরিকা।

হাত ঝাঁকালুম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।

কাস্টমসের ঘরে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। তার আগে, একজন এসে ভিড়ের মধ্যে আমাকেই শুধু বাছাই করে জিজ্ঞেস করল. তুমি এক্স-রে প্লেট এনেছ?

—আমি? এক্স-রে প্লেট?

এনেছি না শেষ মুহূর্তে ফেলে এসেছি? বুকটা ধ্বক করে উঠল। যদি না এনে থাকি, তবে কি ফিরে যেতে হবে এখুনি? যা ভেবেছিলাম তাই সত্যি হবে? হাত ব্যাগে নেই। বাক্সের মধ্যে কি আছে? ইস মনেই পড়ছে না—শেষ মুহূর্তে ভরেছিলাম কিনা।

—কোন্‌টা তোমার সুটকেশ? চিনতে পারছ?

হ্যাঁ, অটোমেটিক রোলার গড়িয়ে আসছে অনেক বাক্স, খপ করে আমারটা তুলে নিলাম। উৎকণ্ঠিত হাতে তালায় সহজে চাবি লাগে না। লাগল। আছে। লোকটি এক্স-রে প্লেট একটা যন্ত্রে বসিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। কি নিষ্ঠুর লোকটা, এত সময় নিচ্ছে, আমার বিহ্বল মুখের দিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই! যাও, ঠিক আছে। দেখি তোমার বাক্সে আর কি আছে? আচ্ছা, থাক আর দেখাতে হবে না। এই যে ফেরৎ নাও পাশপোর্ট, ঐ সামনের সোজা দরজা দিয়ে বেরুলেই শহরে যাবার বাস পাবে। ওয়েলকাম টু আমেরিকা!

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলাম সেই দরজার দিকে। বিশাল কাচের দরজা আমি সামনে দাঁড়াতেই ম্যাজিকের মতো আপনি খুলে গেল। বাইরে অসম্ভব উজ্জ্বল আলো ও জনতা। আমি তার মধ্যে মিশে গেলাম।

৯

ইনি আসছিলেন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে শ্যামবাজার মুখো। গজেন্দ্রগমনই বলা যায়, কেন না, চেহারাটা ছোটখাটো হাতিরই মতন। ছোট ছোট শিং দুটোয় বালি মাখানো রয়েছে। বালির স্তূপ দেখলেই ষাঁড়দের মনে কি রকম যেন পুলক জাগে, মনের সুখে মাথা দিয়ে ঢুঁসোয় বালির স্তূপ। হয়তো এই বলীবর্দের বালি নিয়ে লীলাখেলায় কিছু বিঘ্ন ঘটেছিল, তাই মেজাজটা অপ্রসন্ন। মাঝে মাঝে গম্ভীর

তেজালো গলায় হাঁক উঠছে, উঁ—গাঁক্, উঁ—গাঁক্! রাস্তায় মানুষজন, ফুটপাতের তরিতরকারিওয়ালা সভয়ে দেখছে ওর দিকে, ওর অবশ্য কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মৃদুমন্দ গতিতে একখানা পা টেনে টেনে চলেছেন শ্যামবাজারের দিকে, মনে হয় ওনার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেখানে।

বাসস্টপের কাছে বেশ ভিড়, অনেকক্ষণ বাস আসেনি। উনি সে-সব গ্রাহ্য করলেন না, ভিড় ঠুসেই আসতে লাগলেন, মুহূর্তে ভিড় ছত্রাখান হয়ে গেল। এক যুবতী পৃথিবী বিস্মৃত হয়ে শুধু সম্মুখস্থ এক যুবার চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলেন, হঠাৎ কনুইয়ের পাশে শিং সমেত ঐ বিরাট মুণ্ড দেখে এমন একখানা লাফ দিলেন, কোনো মহিলাকে সে-রকম লাফ দিতে আমি আর একবারই দেখেছি (ছবিতে), তিনি হাইজাম্পে অলিম্পিক চাম্পিয়ন ইয়োল্যানডা বালাস। ষাঁড় মহাপ্রভু আবাব এগিয়ে চললেন সামনে।

কলকাতার ষাঁড়দের গতি দ্রুত হতে পারে না, কেন না, তাদের একটা পা বাল্যকালেই ইনজেকশন দিয়ে জখম করে দেওয়া হয়। জখম করার পরও কলকাতার রাস্তায় কেন ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে বহুকাল ধরে, তা অবশ্য জানি না। কলকাতা ও শহরতলীর শকুনরা পৌরসভার অনেক উপকাব করে জানি, পৌরসভার প্রতীকই তো হাড়গিলে শকুন। তবে, ষাঁড়দের উপকারিতা বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। অবশ্য লোকমুখে একটা কারণ শুনতে পাই সেটা আবার লেখা চলে না।

এক সময় রাস্তা থেকে বেওয়ারিশ ষাড় গরু হটাবার একটা উদ্যোগ হয়েছিল, বছর নয়েক আগে বোধহয়। হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল কেন কে জানে! এর সঙ্গে গো-রক্ষা আন্দোলনেব কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাই বা কে বলবে! কিন্তু, এখনো প্রায়ই খাটাল অপসারণের আস্ফালন শুনতে পাই, ষাঁড় খেদাও আন্দোলন একদম স্তব্ধ। যাই হোক, সেটা আমাদের বিষয় নয়।

ইনি যাচ্ছিলেন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে, উনি আসছিলেন গ্যালিফ স্ট্রীট দিয়ে। এনার রং সাদা, ওনাব রং লালচে। মুখোমুখি দেখা হলো শ্যামবাজারের মোড়ে। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দুজনে মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল বন্ধু। নাকে নাক ঘষাঘষি করলেন, দুজনেই দু'বার হাঁক দিলেন উঁ-গাঁক, উঁ-গাঁক। তারপর ল্যাজ দুটো ঝাপটাতে লাগল মৃদু মৃদু, দু'জনেরই পিছনের পা মাটি আঁচড়াল। এরপর দু'জনেই পিছিয়ে এলেন খানিকটা, আর একবার হুঙ্কার, তারপরই শৃঙ্গে শৃঙ্গাঘাত! দুই শিবের বাহন প্রমত্ত হলেন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে।

লালচে ষাঁড়টির আয়তন ছোট, কিন্তু মনে হয় যেন তারই তেজ বেশি। প্রথমটায় সেই সাদা ষাঁড়টাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল সারকুলার রোড পর্যন্ত, অনেকখানি পিছিয়ে সাদাটা আবার প্রবল উদ্যমে ঠেলে লালচেকে নিয়ে এল নেতাজীর মূর্তির কাছে। তারপর চলল এরকম হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি আর গর্জন।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় ফাঁকা। সমস্ত লোক ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গাড়ি বারান্দার নিচে, নিরাপদ দূরত্বে। রিক্সাওয়ালারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে, একটা রিক্সার গায়ে ওদের সামান্য ধাক্কা লেগেছিল, তাতেই তার চাকা ভেঙে দু'টুকরো। দু'জন অকুতোভয় পুলিশ কনসটেবল এগিয়ে গিয়েছিল ওদের থামাতে, বেশি দূর যেতে হলো না, ঠেলাঠেলি করে ষাঁড় দুটো ওদের দিকে দ্রুত আসতেই ওদের পরিত্রাহি দৌড় দেখার মতন।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল লড়াই, শ্যামবাজারের পাঁচটা রাস্তার সব যানবাহন থেমে রইল, মানুষ চলাচলও বন্ধ। দুটো ষাঁড়েরই একটা করে পা খোঁড়া। তবু কি বিপুল তেজ, মাংসপেশীর কি প্রবল শক্তি। এ-পাশ থেকে ও-পাশ থেকে ছোটাছুটিতে একটুও ক্লান্তি নেই, সাদা ষাঁড়টা শুধু একবার গোবর ত্যাগ করে ফেলল—তবু অবদমিত। মোট কথা আধ ঘণ্টা ধরে গোটা শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা রইল ওদের অধিকারে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী একবার গোটা বাংলা দেশ জয় করে নিয়েছিল না? সেদিন আমার মনে হলো, গোটা সতেরো ষাঁড় যদি এককাট্টা হয়, তাহলে অনায়াসেই কলকাতা শহরটাও জয় করে নিতে পারে।

১০

হাইড পার্কে একজন লোক বাইবেলের নানান ভুল দেখিয়ে খুব তোড়ের সঙ্গে বক্তৃতা করছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম, লোকটি ভারতীয়, খুব সম্ভবত বাঙালি হিন্দু। আমারই মতো গায়ের রঙ খয়েরি, কোকড়ানো চুল, দৈর্ঘ্যও খুব বেশি নয়। আমার বক্তৃতা করার স্বভাব নেই বলে, ভাবলুম লোকটির বক্তৃতা শেষ হলে আলাদা ডেকে বলব, হিন্দু ধর্ম তো অন্য ধর্মকে আক্রমণ করতে শেখায় না।

একটু পরে লোকটিকে আলাদা পেয়ে ভরসা করে বাংলাতেই কথা শুরু করি। লোকটি সাদা মুখে তাকিয়ে রইলেন। এবার আমি লজ্জিত হয়ে ইংরেজিতে।

লোকটি আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে একটু রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন, প্রথমত আমি হিন্দু নই। দ্বিতীয়ত আমি ভারতীয়ও নই। আমি খৃস্টান এবং ইংরেজ।

—কিন্তু আপনার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল...

—চেহারা দেখে জাত বোঝায় না। আমি ইংলণ্ডের নাগরিক।

—কিন্তু কিছুদিন আগে নিশ্চয়ই...

—আমি কোনোদিন ইণ্ডিয়ায় যাইনি। আমার ঠাকুরদাদা এসেছিলেন আপনাদের দেশ থেকে। আমার বাবা ছিলেন সাউথ আফ্রিকার নাগরিক। আমি ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব নিয়েছি। কোনো আমেরিকানকে কী আপনি এখন বলতে পারবেন, সে জার্মান কিংবা ফ্রেঞ্চ? সে এখন আমেরিকান। আমিও ইংরেজ।

—ও, আচ্ছা, আমি লজ্জিত। ক্ষমা করবেন। আপনার নাম?

—আর্থার কে চন্দা।

লোকটির সঙ্গে আর একটুক্ষণ সৌজন্যমূলক কথা বলে আমি বিদায় নিলাম। বিলেতে সেই আমার দ্বিতীয় দিন। আগেই জানা ছিল কিন্তু স্পষ্ট এমনভাবে বুঝতে পারিনি যে, নিগ্রো মাত্রই আফ্রিকান নয়। নাগরিক অধিকারে অনেক নিগ্রোই আমেরিকান বা ইংরেজ। আবার আফ্রিকান মাত্রই নিগ্রো নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আছে খাঁটি শ্বেত নাগরিক। তেমনি ভারতীয়ের মতো চেহারা বা নাম হলেই তাকে অন্য ভারতীয়ের পক্ষে আত্মীয় ভাবা চলে না। দাদা বলে ডাকতে গেলে হয়তো গলা টিপে দেবে। ক্রিকেট খেলোয়াড় কানহাইকে নিয়ে ভারতবর্ষের গর্ব করার কিছুই নেই, বরং ভয় করার আছে। এই তো সেদিন আরেকজন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লেখক, নইপাল, যাঁর বংশ কয়েক পুরুষ আগে ছিল ভারতীয়, এখন তিনিই ভারতবর্ষকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে একটা বই লিখেছেন। বম্বের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্ক মোরেজ একজন গোয়ানিজ ও এখনো ভারতীয়, কিন্তু তাঁর ছেলে কবি ডম মোরেজ এখন ইংলণ্ডের নাগরিক ও খাঁটি ইংরেজ। এবং তিনিও ভারতবর্ষকে গালাগালি দিয়ে ঋণ শোধ করতে ভোলেন নি। ডম মোরেজের কবিতা 'নিউ পোয়েটস অব ইংলণ্ড এণ্ড আমেরিকা' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং ইংরেজ শুনলেই যে গোরা সাহেবদের কথা এতদিন আমাদের মনে আসত, এখন আর তা ভাবলে চলবে না। এখন ব্রিটেনে কালো লোকের সংখ্যা নয় লক্ষ, মোট জনসংখ্যার শতকরা দুই ভাগ। এ সংখ্যা খুব নগণ্য নয় ইংরেজদের পক্ষে। কারণ বহু শতাব্দী তারা অমিশ্র স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছেন। 'ইংরেজ' এই শব্দটিই ইংলণ্ডের লোক পরম গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে, সারা পৃথিবীর মধ্যে এই জন্যই তাঁরা বিশিষ্ট।

বিজিত দেশগুলি এক এক করে স্বাধীন হবার পর, যখন কমনওয়েলথ সৃষ্টি হয়, তখন গোড়ার দিকে ব্রিটেন বেশ উদারতা দেখাতে চেয়েছিল কমনওয়েলথ দেশের নাগরিকদের প্রতি। ভাবখানা যেন এই, এতকাল ধরে ও-সব দেশ থেকে যত সোনাদানা, অর্থ সম্পদ আনা হয়েছে আহরণ করে, এখন তার বিনিময়ে ওসব দেশের কিছু লোক শিক্ষা-দীক্ষা বা চাকরির সুযোগ পাক ইংলণ্ডে। কিন্তু ১৯৫০-এর পর থেকেই বহিরাগতদের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত লয়ে। কারণ বিদেশী ছাত্র বা চাকুরে এসে নিজেরা একটু গুছিয়ে নিয়েই দেশ থেকে আনিয়ে নেয় নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন। তাছাড়া গরম দেশের লোকদের জন্মহার বেশি। সুতরাং বহিরাগতদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইংলণ্ডের বুকে বসে যে সমস্ত অ-ব্রিটিশ প্রজার দেখা পাওয়া যেত, তারা সাধারণত রাজা-মহারাজা-নবাব-শেখ, অথবা নিম্নশ্রেণীর জাহাজী নাবিক-লস্কর। শেলীর কবিতায় ভারতীয় মাঝির মুখের গান ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এখন ইংলণ্ডের বসতি-বহুল অঞ্চলে দেখা যাবে শিখদের গুরুদ্বার, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মদের দোকান, উর্দু সিনেমা হল। পুরুষরা প্যান্ট-কোট পরলেও ওসব দেশের মেয়েরা নিজেদের দেশীয় পোশাক পরে অসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়। গোঁড়া ইংরেজদের চোখে এসব দৃশ্য খুব সুসহ নয়। বহিরাগতদের মধ্যে অর্ধেকই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকি অর্ধেকের মধ্যে ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং আফ্রিকানরা প্রায় সমান সমান।

১৯৬২ সালে পাশ হয়েছিল বহিরাগমন নিরোধ আইন। কিন্তু উপস্থিত বহিরাগতদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিকারে সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ করা হয়েছে—যার ফলে হোটেল-রেস্টুরেন্ট, সিনেমা, থিয়েটার, যানবাহনে বহিরাগতদের প্রতি অসমান ব্যবহার আইনের চোখে দণ্ডনীয়। এতে কিন্তু চাকরি বাড়িভাড়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বিলের স্বপক্ষে আর বিপক্ষে ভোট পড়েছিল যথাক্রমে ২৬১ আর ২৪৯, সামান্য ব্যবধান থেকেই বোঝা যাবে যে, ইংলণ্ডের জনমত পুরোপুরি এখনো এর স্বপক্ষে নয়। অধিকাংশ ইংরেজই এখনো এই সব কালো (আদর করে যাকে ওরা বলে 'রঙীন') বহিরাগতদের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকছে। যাতে ওরা খাঁটি ইংরেজ পাড়ার মধ্যে বাড়ি ভাড়া না পায়, ইংরেজ সন্তানদের জন্য সুরক্ষিত ভালো ভালো চাকরি না পায়, সে চেষ্টার বিরাম নেই। এখনো বহিরাগতদের জন্য নিম্ন শ্রেণীর চাকরিই বরাদ্দ। ওদের আচার-আচরণ সংস্কৃতির ছাপ ইংরেজদের উপর যাতে না পড়ে, সে সম্বন্ধেও শুচিবায়ুর অন্ত নেই। কিন্তু অনেকের ধারণা, এই শতাব্দীর শেষে কালো বহিরাগতদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষে দাঁড়াবে। এই বিপুল সংখ্যাকে বেশিদিন কী দূরে সরিয়ে

রাখা যাবে? সংস্কৃতির মিশ্রণ, মিশ্র বিবাহ শুরু হবেই। তাই স্পেকটেটর কাগজে একজন পার্লামেন্টের সদস্য সখেদে লিখেছেন, আর কিছু দিন পর আমাদের সমস্ত ইংরেজদেরই গায়ের রঙ হয়ে যাবে চকোলেটের মতো, আমাদের সমাজ হবে মিশ্র আফ্রো-এশীয় সমাজ!

১১

রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য গিয়েছিলাম হাসপাতালে। আমার কী অসুখ হয়েছে জানি না। আমার মনের মধ্যে একটা কঠিন অসুখের ভয় ঢুকে আছে।

নার্সের সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। নার্সটি তরুণী, এমন চকচকে চেহারা যে দেখলে হঠাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মনে হয়। অথচ ঝরঝরে বাংলায় কথা বলছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে।

অনেক নার্সকেই দেখেছি গোমড়ামুখী। এই নার্সটি বেশ হাসিখুশি। কত অবলীলাক্রমে আমার হাতটি তুলে নিলেন নিজের হাতে। নার্সটি সমবয়েসী। এই বয়সী কোনো অচেনা মেয়ের হাত আমি এমন ভাবে ধরতে পারি? অভ্যাসে কত কী হয়!

নার্স সিরিঞ্জ ফুটিয়ে আমার হাত থেকে রক্ত তুলে নিতে লাগলেন। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, কাচের নলে উঠে আসছে আমার রক্ত। ব্যথা নয়, আমার খুব অস্বস্তিবোধ হলো।

সিরিঞ্জ ফোটাবার আগে, স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে নার্স যখন আমার হাতটা ঘষে দিচ্ছিলেন, তখনো আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। কেন না, স্পিরিট ভেজানো তুলোটা ঘষামাত্রই সেটা এমন ময়লা হয়ে গেল যে, মনে হয়েছিল নার্স বুঝি আমাকে বকবেন। ধমকে বলবেন, চান-টান করেন না নাকি?

আমার হাতখানা দেখতে তো বেশ পরিষ্কারই, রোজ সাবান মাখি না অবশ্য, কিন্তু স্নান তো রোজই প্রায় করি (শীতকালে দু'একদিন বাদ যায়) তবু এত ময়লা আসে কি করে? কিংবা স্পিরিট দিয়ে ঘষলে সবারই গা থেকে ময়লা ওঠে? চকচকে আয়নাতেও তুলো ধরলে ময়লা দেখা যায়। আমি শুধু শুধু নার্সের ধমকের ভয় পাচ্ছিলাম।

রক্ত টানার সময়টা কী দীর্ঘ। শেষ হলে বাঁচি। মনে হচ্ছে যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলছে। ঠিক যে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি তাও নয়—এখন আবার অন্য রকম অস্বস্তি।

আমার হাতখানা ঝুলছে, তাতে সিরিঞ্জ বেঁধানো, কিন্তু আঙুলগুলো নার্সের বুকের প্রায় কাছে। সিকি ইঞ্চি তফাৎ বড়োজোর। যে কোনো সময় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে। আমার কোনো শুচিবাই নেই অবশ্য, কিন্তু এই কি বুক ছোঁয়ার সময়! তা ছাড়া, এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই, কেন না আমার হাত নার্সের হাতে বন্দী।

নার্সের মুখ নির্বিকার। উনি শুধু রক্ত দেখছেন, নিজের বুক দেখছেন না। কিন্তু আমার পক্ষে নির্বিকার থাকা চলে না। আমার হাতের আঙুল কোনো মেয়ের ভরাট বুকের কাছে—অথচ আমি নির্বিকাব থাকব—আমি তো ডাক্তার নই! আঃ, রক্ত নিতে কত সময় লাগে।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সেই সময় রক্ত নেওয়া শেষ হলো এবং নার্সের বুকের সঙ্গে আমার আঙুল ছুঁয়ে গেল।

একটু লজ্জিত ভাবে হেসে তাকালাম নার্সটির দিকে। যদিও আমার লজ্জা পাবার কোনো কারণই নেই, আমি তো আর ইচ্ছে করে ছোঁওয়া লাগাইনি।

নার্সের মুখে কোনো লজ্জা-টজ্জা নেই, সিরিঞ্জের রক্তের দিকে উনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন উনি রক্ত খুব ভালোবাসেন। বুক ছোঁয়াটোঁয়ার মতন সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামান না।

নার্স বললেন, আপনি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে পারবেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন—আরো কিছু বাকি আছে?

—একটা টেস্টের ফলাফল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানা যাবে। আপনি জেনে যেতে পারতেন।

আমি বললুম, আচ্ছা, অপেক্ষা করছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

নার্স মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা!

মুচকি হাসি কেন? ধন্যবাদ শুনলে কেউ হাসে? কিংবা কিসের জন্য ধন্যবাদ নার্সের প্রাপ্য। আমার মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব এসেছিল, ধন্যবাদ না বলে আমার উপায় ছিল না।

বাইরে বেরিয়েই মনে হলো, নার্সটির নাম জিজ্ঞেস করলে কেমন হতো? হাসপাতালে এইটুকু কাজের জন্য এসে কেউ নার্সের নাম জিজ্ঞেস করে না। যদিও নার্স আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন...কারণ সেই নাম আমার রক্তভরা টিউবের ওপরের লেবেলে লিখতে হবে। হাসপাতালটা একটু অদ্ভুত জায়গা, এখানে একপক্ষ শুধু নাম জিজ্ঞেস করে। সভ্য সমাজের নিয়ম কিন্তু অন্যরকম।

বাইরে বেরিয়ে এসে শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছিল। শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে যাবার জন্য নয়—এরকম হাল্কা ভালোলাগা আমি আগেও অনেকবার

বোধ করেছি। তাহলে শুধু রক্ত বিয়োগ নয়, আঙুলের তলাতেও খানিকটা ভালোলাগা আছে! নার্সকে নিশ্চিত ধন্যবাদ।

এখন মুস্কিল হলো, এই এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা। কাছাকাছি কোনো বন্ধুর বাড়িও নেই। দারুণ রোদ্দুর, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার কোনো মানে হয় না। অগত্যা হাসপাতালের মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কম্পাউণ্ড বেশ বড়ো।

আমি পারতপক্ষে হাসপাতালে আসি না। নিকট আত্মীয়দের অসুখ-বিসুখেও আসা হয় না। অথচ এখন একজনও চেনা কেউ রুগী হয়ে নেই, তাহলে এই ফাঁকে বেশ একটা কর্তব্য করে নেওয়া যেত।

হঠাৎ খুব ইচ্ছে হলো, অচেনা কোনো রুগীর পাশে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিই। তাকে খুব আন্তরিক ভাবে সান্ত্বনা জানাই। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যেমন অচেনা অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যেও পিণ্ড অর্পণ করতে হয়, তেমনি, নিজের চিকিৎসার সময় অন্য অচেনা কারুর রোগ মুক্তির জন্যও প্রার্থনা করা উচিত বোধহয়। সেই মুহূর্তে, আমার অদেখা অচেনা কোনো মুমূর্ষু রোগীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললুম, তুমি ভালো হয়ে ওঠো—তুমিও আমার সঙ্গে বেঁচে থেকে এই পৃথিবীকে দেখো।

ক্যান্টিনে বেশ ভিড়। ডাক্তারি ছাত্ররা সেখানে খুব রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। বেশিক্ষণ বসা যায় না, পনেরো মিনিটের বেশি সময় কাটানো গেল না।

এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলুম। লাল রঙের বাড়িগুলির মাঝে মাঝে ফুলবাগানও আছে। কিন্তু সর্বত্র ডেটলের গন্ধ। ফুলের গন্ধেও ডেটলের গন্ধ। রাস্তাগুলো খোলা ব্যাণ্ডেজের মতন। খারাপ লাগছিল না। অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। হাসপাতালে শুধু তো আর অসুস্থরাই আসে না।

এই সময় একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়ল। প্রধান বাড়িটার পাশে একটা সরু মতন গলি, সেখানে দেওয়ালের গায়ে লেখা, 'মোরনার্স কর্ণার'—শোকার্ত আত্মীয়দের বিশ্রামগৃহ।

হাসপাতালে এরকম কোনো জায়গার অস্তিত্ব তো জানতুম না। শুনিওনি কখনো। অবশ্য, হাসপাতালে এসে শোকপ্রকাশ করার সুযোগও কখনো আমার আসেনি।

যাই হোক, ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো লাগল। বাংলা অনুবাদটা বিচ্ছিরি হলেও ইংরেজি শব্দ দুটোর মধ্যে ঝঙ্কার আছে। এই হাসপাতালটা এক সময় সাহেবদের ছিল।

আমি কারুর জন্য শোক করতে চাইনি, নিজের জন্যও নয়, এবং আমি

অপরের সুখ প্রার্থনা করছিলুম। তবু ইচ্ছে হলো একবার ঐ জায়গাটা দেখে আসি। অবশ্য কেউ বোধহয় ওখানে নেই, সকালবেলা শোকের সময় নয়। এখানে কেউ না থাকলেই ভালো, শোকের ঘরে বসে মনের সুখে একা একা সিগারেট টানা যাবে। মনে হয়, সারা হাসপাতালে এই একমাত্র নিরিবিলি জায়গা।

ঢুকে দেখলুম, ফাঁকা ঘরটিতে একমাত্র মানুষ বসে আছে। বিশাল দীর্ঘ চেহারার প্রৌঢ়, হাতের ওপর কপাল রেখে মুখ নীচু করা, হঠাৎ মনে হয় ঘুমন্ত। কিন্তু শরীরটা মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। ভদ্রলোক একা একা বসে কাঁদছেন নাকি? এত বড়ো চেহারার একজন পুরুষমানুষের কান্না দেখলে কি রকম অস্বাভাবিক লাগে—তাও একা একা। নিঃশব্দ কান্না আবার বেশি করুণ। ভদ্রলোকের কি বাড়ি-ঘর নেই? সেখানে বসে কাঁদলেই তো পারতেন।

আমি একটু দূরে বসে সিগারেট ধরালুম। বোধহয় আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক হয়তো আমাকে দেখলে লজ্জা পাবেন। কিন্তু আমারও যে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

একটু বাদে ভদ্রলোক মুখ তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে। কোনো কথা বলছেন না। সুতরাং আমিই বললাম, আপনার কেউ মারা গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, না, কেউ মারা যায়নি। ঠিক আছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি সমস্ত মুখমণ্ডল মুছলেন। মোছার পরেও আবার চোখে জল এল। আবার মুছলেন।

আমি সরল ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর গুরুতর অসুখ?

—না কারুর অসুখ নয়। ঠিক আছে।

—অসুখ নয়। মানে, আপনি—

—বললাম তো, ঠিক আছে। কিছু হয়নি। কিছু হয়নি!

আমি থতমত খেয়ে বললুম, আপনাকে বিরক্ত করলুম, মাপ করবেন! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন, না না ঠিক আছে। তুমি এখানে এসেছ কেন ভাই—তোমার কেউ মারা গেছে?

—মানে, আমার এখন কিছুই করার নেই। তাই এখানটায় নিরিবিলি।

—কিছু করার নেই তো হাসপাতালে কেন?

—এমনিই, মানে একটু দরকারে।

—এমনি এমনি কেউ হাসপাতালে আসে না। আমি আজ এই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।

—আপনার কি হয়েছিল।

—খুব কঠিন অসুখ। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। তবু হঠাৎ বেঁচে গেলাম!

—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

—তাই তো মনে হয়। অথচ আমি হাসপাতালে এসেছিলাম মরতেই।

—সে কি! আমি তো হাসপাতালে এসেছি ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য। সবাই তো সেইজন্যই আসে!

—তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা, বাবা, ভাই, বোন—

—বন্ধু-টন্ধুও আছে নিশ্চয়ই।

—তাও আছে।

—আমার কেউ নেই।

—সেইজনাই আপনি মরতে চান? তাহলে তো আত্মহত্যা করলেই পারতেন। শুধু শুধু এতগুলো ডাক্তার আর নার্সদের পরিশ্রম করালেন কেন?

—আত্মহত্যা করার মতন মনের জোর আমার নেই। অসুখ হবার পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। কোনো ডাক্তার আশা দেয়নি। ভেবেছিলাম এমনি এমনিই মরে যাব। হঠাৎ বেঁচে গেলাম, ছাড়া পেয়ে গেলাম আজকে। হাসপাতাল থেকে যখন বেরুচ্ছি, তখন এই ঘরটা চোখে পড়ল। এই ঘরটা চুম্বকের মতন আমাকে টানল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি মরে গেলে আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই। আমি মরে গেলে একজন মানুষও চোখের জল ফেলবে না।

—সেইজন্যই আপনি নিজের জন্য—

ভদ্রলোকের চোখে আবার জল এসে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এক ঘণ্টা কি হয়ে গেছে? লোকটির হাতে ঘড়ি নেই—উনি সময়ের খবর রাখেন না। ওঁর দুঃখ আমি বুঝতে পারব না।

ফিরে এসে সেই নার্সটিকে আর দেখতে পেলাম না। কারুকে যে ওঁর কথা জিজ্ঞেস করব—তারও উপায় নেই, কারণ ওঁর নাম জানি না। একে ওকে জিজ্ঞেস করেও কোনো হদিশ পেলাম না। অথচ আমার রক্তের রিপোর্ট পাওয়া দরকার।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি সেই নাম না-জানা নার্সকে খুঁজে বেড়ালুম। কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করি না, চোখ দিয়ে খুঁজি। খানিকটা বাদে দেখতে পেলাম, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছেন।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমারটা কি হলো?

নার্সটি ভুরু কুঁচকে বলল, আপনার আবার কি?

আশ্চর্য ব্যাপার, নার্সটি আমাকে এরই মধ্যে ভুলে গেছে। অত কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, উনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন—এক ঘণ্টার

মধ্যে সব ভুল।

—আমার রক্ত?

—আপনার নাম?

আমি নাম বললাম। নার্সটির মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসি মুখে বললেন, আপনার রক্তে কিছু পাওয়া যায়নি। রিপোর্ট খুব ভালো।

এই মেয়েটি শুধু রক্তের ব্যাপারে আগ্রহী, মানুষ সম্পর্কে কোনো উৎসাহ নেই।

১২

আমার বন্ধু তপনের ছিল বদলির চাকরি। ছ'মাস এক বছর পরপরই তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো। ব্যাপারটা তার পক্ষে যতই বিরক্তিকর হোক, আমার কাছে ছিল খুব আনন্দের। সে নতুন জায়গায় বদলি হলেই আমি তার কাছে বেড়াতে যেতাম। আমি তো তখন চাকরি করিই না, অদূর ভবিষ্যতে কখনো চাকরি করব—সে রকম সম্ভাবনাও নেই। অথচ তপন আমার বয়েসী হয়েও মাসের গোড়ায় এক তাড়া টাকা পায়, বেয়ারা দরোয়ানরা তাকে 'সার' বলে ডাকে ও সেলাম করে—এটা ছিল আমার কাছে একটা ঈর্ষার ব্যাপার। মা-বাবার থেকে দূরে একা একটা কোয়ার্টারে থাকা, বাবুর্চির রান্না ইচ্ছে মতন যা-খুশি খাওয়ার সুযোগ--এগুলোও আমার কাছে রোমাঞ্চকর।

একবার তপন বদলি হলো ডালটনগঞ্জে। ও সেখানে কোয়ার্টারে গুছিয়ে বসার এক মাসের মধ্যেই আমি হাজির হলুম। নাম শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, ডালটনগঞ্জ বুঝি একটা খুব জমজমাট সাহেবী কায়দার শহর। গিয়ে দেখি একটা ধুলোয় ভরা ছোট্ট জায়গা, শহর না বললেও চলে। তবুও যখন সারাদিনের পর ভারী হয়ে সন্ধে নামে, সিল্কের কাপড়ের মতন হাওয়া এসে গায়ে লাগে, মাথার ওপর ফটফটে নীল আকাশ অসংখ্য তারায় ভরে যায়—তখন এক ধরনের মাদকতা আসে শরীরে। তপন সারাদিন অফিস করে, আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ি. তারপর সন্ধের দিকে চা-টা খেয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোই এক সঙ্গে। ধুলোর রাস্তা পেরিয়ে আদালত জেলখানা পেছনে ফেলে, নাম-ভুলে গেছি-কি-যেন নদীর পাড় দিয়ে অনেক দূর চলে যাই—তপন অনুযোগ করে, ধুৎ এই চাকরি আর পোষায় না, [illegible] ঠিক নেই। আমি মনে মনে বলি, ইস, আমাকে যদি [illegible] খুব ভালো লাগত!

সেবার তপনকে একটু গম্ভীর দেখলাম। অন্যবার আমাকে পেয়ে ও দারুণ খুশি হয়ে ওঠে, চতুর্দিকে চাকর বেয়ারা পাঠিয়ে নানা রকম মাছ মাংস আনায়, সারা রাত ধরে গল্প করে। কিন্তু সেবার যেন সব কিছুই একটু চাপা। দু'এক দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেললাম, তপন প্রেমে পড়েছে। শুধু চাকরি নয়, প্রেমের ব্যাপারেও তপন আমার থেকে এগিয়ে গেল। এতে প্রথমটায় আমি একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাব কাটিয়ে উঠলুম। সেই বয়েসে একটা সবজান্তা ভাব থাকে। যে কখনো একটি অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলেনি সেও অপরের প্রেমে পরামর্শ দিতে ছাড়ে না। আমার যদিও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু আমি তপনকে বললাম, তোর প্রব্লেমটা কি, বল না।

বহুকাল থেকেই প্রবাসী বাঙালি একটি পরিবার, মেয়েটির নাম শান্তা, রাচী কলেজে পড়াশুনো করে, ছুটিতে এসেছে। তপনের এক পিসতুতো ভাইয়ের শালিকার সঙ্গে শান্তার দাদার বিয়ে হয়েছে, সেই সূত্র ধরে তপন গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ক্রমে প্রগাঢ় আলাপ, তপন ও বাড়িতে প্রায়ই নেমন্তন্ন পায়। দূর থেকে দেখলাম একদিন শান্তাকে, ভারী নরম আর স্নিগ্ধ চেহারা মেয়েটির, ওকে দেখলেই কমনীয়তা শব্দটি মনে পড়ে।

তপনের সমস্যা হচ্ছে এই, কিছুতেই ও শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। ওদের বাড়ি ভর্তি লোকজন, তপনের সঙ্গে তাঁরা খুব আন্তরিক ব্যবহার করেন, তপন গেলেই সবাই মিলে গল্প করতে বসেন। সকলের অত স্নেহ ভালবাসা, তবু মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত মানুষের মতন তপন শান্তার একটি কথা শোনার জন্য চেয়ে থাকে।

তপন আমাকে নিয়ে গেল শান্তাদের বাড়িতে। ওরা সবাই বহুকাল ধরে বিহারে রয়েছেন, আর আমি কলকাতার ছেলে, আমার কথাই আলাদা। আমি কলকাতার সব নতুন সিনেমা থিয়েটারের কথা জানি, উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের সঙ্গে আমার প্রায়ই পথে ঘাটে দেখা হয়। বাসে পকেটমার ধরা পড়লে লোকে কি রকম মারে, কলকাতার কলেজে অধ্যাপকরা কি রকম নাকানিচোবানি খান—এ সবই আমার জানা, রহস্যময় কলকাতার সবই আমার নখদর্পণে। সুতরাং সে বাড়িতে আমিই শুধু বক্তা বাকি সবাই শ্রোতা। দু'তিন দিন বাদেই আমি শান্তাকে নিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলুম। ওর অভিভাবকরা অসঙ্কোচে সম্মতি দিলেন।

সেই একটা বয়েস, যখন প্রত্যেকটা মেয়েই চুম্বকের মতন টানে। কারণ বুঝি না, সার্থকতা বুঝি না, তবু কোনো চলন্ত ট্রেনে কিংবা কোনো অলিন্দে কোনো একটি মেয়েকে এক পলকের দেখার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করে। আবার সেই বয়সেই বন্ধুত্বের মূল্য থাকে চরম। শান্তা এমন সুন্দর মেয়ে, কিন্তু তার প্রতি

আমার সামান্যতম দুর্বলতাও জন্মাল না। তখন তপনের জন্য আমি যে কোনো সময় প্রাণ দিতেও রাজী ছিলুম। শান্তা সেজেগুজে বেড়াতে বেরুবে, সেই সময় তার ছোট ভাই মণ্টু বলল আমিও যাব। শান্তার ছোট বোন কেয়া বলল আমিও। না বলা যায় না, ওদেরও সঙ্গে নিতে হলো।

তাতেই সব মাটি হবার উপক্রম, মণ্টুর বয়েস নয়, কেয়ার বয়েস এগারো, ওদের দুজনেরই বুক ভর্তি অসংখ্য প্রশ্ন। তপন শান্তার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ পাবে কি, আমাদের তিনজনকে ঘিরে ধরে মণ্টু আর কেয়া কলকল করে অজস্র কথা বলে যেতে লাগল। এক মুহূর্তেরও বিরতি নেই। তপন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল ঘন ঘন। শান্তা খুব লাজুক, সে প্রায় কোনো কথাই বলছে না। তপনের মনের অবস্থা তো বোঝাই যায়, আমারও এমন রাগ হতে লাগল ঐ ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর, যে ইচ্ছে হলো ঠাশ ঠাশ করে চড়িয়ে দিই। বিচ্ছু কোথাকাব—এই সব বাচ্চাদের কাছে বেশিক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যেতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম সেই নাম ভুলে যাওয়া নদীর ধারে। কয়েকটা বড়ো বড়ো পাথর পড়েছিল, সেখানে বসলাম, মণ্টু আব কেয়া আমাদের অনবরত জ্বালাতন করতে লাগল—কলকাতা শহরটা এখান থেকে ঠিক কোন দিকে—সেই প্রশ্ন নিয়ে। তপন আর একবার আমার দিকে মিনতি পূর্ণ চোখে তাকাতেই আমি উঠে পড়লুম, কণ্ঠস্বরে অতিকষ্টে জোর-করা মিষ্টত্ব ফুটিয়ে বললুম, মণ্টু কেয়া, এসো তো এই নদীটা কোথা থেকে এসেছে, আমরা দেখে আসি।

—সে তো অনেক দূরে!

—যত দূরেই হোক না, আমরা খুঁজে বাব করব।

—শেষ পর্যন্ত যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই!

—দিদি আর তপনদা?

—ওরা থাক। ওরা অতদূর যেতে পারবে না।

মণ্টু আর কেয়া লাফিয়ে ছুটে এল আমার সঙ্গে। মণ্টু পরেছে সাদা হাফ সার্ট আর সাদা হাফ প্যাণ্ট, পায়ে কেডসের জুতা। কেয়ার গায়ে একটা হলদে-কালোয় ডোরাকাটা ফ্রক। দুদিক থেকে ওরা আমার দু'হাত ধরল, তপনের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আমি ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওদের কথার কলকলানিতে আমি শুধু হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছি, আসলে রাগে আমার গা জ্বলছে। তপনের জন্য আমি সব কিছুই করতে রাজী ছিলাম কিন্তু এইরকম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার—দুটি টকিং মেশিনের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা ভাবিনি। উরে বাপস,

কানে তালা লাগিয়ে দিল একেবারে! তখন আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স, তখন নিজের সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে ছাড়া কমবয়েসী বাচ্চাদের মানুষ বলেই গণ্য করি না, বিশেষত যে বাচ্চারা চুপচাপ থাকতে জানে না, তাদের একেবারেই সহ্য হয় না। আমি চরম ধৈর্যের সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যেতে লাগলাম হনহন করে।

তবু সেইদিন আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলেই এই ঘটনাটা লেখা। প্রথমে কিছুক্ষণ আমি ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনে শুধু হুঁ-হাঁ করছিলুম। খানিকটা বাদে বাধ্য হয়েই শুনতে হলো। আস্তে আস্তে আমি টের পেলুম, ছেলেমেয়ে দুটি বিষম সরল। বরাবর ডালটনগঞ্জেই আছে, বড়ো শহর বলতে জীবনে শুধু দু-একবার রাঁচী দেখেছে, কলকাতা ওদের কাছে স্বর্গের মতন অলীক। ওদের সারল্য মানে বোকামি নয়, দুজনেরই বেশ বুদ্ধি আছে, কথা শুনলে বোঝা যায়। আমি টের পেলুম, এমন সুন্দর সরল আমি আগে কখনো দেখিনি। ওরা সত্যিই বিশ্বাস করেছে আমরা সত্যিই নদীর শেষ পর্যন্ত যাব, দূরে কোথাও একটা পাহাড় আছে, আমরা তার চূড়ায় উঠব, হয়ত সেখানে আমরা পথ হারিয়ে ফেলব--তখন ধ্রুবতারা দেখে দিক ঠিক করতে হবে। মহা উৎসাহে ওরা কয়েক কদম দৌড়ে যাচ্ছে, কখনো হোঁচট খেয়ে পড়ছে বালিতে, আনন্দে গড়াগড়ি দিয়ে আবার লাফিয়ে উঠে বালি ঝেড়ে ফেলছে। অনেক দূরে চলে এসেছি, আস্তে আস্তে আমি ওদের মধ্যে কখন মিশে গেলুম, নিজেও টের পাইনি। ওদের দিকে চেয়ে একবার যেন আমার লুপ্ত শৈশবের কথা ভেবে বুক মুচড়ে উঠল। তখন আর শান্তার কথা একেবারেই ভুলে গেলুম।

সেদিকে কোনো জনবসতি নেই, নদীর দু'ধারে জনাই আর সর্ষের খেত, আস্তে আস্তে আলো ম্লান হয়ে আসছে। আমার মনে হলো, এখানে আর কেউ দেখার নেই, এখানে আমি ইচ্ছে করলেই নিজের শৈশবে ফিরে যেতে পারি। আমি ছুটতে লাগলুম ওদের সঙ্গে, শূন্যে লাফ দিয়ে ইচ্ছে করেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম বালিতে, ওদের খলখল হাস্যের সঙ্গে আমার কণ্ঠ মিলে গেল। মুখে মুখে গল্প বানাতে লাগলুম আমরা, আমার নিজেরও যেন বিশ্বাস হয়ে গেল, সত্যিই আমরা নদীর শেষ দেখতে যাব। একটা আস শ্যাওড়ার ডাল দু'টুকরো করে ভেঙে নিয়ে তরোয়ালের মতন বাগিয়ে ধরলুম আমি আর মণ্টু, কেয়া যেন রাজকন্যা, যদি কোনো দৈত্য আসে তাহলে আমরা এইরকম ভাবে লড়াই করব—এই বলে সেই হাওয়ার মধ্যে অদৃশ্য দৈত্যের বিরুদ্ধে শপাশপ করে তলোয়ার ঘোরাতে লাগলুম।

সেইদিন কিছুক্ষণের জন্য নিজের শৈশবে ফিরে গিয়ে আমি তীব্র আনন্দ পেয়েছিলাম। সেইদিনই বুঝেছি, প্রেম কিংবা বন্ধুত্বের চেয়েও সরলতার সান্নিধ্যে যে আনন্দ, তা আরো অনেক বেশি গভীর।

১৩

শীতকালের কয়েকটা মাসও যদি মুখ গোমড়া করে থাকতে হয়, তা হলে আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। সারা বছরে এই তো দু-তিনটে মাস সকলে মিলে একটু এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে থাকি, বাইরে বেরুলেও বৃষ্টি বাদলার ঝামেলা নেই। বাজারে সজীব টাটকা তরিতরকারি ওঠে, স্বাস্থ্যবান ফুলকপি বাঁধাকপি দোকানে দোকানে ঝলমল করে, মাছের দোকানে পচা গন্ধ পাওয়া যায় না। অন্যান্য বছর দেখেছি, এই সময়টায় অন্তত ব্যবসায়ীদের শুভেচ্ছার মুখে ছাই দিয়ে সব জিনিসপত্রেরই দাম কমে। রেশন ব্যবস্থার দশা যাই হোক, চাল পাওয়া যায়। রাস্তায় রাস্তায় রঙীন পোশাকে শহরের রূপটা বদলে যায়। খেলার মাঠে ভিড় হয়। লোকে কখনো কখনো হাসে।

কিন্তু এবার কি হলো? প্রকৃতি ও সমাজ এবার খেলার নিয়ম বদলে ফেলল কেন? শীত আসবে আসবে করেও পুরোপুরি আসছে না। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। বর্ষাকাল শেষ হবার পরও যখন তখন বৃষ্টি। ক্যালেণ্ডারে ডিসেম্বর মাস অথচ সারা দিন আকাশে রোদ নেই, এরকম দেখিনি বহুদিন।

প্রত্যেকবারই দেখেছি, গ্রীষ্মকালে যা কিছু আন্দোলন আর ধর্মঘট আর মিছিল শুরু হয়। যত গরম বাড়ে, তত বাড়তে থাকে দাবিদাওয়া। হরতাল ডাকা হয় বর্ষাকালে। সরকার এবং বিরোধী পক্ষগুলি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আকুলি-বিকুলি করার জন্য দারুণ প্রতিযোগিতায় মাতে। এই ফাকে ব্যবসায়ীরা মনের আনন্দে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। তারপর পুজোর কিছুদিন আগে পর্যন্ত বোনাসের দাবি নিয়ে খুব হৈ হৈ চলে। পাড়ার ছেলেরা চাঁদার জন্য জুলুম চালিয়ে যায়। তারপর পুজো একবার এসে পড়লে সব পক্ষেই সাময়িক যুদ্ধবিরতি। আস্তে আস্তে আকাশ নীল হয়ে আসে, বাতাসে মিহিন শিরশিরে ভাব আসে, তোরঙ্গ আলমারি থেকে বেরুতে শুরু করে ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা গরম জামা। শীতকালটাই উপভোগের সময়।

এবার বর্ষাকালটা সুদীর্ঘ হয়ে আচ্ছন্ন করে দিল শরৎ ও হেমন্ত। শীতের সময়েও তার হামলা চলছে। জিনিসপত্রের দাম এবার যেন কমবেই না ঠিক করেছে। এবার শুধু ব্যবসায়ীরাই জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন না, সরকারও প্রতিযোগিতায় মেতেছেন। প্রথমে পেট্রোল, তারপর বাস ভাড়া—আরো অনেক কিছু আসছে।

কিন্তু এ-সবই কি শীতকালটায় করার দরকার ছিল? মার্চ মাসে বাজেটের আগে সব কিছুরই দাম বাড়ে, তখনকার জন্য এই সব জমা রাখলে চলত না? এই শীতকালেই আবার একদিন হরতাল হয়ে গেল।

আমি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, আর দেখতে পাই কোথাও মানুষের মুখে হাসি নেই। ঠিক গ্রীষ্মকালের মতনই বিরক্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখ। কে কখন বাড়ি ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন গাড়িবারান্দা বা শেডের তলায় দাঁড়িয়ে আছে গোছা গোছা বিষণ্ন মানুষ। এরকম অভিশপ্ত শীতকাল আগে কখনো দেখিনি।

বাজারে সাধারণত সব জিনিসই আমি চেনাশুনো নির্দিষ্ট দোকানীর কাছ থেকে কিনি। বাড়ির বেকার ছেলে হিসেবে আমাকে নিয়মিতই বাজারে যেতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই বাজারে যাওয়া পছন্দ করে না, অনেকে বাজারের ভেতরটা কি রকম দেখতে হয় তাও চোখে দেখেনি, কিন্তু আমার তো সে উপায় নেই। একদিন একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাজারের মধ্যে দেখা, সে আমাকে দেখে আগেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, আমি ফার্ন রোডে যাব তাই বাজারের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করছি, আমি বাজারে আসিনি। আমি তাকে হেসে বলেছিলাম, আমি কিন্তু বাজার করতেই এসেছি।

যাই হোক, বহু বছর ধরে বাজার করার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, চেনা লোকের কাছ থেকে কিনলে কম ঠকতে হয়। বাজারে গিয়ে শস্তায় জিনিস কেনাই আসল কথা নয়, ভালো জিনিস খুঁজে বার করাই কঠিন। দোকানদাররা চেনা লোককে ওই ব্যাপারে ঠকায় না।

তরকারির দোকানদারের কাছাকাছি আসতেই দোকানী উৎসাহিত হয়ে বলল, 'এই যে বাবু আসুন, আসুন!'

শীতকালের উপযোগী প্রকৃত স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী বেগুন ও টমাটোর ওপর হাত রেখে সে বলল, এই দেখুন, ভালো ভালো জিনিস আছে।

আমি বললাম, কিন্তু দাম তো সেই গত সপ্তাহের মতন দু' টাকাই আছে?

সে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল।

আমি তার চোখে চোখ ফেলতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই আমার চোখের দিকে তাকাবে না। একেই বোধ হয় চক্ষুলজ্জা বলে। আর কোনো কথা না বলে ওর কাছ থেকে জিনিস কিনে চলে এলাম।

এই সময় ভালো নারকোল ওঠে। নারকোল কিনি এক রমণীর কাছ থেকে। এই স্থূলকায় হাসিখুশি রমণীটির সঙ্গে দরদাম করে কিছুক্ষণ সময় বেশ ভালোই কাটে। এই দরাদরির ব্যাপারটা অনেকটা খেলার মতন; কারণ শেষ পর্যন্ত সে তার দামে ঠিকই এঁটে থাকবে এবং জিনিসটা ভালো দেবে। ওর কাছ থেকে আমি কোনোদিন হালকা নারকোল পাইনি।

নারীটি আমাকে বললে, কই আজ নারকোল নেবেন না?

দুটি নারকোল সে তুলে ধরল। এবং নিজেই জানাল, এর মধ্যে একটি নারকোল এখনো নরম আছে, কাঁচা খাওয়ার পক্ষে অতি উপাদেয়।

—কত করে জোড়া?

সে হেসে বলল, ছ' টাকার এক পয়সার কম নয়।

হাসি শুনেই বুঝলাম, এটা আসল দাম নয়। ঠাট্টা। নারীটি হাসতে ভালোবাসে, সে এইভাবে রসিকতা করছে। বাজারে যারা দোকান সাজিয়ে বসেছে, তারা যে সবাই শুধু নীরস কেনাবেচা করতে চায়, তাই-ই নয়। অনেকেরই হাস্য-পরিহাস বোধ আছে।

আমি নারকোল-নারীকে বললাম, আমি ওসব শুনতে চাই না। গত বছর শীতকালে নারকোলের জোড়া কত ছিল?

হাসি মুছে গেল তার মুখ থেকে। তার বদলে ফুটে উঠল রাগ। অনেকের দুঃখের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় রাগে। সে প্রায় মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, সেসব দিনকাল কি আর আছে? গত বছর সব জিনিসই শস্তা ছিল।

কোনো বছরেই লোকে মনে করে না যে তারা খুব সুখে আছে। সব সময়ই মনে হয়, আগের বছরটা তবু ভালো ছিল। গত বছরেও লোকে জিনিসপত্র কোনো স্বর্গরাজ্যের দামে পায়নি। কিন্তু এবছর দুর্দশাটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

জেরা করে ঐ নারীর কাছ থেকে জানা গেল যে, গত বছর ঐ নারকোলের জোড়া ছিল আড়াই টাকা। এবছর চার টাকার কমে কিছুতেই নয়। তবে আমাকে সে কেনা দামে সাড়ে তিন টাকায় দিতে পারে।

এরপর থেকে সে একবারও হাসল না।

এরপর গেলাম মাছওয়ালার কাছে। দু' তিনজন অল্পবয়েসী ছেলে সব সময় হৈ হৈ করে। আমাকে দেখেই ডাকাডাকি করতে লাগল যথারীতি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি, পোনামাছ সেই বারো টাকাই তো?

ছোকরা কয়েকটি ঠোঁট উল্টে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল। তারপর বলল, আজ চোদ্দ টাকা উঠেছে।

বেশি দামে জিনিস বিক্রি করায় এরা কেউ খুশি নয়। কালোবাজারী কিংবা অসাধু ব্যবসায়ী যাদের কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, তাদের কিন্তু আমরা চিনি না, কখনো চোখে দেখিনি। যাদের আমরা চোখে দেখি, খুচরো দোকানদার—জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য এদের কোনো উল্লাস নেই। তবু প্রত্যেক শীতকালেই এদের একটু চাঙ্গা হতে দেখি, কিছুদিনের জন্য অন্তত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো রেশারেশি থাকে না। গত বছর এই সময় আমাকে একটি আস্ত মাছ গছিয়ে দেবার জন্য এই ছেলেগুলো ঝুলোঝুলি করেছে, এবছর মুখ ফুটে কিছুই বলল না।

একজন জিজ্ঞেস করল দাদা, আজকাল আপনাকে প্রায়ই দেখি না। কেন? রোজ আসেন না?

আমি বললাম, একদিন অন্তর একদিন আসি আজকাল। জিনিসপত্রের দাম ডবল করে আমাকে কেউ কাবু করতে পারেনি।

১৪

অনেক কিছুই বদলায়, বদলায়নি শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের বিস্ময়। এবং আনন্দিত হবার ক্ষমতা। নতুন জামায় এখন সব বাচ্চাদের মুখ নতুন। আকাশের রং নীল, মেঘের রং শাদা কিংবা কালো—কিন্তু এক এক সময় মেঘ ভেঙে এমন অদ্ভুত রং বেরোয়—যার কোনো বর্ণনা হয় না। খুশি ঝলমল বাচ্চাদের মুখগুলোও এখন সেইরকম।

সকালবেলা চেয়ারে শরীর এলিয়ে টেবিলের ওপর পা দু'খানা কাঁচি করে তুলে ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। নীলনদের ওপর খুনী তরুণীর চতুরতা ও বৃদ্ধ বেলজিয়ান গোয়েন্দার আখখুটেপনায় এমন মগ্ন হয়েছিলাম যে, মনেই পড়েনি আজ পুজোর প্রথম দিন, আজ একটা বিশেষ দিন। অনেকগুলো কচি গলার কলরবে পড়ায় ব্যাঘাত হলো, বই মুড়ে রেখে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়ালাম।

চোখে অনেকগুলো রঙের ঝলক লাগল। প্রথমেই মনে হয়, বাঃ ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সত্যিই খুব উন্নতি হয়েছে। এত সুন্দর সুন্দর রঙের জামার কাপড় ও শাড়ি বেরিয়েছে এ বছর—কোয়ালিটিতেও পৃথিবীর যে-কোনো দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমরা ছেলেবেলায় একটা চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি পেয়েই খুশিতে ডগমগ হতাম, এখন কি দুর্দান্ত একটা নাইলনের গেঞ্জি পরেছে ঐ বাচ্চা ছেলেটি—সেরকম হলুদ গেঞ্জি ওকে দিলে নিশ্চয়ই ছুঁড়ে ফেলে দিত—কিন্তু আনন্দটা একরকম।

এই সকালেই স্নান-টান করে সেজেগুজে বেরিয়েছে, অথচ আমি চোখে মুখে একটু জল ছুঁইয়েছি মাত্র। টুথপেস্টের স্বাদটা মুখ থেকে তাড়াবার জন্য দু'তিন কাপ চা খেতে হয়, আবার চায়ের স্বাদ তাড়াবার জন্য সিগারেট। অন্য যে-কোনো দিনেরই মতন, পুজোর দিনটার জন্য আলাদা কোনো প্রস্তুতি নেই। এখন পুজোর দিনগুলো যত না আনন্দের, তার চেয়ে বেশি ভয়ের। বাড়ির পাশেই বারোয়ারি পুজো। যেদিন থেকে প্রথম ম্যারাপ বাঁধা শুরু হয়েছে, বাড়িতে যে-কেউ এসেই প্রথম কথা বলেছে, 'বাড়ির পাশেই পুজো, সর্বনাশ!' সর্বনাশেরই তো কথা—ভোর

থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত মাইকের বিকট চিৎকার, হিন্দী গানের উৎপাতে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।

অথচ এক সময় তো আমরাও পুজোর অনেকদিন আগে থেকে পুজোর প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, যত দিন এগিয়ে আসত ততই যেন অধীর হয়ে উঠতাম।

আমার ছেলেবেলায়—খুব বেশিদিন আগের কথা নয় যদিও, তবু তখন বারোয়ারি পুজো এত ছিল না। কলকাতার মানুষ তখনও এতটা নাগরিক হয়ে যায়নি। পুজোর সময় অর্ধেক কলকাতা ফাকা হয়ে যেত—তখন প্রায় সবারই একটা 'দেশ' ছিল, কারুর পদ্মাপারে, কারুর রংপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুর—পুজোর ক'টা দিনের জন্য গ্রামে ফিরে যেত অনেকেই। আমিও পদ্মাপারের এক ছোট্ট নিরীহ গ্রামে পুজোর পনেরো-কুড়িদিন আগে থেকে দেখতাম মূর্তি গড়া। কুমোরটুলি থেকে হঠাৎ পঞ্চমীর দিন সিংহ-অসুর সমেত আস্ত ঠাকুর নিয়ে আসা নয়—বাড়িতেই তৈরি হতো খড়ের মূর্তি—তারপর একমেটে, দোমেটে করে।

ঠাকুরদালানে দোমেটে উলঙ্গ মুণ্ডহীন মূর্তিগুলো ফাটা ফাটা হয়ে দাড়িয়ে থাকত, সকালে-বিকেলে একবার করে দেখে যেতাম আমরা। যেদিন সাদা রঙের পোচ পড়ত, বুঝতাম পুজোর আর দেরি নেই। তারপর নৌকো করে আসত হেড-কুমোর জলধর। জলধরের নৌকোটি মনে হতো এক রহস্যময় জগৎ, অন্তত পঞ্চাশ-যাটটা নারকেলের মালায় গোলা থাকত রং সেগুলো ঝুলতো নৌকোর ছইয়ে। বেঁটে কালো কুৎসিৎ চেহারা লোকটার। কিন্তু বড়ো দাম্ভিক, মূর্তির মুখ তৈরি করার সময় কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলত না। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখ হতো ছাঁচে, কিন্তু মা দুর্গার মুখখানা সে তৈরি করত নিজের হাতে। একতাল মাটি নিয়ে অনবরত দু'হাতে টিপছে আর কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। আমাদের সবারই ধারণা ছিল জলধর মন্ত্র জানে, নইলে একতাল মাটি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ওরকম অপরূপ মুখ বানিয়ে ফেলে কি করে? নারীরই মুখ, অথচ আর কোনো নারীর ওরকম মুখ হতে পারে না—কি যেন একটা অপার্থিব ব্যাপার আছে।

আমাদের আর একটা কাজ ছিল, চারটি পাঁঠাকে রোজ ঘাস খাওয়ানো। অষ্টমীর দিন দুটো আর সপ্তমী-নবমীতে একটা করে বলি দেওয়া হবে। এক মাস আগে থেকে সেগুলো কিনে রাখা হতো।

শৈশবে সবাই নিষ্ঠুর থাকে—বয়স্কদের চেয়েও শিশুরা বেশি নিষ্ঠুর, নিজের হাতে ঘাস খাওয়ানো ঐ পাঁঠাগুলোকে বলি দেবার সময় খুব তো কষ্ট হতো না! এখন কলকাতার বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে পাঁঠা বলি দেখলে সেই বীভৎস দৃশ্যে শিউরে উঠতাম। আশ্বিন মাসে খেত ভরা কচি ধানগাছ, কি ধারালো হয় ধানের

পাতা, হাত কেটে যায়, কিন্তু পাঠারা ঐ ধান খেতেই ভালোবাসে বেশি। গলায় দড়ি বেঁধে পাঠাগুলোকে নিয়ে ছুটতাম, বুড়ো তাহের আলি ডেকে উঠত, ওকি দাদাভাই, অমন করে ছোটায় না, গলায় দাগ পড়ে যাবে—ঠাকুরের পুজোয় খুঁতি পাঁঠা দিতে নেই।

এখন গম্ভীর কেজো কর্কশ বয়স্কদের জগতে চলে এসেছি। এখন আর পুজোর দিনে আমি স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে বেরুব না। পাড়ায় পাড়ায় পূজা মণ্ডপে জমে উঠছে ভিড়, ছেলেদের লাইন—মেয়েদের লাইন সামলাতে ব্যস্ত ভলানটিয়াররা, এই ভিড়ে কেউ কেউ ইচ্ছে করে হারিয়ে যাচ্ছে, ঢাকের বাজনা বাতাসের স্তর ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যায়, জ্বলে উঠবে আলোর মালা—শাড়ি ও প্রসাধনের এক দীর্ঘস্থায়ী প্রদর্শনী হবে সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত—চারদিকে একটা খুশি খুশি হাওয়া। তবে, সকালে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখে মেঘ ভাঙা আলোর মতন যে আনন্দ দেখলাম তার কোনো তুলনা নেই। শৈশবই সবচেয়ে পবিত্র আনন্দ ও বিস্ময়ের কাল। যে শৈশব আমি হারিয়েছি আর কখনো ফিরে পাব -একথা আমার মতন আরো সব বড়ো হয়ে যাওয়া মানুষদের মনে পড়ে না পুজোর দিনে?

১৫

'হ্যাঁরে, বিদেশে ভিখিরি ছিল?' মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'—কেন, আমিই তো ছিলাম।' তবে আমি একা নয়। আরো ছিল। শিকাগোর রাস্তায় যে লম্বা মতন লোকটা কানের কাছে ফিসফিস করত, ও কে?

যে-কোনো নতুন লোকেরই শিকাগো শহরে প্রথম কয়েকটা দিন ভয় ভয় করবে। এমন সব রোমাঞ্চকর গল্প শিকাগো শহরের সম্পর্কে আগে শুনেছি, বিখ্যাত গুণ্ডা আল-কাপনের জায়গা, যেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হতো। এখন অতটা হয় না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই নিরুপদ্রব পৃথিবীর কোনো বড়ো শহরই নয়, প্রায়ই মারাত্মক দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডের খবর শিকাগো থেকে আসে। সুতরাং বাক্‌সর্বস্ব এই বঙ্গ-সন্তান প্রথম কয়েকদিন ভয়ে সরু হয়ে পথ হাঁটতুম।

প্রায়ই একটা দশাসই নিগ্রো বিনয়ে নিচু হয়ে কানের কাছে গুনগুন করে কী বলত। সে পাশে পাশে আসত সাউথ ওয়াবাস্ এভিনিউর মোড় পর্যন্ত তারপর আর দু'জন তার জায়গা নিত। সেই একই রকম পাশে পাশে গুনগুন। একটি অক্ষরও বুঝতে পারতুম না, নমস্কারের ভঙ্গিতে বার বার 'থ্যাঙ্ক য়ু' 'থ্যাঙ্ক য়ু' বলে

সুট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তুম।

কী চায় ওরা বুঝতে না পেরেই অমন অস্বস্তিতে ছিলুম। বিলেত দেশটা মাটির হলেও আমেরিকা দেশটা তো সোনার। তবে, আমার মতো কাদা-মাটির দেশের মানুষের কাছে কি গূঢ় দাবি থাকতে পারে ওদের। গলির মোড়ে মোড়ে বা কফিখানায় একদল সুসজ্জিত ছোকরাকে দুপুরে জটলা করতে দেখতুম, দেখে মনে হয় বেকার। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার পঞ্চাশ গজের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিটে বিয়ারের বোতল ছোঁড়াছুড়ি করে দুই দলে রোমহর্ষক মারামারি হয়ে গেল।

একা রাস্তায় ঘুরলেই সেই ফিসফিসানিদের পাল্লায় পড়তাম। ক্ষীণ সন্দেহ হতো, পৃথিবীর সব শহরেই, বিদেশীদের নিষিদ্ধ প্রমোদ ভবনে নিয়ে যাবার জন্য এক ধরনের লোক থাকে, ওরাও কি তাই? কিন্তু, বলা বাহুল্য ওসব জায়গায় যাবার ঝুঁকি নিতে আমার মোটেই শখ ছিল না। যাই হোক, ক্রমে সবরকম উচ্চারণ যখন কানে সড়গড় হয়ে গেল, তখন আমি একটু ভরসা করে দাঁড়িয়ে সেই লম্বা লোকটার কথা শুনলুম, অত্যন্ত বিনীত সুরে সে বলছে : আ ডাইম প্লিজ!

ওঃ, মোটে একটা ডাইম! (অর্থাৎ ওখানকার দশ নয় পয়সা, আমাদের বারো আনা) ভিক্ষে চাই! তা হলে তো তুমি আমার চেনা লোক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। পকেট থেকে একটা ডাইম খসিয়ে ওরকম আনন্দ কখনো পাইনি।

সানফ্রান্সিস্কোর মতন অমন রূপসী নগরী দুনিয়ায় ক'টা আছে জানি না। অল্প শীতের দুপুরবেলা উপসাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পথে একটি দর্শনীয় চেহারার মানুষ চোখে পড়ল। অতিশয় লম্বা, বৃষস্কন্ধ শালভুজ। বয়েস সত্তরের কম না, কিন্তু কি সবল শরীর। প্রায়-সব-সাদা গোপ দাড়ি, লম্বা চুল, পোশাক দেখলে মনে হয় যেন ঐ পোশাক পরেই লোকটা রাত্তিরে শোয়। যেন একটি প্রাচীন নাবিক, হঠাৎ ক্যাপ্টেন এহাবের কথাই মনে পড়েছিল আমার। কিন্তু এহাবের মতো অহঙ্কারী সে মোটেই নয়, বরং কোলরিজের সেই বুড়ো নাবিকের মতোই সে হঠাৎ আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি ভারতীয়?

ততদিনে আমি আমেরিকার কথাবার্তার ধরন ঢের জেনে গেছি।

বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের 'ভারতীয়' নয়, খাঁটি ভারতবর্ষের ভারতীয়।

লোকটি বলল, আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম। চমৎকার দেশ। গান্ধী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তুমি কোথায় যাবে, চলো, আমিও একটু তোমার সঙ্গে হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা বলল, গান্ধীর মতন লোক হয় না, সত্যি। আমি ওর অনেক লেখা পড়েছি। গ্রেট ম্যান—তারপরই লোকটি আমার কানের কাছে মুখ

এনে নিচু গলায় বলল, তোমার কাছে একটা সিকি (কোয়ার্টার) হবে?

আমি স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকটির হাতে একটা সিকি তুলে দিলুম। লোকটি দরাজ গলায় আমাকে বলল, গড ব্লেস ইউ, মাই সান। তারপরই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল, লণ্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে যে, রাস্তায় কোনো অপরিচিত লোক যদি হঠাৎ এসে বলে যে, 'নেহরু খুব ভালো লোক' বা 'গান্ধী একজন সত্যিকারের মহাত্মা', তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে এড়িয়ে চলা উচিৎ। লোকটা নিশ্চিত কোনো মতলববাজ, কিংবা ভিখিরি।

ঐ সানফ্রান্সিস্কোতেই আর একজন মজার ভিখারির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কলম্বাস এভিনিউতে লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে এক দোকানে বসে এসপ্রেসো কফি খাচ্ছিলুম, পাশে আর একটি খোঁচাদাড়ি বুড়ো বসে খুব বকবক করছিল। সাহিত্য, জীবন, ভগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে। হঠাৎ এক সময় লোকটা হাই তুলে বলল, চারটে বাজল! বাবা!—তার পরই আমার দিকে ফিরে : তোমার কাছে খুচরো আছে?

ভাবলুম লোকটা টাকা ভাঙাতে চায়। কোটের পকেটে হাত দিয়ে বললুম, না পুরো হবে না, আমার কাছেও ডলারের নোট।

লোকটা উদার হেসে বলল, না, না, আমি আস্ত এক ডলার কারুর কাছ থেকে নিই না। ও খুচরো যা আছে, তাই দাও।

ফের্লিংগেটি বলল, ও কি হচ্ছে ডন—ছি ছি, ও একজন গরীব ভারতীয়, তাও কবি, ওর কাছ থেকে তোমার নেশার পয়সা না নিলে চলে না!

লোকটা বলল, তুমি ভারতীয়? আচ্ছা, তোমার পয়সা আমি শোধ দিয়ে দেব। ঠিক দেব, কোনো না কোনো দিন। আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।

ওকে বলা হয়নি, আমি সেদিনই ওখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মেয়ে ভিখারির দেখা পেলাম নিউইয়র্কে। গ্রীনিচ ভিলেজ থেকে ইস্ট সাইডে যেতে প্রায়ই একটি মাঝবয়েসী মেয়ে নিঃশব্দে হাত পেতে থাকত। পর পর তিন দিন তাকে আমি একটি করে নিকেল দিলাম। তাই দেখে আমার বন্ধু অ্যালেন হেসে বলল, কি, খুব মজা লাগছে বুঝি ভিক্ষে দিতে! একটা প্রতিশোধ। এত বড়োলোকের দেশেও ভিখিরি।

আমি বললুম, না, এরা তো আমার চেনা লোক। একেবারে ভিখিরি না থাকলেই বরং দেশটা একেবারে কাঠ কাঠ লাগত।

—এরা কিন্তু বেশির ভাগই নেশাখোর। না খেতে পাওয়া ভিখিরি প্র্যাকটিক্যালি এ দেশে নেই।

—সে যাই হোক, ভিক্ষে কেন করছে এটা বড়ো কথা নয়। ভিক্ষে চাইছে, এইটাই আনন্দের খবর। সবাই পরিশ্রম করবে, তার কি মানে আছে। যে হিসেবে সাধু-সন্ন্যাসীরা ভিখিরি, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। অবশ্য, আমাদের দেশে বেশির ভাগই বাধ্য-হওয়া, খেতে না পাওয়া ভিখিরি।

ঠিকই এদেশে আরো বেশি ভিখিরি থাকা উচিত ছিল। বেঁচে থাকা এখানে এত সহজ।

লণ্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে প্রায় সন্ধেবেলা বক্তৃতা হয়। নানান জায়গায় যে ইচ্ছে বক্তৃতা দেয়, পৃথিবীর হেন বিষয় নেই যা নিয়ে ফাটাফাটি হয় না রোজ। একজন লোক ছিল ভারী মজার, সারা হাতে মুখে উল্কি, ফ্যাসফেসে গলা—চুরি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই বিষয়ের ভিত্তিতে সে তার জীবনের নানান চৌর্যকর্মের বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা দেয়। একদিন মাঝপথে বক্তৃতা থামিয়ে হঠাৎ দুঃখিত গলায় বলল, আজকাল চুরির বাজার বড়ো মন্দা, যাই হোক, আসেপাশে পুলিস নেই— আপনারা ঝটপট আমাকে দু'চার পেনি করে ভিক্ষে দিন তো!

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আমাদের দেশে খুব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও, ভিক্ষের রেট খুব বাড়েনি। এখনো বুলি সেই পুরোনো, 'মা, একটা পয়সা ভিক্ষে দিন।' বড়ো জোর আধুনিক ছেলেছোকরা ভিখিরিরা দু'পয়সা চায়। বিদেশের ভিখিরিরা কিন্তু চার-আনা আট-আনার কম কথাই বলে না। এক সময় শ্যামবাজারে একটি সত্যিকারের স্টাইলিস্ট ভিখারি দেখতাম। একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ছোকরা, প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, বোধ হয় আধপাগলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে লোক নির্বাচন করে নিয়ে—সেই লোকের কাঁধে টোকা দিয়ে বলত, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে। হতচকিত কোনো লোক যদি থেমে যেত, তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলত, আপনার কাছে একটা স্পেয়ারেবল দোয়ানি হবে? আমার শর্ট পড়ে গেছে।

কি জানি ছোকরাটা বিলেত ফেরৎ কিনা! কারণ, বিলেতে অনেক ভিক্ষার্থীর মুখে 'স্পেয়ারেবল' শব্দটা শুনেছি।

প্যারিসেও দেখেছি মাটির তলায় ট্রেনের রাস্তায় হাত পেতে নিঃশব্দে বসে আছে। কেউ অথর্ব, কেউ হাত-পা কাটা। কেউ ব্যাঞ্জো বাজায়, কেউ চোখে চোখ ফেলে করুণ মিনতি করে। আর যেখানেই রিফিউজি, সেখানেই ভিখারি। প্যারিসে কিছু আছে আলজিরিয়ার রিফিউজি। একদিন দেখি, একটা ছোট্ট পার্কে ওয়াইনের বোতল সঙ্গে নিয়ে একজন কেক খাচ্ছে—আশেপাশে দু-তিনটে রিফিউজি ছোকরা-ছুকরি ঘুর ঘুর করতে লাগল। একজন শেষে বলেই ফেলল, তার নাকি ওয়াইন শর্ট পড়ে গেছে, কেক খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সুতরাং সে যদি একটু—।

রোমে একটা লোক এসে বলল, তুমি বোতাম কিনবে?

—না, ধন্যবাদ।

—ক্যালেণ্ডার কিনবে?

—না, ধন্যবাদ।

—দেন, প্লিজ হেলপ মী টেন লীরা। প্রত্যেক জায়গাতেই আমি এ-সব শুনে খুশি হয়েছি। কারণ, ওসব দেশে, এত অসংখ্য লোক আমাকে অকারণে সাহায্য করেছে।

দেশে ফেরার পরের দিন গলির মোড়ে পুরোনো বৈরাগীকে দেখতে পেলাম, খঞ্জনি বাজিয়ে আগমনী গান গাইছিল : 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা কত মা মা বলে কেঁদেছে।' আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, খোকাবাবু ভালো আছ, কদ্দিন দেখিনি। দাও, গরীবকে একটা পয়সা দাও।

পকেটে হাত দিলাম। হা-কপাল। একটাও পয়সা নেই। সত্যিই নেই।

১৬

ছেলেবেলায় আমার খুব সিনেমা দেখার ঝোঁক ছিল, এখন একেবারেই নেই। মনে আছে, কানন দেবী ও অশোককুমার অভিনীত বাংলা 'চন্দ্রশেখর' ছবিটি যখন মুক্তি পায় তখন আমি স্কুলের ছাত্র—ছ'বার না সাতবার দেখেছিলাম ঐ ছবিটা। মাঝে মাঝেই বাড়ির কাছাকাছি শ্রী বা উত্তরা হলে সাড়ে ছ' আনার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তাম। মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল দৃশ্যগুলো তবু প্রত্যেকবারই বেশ উপভোগ করতাম। অতবার দেখেছিলাম বলে এতদিন পরেও ফিল্মটি বেশ মনে আছে এবং এখন পরিণত বিচারে বুঝতে পারি, ফিল্মটি বেশ খারাপই হয়েছিল। 'চন্দ্রশেখর' যখন আমি ফিল্মে দেখি, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি পড়িনি। মূল কাহিনী থেকে ফিল্ম অনেক দূরে সরে গিয়েছিল বলে সেই সময় বেশ সোরগোল উঠেছিল (যেমন প্রায়ই ওঠে), সেই সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি পড়ার আগ্রহ হয় খুব। স্কুলের ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্রের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুপাচ্য নয়, তবু পড়েছিলাম। এবং যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলাদাভাবে জোগাড় করেছিলাম, তাই অন্য উপন্যাসগুলিও পড়তে শুরু করি, বঙ্কিমচন্দ্র আমার জীবনে এসে গেলেন।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারত যে 'চন্দ্রশেখর' জাতীয় ফিল্মগুলি মানুষকে সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করায়—এই একটা উপযোগিতা তো আছে। আমার

ক্ষেত্রে কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই গ্রন্থকীট, তখন ডিটেকটিভ ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীই বেশি পড়তাম বটে, কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে 'বড়োদের বই' পড়ার ব্যাপারেও বেশ ঝোঁক ছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অনতিবিলম্বে পড়তামই। সুতরাং এই যোগাযোগকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৈশোরের বিস্ময়কে কিছুটা আলোড়িত করা ছাড়া শিল্প হিসেবে চন্দ্রশেখর জাতীয় ছবির বিশেষ কোনো মূল্য নেই।

স্কুল পেরোবার পর সিনেমা দেখা আস্তে আস্তে কমে আসে, কিন্তু একেবারে বাদ দিইনি। বাংলা ছবি দেখতাম বেছে বেছে, ইংরেজি সিনেমার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ দিনেই ছুটে গিয়ে লরেন্স অলিভিয়ের অভিনীত ও পরিচালিত 'হ্যামলেট' দেখেছিলাম— অনতিবিলম্বেই এ ছবিটা তিনবার দেখা হয়ে যায়— তখন কোনো বাংলা ছবি একাধিকবার দেখার কথা চিন্তাই করতে পারি না —নেহাৎ কোনো নারী অনুরোধ না করলে— সেরকম অনুরোধও যে বিশেষ পাইনি, বলাই বাহুল্য। বাংলা ফিল্মের চেয়ে ইংরেজি ফিল্মের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশই বাড়তে থাকে, বাংলার নায়ক-নায়িকাদের বদলে বিদেশী নায়ক-নায়িকারা মন অধিকার করে নেয়— অরসন ওয়েলস, রোনাল্ড কোলম্যান, জেমস মেসান, মনটগোমারি ক্লিফট প্রভৃতি অভিনেতাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি না জানলে আশ মিটত না। বেশ কয়েক বছর আমি ইনগ্রিড বার্গমান ও আড্রে হেপবর্ন-এর প্রেমিক ছিলাম, গ্রেস কেলী যখন ফিল্ম ছেড়ে এক রাজকুমারকে বিয়ে করে প্রিন্সেস গ্রেস হলেন তখন মনে গভীর দুঃখ পেয়েছিলাম। বাংলা ছবি তখন যা দেখি, তার অধিকাংশই সাহিত্য থেকে তৈরি করা ফিল্ম। বাংলায় শুধু ফিল্মের জন্যেই তৈরি করা যেসব গল্প, তা এমনই গোঁজামিলে ভর্তি যে বেশিক্ষণ সীটে বসে দেখা যায় না। সেসব গল্পে বিয়ের রাত্রে বাসরঘর থেকে বৌ পালিয়ে যায়, অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পায় ক্লাইম্যাক্স সীনে, স্মৃতিশক্তি নষ্ট ও ফিরে পাওয়াও পূর্ববৎ, নায়িকার বাবার ড্রেসিং গাউন পরা বাধ্যতামূলক ইত্যাদি। মানুষের জীবনে এরকম উদ্ভট ব্যাপার ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার যথাযথ পটভূমিকা না থাকলে কিংবা শুধু কাহিনীর প্রয়োজনে এসব ঘটনা আনলে গা রি রি করে। বাংলা সিনেমায় সাহিত্য থেকে নেওয়া কাহিনীগুলিতে তবু মানবিক সম্পর্ক বা কাহিনীর গতিতে খানিকটা স্বাভাবিকতা থাকে। একটু রুচিবান দর্শকের কাছে শতকরা নিরানব্বইটি ইংরেজি-মার্কিনী ছবি শিল্প হিসেবে কিছু না— তবু সেখানে কাহিনী বা চরিত্রগুলির ব্যবহারে মোটামুটি সঙ্গতি পাওয়া যায়। মানুষের প্রবৃত্তির রহস্যেরও ইঙ্গিত থাকে— এমন কি সিনেমার জন্যই তৈরি করা গল্পেও।

যে-আমি কোনো সময়ে সমস্ত বাংলা ছবি দেখতাম, কোনো কোনো বই

একাধিকবার, সেই আমিই যে এখন বাংলা বই প্রায় দেখিই না, এর কারণ কি? আমার সময়াভাব নয়। ফিল্ম সম্পর্কে আমার অনাসক্তিও জন্মায়নি। আমি বা আমার মতন এরকম আরো অনেকের, অনেকের মুখেই এরকম শুনেছি। তাহলে বাংলা ছবি কি আগেকার চেয়ে এখন আরো খারাপ হয়ে গেছে? আমি তা বিশ্বাস করি না। অনেক প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধকে হা-হুতাশ করে বলতে শুনেছি, তাঁদের কালে বাংলা ছবি কত ভালো ছিল, এখন আর সেরকমটি নেই। সেই কাননবালার মতন নায়িকা একালে কি একজনও আছে? কিংবা দুর্গাদাসের মতন নায়ক? আমরা অবশ্য সেকালের কিছু কিছু ছবি দেখেছি, সেসব ছবিকে একালের ছবির চেয়ে কোনোক্রমেই উৎকৃষ্ট বলা যায় না। কানন দেবী আর সুচিত্রা সেন-এর অভিনয় রীতি সম্পূর্ণ আলাদা, কেউ কারুর থেকে কম ভালো অভিনেত্রী একথা বলা যায় না। তবু যে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা হা-হুতাশ করেন, যেমন তাঁরা বলেন সেকালে যেরকম ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত, একালে তেমন কিছুই পাওযা যায় না—সেকালের সাহিত্য এখনকার চেযে কত উন্নত ছিল ইত্যাদি—এসবই হচ্ছে যৌবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস। যৌবনে অনেক কিছুই ভালোলাগার জন্য মন প্রস্তুত থাকে। জীবনসায়াহ্নে খুবই উপভোগ্য হয় সেই যৌবন-রোমন্থনের আমেজ। সমসাময়িক কিছু আর পছন্দ হয় না। বাংলা সিনেমার প্রথম যুগে—যখন এই শিল্পটি থেকে নতুনত্বের চমক বিচ্ছুরিত হচ্ছে—হয়তো আমাদের দেশের সর্বশ্রেণীর দর্শকদেরও এমনকি যৌবনকেও মুগ্ধ করতে পেরেছিল—এখন শুধু কৈশোর, অপরিণত মানুষ ও নিষ্কর্মাদেরই আকৃষ্ট করতে পারে।

বছর দশেক আগে কলকাতার শিক্ষিত নব্য যুবকদের মধ্যে একটা ফ্যাশন চালু হয়েছিল—ফিল্ম ক্লাবের সদস্য হয়ে ফরাসী, চেক, ইতালিয়ান ছবি এবং সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক ব্যতীত (মৃণাল সেন তখনো যথেষ্ট প্রগতিশীল হননি) অন্য কোনো পরিচালকের বাংলা ছবি না দেখা। আমিও সেই ফ্যাশনের বশবর্তী হয়েছিলুম। প্রথম প্রথম ফিল্ম ক্লাব প্রদর্শিত যে কোনো ফিল্মকেই উচ্চাঙ্গের বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতুম, যে ফিল্মের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি সেটিকেও বাহবা দিয়েছি। ফ্যাশনের নিয়মই এই। আস্তে আস্তে ব্যক্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে মতামত জানাতে আর ভয় পাই না যে ফিল্ম সোসাইটিতে দেখা অধিকাংশ ছবিই মোটামুটি যেমন তেমন, কিছু ছবি বেশ খারাপ। দুর্বোধ্য ছবি মানেই বাজে ছবি।

ফিল্ম যে সাহিত্য বা চিত্রশিল্প নিরপেক্ষ আলাদা একটি শিল্প—এই মতবাদ এক সময় প্রবল হয়ে ওঠে। ঠিক আছে, আলাদা শিল্প হিসেবে মেনে নিতে কারুর কোনোই আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু সেই আলাদা শিল্পের চেহারাটা কি? সে

সম্পর্কে এই মতবাদ পোষণকারীরা কখনোই স্পষ্ট হতে পারেননি। যখনই কারুর বিশ্বাস বা চিন্তা স্পষ্ট হয় না—তখনই কতকগুলি দুর্বোধ্য জগাখিচুড়ি বস্তু তৈরি হয়, সাহিত্যেও নতুন আন্দোলনের নামে এই ব্যাপার বার বার দেখা গেছে। যাই হোক, ফিল্মকে আলাদা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথম কোপই আসে কাহিনীর ওপর। সাহিত্য থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টায় আধুনিক ফিল্ম কাহিনীকে বাদ দিতে চায়।

যেমন, আধুনিক চিত্রশিল্পও কাহিনী বিবর্জিত হতে চেয়েছিল। কোনো শিল্পী যখন কোনো নারী-পুরুষ বা প্রকৃতির দৃশ্য আঁকেন, তখনই তার মধ্যে একটা কাহিনীর আভাস আসে—সেই নারী বা পুরুষটি কি করছে বা ঐ প্রকৃতির দৃশ্য কেন—এই প্রশ্ন। আমরা যখন মোনালিসার ঠোঁটের হাসিটির প্রশংসা করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা ঐ চিত্রটির শিল্পীকে কোনো শিরোপা দিই না—আমরা মুগ্ধ হই একটি হাস্যময় নারীর মুখচ্ছবির গল্পে, শিল্পী সেটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র। সুতরাং আধুনিক চিত্রশিল্পে সব রকম হুবহু প্রতিকৃতি বাদ গেল, শুধু রেখা ও রঙের সমাহার। থিয়োরি হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু নিরবয়ব রেখা ও রঙের সমাহারের ছবি দ্রুত দূরে সরে যেতে লাগল উপভোক্তাদের কাছ থেকে। শুরু হলো দুর্বোধ্য ছবির যুগ—চিত্র প্রদর্শনীতে কোনো ছবি উল্টো বা সোজা করে টাঙানো হয়েছে কিনা বোঝা যায় না—কিছু লোক কিছুই না বুঝে আহা উহু করে, অনেকে সোজাসুজি নাক কুঁচকোয়। মুষ্টিমেয় বড়োলোকের বা বিদেশী দূতাবাস কর্মীদের অনুকম্পায় বৈঠকখানা শোভিত হওয়া ছাড়া আধুনিক চিত্রশিল্পের আর কোনো মূল্য থাকছিল না। এখন অনেক আধুনিক চিত্রশিল্পী আবার অবয়বে ফিরে আসছেন।

আধুনিক ফিল্ম আন্দোলনের নামে ফরাসী দেশে পটাপট কিছু ফিল্ম তৈরি হতে লাগল—যাতে গায়ের জোরে কাহিনীকে অস্বীকার করার চিহ্ন স্পষ্ট। গদার বা অ্যালা রেজে জাতীয় পরিচালকের নামডাকে গগন ফাটার উপক্রম। বস্তুত ওঁরা কতকগুলো সাময়িকভাবে চাঞ্চল্যকর ছবি তুলেছেন, যা মাথার মধ্যে খানিকটা সুড়সুড়ি দিলেও মনে দাগ কাটে না। আমাদের দেশে ওদের নিয়ে এক সময় পত্রপত্রিকায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করা হয়েছিল, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ ধরনের ছবি তুলে কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেননি। দর্শকরা ছবিঘরে বসে পর্দায় মানুষের মুখ ও হাঁটা চলা দেখতে ও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথা শুনতে (যার মধ্যে নাকি চিন্তার খোরাক আছে) মোটেই রাজি হলো না। সেই সব পরিচালকরা আবার কাহিনীতে ফিরে এসেছেন। কাহিনী বাদ দিয়ে সিনেমাকে আলাদা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা গেল না।

পৃথিবীর সত্যিকারের বড়ো পরিচালকরা অবশ্য কখনো কাহিনীকে বাদ দেন

নি। প্লট সম্পর্কে ধারণা বদলেছে ঠিকই, যেমন আধুনিক সাহিত্যে। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আরো কয়েকজনের ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়, বিদেশ ভ্রমণের সূত্রে। দৈবাৎ ইওরোপের একটি শহরে এক পক্ষকালীন প্রদর্শনীতে ইনগমার বার্গমানের (এই নামের আরো তিনরকম উচ্চারণ আছে) সব কটি ছবি দেখার সুযোগ জুটে যায়। এই চলচ্চিত্রের দার্শনিকটি প্রথম আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেন যে সাহিত্য বা মঞ্চ নাটকের চেয়ে চলচ্চিত্রের খানিকটা আলাদা ও গভীর আবেদন আছে। 'সেভেনথ সীল' বা 'সাইলেন্স' ছবি বহুদিন মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। একই সঙ্গে তুলনা করা চলে জাপানী পরিচালক কুরোসোয়া'র। 'রসোমন' থেকে 'রেড বিয়ার্ড' পর্যন্ত ছবিগুলির কি অসাধারণ ব্যাপ্তি। 'রেড বিয়ার্ড' দেখতে দেখতে মনে হয় একটি আধুনিক মহাকাব্যকে প্রত্যক্ষ করছি। যেমন, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'রসোমন' ছবিটির নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। একটি মানবিক কাহিনীকে কত নতুনভাবে বলা যায়, তিনি দেখিয়েছিলেন। বহুকাল আগে তোলা অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন'ও এইরকম একটি দৃষ্টান্ত। বুনুয়েল-এর 'ল্যাস অলভিদাদস' ফিল্মে দেখেছিলাম সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের আঙ্গিক মিশিয়ে একটি সামাজিক বক্তব্য কত তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। ফেলিনির ছবিও সাহিত্য রসাশ্রিত, 'সাড়ে আট' ছবিটি খুব গভীরভাবে সাহিত্যরসই পৌঁছে দেয়—যদিও আঙ্গিকটি এমন যা ফিল্মের পক্ষেই সম্ভব, ভাষার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলা যায়।

এইসব ছবির দেখার পর মনে হয়, আমাদের দেশে এইসব ছবির অবাধ প্রদর্শনের ব্যবস্থা কেন করা হয় না। তাহলে সাধারণ ইঙ্গ-মার্কিনী ছবিগুলি দেখার রুচি আর হতো না। কিন্তু একথাও অবশ্য মনে রাখা উচিত, সত্যজিৎ রায়ের মতনই ঐ সব পরিচালকও তাঁদের যাঁর যাঁর দেশে দু'একজনই মাত্র। অনেক ইটালিয়ান ও ফরাসী ছবি আমি দেখেছি—যা প্রায় হিন্দী সিনেমার মতনই। যে কোনো উচ্চাঙ্গের শিল্পের মতনই ভালো ফিল্ম সব দেশেই নামমাত্র।

লেনিন চলচ্চিত্রের ভূমিকার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের ফিল্মের সঠিক স্থান এখনো বোঝা গেল না। ওইসব দেশের ফিল্ম না হতে পারল শিল্প, না হতে পারল প্রচারের উৎকৃষ্ট বাহন। প্রচার হোক আর যাই হোক, উৎকৃষ্ট রস যদি পরিবেশন করতে না পারা যায় তাহলে যে দর্শক দেখবে না। জোর করে তো ফিল্ম দেখান বা বই পড়ান যায় না। পোলাণ্ডের বেশ কয়েকটি ভালো ছবি আমরা দেখেছি, চেকোশ্লোভাকিয়ার দু'একটি—বাদ বাকি, রাশিয়া সমেত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ফিল্ম অত্যন্ত মোটা দাগের। রাশিয়ায় তোলা ব্যালের ডকুমেণ্টারি ধরনের ছবিগুলি ছাড়া অন্য কোনো ফিল্ম দেখতে

আগ্রহ বোধ হয় না। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের একটিও ফিল্ম এ পর্যন্ত দেখার সুযোগ পাইনি—ও দেশের ফিল্ম সম্পর্কে কোনো খবরাখবরও চোখে পড়েনি। সুতরাং কিছুই জানি না।

ফ্যাশানের বশবর্তী হয়ে বেশ কয়েক বছর ফিল্ম ক্লাবের বিদেশী ছবি দেখতাম ও সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক ছাড়া অন্য বাংলা বই দেখতাম না। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা অন্তে ঠিক করলাম, আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ যেসব ছবি দেখে ও আনন্দ পায় সে সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। তখন 'মণিহার' নামে একটি ছবি বেশ জনপ্রিয়—ঝপ করে ঢুকে গেলুম সেটা দেখতে। শেষ পর্যন্ত দেখেছি, উঠে আসিনি। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যাঁরা এই ছবিটি তোলার উদ্যোগ আয়োজন করেছেন, পরিচালনা বা চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব যাঁদের ওপর—তাঁরা কি সত্যই তত মুর্খ যতটা মনে হয় এই ছবি দেখে? তা হতেই পারে না। এত বড়ো একটা বিরাট কাণ্ড মূর্খ লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে তাঁরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান, তাঁরা খুব দক্ষভাবে হিসেব করে দেখেছেন, সাধারণ দর্শকরা কি কি দেখতে ভালবাসেন। একটি ছবির মধ্যে তার সবগুলিই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি ছবি দেখে বিচার করা উচিত নয় বলে দেখতে গেলাম আর একটি ছবি, 'বালিকা বধূ'। প্রখ্যাত লেখকের গল্প, সুতরাং মনে মনে একটু ভরসা ছিল—কিন্তু দেখতে গিয়ে পেলাম অতিরিক্ত অনেকখানি। খুবই সাবলীল স্বচ্ছ, কৌতুকময় ছবি—জনরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়েছে কিন্তু উদ্ভট আজগুবি কিছু ঢোকানো হয়নি—আমাদের দেশের পক্ষে এই ধরনের ছবি যথেষ্টরও বেশি ভালো। কিন্তু বাংলা ছবির মান এখানেই বাঁধা থাকে না—আবার মাঝে মাঝেই যে অনেক নিচে নেমে যায়।

হিন্দী ছবি সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। ইহজীবনে আমি তিনটি মাত্র হিন্দী ছবি দেখেছি—তার মধ্যে একটির নাম 'ডক্টর কোটনিস কি অমর কহানী' —স্কুল থেকে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেখতে গিয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয়টি, 'বৈজু বাওরা'—ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব ঐ ছবিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, এইজন্য দেখতে যাওয়া। তৃতীয় ছবিটি দেখি অনেক পরে। নারগিস, রাজকাপুর, দেব আনন্দ, হেমামালিনী প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত ব্যক্তিদের আমি দেওয়ালের পোস্টারে ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। তাতে খুব যে ক্ষতি হয়েছে জীবনের, তা মনে হয় না—জীবনে কত ভালো ভালো জিনিসই তো দেখা হয়নি। তৃতীয় হিন্দী ছবিটি দেখতে যাই ঐ একই কারণে, হিন্দী ফিল্ম ব্যাপারটা কি জানার জন্য। হাতের কাছেই তখন চলছিল 'ছোটিসি মুলাকাৎ'। এটাও শেষ পর্যন্তই দেখেছি—একবারও সিগারেট খেতে বাইরে যাইনি—তবে মাঝে মাঝে ছবির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে

দেখার চেষ্টা করছিলাম কাছাকাছি দর্শক-দর্শিকাদের মুখের ভাব। মনে হলো সবাই বেশ পছন্দ করছে। এরকম একটা দানবিক কাহিনী যে পনেরো ষোলো হাজার ফুট ধরে কেউ দেখাবার কথা চিন্তা করতে পারে—একথা আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। যেরকম ফর্মুলা বাঁধা গল্প, তাতে মনে হয় অধিকাংশ হিন্দী ফিল্মের অনুকরণেই এটি রচিত। যাক খুব শিক্ষা হয়ে গেল। বুঝলাম, ভারতবর্ষে এখন কি ব্যাপার চলছে!

হিন্দী ছবি না দেখলেও হিন্দী সিনেমার গান এড়াবার উপায় নেই। নির্জন পাহাড়ে গেলেও হিন্দী সিনেমার গান তাড়া করবেই। প্রথম দিকে বিরূপতা ছিল, পরে মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝলাম, হিন্দী ছবির গান খুব অপকৃষ্ট নয়। বাংলা সিনেমার গান বা আধুনিক গানের চেয়ে অনেক ভালো এবং জোরালো। বিদেশী সুর মেশানো থাকলেও অধিকাংশ হিন্দী গানের মূল ভিত্তি বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের ওপর—বাংলা ফিল্ম এ ভূমিকা নিতে পারেনি। তবু আমাদের দেশের সর্বত্র যে এই হিন্দী গান ঢুকে পড়ছে তার জন্য অস্বস্তি হয়—ঐ গানের জন্য নয়, ঐ সব গান হিন্দী সিনেমার যে কালচারের প্রতিনিধিত্ব করে তার জন্য।

কিন্তু অধিকাংশ দর্শক যদি ঐ 'ছোটিসি মুলাকাৎ' বা 'মণিহার' ধরনের ছবি দেখতে চায়, তাহলে উপায় কি? ফিল্ম তোলা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার —শিল্পের নামে তো কেউ উৎসর্গ করতে পারে না। একবার পারলেও বারবার পারে না। আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন পরিচালক সত্যিকারের ভালো ছবি তোলার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু একটির বেশি দুটি ছবি তাঁরা তৈরি করার সুযোগ পাননি, পেলেও পরবর্তী ছবি অবধারিতভাবে কমার্শিয়াল। একই লোকের পক্ষে দু'রকম ছবি তোলা একটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। ঋত্বিক ঘটক এরকম চেষ্টা করেছেন এবং বেশি ডুবেছেন। ফলে উন্নত মানের ছবি তুলতে অনেকেই এখন ভয় পান বা প্রযোজকের অভাবে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নিতে পারেনি শুনেছি। একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের কথা আলাদা। অনেক দুঃখ কষ্ট বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তিনি এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ এই লেখার মধ্যে 'আমি'র অংশ একটু বেশি হয়ে গেছে। আমি কি দেখেছি বা আমি কি মনে করি—এটা একটা বলার মতন ঘটনা নয়। আসলে আমি বোঝাতে চাইছিলাম, পশ্চিম বাংলায় আমার মতন যে কোনো একজন মানুষ মোটামুটি শিক্ষিত বলা যায়, বাইরের কিছু খবরাখবর যে রাখে, ফিল্ম জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনেও ভূমিকা নেই—অথচ ভালো ফিল্ম দেখলে খুশি হয়, এমন একজনের বাংলা ছবি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

কি? জনরঞ্জন ও শিল্পরুচি নিয়ে বাংলা ছবির যে দ্বন্দ্ব আছে তার কোনো সমাধান আমার জানা নাই।

১৭

বনগাঁ লোকালের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। দরজার কাছাকাছিই জানলার পাশে বসে আছে ঐ দুজন লোক, দুজনেরই হাতে হাতকড়া, তাছাড়াও কোমরে দড়ি বাঁধা —দড়িটির এক প্রান্ত ধরে আছে দুজন পুলিশ।

লোক দুজনেরই পরনে টেরিলিনের সার্ট, যদিও ময়লা খুবই, এবং ধুতি। গালে সপ্তাহ দুয়েকের দাড়ি, একজনের হাতে বেশ একটা দামি ঘড়ি যদিও কাচটা ফাটা।

সচরাচর এমন বিচিত্র যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা যায় না। সবাই কৌতূহল গোপন না-করা চোখে দেখছে, ও-দিকের কোণ থেকে একটি বাচ্চা ছেলে, আমি দেখব আমি দেখব বলে সীটের উপর উঠে দাঁড়াল।

লোক দুটির একেবারে মুখোমুখি যে সীট, সেটাতে বসে থাকা যাত্রীদের আর কোনো কাজ নেই, তারা প্যাট প্যাট করে দেখছে ওদের। প্রত্যেকদিন ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়—জানলার বাইরের মাঠ-ঘাট জঙ্গলের দৃশ্য একঘেঁয়ে হয়ে গেছে, ফেরিওলাদের বয়ানও মুখস্থ, নতুন বলতে শুধু এই হাতকড়া দিয়ে বাঁধা লোক দুটি।

বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারল না, একজন জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

বন্দী দুজনের একজনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হরিদাসপুর।

—ও হরিদাসপুর? আপনাদের কি পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—আপনারা কি পাকিস্তানী?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। পাকিস্তানী চর? ছত্রী বাহিনী? কিন্তু সেসব হুজুগ অনেকদিন কেটে গেছে। লোক দুটির চেহারা দেখেও এমন কিছু ভয়ংকর মনে হয় না। নিরীহ, কামরার আর পাঁচজনের মতনই।

একটু বাদে আবার আর একজনের প্রশ্ন : আপনারা ইন্ডিয়ায় এসেছিলেন কেন?

একজন কনস্টেবল বলল, বাবুজী, ইন লোগকা সাথ বাতচিৎ মাৎ কিজিয়ে!

পুলিশকে আজকাল আর কে গ্রাহ্য করে! বাবুজীটি তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি থামো তো! কথা বললে কি ক্ষয়ে যাবে নাকি! তোমাদের কেরদানি তো সব জানা আছে! ইয়ে, আপনারা ইন্ডিয়ায় এসেছিলেন কেন?

বন্দী দুজনেব একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ম্লান গলায় বলল, হিন্দুস্থানে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। অনেকদিন দেখা হয় না—তাই দেখা করতে এসেছিলাম। দেখাও হলো না—

—আপনারা পাসপোর্ট নিয়ে আসেননি?

—পাসপোর্ট ছিল, কিন্তু ভিসা পাইনি—ছ-মাস ঘুরেও ভিসা পাইনি।

এরপর আব কথা বলাব বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন শুধু শূন্যে খেদোক্তি করল, ঝগড়া হচ্ছে দিল্লি রাওয়ালপিনডির সঙ্গে, আর বাংলা দেশের পিণ্ডি চটকাচ্ছে! আমারও আপন মেজোশালা রয়েছে খুলনায়—কতদিন তাকে দেখি না!

আর একজন লোক আবার জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানে কোথায় বাড়ি আপনাদের?

—খুলনায়। মীরপুর গ্রামে—

—মীরপুর? ওব কাছেই তো আমাদেব কাপাসডাঙ্গা। চেনেন কাপাসডাঙ্গা!

—হ্যাঁ চিনি।

কামরার সবাই কান খাড়া করে এই আলোচনাই শুনছিল। ভেতব দিক থেকে একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা একেবারে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এলেন এখানে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কি বললে বাবা? মীরপুর? খুলনার মীরপুব? তোমরা মীরপুরের লোক?

—হ্যাঁ, মা। আমরা দুজনেই মীবপুরে থাকি।

—ঐ মীরপুরেই তো ছিল আমার শ্বশুরবাড়ি! মীরপুরের ঘোষালদের বাড়ি চেন না? কি ধুমধাম করে দুর্গোৎসব হতো সেখানে।

—হ্যাঁ মা, চিনি ঘোষালবাড়ি। ঐ তো ইয়ে, আপনার বড়ো বট গাছটার পাশে—

—আমি মীরপুরের সবাইকে চিনতাম। আমি যখন দেশ ছেড়েছি, তখন তোমরা খুব ছোট ছিলে। মৌলবী সাহেব এখনো বেঁচে আছেন? দৌলত হোসেন।

—না, উনি মারা গেছেন।

—তোমরা মীরপুরের লোক! কতদিন শ্বশুরবাড়ির লোক দেখিনি। তোমাদের দেখে যা আনন্দ হচ্ছে না! তোমাদের এরকম হাতকড়া পরিয়েছে কেন পোড়ার-মুখোরা!

—আমার দিদি থাকেন খিদিরপুরে, আর এর আপন চাচা থাকেন মেটিয়া বুরুজে, তাই দেখা করতে এসেছিলাম। দেখাও হলো না, পুলিশে ধরল।

—আপন লোকের সঙ্গে মানুষ দেখা করবে না! আমার দ্যাওর রয়েছে এখনো চিতলডাঙ্গায়—

তারপর কামরার মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল। পাকিস্তানে চালের দাম এখন কত? মাছ দুধ এখনো কি সস্তা? মীরপুরের সাঁকোটা কি এখন পাকা হয়েছে? কাপাসডাঙ্গায় এখনো দুর্গাপুজোয় মোষ বলি হয়? খুলনা টাউনে নাকি মেয়েদের কলেজ হয়েছে? পাকিস্তানের ট্রেনে কি এরকম ভিড় হয়?

অনেকে উঠে এসে বন্দী দুজনের গা ঘেঁষে বসেছে। কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর। অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক বাষ্প চাপা রইল।

আমি একপাশে বসে বসে শুনছিলাম, আমার স্টেশন এসে গেছে, উঠে দাঁড়ালাম। একজন কনস্টেবল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে আর ফিকফিক করে হাসছে আপন মনে। হাসিটা দেখে আমার কি রকম সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, কি সিপাহীজী, হাসছ কেন?

লোকটি এক গাল হেসে হিন্দীতে যা বলল, তার অর্থ এই ঐ বদমাস দুটো কি গুল ঝাড়ছে! ওরা পাকা স্মাগলার, এই নিয়ে তিনবার ধরা পড়ল। অথচ কি রকম নিরীহ সেজে গল্প জমিয়েছে? দেব নাকি সবাইকে সত্যি কথাটা বলে?

আমি ফিসফিস করে বললাম না, দরকার নেই সত্যি কথাটা বলে। সবাই কিছুক্ষণের জন্য পুরোনো দিনের কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছে—কি দরকার সেটা ভেঙে। তাছাড়া দেশ ভাগ না হলে তো আর আমরা ওদের স্মাগলার বলতুম না।

১৮

কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের সামনে প্রায়ই একটি মুসলমান মেয়ে আমার কাছে ভিক্ষে চাইত। অবশ্য ভিখারির আবার হিন্দু মুসলমান কি? ভিখারির জাত হচ্ছে ভিখারিই।

তবু, মেয়েটির মুখখানা ভারি সুশ্রী, টলটলে হরিণ চোখ, আর কথাবার্তায় সারল্যের সুর দেখে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই খুকি, তোর নাম কি রে?

মেয়েটির বয়েস হবে আট ন' বছর, মাজা মাজা গায়ের রং, আগেকার দিনের

বিখ্যাত অভিনেত্রী নারগিসের সঙ্গে ওর মুখের যেন একটা মিল আছে কোথায়। ভালো করে সাবান মাখিয়ে স্নান করালে এবং একটা পরিষ্কার ফ্রক পরিয়ে দিলে ওকে নারগিসের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

নাম জিজ্ঞেস করায় মেয়েটি লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়ল। ভিখারিদের তো নাম জিজ্ঞেস করার নিয়ম নেই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, তোর নাম কি বল না?

ঘাড় গুঁজে বিড়বিড় করে কি যেন বলল, আমি বুঝতেই পারলাম না।

এবার ওর থুতনি ধরে উঁচু করে আবার ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েটি বলল, আইসা।

আমি বললাম, আইসা! আইসা আবার কি নাম? ঠিক করে বল।

আমার সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধু ছিল। তাদের মধ্য থেকে সামসের বলল, আইসা মুসলমান মেয়েদের নাম হয়।

যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, তোরা মুসলমান?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ।

সামসের আমাকে বলল, অবাক হচ্ছো কেন? মুসলমান ভিখিরি দেখনি কখনো আগে?

আমি বললাম, কি জানি। ভিখিরিদের জাতের কথা আগে ভেবে দেখিনি।

সামসেরদের দুটো কয়লা খনি আছে রাণীগঞ্জে। মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে। কিন্তু ভিক্ষে দেওয়ার খুব বিরুদ্ধে। ওর বক্তব্য হচ্ছে, ভিক্ষে দেওয়া মানেই সমাজে নতুন ভিখিরির সৃষ্টি করা। ভিক্ষে দেওয়া বন্ধ করলে তবেই এরা কাজ করতে বাধ্য হবে।

আমি অতশত চিন্তা করি না। মেয়েটিকে দশটা পয়সা দিয়ে কফি হাউসে উঠে গেলাম।

তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয়। কফি হাউসে ঢোকার সময় কিংবা বেরুলেই কোথা থেকে ছুটে আসে, হাত ধরে বলে, ও বাবু, দাও, পাঁচ নয়া দাও, তিনদিন আসনি।

ভিখারি দেখলে আমার দয়া উথলে ওঠে তা নয়। আমি সমাজ সংস্কারকও নই। ওদের পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কখনো দিই কখনো দিই না। সেটা আমার মেজাজের উপর নির্ভর করে। এই মেয়েটিকে দেখলেই আমার মনের মধ্যে এক ধরনের সজল ভাব আসে বলে (আমি নারগিসের খুব ভক্ত ছিলাম কিনা!) ওকে পাঁচ-দশ পয়সা দিই। পাঁচ পয়সার কম দিলে ও নেয় না। ও যেন ভিক্ষে চায় না। দাবি করে।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলুম, এই. তুই রাত্তিরবেলা থাকিস কোথায়?

আইসা হাত দিয়ে হ্যারিসন রোডের ওপর একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে দিল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঐ বাড়ির গাড়িবারান্দার তলায় ওদের মতো অনেকেই থাকে।

—তোদের কোনো বাড়ি নেই? তোর বাবা মা নেই?

—আছে।

—কোথায়?

—বাবা বসিরহাটে। মা এখানে। মা-টার সঙ্গেই তো আমি থাকি।

—বাবা কি করে?

—চাষ করে।

—তা হলে বাবার সঙ্গেই থাকিস না কেন?

ও কোনো উত্তর না দিয়ে ঠোঁট দিয়ে একটা ভঙ্গি করল। মেয়েটা কখনো দুঃখ দুঃখ ভাব করে না। বেশ হাসিখুশি থাকে।

টুকিটাকি প্রশ্ন করে ওর মোটামুটি পরিচয়টা জেনে নিলাম। ওর বাবা একজন চাষী। দুটি বিয়ে, সব সমেত পনেরোটি সন্তান। আইসার মায়ের দুর্ভাগ্য এই যে তার শুধু সাতটা মেয়েই হয়েছে, ছেলে হয়নি। বোঝা যায়, পরিবার পরিকল্পনার ডঙ্কানিনাদ বসিরহাটে ঐ চাষী পরিবারের কানে পৌঁছায়নি।

যাই হোক, অতগুলো মেয়ে নিয়ে আইসা'র বাবা করবে কি! চাষের কাজেও লাগে না। শুধু বসে বসে খাওয়ানো। তাই মেয়েগুলি সমেত আইসার মাকে ওর বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে।

এক মেয়ের কোনোক্রমে বিয়ে হয়েছিল। আর এক মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। বাকি পাঁচ মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। ওর মা ছুটকো-ছাটকা কাজ করে। রাজমিস্ত্রিদের কাছে ঠিকে কাজ পায় কখনো কখনো। আইসা'র পরেও আরো ছোট তিন বোন আছে।

গোলদিঘির কাছে দাঁড়ানো একটি বারো তের বছরের মেয়েকে দেখিয়ে আইসা বলল, ঐ যে আমার দিদি।

সে বেশ চতুর ভাবে ভিক্ষে করতে শিখেছে। ঘ্যানঘ্যানানির সুরটা রপ্ত করে নিয়েছে ভালোভাবে।

আইসাকে জিজ্ঞেস করলাম, সারা দিনে কত পাস রে?

—আট আনা! ষাট পয়সা!

তাতেই আইসাকে বেশ খুশি মনে হলো। কে যেন বলেছিল, কলকাতায় ভিখিরিদের অনেক রোজগার?

যে বিরাট বাড়ির গাড়ি বারান্দার তলায় ওরা শোয়—সে বাড়িতে কখনো বিয়ে-শাদী কিম্বা কোনো উৎসব হলে সেদিন আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ওরাও ভালো ভালো খাবার পায়।

আইসার কাহিনী শুনে আমি দুঃখে অভিভূত হয়ে যাইনি। নিষ্ফল দুঃখ নিছক বিলাসিতা মাত্র। আমি নিজে যদিও ফর্সা জামাকাপড় পরি, এবং রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষে করি না—তবু জীবনের নানা স্তরে আমিও ভিখারি। ইচ্ছে মতন বেঁচে থাকার স্বাধীনতা আমারও নেই।

কলকাতায় সাধারণত ভিখিরিরা এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। ওদেরও আমি দেখেছিলাম দু'তিন বছর মাত্র। তারপর সামসের চলে গেল আমেরিকায়, রতন চলে গেল দিল্লিতে চাকরি নিয়ে—কফি হাউসে আমাদের আড্ডাও গেল ভেঙে।

এই দু'তিন বছরে আমি আইসার খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি। তবে, এর মধ্যে দেশের অবস্থা যে আরো খারাপ হয়েছে, তার ছাপ পড়েছে ওর চেহারায়। মুদ্রামূল্য কমে গেলেও তো দেশে ভিখিরিদের রেট বাড়ে না। কেরানি বা শ্রমিকদের মতন তারা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বাড়ানোর জন্য মিছিলও করতে পারে না।

আইসা এই দু' বছরে আর একটু রোগা হয়েছে। মুখের সেই সজীব টলটলে ভাবটা আর নেই, নভেম্বরের শীতেও একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ও ইজের পরে আছে।

কিন্তু ওর সারল্যটুকু নষ্ট হয়নি: এখনো ছুটে এসে হাত ধরে বলে, ও বাবু, দাও দশ নয়া। তুমি অনেকদিন আসনি। আস না কেন?

যেন ওর জন্যই আমার কফি হাউসে আসা উচিত। আমি একটু হেসে চুপ করে থাকি।

গোলদিঘির রেলিং-এর পাশে যে মেয়েটিকে দেখিয়ে আইসা বলেছিল, ঐ যে আমার দিদি, তার অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দু' বছর আগে তাকে দেখেছিলাম একটা ছেঁড়া ফ্রক পরে থাকতে, এখন সে মোটামুটি একটা অটুট শাড়ি পরে আছে। সেই ঘ্যানঘ্যানানির সুর আর নেই, তার বদলে নীরবে হাত পেতে ভিক্ষে করছে। দেখে মনে হয় যেন শীগগিরই বাচ্চা-কাচ্চা হবে।

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল। এই ভিখিরিগুলো একেবারে রক্তবীজের ঝাড়। খেতে পায় না, পরতে পায় না, তারপর জড়িয়ে পড়েছে। আবার একটা ভিখিরির জন্ম দেবে। কলকাতার রাস্তা এই করে যে ভরিয়ে দেবে একেবারে।

ওর দিদির ওপর রাগ করে সেদিন আমি আইসাকেও ভিক্ষে দিলুম না।

এরপর কিছুদিন আমাকেও কলকাতার বাইরে যেতে হলো। ফিরে আসবার পর কফি হাউসে যাওয়া অনিয়মিত হয়ে গেল খুবই, আইসাকেও আর দেখতে

পাই না। ভুলেও গেলাম ওর কথা।

এর পাঁচ বছর পরের কথা। আমি আর রতন এক সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গল্প করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। ন'টার সময় ফিরছিলাম মাঠের মধ্য দিয়ে, কেল্লার পাশ দিয়ে।

হঠাৎ দেখলাম, একটা কনস্টেবল তিনটি মেয়েকে তাঁড়া করছে লাঠি হাতে। এ দৃশ্যে কৌতূহল জাগ্রত হবেই। মেয়ে তিনটি ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে।

আমি পুলিশটিকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেয়া হোতা হ্যায়?

রতন আমার হাত ধরে টেনে নিল, কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছিস?

আমি বললাম, চুপ কর না।

পুলিশকে ভয় না-পাবার একটাই কারণ থাকতে পারে—যদি চেনাশুনা থাকে পুলিশের কোনো হোমরা-চোমরার সঙ্গে। একজন ডি. সি. আমার বন্ধু।

সেপাইটি বলল, বদমাস হ্যায়! বদমাস!

আমি ধমক দিয়ে বললাম, বদমাস হ্যায় বলেই কি তোমাকে ঘুষ দিতে হবে নাকি?

সেপাইটি চোখ গরম করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, লালবাজারে অরুণ রায়কে টেলিফোন করব?

একথা শুনেই সেপাইটি দাঁড়াল না। হনহন করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মেয়ে তিনটি আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে। কৃতজ্ঞতাসূচক একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওদের মধ্যে একজনকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। ঠিক নারগিসের মতন মুখ না? সন্দেহ কি, এই মেয়েটি সেই আইসা।

ও আমাকে চিনতে পারেনি। আমার মুখ তো কোনো বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার মতন নয়, কেউ বেশিদিন মনে রাখতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

—গোলাপ।

—বাঃ, আইসা'র থেকে গোলাপ নামটা তো ভালোই! মেয়েটি লজ্জা কিংবা ভয় পেল। আমি কিন্তু বেশ খুশিই হয়েছি ওকে দেখে। আর যাই হোক, বেঁচে তো আছে! একটা ঝলমলে শাড়ি পরেছে, স্বাস্থ্যও মন্দ না। যে-কদিন বয়েস আছে, যদি একটু ভালো করে খেতে পরতে পায়, তাহলে আমি ওকে ঘৃণা করব কোনো অধিকারে?

এটা একরকমের ভিক্ষে, তবে একসঙ্গে দু'পাঁচ টাকা পায়, বিনিময়ে কিছু দেয়। মেয়েটা বাঁচে বাঁচুক।

আইসার পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

মেয়েটি নতমুখে বলল, বীণা চক্রবর্তী।

তৃতীয় মেয়েটিকে আমি আর নাম জিজ্ঞেস করলাম না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে ভিখিরিদের মতন এই মেয়েদেরও জাত থাকে না।

বললাম, ঠিক আছে, যাও। পুলিশকে কক্ষনো পয়সা দিও না। এত কষ্টের পয়সা।

১৯

ছেলেবেলা থেকেই সব কিছু অবিশ্বাস করতে শিখেছিলাম। দ্বিজেন জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জ্বেলে আমরা কয়েকজন গল্প শুনতুম ওঁর কাছে। হঠাৎ বাইরে কি রকম অস্বাভাবিক শব্দ হতে আমরা সবাই ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে জ্যাঠামশাইয়ের সামনে এসে বসতাম। দ্বিজেন জ্যাঠা গম্ভীর হয়ে বলতেন, যা দেখে আয় তো ওটা কিসের শব্দ! কে যাবে— আমাদের কারুর সাহস নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই জোর করে একজন না একজনকে পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো সেণ্টু ফিরে এসে মুখ চুন করে বলত, কিছু তো দেখলুম না। জ্যাঠামশাই চোখ বুজে গড়গড়া টানতে টানতে বলতেন, সে কি আর এতক্ষণ থাকে।

—কে? সে? আমরা একেবারে শিউরে উঠতুম।

—কারণ ছাড়া কার্য হয় না। চোখে দেখতে না পেলেও কিসে কি হচ্ছে বুঝে নিতে হয়। আমাদের বাড়ির চাল থেকে তোদের বাড়ির রান্নাঘরের চালে লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল মদনমোহন, পারেনি ঠিক মতো, ফসকে গিয়ে অতিকষ্টে রান্নাঘরের ছাদের দেয়ালটা ধরে ফরফর করে নেমেছে—আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছিল রুটির সেঁকার চাটুটা—সেটা পড়ে গিয়ে ওরকম শব্দ হলো।

মদনমোহন, জ্যাঠামশাইয়ের আদরের হুলো বেড়ালটার নাম। ঘর থেকে এক পা-ও না বেরিয়ে ওরকম ছবির মতো ঘটনাটা কি করে বললেন—ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতুম। কিন্তু বিশ্বাস করতুম জ্যাঠামশাইকে। ঐরকমভাবেই আমরা ভূত-প্রেত অবিশ্বাস করতে শিখেছিলুম।

সন্ধেবেলা এক-একদিন আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতুম। ফেরার সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে আদিগন্ত পাট খেতের পাশ দিয়ে আসতে দূরের একটা সাদা মতন পদার্থ দেখিয়ে জ্যাঠামশাই বলতেন, ঐ দ্যাখ পেত্নি দাঁড়িয়ে আছে। মাছ খেতে আসে রোজ।

জ্যাঠামশাই যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওটা পেত্নি নয়। কারণ জ্যাঠামশাই

বলেছেন যে, ভূত-পেত্নি বলে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর কথার মর্যাদা রাখতেই আমরা তাঁর একথার প্রতিবাদ করতুম। তবে ওটা কি এখান থেকে বল তো? তিনি জিজ্ঞেস করতেন। তখন আরম্ভ হতো আমাদের অনুমানের খেলা। কেউ বলত কলাগাছ, কেউ বেলগাছ, কেউ বলত—ওখানে একগোছা পাট শুকিয়ে ইন্দ্রপুজোর জন্য ধ্বজা করে গেছে। আমি বলেছিলুম : ধোপাদের বউ ওখানে দাঁড়িয়ে হারানো গাধাটাকে খুঁজছে। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, আমারটাই ঠিক। আমরা আর কেউ মিলিয়ে দেখতে যাইনি। অন্য গল্প করতে করতে বাড়ি চলে গেছি।

এইভাবেই—যে-কোনো কাজের পিছনে যুক্তি খোঁজার বদ অভ্যেস আমার দাঁড়িয়ে গেছে। এখন মনে হয়, সত্যিসত্যিই হয়তো অনেক ভূত-প্রেত অলৌকিক রহস্যকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনো একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাবার আজকাল খুব ইচ্ছে হয়। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনো খুব ভালো, কিন্তু ইচ্ছে হয় অকারণে চশমা-টশমা নিয়ে চোখ দুটো একটু খারাপ করে ফেলি। তবু যদি কখনো কোনো সত্যিকারের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। এসব চেনা জিনিস দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যুক্তি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

মনে পড়ে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে যখন থাকতুম, নীচের তলাটা ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু একটা ঘরে শুতুম আমি, বাড়ির আর সবাই দোতলায়। ঐ বাড়িতে ভূতের ভয় ছিল শুনেছি। আমাদের আগের ভাড়াটেদের বড়ো মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল ও বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে। কতজন তাকে দেখেছে। ছাদের ওপর চুল এলো করে বসে কাঁদত—কেউ দেখতে পেলেই এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি কতবার চেষ্টা করেছি তার দেখা পাবার। একদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ওপর টক টক আওয়াজ শুনলুম।

ঘুমের ঘোর কাটার আগে শব্দটা কোথা থেকে আসছে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার পাতলা ঘুম, চট করে ভেঙে যায়। বুঝতে পারলুম, শব্দ হচ্ছে আমার পায়ের কাছের জানলার পাল্লায়। অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি জানলার বাইরেটা—সেখানে কোনো মানুষের মুখ নেই। কিন্তু শব্দটা হাওয়ার নয়, স্পষ্টত মানুষের, নির্দিষ্টভাবে একটু থেমে শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক ঠক্।

আমার বালিসের তলায় বেড স্যুইচ। তা ছাড়া ইঁদুরের উৎপাতের জন্য পাশে একটা মোটা বেতের লাঠি রেখে দিতাম। সুতরাং সশস্ত্র ছিলাম। তবু আলো জ্বালিনি, শুরু করেছি যুক্তির খেলা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমারই কোনো বন্ধু-বান্ধব ডাকতে এসেছে। দীপকের ফ্ল্যাটবাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে ও আমার সঙ্গে শুত। কিন্তু দীপক তো চুপ করে থেকে জানলা

নক করার ছেলে নয়। এতক্ষণে ওর কম্বুকণ্ঠে সারা পাড়া নিনাদিত হয়ে উঠত। তবে কি কোনো চোর? আমি জেগে আছি কিনা দেখার জন্য আওয়াজ করছে? আমি খর চোখে তাকিয়ে রইলুম—জানলার পাল্লায় আবার আওয়াজ হলো ঠক ঠক ঠক। কিন্তু কোনো মানুষের হাত বা মুখ দেখা গেল না। অথচ জানলাতেই যে শব্দটা করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। জানলার কপাটদুটো ঘরের মধ্যে ঢোকানো—সুতরাং কেউ আওয়াজ করলে তার হাত দুটো আমি দেখতে পাবই। এমন মূর্খ আমি—কোনো অদৃশ্য বা অলৌকিক অস্তিত্বের কথা তখন আমার মাথাতেই আসেনি। আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল—আলো জ্বেলে উঠে গিয়ে দেখা। কিন্তু ঐ যে—অনুমান এবং ডিডাকশান করার লোভ। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নানান যুক্তি ভাবতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম সমাধান। টিকটিকিতে আরশোলা ধরেছে। আরশোলাটাকে মারার জন্য টিকটিকি অনেকবার ঝাপটা মারে। টিকটিকির যা স্বভাব—অসীম ধৈর্য নিয়ে থেমে থেমে ঝাপটা মারতে মারতে ওকে শেষ করবে। কাঠের জানলায় ঐ রকম আওয়াজ হচ্ছে ঝাপটা মারার। আমার এই সিদ্ধান্তে আমি এতদূর নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম যে, উঠে গিয়ে মিলিয়ে দেখারও ইচ্ছে হলো না। ঘুমিয়ে পড়লুম পাশ ফিরে।

আজ সে-জন্য কত অনুতাপ হয়। হয়তো টিকটিকি নয়—সেই আত্মহত্যাকারিণী অষ্টাদশী মেয়েটি আসতে চেয়েছিল আমার ঘরে। দুটো কথা বলতে এসেছিল। আসবার আগে ভদ্রভাবে অনুমতি চেয়েছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজকাল ভূত আর ভগবান তো একই—অবিশ্বাসীর কাছে আসে না একেবারেই। ভয় দেখাতেও আসে না।

কিন্তু আমি যদি কোনো অলৌকিকের দেখা না পেয়ে থাকি—তবে 'অলৌকিক' নামে এ লেখাটা লিখছি কেন? না, পেয়েছিলাম একবার। একটি অসম্ভব, অলৌকিক দৃশ্যের রাত্রি। চক্রধরপুর থেকে রাঁচী যাবার রাস্তায়, পাহাড়ের ওপর হেসাডি ডাকবাংলোয় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু। চারপাশে জঙ্গল—সন্ধের পর ভাল্লুক আর চিতাবাঘের ভয় আছে—রাস্তার পাশে এই বাংলো—আর চতুর্দিকে ১৫ মাইলের মধ্যে কোনো জনমানব নেই। সন্ধের পরই অন্ধকার এবং স্তব্ধতা একসঙ্গে ছেয়ে আসে। মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা ট্রাক তীব্র আলো জ্বেলে ঝড়ের বেগে ছুটে যায়—ডাকাতির ভয়ে কোথাও না থেমে।

কয়েকদিন তাস-টাস খেলে হৈ-হুল্লোড় করে কাটল। তারপর আর সন্ধে কাটতে চায় না। কি বিপুল দীর্ঘ সন্ধেগুলো। সুতরাং একদিন ১৮ মাইল দূরে ওরাওঁদের গ্রামে হাট হবে শুনে আমরা দুপুরবেলাই একটা ট্রাক ধরে চলে গেলাম। চাল, হাঁস, মুরগী, কাচের চুড়ি, আয়না আর হাঁড়িয়া ও জুয়ার আড্ডা নিয়ে ছোট্ট

গ্রাম্য-হাট। সন্ধের পরই ভেঙে গেল। তখন সমস্যা হলো আমাদের ফেরা নিয়ে। কি করে অতখানি রাস্তা ফিরে যাব—কোনো ট্রাক আমাদের নিতে চায় না। শেষে একটা সিমেন্টের ট্রাক আমাদের পৌছে দিতে রাজী হলো বাদগাঁও পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের বাংলো ছ' মাইল। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জমাট অন্ধকারে পাকা পিচের রাস্তা ধরে চুপচাপ হাঁটছিলুম আমরা খুব সাবধানে। যে কোনো সময় ছুটন্ত ট্রাক আমাদের চাপা দিয়ে যেতে পারে—এখানে আর কে দেখছে। হাঁটতে একদম ভালো লাগছিল না—শেষে, কে এই হাটে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল সেই নিয়ে খিটিমিটি বেধে গেল। তারপর তুমুল ঝগড়া। আমি ঝগড়ায় এমন উন্মত্ত হয়ে গেলাম যে, পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে-যাওয়া একটা পায়ে-চলা রাস্তা দেখে বললুম, আমি ঐ রাস্তায় যাব—ঐটাই সর্টকাট। কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজী হলো না, দু'একজন আমাকে বারণ করল। আমি তখন নামতে শুরু করেছি।

খানিকটা বাদে বুঝতে পারলুম কি ভুল করেছি। পায়ে-চলা পথ আর দেখা যায় না, মিলিয়ে গেছে জঙ্গলে। আমি নামার ঝোঁকে অনেকখানি নেমে এসে দাঁড়ালাম, বুঝতে পারলুম, ফেরার আর উপায় নেই। খাড়া পাহাড়—অতিকষ্টে ঝোঁক সামলে নীচে নামা যায়। কিন্তু ওপরে ওঠা যায় না। খানিকটা ওঠার চেষ্টা করে হাঁপিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলুম এতদূর নেমে এসেছি যে, ওপরের রাস্তাটা আর দেখা যায় না। পায়ের কাছে অনেকটা সমতল হয়ে এসেছে—শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, কোথাও এক বিন্দু আলোর চিহ্ন নেই। আমার সঙ্গে হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের ছড়ি—আর কিছু না, একটা টর্চ না পর্যন্ত। আমি জঙ্গলে পথ হারালাম।

মনে আছে সেই রাত্রির কথা। ভাল্লুক আর চিতাবাঘ বেরোয় ঐ জঙ্গলে শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর পাহাড়ে চিতিবোড়া সাপ, যার একটা আমরা আগের দিন নিজেরাই দেখেছিলাম। বন্ধুদের নাম ধরে ডাকলুম। কোনো সাড়া নেই। ওরা শুনতেও পাচ্ছে না বা এগিয়ে গেছে। বেশি ডাকতেও সাহস পেলুম না—শব্দ করতে যেন ভয় করছিল। পাগলের মতো হন্যে হয়ে ছুটতে লাগলুম। তারপর একবার ক্লান্ত হয়ে বসলাম এক খণ্ড পাথরের ওপর। ছড়িটা দিয়ে চারপাশ পিটিয়ে দেখে নিলাম সাপ আছে কিনা কাছে। বসে থেকে এমন অসহায় লাগতে লাগল। কোনো গাছের ওপর বসে যে রাত কাটাব তারও উপায় দেখলুম না —লম্বা লম্বা শালগাছগুলো অনেকদূর উঠে গেছে সিধেভাবে—তারপর ডালপালা ছড়িয়েছে। ও গাছে চড়া আমার সাধ্য নয়।

চুপ করেই বসে রইলুম। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিল, কেঁপে উঠল গাছের

পাতাগুলো। আমি স্পষ্ট গলায় আওয়াজ শুনতে পেলাম, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! ফিসফিস করে কেউ বলল আমার মাথার উপরের গাছটা থেকেই। আমি একটু নড়েচড়ে বসলুম। আবার এক ঝলক হাওয়া দিতে সামনের গাছ থেকে ফিসফিস শব্দ হলো, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! আমি উপরের দিকে তাকালুম। দুটো গাছ যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলছে, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! তারপর বেশ জোরে হাওয়া দিল একবার—আশেপাশের সবগুলো গাছ বলে উঠল : আহা-হা, লোকটা, লোকটা!

মনের ভুল সন্দেহ কি। কিন্তু এরকম মন বা কানের ভুল হবেই বা কেন? শুনেছি মরুভূমিতে অনেক লোক পাগল হয়ে যায়, আমিও কি শেষে জঙ্গলে...? উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। বেশ হাওয়া দিচ্ছে তখন, সারা বন বলছে, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! নিষ্ঠুর কৌতুকের নয়, করুণ সহানুভূতিময় সেই স্বর, যেন শত শত বৃক্ষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—আমি ছুটতে লাগলুম।

হঠাৎ একবার বাতাস থেমে গেল। তারপর আর এক ঝলক বাতাস বইতেই আমি অন্যরকম কথা শুনতে পেলুম। এইখানেই অলৌকিক দৃশ্যের আরম্ভ। আমি থেমে দাঁড়ালুম। এবার শুনতে পেলুম—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই প্রথম শিহরণ হলো। গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে সর সর শব্দ করে আমাকে বলছে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আমি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলুম। আবার শুনতে পেলাম : ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।

চিৎকার করিনি, কিন্তু মনে মনে জিজ্ঞেস করলুম, কোন দিকে? বোবা বৃক্ষেরা কথার উত্তর দেয় না। শুধু নিজেরা কথা বলে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। কি রকম বোবা ওরা কি জানি।

আমি ডানদিকে ঘুরলুম। আর কোনো কথা নেই। হাওয়া থেমে গেছে। এবার সবাই আমাকে দেখছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। ডান দিকেই হাঁটতে লাগলুম। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আবার হাওয়া উঠল। আবার শব্দ উঠল, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। থেমে দাঁড়িয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিলুম। তখনও শব্দ—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। দাঁড়িয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলুম। শব্দ থেমে গেল।

তারপর যতক্ষণ হেঁটেছি—ভুলে গিয়েছিলাম বাঘ-ভাল্লুক বা সাপের কথা। শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনেছি গাছের পাতার সরসরানি। মাঝে মাঝে থেমে ওদের নির্দেশমতো চলেছি। একটু পরেই দেখতে পেলুম, দূরে ডাক-বাংলোর আলো, শুনতে পেলুম বন্ধুদের গলার আওয়াজ।

২০

মানিকতলার দিকে রাস্তাঘাট ভালো চিনি না। তাই এক রাস্তা খুঁজতে গিয়ে অন্য রাস্তায় চলে যাই। একটা সরু গলি দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এমন একটা চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম, যার দু'দিকের সব বাড়িগুলোই নতুন। সম্ভবত রাস্তাটাই নতুন। কিন্তু রাস্তাটা ভালো নয়। চতুর্দিকে এখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, জলকাদা জমে আছে। একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে নেমন্তন্ন বলে সেদিনই আমি আবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছি।

অভ্যেস নেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরার, নেহাৎ মায়ের নির্দেশে পরতে হয়েছে। যে কোনো সময় ধুতির কোঁচা খুলে যাবার ভয়। তার ওপর আবার কাদা বাঁচিয়ে চলতে হবে।

বেশি সাবধান হবার জন্য আমি ফুটপাথের ধার ঘেঁসে হাঁটছিলাম। একটা ছোট ব্যালকনির নীচ দিয়ে যাবার সময় ওপর থেকে কি যেন পড়ল আমার গায়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল গরম জল। তারপর তাকিয়ে দেখি আমার জামাটায় খুনখারাপি রঙের আধুনিক ছবি। কেউ ওপর থেকে পানের পিক ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দিকে তাকালাম। কেউ দ্রুত পালিয়ে গেল ভেতরে, এটা বুঝলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না কাউকে।

জামাটার অবস্থা দেখে আমার প্রায় কান্না পাওয়ার জোগাড়। সদ্য পাটভাঙা আদ্দির জামায় পানের পিকের রং সাঙ্ঘাতিক খুলেছে। আমার ঘেন্না ঘেন্না করতে লাগল। পানের পিক মানে তো অন্য একজনের এঁটো থুতু। ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে রাগও চড়তে থাকে।

ঝিমঝিমে দুপুর, রাস্তাটায় আর লোকজন নেই। একটা রিক্সাওয়ালা শুধু যেতে যেতে আড় চোখে দেখছে আমাকে। নিশ্চয়ই লোকটা মুখ ফিরিয়ে হাসছে।

যে বাড়ির লোক এই অপকীর্তি করেছে, সেই বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে কৈফিয়ৎ চাইব? যদি অস্বীকার করে? এ পাড়ায় আমি অচেনা, যদি ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেয়?

একটু দূরে একটা পানের দোকান, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। শুনেছি চুন ঘষলে লাল রং মিলিয়ে যায়।

দোকানদারকে বললাম, ভাই একটু চুন দেবে?

লোকটি আমার সর্বাঙ্গ ভালো করে দেখল, তারপর ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, ও চুন ঘষলেও কিছু হবে না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে এখুনি জলে ডুবিয়ে দিন।

বাড়ি আমার অন্তত পাঁচ মাইল দুরে, সেখানে এক্ষুনি পৌঁছানো যায় না। তাছাড়া আমার শ্রাদ্ধবাড়িতে যাওয়ার কথা। শ্রাদ্ধ বাড়িতে কেউ রঙীন জামা পরে

যায় না বলেই প্যান্ট-সার্ট ছেড়ে আজ আবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসা। সেই পাঞ্জাবিব এই পরিণতি।

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য আমি সিগারেট কিনে ধরালাম। চোখ রাখলাম সেই ব্যালকনির দিকে। সব অপরাধীই নাকি অকুস্থলে ফিরে আসে একবার না একবার। যে পানের পিক ফেলেছিল, সে আসবে না?

বাড়িটা ছাই রঙের। তিনতলা। কিন্তু বাবান্দাটা দোতলায়। ঘর ও বারান্দা --মাঝখানের কাচের দরজাটা খোলা। ভেতরে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কেউ হাঁটাচলা করছে, এটা বোঝা যায়। আমি চোখ খর করে রইলাম।

একটা সিগারেটের পর আর একটা। না দেখে যাব না। দেখতেই হবে, কে আমাকে আজ এমন বিপদে ফেলল।

হঠাৎ একটি উনিশ-কুড়ি বছবের মেয়ে দৌড়ে এল বারান্দায়। রেলিং ধরে ঝুকে ডাকল। রিক্সা রিক্সা।

আমি দেখলাম মেয়েটির ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। পিঠের ওপর চুল খোলা। হলুদ শাড়ি পরা। দুপুরের রোদ্দুরে সেই শাড়িটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

রাস্তা দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল। মেয়েটির ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। মেয়েটি বোধহয় ঘরের ভেতর থেকেই রিক্সাটা দেখতে পেয়েছিল। সে আর কোনোদিকে তাকাল না বলেই সন্দেহ হয় যে সে জানে সে একটা অপরাধ করেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওই টুকটুকে লাল রঙের ঠোঁটের জন্য মেয়েটিকে বেশি সুন্দর দেখাল। পান খাওয়া সবাইকে মানায় না, ওকে মানিয়েছে।

কোনো বুড়ো-টুড়োব পানের পিক যে আমার জামায় পড়েনি, সেটা জেনে আমার ঘেন্নাব ভাবটা একটু কমল। কিন্তু মেয়েটির তো উচিত আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত! এটা অন্যায়।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই মেয়েটি নেমে এল নিচে। একা। রিক্সায় উঠে বসে বলল, চলো।

রিক্সাটা এদিক দিয়েই যাবে। আমি মোড়েব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম মেয়েটিকে ডাকব। পরে মত বদলালাম। অচেনা রাস্তা, একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে গেলে যদি কেউ অন্যরকম কিছু ভাবে? মেয়েটি যদি পানের পিক ফেলার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে?

ঠিক আছে, ওকে ক্ষমা চাইতে হবে না ও শুধু দেখুক। দেখে লজ্জা পাক অন্তত। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনোদিন বারান্দা দিয়ে রাস্তায় পানেব পিক না ফেলে।

মেয়েটি একবারও তাকাল না আমার দিকে। আগাগোড়াই অন্য ফুটপাতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল, রিক্সাটা চলে গেল বড়ো রাস্তায়।

আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হলো এরকম দুঃখ আমি বহুদিন পাইনি। দুঃখ এবং অপমান।

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। বড়ো রাস্তায় এসে পড়ার পর বুঝলাম, সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। এরকম ভাবে হাঁটা যায় না। রিক্সা নিয়ে চলে যাব শ্রাদ্ধবাড়ি? এই পোশাকে? সেখানেও যদি সবাই আমাকে দেখে হাসে? শোকের বাড়িতে হাসি-ঠাট্টার বিষয়বস্তু হওয়া কি ভালো?

কাছাকাছি একটা টিউবওয়েল দেখে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললাম। পানের পিকলাগা জায়গাটা ধুয়ে ফেললে যদি কোনো সুরাহা হয়। কোনো কালে জামা কাপড় কাচার অভ্যেস নেই আমার। অনভিজ্ঞ হাতে ধুতে গিয়ে পুরো জামাটাই প্রায় ভিজে গেল—সেটা আবার পরবার পর মনে হলো। আমি যেন দোল খেলে ফিরছি।

ঘটনাটা আমি বেশ কিছুদিন ভুলতে পারিনি। মেয়েটির মুখ আমার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। তিন-চারদিন বাদে আর একবার উত্তর কলিকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হতে আমি মানিকতলার সেই গলিটাতেও আর একবার গেলাম। যদি মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা হয়। দেখা হলে আমি কিছুই বলতাম না হয়তো। একলা হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললাম, আমার দিকে একবার অন্তত তাকান উচিত ছিল না কি?

আরো দিন চারেক বাদে, এসপ্লানেড পাড়ার একটি সিনেমা হলের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে একটি শাড়ি পরা মেয়েকে উঠে যেতে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। এই তো সেই মেয়েটি! ওর মুখ দেখতে পাইনি, তাড়াতাড়ি উঠে হলের মধ্যে ঢুকে গেল, পেছন থেকে চুলটা মনে হলো অবিকল সেই রকম।

কী করে ওকে খুঁজে পাওয়া যায়? শো আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার টিকিট নীচের তলায়, সেখানে বসে আমি ছটফট করতে লাগলাম। একবার সন্দেহ হলো, হয়তো সেই মেয়েটি নয়। সেদিন সে হলদে শাড়ি পরেছিল, আজও তাই পরবে? মেয়েরা কি একই শাড়ি এত তাড়াতাড়ি পরে?

ছবি শেষ হবার পর আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে রইলাম তীক্ষ্ণ চোখে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। এমনকি সেই রকম হলুদ শাড়ি পরা কোনো মেয়েকেই দেখলাম না। তাহলে কি আমার চোখের ভ্রম? কিংবা, মেয়েটি কি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে? মেয়েদের তো পিঠেও একটা করে চোখ থাকে, তাতে তারা সব কিছুই দেখতে পায়।

কয়েকদিন বাদে আমার মনে হলো এটা আমার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। কেন ওই একটি মেয়ের কথা আমি বারবার ভাবছি। কেন ওকে নানান জায়গায় খোঁজার চেষ্টা করছি? সামান্য একটা ব্যাপার, মেয়েটি ভুল করে পানের পিক ফেলেছিল, ওর নিশ্চয়ই সে কথা আর মনেই নেই। আমার সঙ্গে যদি দৈবাৎ মেয়েটির কোথাও দেখা হয় ও আমাকে নিশ্চিত চিনতে পারবে না। কি করে চিনবে, ও তো আমাকে দেখেইনি।

পাঞ্জাবিটা ডায়িং ক্লিনিং থেকে কেচে এসেছে, কোনো দাগ আর নেই। সুতরাং আমার মন থেকেও দাগ মুছে ফেললাম। আমি মেয়েটিকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি মনে মনে তার উদ্দেশ্যে বললাম—তোমার আর অস্বস্তিতে থাকার দরকার নেই, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, বুঝলে? সত্যিই ক্ষমা করে দিয়েছি।

এরপর বছরখানেক কেটে গেছে। আমার মাসতুতো বোন সুজয়ার বিয়েতে আর একটা ঘটনা ঘটল। আমার নেমন্তন্ন খাওয়া হয়ে গেছে, সুজয়ার সঙ্গে দেখা করেই কেটে পড়ার ইচ্ছে। বাসরঘরে সাঙ্ঘাতিক ভিড়। দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছি।

বারান্দায় এক পাশে সুজয়ার ছোট বোন সুস্মিতা তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। একটি ছেলে প্লেটে করে কিছু পান নিয়ে যাচ্ছিল, সুস্মিতা তাকে ডাকল। বন্ধুদের সে পানগুলো বিলি করে দিল। তার এক বন্ধু বলল, আমি পান খাই না।

সুস্মিতা আমাকে ডেকে বলল, সুনীলদা, তুমি পান খাবে? আমি বললাম, না রে।

সুস্মিতা তার বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ করাতে চাইল। যে-মেয়েটি বলেছিল, আমি পান খাই না, তার নাম গীতি। বেশ লম্বা, কায়দা করে খোঁপা বাঁধা, একটা সবুজ সিল্কের শাড়ি পরা।

আমাকে হাত জোড় করে নমস্কার করে সে হঠাৎ মুচকি হেসে বলল, আমি মানিকতলায় থাকি। আমি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমি চমকে উঠলাম। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। তাকে আমার চিনতে পারার কোনো কথাই নয়। কিন্তু সে কি করে আমাকে চিনল? নইলে নিজের থেকে এ কথা বলল কেন?

হঠাৎ বাসরঘর থেকে ভিড়ের একটা ঢেউ বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল আর একটা ঢেউ। আমরা ছিটকে গেলাম। সেই মেয়েটিকে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে। তার সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

কেন সে পান খাওয়া ছাড়ল? আমি তো তাকে একদম ক্ষমা করে

দিয়েছিলাম। এবং একথাও ঠিক, পান খেয়ে লাল করলে তার ঠোঁট দুটি বেশি মানায়। একথা তাকে বলা হলো না। সে আমাকে হারিয়ে দিল একেবারে।

২১

মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। কেন এরকম হঠাৎ হঠাৎ ট্রেন থেমে যায়, কেউ জানে না। তবু থামে। যথারীতি অসহ্য ভিড়। বহু লোক দাঁড়িয়ে। যারা দাঁড়িয়ে—চলন্ত ট্রেনের চেয়েও থেমে-থাকা ট্রেনে তাদের কষ্ট যেন বেশি। বাইরের মাঠে হা-হা করছে রোদ। খালগুলি প্রায় শুকিয়ে গেছে, তার ধারে ধারে বসে আছে কয়েকটা নিথর বক। আশ্চর্য ওদের ধৈর্য।

আমি একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম, জানলার ধারেই। সুতরাং অন্যান্য অনেক যাত্রীর তুলনায় আমাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলা যায়। যদিও গায়ের ওপর লোকজন হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ছে, অসহ্য ঘামের গন্ধ। এর মধ্যে আছে আবার নানান ফেরিওয়ালা।

দূর থেকে একটা গান ভেসে আসছে। বাউল গান। ট্রেনে এরকম হরদম শোনা যায়। অল্পবয়েসী ছেলের গলা। মন্দ নয়, শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল।

কেন যেন গানটা শুনতে শুনতে মনে হলো, ছেলেটা অন্ধ। এরকম মনে করার কোনো কারণই নেই। কণ্ঠস্বর শুনে অন্ধ কিনা বোঝা যাবে কি করে। তবে, ট্রেনে অনেক সময়েই অন্ধ ভিখিরির গান শুনতে পাই, সেই জন্যই বোধহয় এরকম মনে এসেছিল।

গানটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। এক সময় শোনা গেল আমাদেরই কামরাতে। তাকিয়ে দেখলাম, একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর, পুরোদস্তুর বাউলের পোশাক, হাতে একটা একতারা এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যিই ছেলেটি অন্ধ! হঠাৎ এই সব ব্যাপার মিলে গেলে কি রকম যেন একটু ভয় ভয় করে।

ছেলেটির গানের গলা বেশ ভালোই। বেশ জোরালো। পর পর গেয়ে যাচ্ছে এবং অন্য কারুর সাহায্য না নিয়েই সে ভিড় ঠেলেঠুলে এগুচ্ছে।

সব সময় ভিখিরিকে আমি ভিক্ষে দিই না। কিন্তু কারুর গান শুনে যদি ভালো লাগে, তবে সেই সঙ্গীতশিল্পীকে কিছু পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো পয়সা বার করে হাতে রাখলাম।

ছেলেটি বেশ ভালোই পয়সা পাচ্ছিল, হাত ভরা তার খুচরা পয়সা। একবার

একটি লোকের সঙ্গে তার কি যেন একটা কথা হলো। আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম না। হঠাৎ ছেলেটি গান থামিয়ে জোর করে সবাইকে ঠেলে এগুতে লাগল। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি তাকে বললাম, এই যে একটু দাঁড়াও।

সে বোধহয় শুনতে পেল না। থামল না।

আমি তার একটা হাত ধরে আমার পয়সাটা গুজে দেবার চেষ্টা করলাম।

সে হাতের একটা ঝটকা মারল, পয়সাটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

আশেপাশের কয়েকজন লোকও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা কেউ কেউ বলল, এই যে সুরদাস, একটু দাঁড়াও—বাবু তোমাকে পয়সা দিচ্ছেন।

ছেলেটি এর পরে আর একটি আশ্চর্য কাণ্ড করল। সে অন্য হাতের পয়সাগুলোও ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। অনেকগুলো পয়সা।

তারপর দরজার কাছে হ্যাণ্ডেল ধরে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। হন হন করে একদিকে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

ঘটনাটা রহস্যময়। কিন্তু আজও আমি ছেলেটার ওই রকম রাগের কোনো ব্যাখ্যা পাই নি। সে কেন হঠাৎ সব পয়সা ফেলে দিল? ভিখিরির কি এত রাগ মানায়? যে-লোকটির সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছিল, আমরা সকলেই সেই লোকটির দিকে তাকালাম। সে বলল কই, আমি তো তেমন কিছু বলিনি। আমি শুধু বললাম, ডান দিকে যাও।

এর পর সমস্যা দাঁড়াল, ঐ পয়সাগুলো কি হবে? এতগুলো পয়সা মাটিতে পড়ে থাকলে দেখতে বিশ্রী লাগে। অথচ সকলেই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

আমার পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, আপনার সিকিটা—

তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি হাত চেপে ধরে বললাম, থাক।

আমার সিকিটা অত পয়সার মধ্যে মিশে গেছে। নিজের সিকিটা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। অন্য পয়সাই বা আমি নিই কি করে? ভিক্ষের পয়সা।

তারপর ট্রেন ছাড়ল। এত ভিড়ের মধ্যেও সকলেই এমনভাবে দাঁড়াল, যাতে ওই পয়সাগুলোর ওপর পা না পড়ে। একজন কেউ গোপনেও একটা পয়সা নিল না।

যেন ওইগুলো পবিত্র পয়সা, অন্য কারুর হাত দেবার উপায় নেই।

২২

ক্লিয়োপেট্রার যদি নাকটা একটু ছোটো হতো, তা হলে সীজার কিংবা এ্যান্টনি অমনভাবে হয়তো তার প্রেমে পড়তেন না। অত সহজে তা হলে কি আর ভেঙে যেত রোমান সাম্রাজ্য—খৃস্টধর্ম হতো আরো বিলম্বিত, পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো হতো অন্যরকম। অথবা, তারও আগে, মদ খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করে অত অল্প বয়সে যদি মারা না যেতেন মহাবীর আলেকজান্দার, তা হলে ম্যাসিডোনিয়ার ঐ তেজি ছোকরা পৃথিবীর চেহারা কি রকম করে দিতেন কে জানে। তাঁর মৃত্যুর পরই অমন করুণ দশা হতো না বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্যের, আর একবার কি ভারতবর্ষের শেষ দিকে এই বাংলা দেশ পর্যন্ত আসার চেষ্টা করতেন না! কিংবা ওয়াটার্লুর মাঠে যদি হঠাৎ বৃষ্টি না হতো, যদি রোখা না যেত নেপোলিয়নকে, তা হলে আমরা আজ নিশ্চিত ইংরেজির বদলে ফরাসি শিখতুম। টিপু সুলতানকে অত সহজে ঘায়েল করে ভারতে মাঠে মাঠে আর ইংরেজের বিউগল বাজত না তবে। কিংবা নর্মাণ্ডি অবতরণের সময় হিটলার যদি স্লিপিং পিল খেয়ে না ঘুমোতেন—যদি তিনি প্যানজাব বোমারু বাহিনী ছেড়ে দেবার হুকুম দিতেন—তা হলে কোনোদিকে ঘুরে যেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে জানে, কে জানে ঐ রণদুর্মদ রক্তপাগল পৃথিবীতে আরো কত কেলেংকারীর স্রোত বইয়ে দিতেন।

ইতিহাসের অনেক বিশাল সন্ধিক্ষণে এমন অনেক মজার ছোটোখাটো ঘটনা আছে। জয়পালের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অমন বদ মতলব যদি পৃথ্বীরাজের না হতো—তা হলে ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্য আরো কত বিলম্বিত হতো বা আদৌ হতো কিনা অমন জল্পনা করার লোকের অভাব নেই। একজন লেখক লিখেছেন—নর্মাণ্ডিতে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের আসল কারণ নাকি রোমেলের স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সাদা জুতো। রোমেল কারুকে না জানিয়ে বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীকে উপহার দেবার জন্য ফ্রন্ট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। নইলে রোমেল থাকলে অত সহজে—। হয়তো, এসব জল্পনাই। ইতিহাস অত সহজে বদলায় না, সে তার নিজস্ব গতি নেবেই।

পৃথিবীর কয়েকটি ভৌগোলিক বদল সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। কয়েকটি ভৌগোলিক পরিবর্তন মানবসভ্যতার কি আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে, সেগুলি না ঘটলে এ পৃথিবীকে নিশ্চিত অন্য পৃথিবী মনে হতো। যেমন হিমালয় পর্বত যদি না থাকত ভারতের উত্তরে; সাহারা মরুভূমি যদি মরুভূমি না হতো সত্যিই। অর্থাৎ যেমন ছিল আগে।

ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, যেখানে এখন হিমালয়, আগে সেখানে ছিল এক অতি গভীর সমুদ্র, নাম তার টেথিস, হিমালয় তার কত নীচে ডুবে ছিল কে জানে।

অসম্ভব ছিল না ডুবে থাকা। হিমালয়ের উঁচু শিখর এভারেস্টের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ মাইলের কাছাকাছি, পৃথিবীর গভীর মহাসমুদ্রগুলির এখনো কোথাও কোথাও গভীরতা ছ' মাইলের বেশি। যাই হোক, তার পর একদিন প্রকৃতির খামখেয়ালে হলো বিষম ভূমিকম্প, টেথিস সাগর গড়িয়ে এল ভারতের নীচের দিকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অনেকখানি ভূভাগ, দূরে সরে গিয়ে এখন তার নাম অস্ট্রেলিয়া, জন্ম হলো দুটি ছেলেমেয়ে উপসাগর সমেত ভারত মহাসাগরের।

হিমালয় না থাকলে কি হতো ভারতবর্ষের? কাব্য সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হতো—তা ঠিকই, ম্রিয়মাণ কালিদাসের মুখ এখনই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে কোনো পাহাড় নেই, তাদের কাব্য সাহিত্য কিন্তু সেজন্য কম সম্পদশালী নয়, তারা সমুদ্রের বন্দনা করেছে।

এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত হতেন জগন্মাতা দুর্গা সমেত মহাদেব, পদব্রজে স্বর্গে যাবার কোনো উপায় থাকত না যুধিষ্ঠিরের। কোথায় থাকত পুণ্যসলিলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুই বা যেত কোথায়। হিমালয়ের গায়ে অনেক জলজ জন্তু-মাছের অস্থিজীবাশ্ম পাওয়া গেছে, কিন্তু তবুও মুনি-ঋষিরা অপবিত্র স্থানে তাকে কখনো বর্জন করেন নি, ঐ নাগাধিরাজের গুহা কন্দরেই একদিন ভারতবর্ষের মহা ওঙ্কার ধ্বনি প্রথম জেগেছিল।

হিমালয় ব্যতীত ভারতবর্ষ হতো শীতপ্রধান দেশ। সাইবেরিয়া থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত সারা বছর, আমরা সবাই হতুম ফর্সা লোক। মৌসুমী হাওয়া হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে সারা উত্তর ভারতে যে বৃষ্টি ছড়াচ্ছে—সেটা পাওয়া যেত না। বঞ্চিত হতুম বিশাল অরণ্যসম্ভার থেকে। ঐ বিশাল প্রহরী না থাকলে রাশিয়া থেকে ভারত আক্রমণ হতো বহুবার নিশ্চিত।

হিমালয় না থাকলে নেপাল-ভূটান-সিকিম-তিব্বতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না আমাদের। পাহাড় ঘেরা ছিলুম বলে বহুকাল আমরা শুধু ভারতবর্ষকেই সারা পৃথিবী বলে জানতুম। হিমালয় বাইরের শত্রুর কাছে ভারতকে দুর্ভেদ্য করেছিল, আবার তার বিপরীত অর্থে, ভারতের বাইরে ভারতের ক্ষমতা বিস্তারের কথা কখনো মনে পড়েনি। ফলে, আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে গেছে রক্ষণশীল। এখনো তার জের চলছে,—কিন্তু কে না জানে, আন্তর্জাতিক গুণ্ডামিতে সবসময় রক্ষণাত্মক ভঙ্গী নিলে, শেষ পর্যন্ত আর আত্মরক্ষা করা যায় না। সেই জন্যই বাইরের শত্রু এসে বহুবার অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পর্যুদস্ত করেছে। চোখের সামনে অমন গগনভেদী পাহাড়—তারই বন্দনা করেছি আমরা, ঐ বিশাল রহস্যের ভেদ করতে চাইনি বলে আমাদের জাতীয় চরিত্রও হয়ে গেছে মিস্টিক। আমরা সমুদ্রকে উপেক্ষা করেছি। অথচ সমুদ্রজয়ী জাতিগুলিই একদিন পৃথিবী

জয় করেছে। হোমার লিখলেন ইউলিসিসের অজানা সমুদ্রের অভিযান, আর আমাদের দৌড় লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত, তাও সেতুবন্ধন করে, জাহাজ-টাহাজ নয়, জলস্পর্শ বারণ! প্রাচীন হিন্দুরাজারা নৌবিদ্যায় রয়ে গেলেন অজ্ঞ—তারপর মুসলমান শাসকরা এল আরবের মরুভূমি, পাহাড় থেকে, তারা ভালো করে সমুদ্র চোখেই দেখেনি! উত্তরে হিমালয় ভারত পাহারা দিচ্ছে, এই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রায় তিন দিকের উপকূল রয়ে গেল চিরকাল অরক্ষিত।

হিমালয় না থাকলে ভারতের দক্ষিণে আরো জমি থাকত। জনসমস্যার সমাধান হয়ে যেত কত সহজে। আলাদা হতো না সিংহল, সুতরাং সিংহল প্রবাসী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কোনো কথাই উঠত না। যে স্থলভূমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওখান থেকে, তা যদি হয় আজকের অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ, বাংলাদেশের নীচের ভাঙা জায়গাটায়—সারা বঙ্গোপসাগর জুড়ে কি চমৎকার ফিট করে যায়—তা হলে, আরো অতখানি জমি থাকত ভারতের অধিকারে, কি বিশাল হতো বাংলাদেশ, বিভক্ত হলেও উদ্বাস্তু সমস্যা থাকত না নিশ্চিত। তার বদলে, আজ সেই অস্ট্রেলিয়ায় জুড়ে বসেছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসে ইওরোপিয়রা, আজ এমন স্পর্ধা তাদের যে, কালো লোকদের—ভারত সমেত,—ইমিগ্রেশান বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

তা হলে হিমালয়কে নিয়ে অত উচ্চতার গর্ব থাকত না আমাদের—তাও তো এভারেস্ট চূড়া ঠিক ভারতবর্ষের নয়, নেপালেরই প্রায়,—কিন্তু ভারতের ব্যাপ্তি হতো আরো বিশাল, চীনের সমকক্ষ। তাহলে শীতকালে, সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জুঁই ফুলের মতো, বরফ পড়ত, ভারতের আবহাওয়া হতো অনেকটা আমেরিকারই মতো। কে জানে, রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় আমেরিকা এই ভারতই হতো কিনা।

ভূগোলের এই রকম আর একটা খামখেয়াল ঘটেছিল সাহারা মরুভূমিতে। ভূতাত্ত্বিকরা যাঁকে বলেন চতুর্থ বরফ যুগ, সেই সময় আফ্রিকা ছিল অনেক সুযোগভুক্ত, সাহারা ছিল শ্যামল জলাভূমি। তখন কি দুর্দশা ইওরোপের, সমগ্র উত্তর ইওরোপ বরফে ঢাকা, আল্পস ও পিরেনিজ থেকে বিশাল বিশাল বরফের চাঁই নেমে আসত। প্রায় গোটা ইওরোপই ছিল মনুষ্যবাসের অনুপযোগী, ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোমশ হাতী, পশমওলা গণ্ডার। আর সাহারায় তখন অগভীর জল, নলখাগড়ার বন, নানারকম ছোট সাইজের জানোয়ার, অনেক সুস্বাদু মাছ—আর এক জাতের মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে সেগুলো মেরে মেরে বেশ সুখে আছে। টাটকা মাছ, মাংস আর বনের ফলমূল, তখনও আগুনের ব্যবহার আসেনি, সুতরাং রাগ হিংসা আসেনি। সেই সময় যদি সভ্যতার ভোর শুরু হতো।

কিন্তু তা হয়নি। আরম্ভ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বরফ সরে যেতে লাগল আর্কটিক মহাসমুদ্রের দিকে—সারা ইওরোপে জন্মাল অসংখ্য চারাগাছ, কত রকমের ঘাস ফুল। ফুল থেকে এল ফল, তারপর বনস্পতি, সুবাতাস, যাযাবর মানুষ। ইওরোপ হয়ে উঠল মনুষ্যবাসের রম্যভূমি। আটলান্টিক থেকে বর্ষার জোলো হাওয়া মুখ ফিরিয়ে বইতে লাগল উত্তর ইওরোপে, দিতে লাগল সুফলা বৃষ্টি। সে হাওয়া আর মুখ ফিরিয়ে এল না আফ্রিকা-এশিয়ার বিশাল ভূমিখণ্ডে, সাহারা শুকিয়ে গেল, হা-হা করতে লাগল তৃষ্ণায়, পরিণত হলো পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমিতে। সেই মরুভূমির ছোঁয়াচ লাগল আশেপাশেও। আফ্রিকার আর জাগা হলো না।

যদি অচলাবস্থা বজায় থাকত—তবে কে জানে, আফ্রিকানদের দর্পিত পদভারেই সারা পৃথিবী টলমল করত কিনা এতদিনে। ইওরোপের বরফ গলতই একদিন—কিন্তু ততদিনে বৃষ্টিহীন আফ্রিকা যদি কালো না হয়ে যেত—তবে, প্রস্তুত হয়ে থাকত একদল সংঘবদ্ধ মানুষ, তারাই বেরিয়ে পড়ত ইওরোপ দখলে। প্রকৃতির পরিহাসে তা তারা পারেনি, সাহারা থেকে ভ্রষ্ট প্রধান আদিম মানুষের দল যাযাবর হয়ে যায়। নিজেরা সভ্যতা গড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে—তাই সভ্যতার ওপর জাতক্রোধ জন্মে যায় হয়তো তাদের। পৃথিবীর নানান সভ্যতা এদের প্রচণ্ড আক্রমণে বারবার কেঁপে উঠেছে। দুর্ধর্ষ তাতার, হুণেরা ঐ যাযাবরদেরই বংশধর।

সাহারা যদি শস্যশ্যামলই থাকত, আর ইওরোপ বরফ ঢাকা—তা হলে কি হতো পৃথিবীর ইতিহাস কে কল্পনা করতে পারবে। এত দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকার বদলে আজ আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই হয়তো হতো জয়জয়কার। হয়তো নিগ্রোদের মতো কালো হওয়াই হতো খুব সুন্দর হওয়ার চিহ্ন।

২৩

সেই কলেজে পড়ার সময় বন্ধুবান্ধবেরা মিলে দল বেঁধে একবার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে গিয়েছিলাম। ব্যাঙ্ক বলতে সেইটুকুই যা আমার জানা ছিল। ব্লাড ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোনো ব্যাঙ্কে আমি অ্যাকাউন্ট খুলিনি দীর্ঘকাল।

তারপর এই কিছুদিন মাত্র আগে, হঠাৎ আমি শ-খানেক টাকার একটা চেক পেলাম, নিশ্চিত পূর্বজন্মের ঘোরতর পুণ্যবলে। কিন্তু পূর্বজন্মের পুণ্যফল, বর্তমানের পাপ-জন্মে সইবে কেন, সেই থেকেই শুরু হয়ে গেল আমার দুর্ভোগ।

চেকখানা পাবার আগে কি সুখেই না ছিলাম। যখন পকেটে পয়সা থাকত না তখন মন-প্রাণ খুব সূক্ষ্ম হয়ে যেত, দার্শনিক তত্ত্ব তখন আমি আবিষ্কার করেছি। পকেটে টাকা থাকলেও খুব একটা অসুবিধে দেখা দেয়নি, টাকা মানে নিছক টাকা, এই মায়াময় জগতের আর একটি মায়ার টুকরো, এই আছে, এই নেই। টাকা জিনিসটার মানে ছিল খুব পরিষ্কার, এক টুকরো নীলরঙের কাগজ যা নাকি পরের হাতে যাবার জন্য উদগ্রীব। ঐ এক টুকরো কাগজের এমন গুণ, যা পকেটে থাকলে শীতকালে গা গরম লাগে, গরমকালে পৃথিবীটাকে মনে হয় এয়ারকণ্ডিসনড, ঐ ছাড়পত্র হাতে নিয়ে চিনেবাদামওয়ালা থেকে শুরু করে সিনেমার কাউন্টারের সামনে পর্যন্ত অনায়াসে দাঁড়ানো যায়। টাকার মানে যখন শুধু এই ছিল, আহা, তখন বড়ো সুখের দিন ছিল আমার। ঐ চেকটা হাতে আসার পর থেকেই শুরু হলো বিপত্তি।

চেক জিনিসটা টাকাও বটে, আবার টাকা নয়ও। ওটার দাম একশো টাকা, কিন্তু চিনাবাদামওয়ালার সামনে কিংবা সিনেমা কাউন্টারে ওর কোনো মূল্য নেই। চেকটায় আমার নাম লেখা—ক্রশড চেক। ওটা ভিখিরিকে দান করতে গেলেও নেবে না, মুরগির কাছে মুক্তোর মূল্য যেমন অর্থহীন। খুব খিদে পেটে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পাঞ্জাবির দোকান থেকে ভেসে আসছে ভুরভুর মুরগ মশল্লার গন্ধ, কিন্তু যদিও আমি গ্যাসটিক আলসারের রুগী নই এবং একশো টাকার মালিক, সেই মুহূর্তে আমার খাবার কোনো উপায় নেই। টাকা হলেও ক্রশড চেক যেন ব্ল্যাক মানি, লোকের সামনে বার করার কোনো উপায় নেই। একমাত্র ব্যাঙ্কে নিয়েই নাকি চুপি চুপি জিনিসটা ভাঙাতে হয়।

সুতরাং জীবনের প্রথমবার, আসল ব্যাঙ্কে গেলাম। ঢোকার মুহূর্তেই আমার কেমন যেন ভয় ভয় করা শুরু হলো। তখন তার কারণ বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে। তখন কল্পনাই করতে পারিনি কি গভীর বিপদের মধ্যে আমি ঢুকতে যাচ্ছি। ব্যাপারটা শুরু হলো এই রকমভাবে। তিন-চারটি কাউন্টার ঘুরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হবার পর, একটি পান-চিবোনো হিটলারি গোঁপবাবু পরিষ্কার ভাবে আমাকে জানালেন যে আমার পক্ষে ঐ চেকের বিনিময়ে টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ওটা যেহেতু ক্রশড চেক। সুতরাং ব্যাঙ্কে আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার। আমি খুব বিনীত সরলভাবে জানালুম, দেখুন, আপনি বিশ্বাস করুন

আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। যিনি চেকটা আমায় দিয়েছেন, এতে

এবং আমার অ্যাকাউন্ট নাইবা থাকল—তাঁর

। সুতরাং তাঁর টাকা থেকেই আমার পাওনা

মার ন্যায্য পাওনা।

হিটলারি গোঁপ তবুও মুসোলিনি ধরনের হেসে (কারণ, হিটলার হাসতে জানতেন না শুনেছি) বললেন, উহুঁ, আপনি নিজের অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আমি বললুম, কি মুস্কিল, আমি তো আর কারুকে টাকা দিতে যাচ্ছি না। আমি টাকা পাব। সুতবাং আমি অ্যাকাউন্ট খুলতে যাব কেন?

হিটলারি গোঁপের তবু সেই হিটলার সুলভ একগুঁয়ে কথা। আগে নিজের একটা অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, ঠিক আছে, খুলে নিন আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট।

—তাহলে টাকা নিয়ে ওদিকের কাউন্টারে যান।

টাকা? ব্যাঙ্ক থেকে আমি এসেছি টাকা নিতে, টাকা দিতে যাব কেন? নিজের প্রাপ্য একশো টাকা পাবার জন্য, আমাকে পকেট থেকে আরো টাকা খরচ করতে হবে? যাই হোক। আমার পকেটে সেদিন কোনো টাকাকড়ির ব্যাপার ছিল না বলে সেদিন চুপি চুপি চলে এলাম ব্যাঙ্ক থেকে।

কত টাকা লাগবে কে জানে, সেই একশো টাকা ভাঙাবার জন্য আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে আবার ব্যাঙ্কে এলাম। এবার যার কাছে আমায় আসতে হলো, তাঁর গলার ভারিক্কী স্বর শুনে মনে পড়ে সেই তার কথা যিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ছদ্মবেশে স্বয়ং ধর্মরাজ। গমগমে গলায় তিনি আমায় বললেন, আপনার কোনো সাক্ষী আছে? আমি ভাবলুম, আমি তো কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়িনি, জ্ঞানত কখনো খুন কিংবা রাটপাড়ি করিনি, তবু আমার সাক্ষী দরকার কিসে? ভয়ে ভয়ে সেই সন্দেহ নিবেদন করলুম। গমগমে সেই কণ্ঠ আবার আমায় জানাল, আপনি যে আপনিই, তার প্রমাণ কি?

এই জন্যই ওঁকে দেখে প্রথমেই আমার ধর্মরাজের কথা মনে হয়েছিল। খাঁটি কথা বলেছেন। আমি যে আমিই এর প্রমাণ কি? আমি যে গাধা কিংবা ছুঁচো নই, দোলগোবিন্দ কিংবা ভস্মলোচন কিংবা লালিমা পাল নই, তার প্রমাণ কি? অন্য কারুকে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করাতে হবে। কিন্তু সে যে সে-ই, তার প্রমাণ কে দেবে? আমি যদি আমার বন্ধু ত্রিলোচনকে সাক্ষী হিসাবে আনি, তবে সেই সাক্ষী ত্রিলোচন যে সত্যিই ত্রিলোচন, তার প্রমাণ দেবার জন্য কি পঞ্চাননকে আনতে হবে? আবার পঞ্চানন যে সত্যিই পঞ্চানন তা প্রমাণ করার জন্য—

আমি আমার এ সন্দেহের কথা জানালুম।

গমগমে বাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, তাহলে, আপনার পাশপোর্ট আছে? চিরকাল কলকাতা শহরেই আছি, কখনো ঘাটশিলা কিংবা দুমকায় বেড়াতে গেছি,

ওর জন্য পাশপোর্ট তো লাগেনি। বাঙালও নই যে কখনো দ্যাশে যাবার জন্য পাশপোর্টের দরকার হবে। আর বিলেত আমেরিকায় যদি কখনো যেতুম, তবে কি এই সামান্য হাতের ময়লা একশো টাকা ভাঙাবার জন্যে নিজে ব্যাঙ্কে আসতুম। তবে তো, আর্দালি বেয়ারা পাঠিয়েই—।

তাহলে?

—তাহলে, এই ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউন্ট আছে—এমন কারুকে যোগাড় করুন। এসব কথা শুনলে রাগ হয় কি না?

তখন ইচ্ছে হয় না, যে লোক আমাকে ঐ চেকটা দিয়েছে, তার সঙ্গে ঝগড়া করি? কিংবা ঐ ব্যাঙ্কে ডিগবাজি খেতে শুরু করি, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের মতন আঙুলের মুদ্রায় দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলি, মাটি টাকা, টাকা মাটি, মাটি টাকা?

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে যেহেতু আমার কয়েক লক্ষ মাইল তফাৎ, তাই ওই একশোটি টাকার লোভও আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে এমন লোকের জন্য আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করি। খবরের কাগজে যে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র পাঁচ টাকা দিয়েই নাকি যে-কোনো সময়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, বুঝলুম সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। চাষাভূষো, কুলি-মজুর কিংবা আমার মতো বেকাররা ইচ্ছে করলেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না, আগে থেকেই অ্যাকাউন্টধারী সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে যাদের আলাপ পরিচয় নেই, তাদের টাকা জমাবার অধিকারও নেই। যাই হোক, বহু খোঁজাখুঁজি করে আমি একজন এরকম অল্পচেনা লোকের সন্ধান পেলুম ও অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁকে দিয়ে আমার আমিত্ব সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়ালুম।

অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকাটা যদি তুলে নিতাম আবার, তাহলে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকত না। কিন্তু, মানুষের তো লোভের শেষ নেই। আমার ইচ্ছে হলো, পঞ্চাশটা টাকা জমা রেখে দি। আবার যদি কখনো বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে কোনো ক্রশড চেক পেয়ে যাই, তাহলে আবার অ্যাকাউন্ট খোলার ঝামেলা সহ্য করতে হবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রাখাই তো সম্ভ্রান্ত হবার লক্ষণ, সুতরাং এই সুযোগে একটু সম্ভ্রান্ত হওয়া যাক না। এই লোভের ফলেই আমার বিপদের পর বিপদ শুরু হলো।

প্রথম বিপদ, সই মেলানো। পরের বার টাকা তুলতে গিয়ে বেশ মেজাজে চেক সই করে, জমা দিয়ে পেতলের চাকতিটা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ক্যাশ কাউন্টারে অপেক্ষা করছি, পকেটে পয়সা নেই বলে শীত-শীত করছিল, মনকে প্রবোধ দিয়েছি এক্ষুনি গুপ্তধন পেয়ে যাব, এমন সময় হিন্দুস্থানী বেয়ারা আমার

নম্বর ধরে হাঁক দিয়ে জানাল, আমাকে সাহেব ডাকছেন। এত লোকের মধ্যে আমাকেই কেন শুধু সাহেব ডাকছেন? আরো শীত করতে লাগল, তবু ভয়ে ভয়ে গেলাম। সাহেব কুটিলচোখে আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, এ সই কার? আমি বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে, আমার হাতের লেখাটা একটু খারাপ বটে, পড়তে হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু ওটা আমারই লেখা।

—ঠিক তো? সাহেবের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

সাহেবের টেবিলের উল্টো দিকে দুতিনটে খালি চেয়ার, কিন্তু সাহেব আমাকে বসতে বলেনি। তা বলবেনই বা কেন, সাহেবের মুখ এখন বিচারকের মতন, আমি দাঁড়িয়ে আছি আসামী হয়ে. বিচারকের সামনে আসামীর বসার কি অধিকার? আমার পক্ষে এখন আবার কোনো সাক্ষীও নেই। তবু যতদূর সম্ভব দৃঢ়ভাবে বললুম, হ্যাঁ ওটা আমারই লেখা। সাহেব ভুরু কুঁচকে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আর একটা সই করুন। করলুম। সাহেব বললেন, উহুঁ হলো না। আরেকটা। করলুম। উহুঁ, আর একটা। করলুম।

সাহেব এবার বেশ বিরক্তভাবে বললেন, এর কোনো মানে হয়? কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার মিল নেই। চারটে লেখাই একদম আলাদা।

আমি এবার হেসে ফেলে গোপন অহংকারের সঙ্গে জানালুম, তা ঠিক বলেছেন। আমি একরকম লেখা দু'বার লিখি এ দোষ কেউ আমায় দিতে পারবে না। আমার প্রত্যেকটা লেখাই নতুন ধরনের। আপনি দেখবেন?

—নিজের নামটা সবাই সবসময় একরকম লেখে।

—সবার কথা জানি না। একরকম একঘেয়ে ভাবে কোনো জিনিসই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। নিজের নামও নয়।

পাগল প্রমাণিত হলে আসামী যেরকম বেকসুর খালাস পায়, অনেকটা যেন সেইরকমই কোনো কারণে, সাহেব আমাকে গভীর দয়া করে বললেন, আচ্ছা যান, এবার ছেড়ে দিলুম। পরের বার কিন্তু—

আমি বললুম, পরের বারও আপনি ছাড়তে বাধ্য হবেন। পরের বার আমি ধুতির বদলে সুট এবং টাই পরে আসব, তখন দেখব আপনি কি রকম না ছেড়ে পারেন।

আমি কথা রেখেছিলাম, তারপরও প্রত্যেকবার আমার সই নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। কয়েকবার গণ্ডগোল হবার পর ব্যাঙ্কের লোকেরা আমায় চিনে গেল। আমায় দেখলেই তারা বলে, ঐ সেই সই-মেলে-না লোকটা এসেছে। সুতরাং আমার আর অসুবিধে হয় না। সাময়িকভাবে, এই সময়টুকু আমার সুখের কাল। ব্যাঙ্কে যাতায়াত করাটা আমার পক্ষে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

সই করলেই টাকা পাওয়া যায়—এটা আমার কাছে একটা নতুন খেলা। যখন তখন পাঁচ দশ টাকা পেলেই আমি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসি, আবার দুদিন বাদেই তুলে আনি। একেকদিন এমন হয়েছে, কোনো জায়গা থেকে গোটা কুড়ি টাকা পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি, জমা দেবার পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে, পকেটে তো আর একটাও পয়সা রইল না। তক্ষুনি ফিরে গিয়ে আবার তার থেকে পনেরো টাকা তুলে ফেলেছি—তোলার পরই আবার মনে হয়েছে—পুরো পনেরো টাকাই খরচ করার তো মানে হয় না। সুতরাং তার থেকে পাঁচ টাকা আবার জমা দিয়ে এসেছি। দুপুরের দিকে বন্ধুবান্ধবরা যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস? আমি গম্ভীরভাবে বলি—এই ব্যাঙ্কে যাচ্ছি! বন্ধুবান্ধবরা শ্রদ্ধা মিশ্রিত অবাক চোখে আমার দিকে তাকায়। মোট কথা, যাকে বলে ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট, আমার সেটা বেশ পাকা হয়ে উঠল।

এর ফলে, ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমার একটা ধারণা গড়ে ওঠে। পরোপকারের জন্য, সেটা অন্যদেরও জানানো দরকার।

যে কোনো ব্যাঙ্কে গেলেই দেখা যায়, পঞ্চাশ কি শ-খানেক পরিচ্ছন্ন ও সুবেশ (অনেকেই সুট-টাই পরা) লোক মহাব্যস্ত হয়ে কাজকর্ম করছে। এখন প্রশ্ন এই, এরা কি সবাই নিঃস্বার্থ সমাজসেবক? নইলে, আমার আপনার জন্য এত খাটাখাটি করে ওদের নিজেদের কি লাভ? টাকা পকেটে রাখলে খরচ হয়ে যায়, বাড়িতে রাখলে চুরি ডাকাতি হবার সম্ভাবনা। ব্যাঙ্কে টাকা দিলেই একেবারে নিরাপদ। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্য কোনো ভাড়া লাগে না, সহজে তোলা পর্যন্ত যায় না, এমনকি কষ্টে সৃষ্টে এক বছর রাখতে পারলে—টাকা ডিম পেড়ে বেড়ে পর্যন্ত যায়, এ এক আজব রহস্য। কেনই বা ওরা জমা করছে, কেনই বা ওরা টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এর কোনো উত্তর খুঁজে পাই না আমি। কেউ কেউ বলেন, এর সঙ্গে নাকি অর্থনীতির গভীর সম্পর্ক আছে। ব্যাঙ্কের প্রসারের মধ্যেই নাকি দেশের উন্নতির মূল সূত্র! এসব একেবারে গুজব। এসব ভালো ভালো কথা শুধু ব্যাঙ্কের ঐ নিরীহ কর্মচারীদের ভোলাবার জন্য। কিন্তু ঐসব ভালো ভালো পোশাক পরা বুদ্ধিমান লোকেরা কি সহজে ভোলে, এসব কথা যে গাঁজাখুরি তা ওঁরা এতদিনে জেনে গিয়েছেন। যে কোনো ব্যাঙ্কে গেলেই তা বোঝা যায়। ওরা যে দায়ে পড়ে পরোপকার করছেন তার ছাপ ওঁদের চোখে-মুখে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ক্যাশ কাউন্টারে যাঁরা বসেন, তাঁরা সাধারণত বেশ হাসি খুশি ধরনের লোক। বারবার করে টাকা গুনছেন, হাসতে হাসতে লোকের হাতে তুলে দিচ্ছেন। যত বেশি টাকা দিতে হয় ততই আনন্দ। ভাবখানা এই, নাও, খরচ করো, ওড়াও! ফুরিয়ে ফেলো। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ফেলো সব টাকা

যাতে এখানে আর আসতে না হয়! আর যাঁরা রিসিভিং কাউন্টারে জমার টাকা বা চেক নেন, তাদের মুখগুলো ততই গম্ভীর। কেউ টাকা জমা দিতে গেলে, গভীর বিরক্তিপূর্ণ চোখ তুলে তাকান। ভাবখানা এই, আবার টাকা জমা দিতে এসেছ? পাজী কোথাকার। টাকা নিজেব কাছে রাখলে কুটকুট করে নাকি? শুধু শুধু আমাদের দিয়ে ভূতের বেগার খাটানো! আচ্ছা দাঁড়াও না, এরপর যখন টাকা তুলতে আসবে তখন এত দেরি করব যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার শখ তোমার সেদিনই ঘুচে যাবে।

মোট কথা, গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে চুপি চুপি একদিন সব ব্যাঙ্কগুলোকে বন্ধ করে দেবার জন্য একটা গোপন চেষ্টা চলছে। সেইজন্যই লোককে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে নিরুৎসাহ করার সবরকম চেষ্টা চলছে। সেইজন্যই অত সব জটিল নিয়মকানুন, লোককে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে জব্দ করার চেষ্টা, সই মেলানো নিয়ে খিটিমিটি। সবগুলোরই উদ্দেশ্য এক। তবু যদি লোকে নাছোড়বান্দা হয়, তাই ব্যাঙ্ক বন্ধও হয় তাড়াতাড়ি। সব অফিস দশটা থেকে পাঁচটা, ব্যাঙ্কই শুধু দুটো পর্যন্ত খোলা, দুটোর পর থেকে বাকি তিন ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে পরামর্শ হয় পরদিন আরো কি কি উপায়ে লোক তাড়ানো হবে। ব্যাঙ্কে সময়ের বড়ো কড়াকড়ি।

হ্যাঁ, সেই সময়ের কথা বলার জন্যই তো এ লেখার সূত্রপাত। গোপনে কি ভাবে যেন আবার ব্যাঙ্কে একশোটা টাকা জমে গেল, এবং সেটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গেলাম। তারপর একদিন, সেদিন মাসের ঊনত্রিশ তারিখ, আমাদের পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা আমার মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। বললেন, দিদি, আমাকে বাঁচান, আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিন। ভদ্রমহিলার স্বামীর অসুখ কয়েকদিন ধরে, আজ সকালবেলা অবস্থা গুরুতর হয়েছে, পাড়ার ডাক্তার এসে বলে গেছেন, যে তাঁর আর কিছু করার সাধ্য নেই, বড়ো ডাক্তার এনে দেখাতে হবে। বড়ো ডাক্তারের ফি, ওষুধপত্র—অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা ভদ্রমহিলার চাই-ই। দরকার হলে তাঁর সোনার বালাটা বন্ধক রেখে—

আমি পাশের ঘরে ছিলাম। মা এসে বললেন, মেয়েটা সত্যিই দারুণ বিপদে পড়েছে। এখন কি করি বলত? টাকা তো একদম নেই—

তখনই আমার মনে পড়ল, আমার তো সেই কয়েকখানা বাজে, ময়লা, স্যাঁতসেতে কাগজ ব্যাঙ্কের অন্ধকার সিন্দুকে অকারণে পচে নষ্ট হচ্ছে। কোনো কাজেই লাগছে না। আমি তখুনি বললুম, তুমি ভদ্রমহিলাকে বলো ডাক্তারকে খবর দিতে, ডাক্তার আসার মধ্যেই আমি টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসছি। আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

পাঁচটা টাকা ছিল, তাই নিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে আমি তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাস পেয়ে গেলুম ভাগ্যবলে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বাস বন্ধ, সামনে ছাত্র শোভাযাত্রা, ছাত্ররা গোটা রাস্তা আটকে দিয়েছে। দেরি হলে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সির জন্য খোঁজাখুজি করতে লাগলুম। খানিকটা বাদে ট্যাক্সি পাওয়া গেল, আমি চেঁচিয়ে বললুম চলুন ডালহৌসি, জলদি!

বেন্টিক স্ট্রিটে এসে আবার ট্রাফিক জ্যাম। শুনলুম সামনেই কোনো একটি ব্যাঙ্কে আগুন লেগেছে। আমি আঁৎকে উঠলুম, কোন ব্যাঙ্ক। আমার ব্যাঙ্ক নয়তো? উঁকি মেরে জেনে নিশ্চিন্ত হলুম, অন্য ব্যাঙ্ক। কিন্তু তখন সামনে পেছনে এমন জ্যাম যে ট্যাক্সির বেরুবার কোনো উপায় নেই। ছাত্র আন্দোলন সামলাতে সমস্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়েছে বলে, এখানে ট্রাফিক সামলাতেও কোনো পুলিশ নেই। এদিকে দুটো বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে যখন ব্যাঙ্কের সামনে পৌছোলুম তখন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। যাক। রাস্তার ওপর থেকে দেখি, ব্যাঙ্কের গেট টেনে বন্ধ করা। কয়েকজন লোক সামনে ভিড় করে দাড়িয়ে আছে। হিন্দুস্থানী পাগড়ি পরা দরোয়ান বলছে, হবে না, হবে না। আর একজন ফর্সা, সাহেবি পোশাক পরা প্রৌঢ় ভিতর থেকে বলছে, গেট আউট, গেট আউট! ডোন্ট ডিস্টার্ব!

আমি ভাবলুম, আহা, ঐ লোকগুলোর বোধহয় আগে ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, এখন সব ফুরিয়ে ভিখিরি হয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কেই এসেছে ভিক্ষে চাইতে। কাছে গিয়ে দেখলুম, তা নয়, লোকগুলোর সবারই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাঙ্ক নাকি বন্ধ হয়ে গেছে তাই ওসব আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই গেট আউট। শুনেই আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, আমি বললুম মোটেই এখনো দুটো বাজেনি। ফর্সা প্রৌঢ় রুক্ষ গলায় ইংরাজিতে বললেন, হ্যাঁ, দুটো বেজে গেছে। অথচ বাইরে উপস্থিত চারজনের হাতের ঘড়িতে তখনো দুটো বাজেনি। আমি ব্যাকুল ভাবে বললুম, যদি দুটো বাজেও, তবু আমায় ভেতরে ঢুকতে দাও। আমার বিশেষ দরকার।

সাহেব বললেন, সবারই বিশেষ দরকার শুনছি। ওসব হবে না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে দাও। আমি অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম। হঠাৎ চোখ পড়ল রাস্তার ওপারে একটি গীর্জা, সেই গীর্জার চূড়ায় এক জ্ঞানবৃদ্ধ ঘড়ি। আমি চেঁচিয়ে বললুম, ঐ দ্যাখো, গীর্জার ঘড়িতে এখনো দুটো বাজেনি। সাহেব বললেন, ওসব জানি না, আমাদের ঘড়িতে অনেকক্ষণ দুটো বেজে গেছে। এমন সময় আমাদের কথা থামিয়ে দিয়ে গীর্জার ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলো,

ঘোষণার মতন সুললিত গম্ভীর ভাবে দু'বার বাজল। আমি বললুম, তুমি শুধু শুধু অন্যায়ভাবে আমাকে আটকে রাখছ কেন? সাহেব বললেন, গীর্জার ঘড়ি যদি ভুল হয় তবে সব দোষ কি আমার?

আমি রাগের মাথায় একটা কঠিন গালাগালি উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলুম। তারপর সেটা চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলুম, না, দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়। সব দোষ ঐ গীর্জার ঘড়ির ওপর চাপানোই ভালো। দোষ ঐ ঘড়ির, সব দোষ সময়ের।

২৪

'মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। কিছুদিন আগে একটা ইংরেজি রসিকতাও শুনেছিলাম। অনেকটা এইরকম। একটি ছেলে একটি মেয়েকে বলছে, তোমাকে না পেলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাব। এক লক্ষ বার মরে যাব! বাংলাতে এরকম রসিকতা আছে, একজন একটি মেয়েকে বলছে, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো --তা হলে আমি আর বাঁচব না। অন্তত আর ৫০ বছরের বেশি কিছুতেই বাঁচব না। কবি দান্তে বিয়াত্রিচের প্রেমে উন্মাদপ্রায় হয়েছিলেন, সারাজীবন তিনি ঐ রমণীকে ভুলতে পারেননি—তা সত্ত্বেও অবশ্য অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে প্রেম করতে তাঁর আটকায়নি। বিবাহ এবং প্রায় আধ ডজন সন্তানাদিও হয়েছিল তাঁর।

কিছু কিছু মানুষ জীবনে একবারই মাত্র প্রেমে পড়ে, অনেকে ঘনঘন প্রেমে পড়ে—(আবার অনেক মানুষ অবশ্য একবার প্রেমে পড়ে না সারাজীবনে, ও জিনিসটার স্বাদই পায় না—এমন মানুষ আমি স্বচক্ষেই দেখেছি)। আমি ঘনঘন প্রেমে পড়া মানুষের দলে। ট্রেনের জানলায় বসে প্ল্যাটফর্মে পায়চারিরতা কোনো রূপসীকে দেখলেও আমি প্রেমে পড়ে যাই। এমনকি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে কোনো মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসা কোনো তরুণীকে দেখেও আমি অনেক সময় এমন প্রেমে পড়ে যাই যে তারপর সাত-আট দিন আমার আর আহার নিদ্রায় রুচি থাকে না, আমার মন উদাস হয়ে যায়, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ে—খাঁটি ব্যর্থ প্রেমিকের সব লক্ষণ আমার মধ্যে ফুটে ওঠে। অনেকে হয়তো বলবেন, একে প্রেম বলে না, এসব শুধু ক্ষণিকের রূপজ মোহ কিংবা দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু কোনো প্রেমটা খাঁটি আর কোনোটা মোহ কিংবা ছলনা—তা যাচাই করার মতন কোনো কষ্টিপাথর তো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। মিথ্যে কথা ধরে ফেলার

জন্য 'লাই-ডিটেক্টর' যন্ত্র আছে, কিন্তু লাভ-ডিটেক্টরের কথা এখনো শোনা যায়নি। একনিষ্ঠ প্রেম যেমন গভীর হতে পারে, তেমনি কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা প্রেমও আন্তরিক ও গভীর হতে কোনো বাধা নেই। গ্যেটেও বলেছেন, প্রেমের আন্তরিকতা কিংবা দীর্ঘস্থায়িত্ব দিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলো না, শুধু দ্যাখো, সেই মুহূর্তে সেটা সত্য কি না।

আমি নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলি। পথেঘাটে অনেক সময় কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে আমাদের চোখ আটকে যায়। আমরা তার দিকে বারবার তাকাই, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকলে তার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করি, মোটামুটি ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা দেখা সম্ভব দেখে নিই—মেয়েরাও তাতে খুশি হয়। বলাই বাহুল্য, একে আমি প্রেম বলতে চাইছি না। এইসব মেয়েদের মুখ আমাদের বেশিক্ষণ মনে থাকে না—সেইদিনই হয়তো আবার আর একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে আগের জনের কথা আমরা ভুলে যাই। তিনদিন বা এক সপ্তাহ বাদেও এরকম পথে দেখা কোনো মেয়ের মুখ মনে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যদি না সেই মেয়ে রূপসী তিলোত্তমা হয়—কিন্তু সেরকম মেয়েকে পথেঘাটে দেখা যাবেই বা কেন—অন্তত আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। মেয়েরা বরং এসব ব্যাপার বেশি মনে রাখে। নেমন্তন্ন বাড়িতে কত ভালো ভালো সাজপোশাক পরা মেয়েদের আমরা দেখতে পাই—তাদের প্রায় কারুরই কথা পরে মনে থাকে না—যদি না আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু মেয়েরা মনে রাখে, ছ'মাস আগেকার কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখা পুরুষ সম্বন্ধে কথা উঠলেই তারা বলতে পারে—কোনো লোকটা? ঐ নীল রঙের সুট পরা যে-ভদ্রলোক নাইলন জর্জেট শাড়ি পরা একটা মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করছিল, সে?

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রিট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে একজন মহিলাকে দেখে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, মহিলাকে আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি! কিন্তু কোথায়? আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কি? একবার পরিচয় হলে—সেই রমণীর মুখ আমি কখনো ভুলি না। তা ছাড়া, মহিলার সঙ্গে একবার আমার চোখাচোখি হলো—তিনি পরিচয়ের কোনো চিহ্ন দেখালেন না।

আমি বসেছিলাম একটা একতলা বাসের জানালায়। কি একটা ছোটখাটো ট্র্যাফিক জ্যামে বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোনো মুহূর্তেই চলবে। মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন ফুটপাথে, হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট।

সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে মহিলাটিকে খুব রূপসী নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু আমার চোখে তাঁকে অপূর্ব রূপবতী মনে হলো। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় তিনি একটু

বেশি লম্বা, বয়েস অন্তত ছাব্বিশ-সাতাশ, শরীরটা খুবই সুগঠিত, তার শরীরে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন এক বিন্দুও কম বেশি নয়—ঠিক যেটুকু হলে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, তবে স্তন দুটি সামান্য একটু বেশি বড়ো—কিন্তু তাদের গড়ন এমন নিখুঁত ও উন্নত যে তাতে সৌন্দর্য একটুও চিড় খায়নি। রং ফর্সা নয়, শ্যামাই বলা যায় তাঁকে, চোখ দুটো খুব টান টান, বড়ো বড়ো চোখের পাতা। মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন সোজা হয়ে, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কোনো ন্যাকামি গুমোর নেই—স্বাভাবিক স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। যে-সব মেয়ে পল্লবিনী লতার মতন অন্য কারুকে আশ্রয় না করে বাঁচতে পারে না—তাদের সঙ্গে একটুও মিল নেই মহিলাটির, অথচ কোনো পুরুষালি ভাবও নেই, কোনো কঠোরতা নেই। রাস্তায় মেয়েরা একা থাকলে সাধারণত মুখখানা গোমড়া করে রাখে অথচ ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকিয়ে চাঞ্চল্য দেখায়—এই মহিলা অন্য রকম।

কিন্তু রূপসী হলেও মেয়েটি এমন কিছু অসাধারণ নয়—বিশেষত আমার বাসের সামনেই সিটে একটি ফর্সা ও বেশ রূপসী কমবয়েসী মেয়ে বসে আছে—কিন্তু তার দিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে আমি পথের ঐ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। খালি মনে হচ্ছে, এঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? যত চেনাশুনো বাড়ি, বন্ধুর বোন বা পরিচিত ব্যক্তিদের স্ত্রী ও শ্যালিকাদের মুখ মনে করলুম—না, ভদ্রমহিলাকে সেরকম কোথাও আমি দেখিনি। আমার সঙ্গে কখনো পরিচয় নিশ্চয় হয়নি। তা হলে কোথায়? কোনো ছবিতে? মহিলা কি বিখ্যাত কেউ? কোনো সিনেমা স্টার হতেই পারে না—তা হলে রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে যেত! কোনো গায়িকা? তাও হতে পারে না—গান শোনার কথা মনে নেই—চেহারা মনে আছে—এটা প্রায় অসম্ভব। গায়িকাদের মধ্যে সুন্দরী যে-কজন মাত্র আছেন তাদের চেহারা ও নাম একসঙ্গেই আমার মনে আছে। তারপরই আমার মনে পড়ল, আমার ঘরে কোণারকের সুরসুন্দরী মূর্তির একটা ছবি বাঁধানো আছে—তার সঙ্গেই কি ভদ্রমহিলার চেহারার খুব মিল নয়? বিশেষত দাঁড়াবার ভঙ্গি, উন্নত স্তন, ও স্ফুরিত অধর!

কিন্তু পাথরের মূর্তির সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের এ রকম চেহারার মিল কখনো হতে পারে না—তা ছাড়া আমিও এত বেশি রোমাণ্টিক নই যে কলকাতায় রাস্তায় কোনো মেয়েকে দেখে আমার বিখ্যাত ভাস্কর্যের কথা মনে পড়বে। কোণারকের মূর্তিটা তৈরি হয়েছিল অন্তত আট-ন'শো বছর আগে—রোদ্দুরে হাওয়ায় সেগুলো অনেক ক্ষয়ে গেছে—রেখাগুলো তেমন সূক্ষ্ম আর নেই—শুধু মুখের রহস্যময় হাসিটি এখনো অক্ষুণ্ন আছে। এই মহিলা তো হাসছেন না—এঁর চেহারা যে-কোনো ভাস্করের মডেল হবার পক্ষে অনবদ্য ঠিকই—কিন্তু...। অথচ, আর কোথাও বা

এঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

ট্র্যাফিক জ্যাম কেটে গেছে, বাস আবার স্টার্ট নিয়েছে, কিন্তু ঐ মহিলাকে আর একটুক্ষণ দেখার জন্য দুরন্ত ইচ্ছে জাগল আমার। সেই মুহূর্তে মনে হলো, পৃথিবীতে এর থেকে বড়ো কাজ আর কিছু নেই। চলন্ত বাস থেকে আমি ঝুপ করে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই মুহূর্তেই একটা ট্যাক্সি ডেকে মহিলাটি উঠে পড়লেন। ট্যাক্সি হুস করে চলে গেল। মহিলাটি ট্যাক্সির জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। একথাও ঠিক, মহিলাটি আমাকে লক্ষ্যই করেননি, আমি যে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম কিংবা তাঁকে দেখার জন্যই বাস থেকে নেমেছিলাম—সে কথা তিনি টেরও পাননি।

বাড়িতে এসেই কোণারকের সুরসুন্দরীর মূর্তির ছবিটা আমি দেয়াল থেকে নামিয়ে ভালো করে দেখলাম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা সাধারণ মিল কল্পনা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এমন কিছু হুবহু মিল নেই যে তাঁকে দেখে সবারই এই মূর্তির কথা মনে পড়বে। মধ্যযুগের কোনো শিল্পীর কল্পনা এই বিংশ শতাব্দীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—সে রকম কোনো ছেলেমানুষী চিন্তার অবকাশ নেই। তবু মহিলাকে দেখে আমার ঐ মূর্তির কথাই মনে পড়েছিল।

সেই ঘটনার পর চার বছর কেটে গেছে। সেই মহিলার মুখ, দাঁড়াবার ভঙ্গি, সম্পূর্ণ চেহারা, এমনকি তাঁর ঘড়ির ব্যাণ্ড যে সাদা ছিল—এবং পায়ে ছিল সাদা রঙের চটি—তার কিছুই আমি ভুলিনি। এখনো, আজ এই লিখতে বসেও মহিলার মুখ আমার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। সেদিনের পর আমি সারা কলকাতার রাস্তায় মহিলাকে আবার খুঁজেছি, আমহার্স্ট স্ট্রিট বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি—কিন্তু ওঁকে সেখানে আর দেখিনি কোনোদিন। মাঝে মাঝেই সেই মহিলার কথা আমার মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুকের মধ্যে একটা দারুণ কষ্ট হয়—কোণারকের সুরসুন্দরী মূর্তির ছবির দিকে তাকাই—মনে হয়, ঐ মহিলার সঙ্গে একবার একটা কথা বলতে পারলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত!

এরপরে আবার অন্য মেয়েদের রূপ আমাকে আকর্ষণ করেছে। পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে, কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, কোনো বিশেষ মেয়ের জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে—তার সামান্য মন খারাপ কিংবা হাসিতে আমি শোক কিংবা সুখ পেয়েছি—তবু সেই দু'-এক মিনিটের জন্য মহিলার কথা মনে পড়লেই আমার বুক টনটন করে।

ভদ্রমহিলাকে আমি আর একবার মাত্র দেখেছিলাম দু'-এক পলকের জন্য। প্রথম দেখার তিন বছর পরে। একটা সিনেমা হলের মধ্যে শো শেষ হয়েছে,

আমি মেট্রো সিনেমার সিঁড়ি দিয়ে নামছি—সিঁড়ির ঠিক নিচে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সেই মহিলা। চিনতে আমার এক মুহূর্তের জন্যও ভুল হলো না—সেদিন মহিলা অনেক বেশি সাজপোশাক করেছেন—তবুও কোণারকের মূর্তির কথাই মনে পড়ল আমার। সেদিন যেন আরো বেশি মিল দেখতে পেলাম। মেট্রো সিনেমার যে-কোনো শো-তে সুদর্শনা নারীর অভাব হয় না। তবুও আমার মনে হলো, সবার থেকে আলাদা হয়ে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চলেছেন ঐ একজন। প্রতিটি পদক্ষেপে অপূর্ব রূপের মাধুরী। এই রূপকে বলা যায় ওজস্বিনী রূপ। আমার তীব্র ইচ্ছে হলো, মহিলার পাশে যাই—কথা বলার কোনো সুযোগ পাব না, কিন্তু সামান্য একটু স্পর্শও যদি পাই, হাতের একটু ছোঁয়া, অথবা চুলের গন্ধ, তাহলে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে।

সে সুযোগও পাইনি। অত ভিড়ের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া কত শক্ত। তবু লোকজনকে ঠেলাঠেলি করে আমি যখন নিচে পৌঁছলাম—তখন দেখি বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে একজন যুবাপুরুষ মহিলাটির জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, মহিলাটি নিচু হয়ে গাড়িতে ঢুকছেন। সেদিন আমি সেই যুবকটির প্রতি যে তীব্র ঈর্ষা বোধ করেছিলাম—কোনো প্রেমিক কখনো অত ভয়ংকর ঈর্ষায় জর্জরিত হয় কিনা জানি না।

২৫

দু'জনকেই চিনি আগে থেকে। সুতপা পড়ত আমার মাসতুতো বোনের সঙ্গে, সেই সময় আমাদের বাড়িতে দেখেছি কয়েকবার। আর প্রিয়তোষ ছিল দুর্গাপুরে আমার বন্ধুর সহকর্মী। একবার দুর্গাপুরে অরুণাভর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই সময় প্রিয়তোষের সঙ্গে আলাপ। অনেক সময় দু'তিনদিনের পরিচয়েই কারুর কারুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। তখন প্রিয়তোষের বিয়ে হয়নি।

তারপর প্রিয়তোষ বদলি হয়ে এল কলকাতায়। সুতপার সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হয়, তখন আমি অবশ্য কলকাতায় ছিলাম না। ইতিমধ্যে অরুণাভ চলে গেল হাঙ্গেরিতে। আর আমার মাসতুতো বোন টুপ করে মরে গেল। কিন্তু বন্ধুর বন্ধু আর মাসতুতো বোনের বান্ধবী প্রিয়তোষ আর সুতপার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

বেশ ছিমছাম সংসার ওদের। আড়াইখানা ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলা নেই। সুতপা ঘরদোর খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে জানে।

কোনো কোনো সন্ধেবেলা ওদের বাড়িতে একটা বেশ ঘরোয়া আড্ডার পরিবেশ হয়, সেই লোভে আমি মাঝে মাঝে যাই। প্রিয়তোষ হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যারা অফিস ছুটির পরেও অফিসের গল্প বলতে ভালোবাসে না। আর সুতপাও শাড়ি গয়না হিন্দী সিনেমা ছাড়াও অন্য বিষয়ে কথা বলতে জানে।

ওদের দেখে আমার মনে হতো একটি আদর্শ দম্পতি। ওরা সুখী এবং সেই সুখ নিয়েও বাড়াবাড়ি করে না। লোককে দেখিয়ে বেড়ায় না। ওদের কৌতুকবোধ আছে।

মানুষের জানা কত ভুল হয়। আমি ওদের একটুও বুঝতে পারিনি। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। মাস তিনেকের জন্য একটা কাজের উপলক্ষে আমাকে ভারতের বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসার পর দেখলাম, কলকাতায় বেশ কয়েকটা পরিবর্তন হয়ে গেল, তার মধ্যে অন্যতম, সুতপা আর প্রিয়তোষের বিচ্ছেদ। হঠাৎ একদিন ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি, সেটা দারুণ অগোছালো, প্রিয়তোষ যেন রাগের চোটে সুতপার হাতের সব চিহ্নও মুছে ফেলতে চায়। আমরা এখন যে সভ্যতায় অভ্যস্ত, তাতে খুব বেশি বন্ধুত্ব না থাকলে আমরা কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করি না।

আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুতপা কোথায়? বাপের বাড়িতে গেছে?

প্রিয়তোষ শুকনো হেসে বলেছিল, না। ওর বাপের বাড়ি নেই। আপাতত গেছে মামার বাড়িতে। তবে এখানে আর ফিরবে না। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

এরপর আর দুটো একটা কথা বলেই আমি চুপ করে গেলাম। কেন বিচ্ছেদ হয়েছে, জানতে চাইলাম না।

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় প্রিয়তোষ প্রথম দিকে খুব মদ ধরল। ওর বাড়িতে দু'-একবার গিয়ে দেখলাম। খুব মাতালের আড্ডা জমেছে। বছর খানেকের মধ্যেই অবশ্য মদ একেবারে ছেড়ে দিল। তার বদলে ওর মুখে শোনা যেতে লাগল গরম গরম কথা। আগে ওর কাছে কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা শুনিনি, কিন্তু এবারে ওকে দেখলাম উগ্র রাজনীতির গোঁড়া সমর্থক। পৃথিবীর সব কিছুর ওপরেই একটা ঘৃণার ভাব।

সুতপার সঙ্গেও একদিন দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। ঠিক আগেরই মতন সাজ-পোশাক। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ভালো আছেন?

মিনিট সাতেক কথা বললাম রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। একবারও প্রিয়তোষের নাম উচ্চারণ করলাম না আমরা কেউ। সুতপা আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে লাগল যেন একটা চ্যালেঞ্জ, যেন সে বলতে চায়, আমি কোনো দোষ করিনি। আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল একটাই প্রশ্ন—কেন? কেন? কেন তোমাদের

সুখের সংসার ভেঙে গেল? কিন্তু ভদ্রতাবোধে মুখে উচ্চারণ করিনি।

বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও বিয়ে ভাঙা সহজ নয়। তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই তিন বছরের মধ্যে ওরা আর বিয়ে করতে পারবে না। তাছাড়া আছে খোরপোষের প্রশ্ন। এই নিয়ে আদালতে মামলা হয়।

একদিন অন্য একজন বন্ধু বলল, আজ প্রিয়তোষের ডিভোর্সের মামলা ছিল, সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। খুব কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কি হলো? কি হলো সেখানে?

বন্ধুটি বলল, সুতপা খুব জেদী মেয়ে। সহজে ডিভোর্স দেবে না। খুব ভোগাবে মনে হচ্ছে।

আমি ওর কাছ থেকে জেরা করে কয়েকটা খবর জেনে নিলাম। বিচ্ছেদের আসল কারণটা সেও জানে না। এর মধ্যে তৃতীয় কোনো নারী বা পুরুষ নেই। ওদের নাকি মনের মিল হয়নি।

আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা পোকার মতন কুরে কুরে ঘুরে বেড়ায়। সেটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি। বারবার বলি, এটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি আছে! ওরা ওদের ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবে।

তবু, মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায়, সুখ কাকে বলে? বাইরের থেকে দেখে আমার তো মনে হয়েছিল, প্রিয়তোষ আর সুতপা যথার্থ সুখী। অথচ ওদের মনের মিল হয়নি! তাহলে চোখের সামনে অন্য যত সুখের ছবি দেখেছি, সবই কি আসলে অলীক? ওদের সেই শান্তির সংসারটার কথা ভেবে আমার দারুণ মন খারাপ লাগে।

২৬

আমি একদিন দু'তিন মিনিটের জন্য চোর হয়েছিলাম। গোছা গোছা টাকা চুরির জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম আমি। পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাটির মূল কুযুক্তি আমি উপলব্ধি করেছিলাম সেই একটু সময়ের মধ্যেই।

তখন আমার বেকারত্ব'র দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'দিক দিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়া যায়, সেই দু'দিকেই দুটো সিগারেটের দোকানে প্রচুর ধার করে ফেলেছি, বাড়ি থেকে বেরুলেই মুস্কিল। দু'তিন দিন অন্তর দাড়ি কামাই, তাও ব্লেডের পয়সা জোটানো এক কষ্টকর ব্যাপার। বাবার প্রায়ই হার্টের

দোষ দেখা দেয়, ছুটি নিতে নিতে হাফ-পে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, সংসারে রোজ টানাটানি, সেই সময় আমি একটা সুস্থ সবল ছেলে, অনেক পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি জোগাড় করেছি, অথচ এক পয়সা রোজগার নেই —লজ্জায় কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ এক বন্ধুর দৌলতে একটা কাজ পেয়ে গেলুম। চাকরি নয়, টিউশানি, কিন্তু চাকরিরই মতন প্রায়, একটি মেয়েকে বাংলা শেখাতে হবে রোজ সন্ধেবেলা, মাইনে একশো টাকা। মেয়েটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে বিলেতে-আমেরিকায় কাটিয়েছে বহুদিন, তাই বাংলা না-জানার জন্য তার লজ্জা হয়েছে, আমি তো খুশিতে ডগমগো, আমারই পাড়ার একটা ছেলে ক'দিন আগে একটা কেরানিগিরি পেয়েছে, দু' শো সাতান্ন টাকা মাইনে, তাতেই সে রোজ গর্বের সঙ্গে সেজেগুজে অফিসে যায়—আর আমি শুধু সন্ধেবেলা একটু সময় পড়িয়েই একশো টাকা পাব। পুরো একশো টাকা!

একটা ব্যাপারে শুধু অস্বস্তি রইল। ছাত্রীর বদলে ছাত্র হলেই আর একটু ভালো হতো। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করার কোনো চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি। আমি শুধু ভাবতুম একটি যুবতী মেয়ের সামনে রোজ বসতে গেলে জামা কাপড়-টাপড় একটু পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, না হলে বড়ো লজ্জা লাগবে। কিন্তু তখন রোজ পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। দাড়িও কামাতে হবে রোজ। ছাত্র হলে এতটা খুঁতখুতুনি না থাকলেও চলত।

কিন্তু এর চেয়েও আর একটা বড়ো অসুবিধে দেখা গেল। থাকি শ্যামবাজারে, পড়াতে যেতে হবে নিউ আলিপুরে—প্রত্যেকদিন ট্রাম-বাস ভাড়া জোগাড় করব কি করে? মাইনে পাব একমাস বাদে, কিন্তু সেই প্রথম একমাস চালাব কোন মন্ত্রবলে? বন্ধুদের কাছ থেকে সিগারেট ত্রক মেরে খাই, কিন্তু তাদের কাছে তো পয়সা চাওয়া যায় না। বাড়িতে টিউশানি পাবার কথাটা চেপে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, প্রথম দু'এক মাস মাইনে পেয়ে ধার-টার শোধ করে তারপর না হয় জানাব।

আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপদা'র ছিল ট্রামের মান্থলি টিকিট, বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি আর বিশেষ বেরুতেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁর কাছ থেকে মান্থলি টিকিটখানা প্রত্যেক সন্ধেবেলা ধার নেবার ব্যবস্থা করলুম। এতে শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আসার একটা সুরাহা হলো, কিন্তু সেখান থেকে নিউ আলিপুর? হেঁটে আসা যায় না। গরমের দিন, অতখানি রাস্তা হেঁটে এলে ঘামে জামার অবস্থা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যায়। কি উপায়ে যে রোজ সেই পয়সা জোগাড় করতুম, তা বেকার ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

সেই সময়েরই একদিনের ঘটনা। ছাত্রীটি বেশ বুদ্ধিমতী, মোটেই চালিয়াৎ নয়, বাড়ির লোকজনও বেশ ভালো, চায়ের সঙ্গে রোজই নানারকম খাবার আসে, আমার সঙ্গে সবাই বেশ সম্মান করে কথা বলে। আমিও এমন ভাব দেখাই, যেন নেহাত শখ করেই আমার টিউশানি করতে আসা—টাকাপয়সার কথা নিয়ে আমি কোনোরকমই মাথা ঘামাই না। ছাত্রীর বাবা প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন, অনেক রাত হয়ে যায়।

একদিন কথায় কথায় রাত দশটা বেজে গেছে। সেদিন শুধু গল্পের জন্য নয়, দারুণ বৃষ্টিতে বেরুতে পারিনি। ছাত্রীর বাবা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, বৃষ্টি যদি না থামে, তিনি আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবেন, কিন্তু বৃষ্টি থামার পর তিনিও আর কিছু বলেননি, আমিও বলিনি।

নির্জন রাস্তা, বাস বন্ধ হয়ে গেছে কিনা ঠিক নেই, পকেটে একটি মাত্র সিকি, হাত দিয়ে সেটাকে সারাক্ষণ চেপে ধরে আছি। সিগারেট খাওয়ার জন্য বুকের ভেতরটায় ছটফট করছে, কিন্তু সিগারেট কিনে খাওয়ার অভ্যেস একেবারেই ত্যাগ করেছি। এই সিকি থেকে পয়সা বাঁচিয়ে রাখতে হবে কালকের জন্য। এই সময় দূরে একটা বাস দেখা গেল, আমি উঠে কণ্ডাক্টরের থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসলুম। বাসে ভিড় নেই, ভিড়ের বাসে তবুও যদিবা টিকিট ফাঁকি দেবার সুযোগ পাওয়া যায়, আজ আর কোনো আশাই নাই।

কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতেই আমি সিকিটা বাড়িয়ে দিলাম। উদাসীনভাবে বললাম, এসপ্ল্যানেড। লোকটা সিকিটা নিয়ে ব্যাগে ফেলতে গিয়েও তুলে ধরল, উঁচু করে কি যেন দেখল, তারপর হাতের তালুতে ঘষে, আমার চেয়েও উদাসীন গলায় বলল, বদলে দিন, এটা অচল!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অচল? অচল কথাটার মানে কি? এ রকম একটা অর্থহীন শব্দ যেন জীবনে কখনো শুনিনি! বিহ্বল গলায় বললাম, কি বলছেন?

—সিকি অচল।

—অচল কেন?

—তা আমি কি করে বলব! যে বানিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করুন। এতো খাঁটি সীসে। বদলে দিন।

যন্ত্রের মতন হাত বাড়িয়ে আমি সিকিটা নিলাম। আশ্চর্য, আমি এতই বোকা, আগে লক্ষ্যই করিনি, সিকিটা সত্যিই ডাহা জাল। এই টানাটানির সময় এই রকম মতিভ্রম?

—কই, অন্য সিকি দিন!

—আমার কাছে আর পয়সা নেই।

—আর পয়সা নেই! শুধু এই অচল সিকি নিয়ে উঠেছেন? ভেবেছেন এই রাত্তির বেলা গছিয়ে দেবেন? বার করুন আর কি আছে!

অপমানে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বাসের সব লোক এদিকে চেয়ে মজা দেখছে। আমার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল! এরা কেউই বিশ্বাস করবে না, সত্যিই আমি জানতুম না, ওটা অচল! অভিমানী গলায় আমি বললুম, ঠিক আছে আমি নেমে যাচ্ছি!

কণ্ডাক্টর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তা তো যাবেনই! জামাকাপড় তো ভদ্দরলোকেরই মতন! আজকাল দেখলে কারুকে বোঝা যায় না—কে ভদ্দরলোক আর কে জোচ্চোর!

সব অপমান গায়ে মেখে আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম। ইচ্ছে হলো রাস্তার ওপর বসে থাকি। কিংবা কোনো চলন্ত গাড়ির তলায় মাথা পেতে দিই! কিন্তু এসব ইচ্ছে বেশিক্ষণ থাকে না। বাড়ি ফেরার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। এখানে বেশি দেরি হলে আবার এসপ্ল্যানেড থেকে লাস্ট ট্রাম চলে যাবে—তা হলে এতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত শেষ। বাবা নির্ঘাৎ পুলিশে খবর দেবেন। কি করি এখন।

যা থাকে কপালে, বলে একটা দোতলা বাসে উঠে পড়লাম রাসবিহারী মোড় থেকে। কণ্ডাক্টর এলে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলব, আমার পকেটে একটা সিকি আছে, সেটা অচল আমি জানতাম না—আমাকে বিনা পয়সায় যেতে দিন। হয়তো তার দয়া হতেও পারে। সব মানুষই তো আর খারাপ হয় না। অচল সিকি আবার চালাবার চেষ্টা করব না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি, ওপরতলার একেবারে শেষ সিঁড়িতে আমার পায়ে কি যেন লাগল। তাকিয়ে দেখি, একটা পেট-মোটা মানি ব্যাগ। কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই সেটা খুলে দেখতে গিয়ে আমার চোখ ঠিকরে আসবার উপক্রম! ব্যাগটার মধ্যে থরে থরে সাজানো একশো টাকার নোট, আগেকার সেই বড়ো সাইজের নোট—চিনতে ভুল হয় না। এক নজর দেখেই বুঝতে পারলুম, অন্তত তিন চার হাজার টাকা, কিছু খুচরো দশ-পাঁচ টাকার নোটও আছে, কয়েকটা কার্ড, একটা ছবি, আর একটা সোনা-বাঁধানো জিনিস—অনেকটা মেয়েদের ব্রোচের মতন।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা স্রোত খেলে গেল। আমার হাতের মুঠোয় চার হাজার টাকা, এই টাকা পেলে একটু আগে আমি যে অপমান সহ্য করেছি, সে রকম সব কিছুর প্রতিশোধ নিতে পারি। আমার জীবনের রং বদলে

যেতে পারে। উঃ, চার হাজার টাকা! উত্তেজনায় আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম, দোতলায় অল্প কয়েকজন মাত্র লোক বসে ঝিমোচ্ছে, আমাকে লক্ষ্য করেনি, কণ্ডাক্টর নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছে তার পার্টনারের সঙ্গে।

কয়েক সেকেণ্ড সেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমার মধ্যে—এত বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাসে যতটুকু উন্নতি ও অবনতি হয়েছে সব খেলা করে গেল। আমি জানি আমার কি কি করা উচিত, ব্যাগের ভেতরের কার্ডের নাম দেখে আমি যাত্রীদের জিজ্ঞেস করতে পারি—এটা তাদের কারুর কিনা! উপযুক্ত প্রমাণ দিলে ফেরৎ দেওয়া উচিত। কিংবা এটা থানায় জমা দেওয়া যায়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া যায়। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে একটা কথাই আমার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল, যদি আমি একবার বাস থেকে নেমে পড়তে পারি—তা হলে এ টাকা আমার! এতগুলো টাকা!

কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, অন্য যাত্রীরা হয়তো আমাকে লক্ষ্য করেনি। মন স্থির করে আমি চটপট নেমে এসে বাসের গেটের কাছে দাঁড়ালাম।

ময়দানের পাশ দিয়ে বাস ছুটেছে, ফাঁকা রাস্তা, দুর্দান্ত স্পীড। এখানে স্টপগুলোও অনেক দূরে দূরে। আমার বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, হাত কাঁপছে, থরথর করে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। আর এক কি আধ মিনিট—বাস থামলেই লাফিয়ে নেমে পড়ব। একবার রাস্তার লোকদের মধ্যে মিশে গেলে...এখন আমার পকেটে বাসের ভাড়াও নেই, কিন্তু আমি এক্ষুনি ট্যাক্সি চাপব! বাসটা কখন থামবে! এত জোরে ছুটছে যে নামতে গেলে আমার হাত-পা ভেঙে যাবে? আর ক'টা মুহূর্ত...

এমন সময় সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ, একজন লোক চীৎকার করতে করতে নেমে এল, আমার ব্যাগ। আমার ব্যাগ। আমার পার্স কে নিয়েছে?

সমস্ত শরীরটা আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার কি হবে আমার আমি জানি। সমস্ত লোক হৈ হৈ করে আমাকে জাপটে ধরবে। পকেটমার হিসেবে আমাকে মারবে, মারতে মারতে আমাকে মেরেই ফেলবে ওরা। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, না, না, আমি চোর নই। আমাকে মেরো না। মেরো না।

কিন্তু প্রমাণ কি। আমি তো ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুঁকে ব্যগ্রভাবে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোনো যুক্তি নেই।

লোকটি আমার কাছে নেমে এসেছে, আমি ব্যাগ সমেত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

লোকটি সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। লোকটিকে কোনো প্রশ্ন করার

সাহস হলো না আমার, ভেতরের কার্ডগুলোর সঙ্গে তার নাম মেলাতে পারলাম না। যে নিজে অপরাধী সে তো আর বিচারক হতে পারে না। লোকটির দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আমি শাস্তি পাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটি আসলে মারল না, চ্যাচাল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। তার পরের মুহূর্তেই সে চলন্ত বাস থেকে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে ঝুপ করে নেমে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি আছাড় খেয়েও পড়েনি, কোন রকমে ঝোঁক সামলে নিয়েছে, এবং সেই রকমই অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

এর দু'মাস বাদেই আমার টিউশানিটা গেল। আমাব ছাত্রীটি বেশ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। কিন্তু কেন তার মতিভ্রম হলো কে জানে, একদিন সে আমার হাতের ওপর হাত রেখে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি আমাকে একটুও ভালবাসবেন না?

আমি দু'পাশে ঘাড় নেড়ে বললুম, না।

ছাত্রী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আপনি কি নিষ্ঠুর!

আমি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

ছাত্রীটির মা কিংবা বাবা কেউ এ দৃশ্য দেখে ফেলেছিল কিনা জানি না। তাব দু'দিন বাদেই তারা অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে আমাকে জানালেন, যে আমার আর আসার দরকার নেই। এব জন্যে আমি কিছু মনে করব না তো? তারা এক মাসের মাইনে অতিরিক্ত দিয়ে দিতে রাজী আছেন। আমিও অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে বললাম, না, না, এতে আর মনে করার কি আছে?

এর ছ'মাস বাদেই ডাকে তার বিয়ের নেমন্তন্নেব চিঠি পেলাম। ডাকে পাঠানো চিঠিতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে নেই—এই অবস্থাতে আমি আর গেলাম না, তাছাড়া উপহার দেবারও একটা প্রশ্ন ছিল।

আরও ছ'মাস বাদে লাইট হাউস সিনেমার সামনে আমার সেই ছাত্রী ও তার বরের সঙ্গে দেখা। আমি অবশ্য তখন একটা চাকরি পেয়েছি। আমার ছাত্রীটির কপালে নতুন সিঁদুর, মুখখানা জ্বলজ্বলে, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে আমাকে ডেকে বলল, মাস্টারমশাই, আসুন আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে আমার—

হাত জোড় করে আমি দৃষ্টি স্থির করে রইলাম। চিনতে আমার একটুও দেরি হয় নি।

ছাত্রীর স্বামীও নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছে, কেন না, মুখে সেই রকম অদ্ভুত হাসি! এই সেই লোক—আমার হাত থেকে মানি ব্যাগটা নিয়ে যে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়েছিল!

ছিঃ দীপা, এ রকম একটা লোক তোমার মাস্টারমশাই ছিল? একথা কি ও

আমার দিকে তাকিয়ে বলবে? আমার কিন্তু আর ভয় করছে না—আমি ওর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে আছি।

ছাত্রীর স্বামী সে সব কিছুই বলল না। বরং চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলো। আমি এবার বললাম, চিনতে পারছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো তো! আচ্ছা আজ চলি, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে...।

যাবার আগে ছাত্রীটি আমার দিকে তাকাতেই আমি রহস্যময় ভাবে হাসলাম।

সেদিনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, এই লোকটির মানিব্যাগ নয়, আমার ওপরে টেক্কা দিয়েছিল। আমি সৌখিন চোর হতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও অনেক পাকা—তাই ও আমার চেয়ে অনেক সার্থক হয়েছে।

ছাত্রীটির প্রতি আমি মনে মনে বললাম, ভয় নেই, তুমি জীবনে সুখী হবে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান লোকের হাতে তুমি পড়েছ! ভাগ্যিস, আমি তোমাকে ভালোবাসিনি, তাই তো তোমাব এই সৌভাগ্য!

২৭

কি পণ করব? লবো স্বদেশের দীক্ষা? নতুন করে আবার স্বদেশের কথা চিন্তা করার দরকার আছে? আমার মতন বয়েস যাদের, এক হিসেবে তাদের বেশ দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মাইনি, আমরা জন্মেছি পরাধীন দেশে। কিন্তু তখনকার স্বাধীনতার লড়াইয়েও আমরা কোনো অংশগ্রহণের সুযোগ পাইনি। আমরা তখন খুবই ছোট ছিলাম, স্কুলের ছাত্র, মাঝে মাঝে দাদাদের নির্দেশে মিছিলে গেছি, ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটেছি এদিকে-ওদিকে। গোরা-পুলিশ তখন দেখতাম অহরহ, একবার এক সাহেব-সারজেন্টের হাতের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলাম, যত না আঘাত লেগেছিল, তার চেয়ে বেশি অপমান। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর একটু বড়ো হয়ে নিই, তারপর তোমাদের দেখে নেব।

সেই অল্প বয়সে অবস্থা-পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। আমরা জানতাম, পরাধীন অবস্থা আরো বহুদিন চলবে, অনেক আত্মত্যাগ, অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা জিতে নিতে হবে। হায়, আমাদের প্রায় নিরাশ করেই স্বাধীনতা এসে গেল বেশ তাড়াতাড়ি। নৈরাশ্যের কারণ, আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সুভাষ-মতে বা গান্ধী-মতে লড়াইয়ে নামতে পারলাম না—। আর, স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক বেদনা জড়িয়ে গেল, দেশ ভাগ হয়ে গেল, বীভৎস দাঙ্গা

হলো ধর্মের নামে।

দেশের মধ্যে, দেশের মানুষের মধ্যে দলাদলি খুনোখুনির ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা এল বলে, আমরা এই স্বাধীনতার ঠিক স্বাদ পেলাম না। পরাধীন ভারতে স্বদেশের দীক্ষা নেবার যতটা দরকার ছিল, স্বাধীন ভারতেও তার দরকার কম ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরই আমাদের মধ্যে বিদেশিআনা বেশি করে আসতে লাগল।

স্বাধীনতার পর, আমরা যখন সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছে, তখনও দেশ গড়ার কাজে আমাদের কাছে কোনো ডাক এল না। বিদেশী শাসকরা চলে গেল বটে, কিন্তু স্বদেশী শাসকরা নিজেদের একটা আলাদা জাত হিসাবে তৈরি করে ফেললেন। তাঁরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, বক্তৃতামঞ্চ ছাড়া তাঁরা সাধারণ মানুষের সামনে আসেন না, মিথ্যে কথা বলতে তাঁদের কোনো দ্বিধা নেই।

সারা জীবন ধরে অহিংসার বাণী প্রচার করে গান্ধীজী খুন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'জাতির পিতা' আখ্যা দেওয়া হয়ে গেল, এবং বাড়তে লাগল রাষ্ট্রপতি ভবন আর 'রাজভবনের' জাঁকজমক। উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিন যে অনাড়ম্বর ও সরল জীবনযাপনের নমুনা রেখে গেলেন—এই ত্যাগবাদী দেশে তার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা গেল না।

আমরা জানতে পারলাম, রাজনীতি একটা পেশা, এর সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের জন্য বেদনা অবশ্য সব দলেরই উপছে পড়েছে, এবং প্রত্যেক দলেরই ধারণা অন্যদের 'বেদনা' কৃত্রিম। নারীকে ভালোবাসায় ঈর্ষার স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম দেশকে ভালোবাসা নিঃস্বার্থ হবে। ডেমোক্রেসি, সোস্যালইজম, কম্যুনিজম—সব কটিরই উদ্দেশ্য যদি হয় সমস্ত মানুষের সমান সুযোগ ও অধিকার, তা হলে পথ নিয়ে এত ঝগড়া কেন? আমরা জানি, গণতান্ত্রিক পথে দু'একটি দেশ প্রভূত উন্নতি করেছে, আবার কম্যুনিজমের পথে সমাজবাদেও দু'একটি দেশ তার সমান উন্নতি করেছে। গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি আছে, সেগুলো শোধরাবারও পথ খোলা আছে। গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তার অনেক সুফল আছে বটে, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মনোভাব কখনো কখনো অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ডেকে আনে। সোস্যালইজমের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক নেই, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার আছে। প্রথম যৌবনে আমরা গণতন্ত্রের বদলে সোস্যালইজম-কম্যুনিজমকে প্রকৃষ্টতম মনে করতাম। কিন্তু এখন দেখছি, একটা সোস্যালিস্ট দেশ আর একটি সোস্যালিস্ট দেশকে আক্রমণ করতে পারে। আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা রইল না। চীন ও রাশিয়ার সীমান্ত বিরোধের খবরে আমরা স্তম্ভিত। সাম্যবাদ অনুযায়ী—এই পাশাপাশি দুই

দেশের কোনো সীমারেখাই তো থাকার কথা নয়। পূর্ব ইওরোপের সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ঝগড়া না থাকলেও সীমারেখা রয়েছে কেন? ভাষা, সংস্কৃতির ব্যবধান যদি এত প্রবল হয় তবে এক দেশের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কি অন্য দেশের সমস্যা দূর করা যায়?

নানা কারণে অনেকেই দেশ নামক সীমারেখাটি তুচ্ছ করেছেন। অনেক কবি-শিল্পী দেশের সীমারেখা মানেন না। রবীন্দ্রনাথও 'বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করি' দেখতে চাননি, বিশ্ব নাগরিক হতে চেয়েছেন। গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতারা দেশকে আরো টুকরো টুকরো হতে দিচ্ছেন। দেশের জন্য কারুর প্রকৃত মনোবেদনা নেই, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই প্রধান কাজ। নবীন বিপ্লবীরা অন্যদেশের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান বলছেন। মার্কসইজমকে অবলম্বন করেই আমাদের এখানে আট-ন'টি আলাদা দল। অন্তত পাঁচটি দল বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী—অথচ তারা আলাদা। অর্থলোভের চেয়ে ক্ষমতার লোভ কম শক্তিশালী নয়। জোতদার বা মুনাফাবাজরা অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের ঘরে সম্পদ জমিয়ে রাখে। তা হলে যে-সব লোক বহু বছর ধরে মন্ত্রিত্ব করছেন বা এক দলের নেতৃত্ব করছেন, তাঁরাও তো ক্ষমতা জমাচ্ছেন এক জায়গায়। মৃত্যু না হলে কিংবা ভোটে না হারলে, কোনো প্রবীণ নেতা কি এ পর্যন্ত কোনো তরুণের হাতে নেতৃত্বের ভার দিয়েছেন?

আমাদের মতন দুঃখী মানুষ নিশ্চয়ই সারা ভারতবর্ষে বহু রয়েছে, যাদের কোনো দল নেই, যারা বিচ্ছিন্ন, যাদের দারুণ আশাভঙ্গ হয়েছে এই ক'বছরে। সাম্যবাদীরা আমাদের ধনতন্ত্রের দালাল বলে গালাগালি দেবে আর গণতন্ত্রীরা আমাদের বলবে ছদ্মকম্যুনিসট। দু'দলই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখে। আমরা বিরলে মনখারাপ করে থাকি। যুক্তিহীনতা, চেঁচামেচি কিংবা মিথ্যে স্তোকবাক্যগুলো চোখে পড়ে বলে আমরা কোনো দলেই যোগ দিতে পারি না। দুঃখ হয়, দলাদলির জন্য মূল উদ্দেশ্যটা ক্রমশই পেছিয়ে যাচ্ছে, তা হলো, দেশের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন—ধনসম্পদ এবং দুঃখ-দুর্দশা সব মানুষের মধ্যে উপযুক্তভাবে ভাগ করে নেওয়া। সেটা বিপ্লবের মাধ্যমে হলেও আপত্তি নেই, কিন্তু বিপ্লব মানে কি অনর্থক খুনোখুনি? আমাদের এখনো মনে হয়, সারা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করার বদলে আমাদের এই দেশ, এই দেশের মানুষ, এর ভাষা—এই সব আমাদের চেনা, এগুলি অবলম্বন করেই আমরা এখানকার সমস্যা সমাধান করতে পারি। ঠিক আমাদের দেশের দুঃখ আর কেউ বুঝবে না। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা তার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকারই অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

আমরা প্রতিজ্ঞা নিতে ইতস্তত করি, তাতে অন্তত প্রতিজ্ঞা ভাঙার গ্লানিটা

সইতে হয় না। ভাটিয়ালি গান শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, তবু আমরা স্বদেশের দীক্ষা নিইনি।

২৮

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার খুব কাছাকাছি বৃন্দাবন পাল লেনের একটি বাড়ির একতলায় থাকি তখন। সদর দরজার কাছেই একটি লম্বাটে ঘর—সেই ঘরে দুটো সিঙ্গল খাট পাতা, লোহার খাট—হাসপাতালের রুগীরা যাতে শোয়। খাট দুটো আমার বাবা শিয়ালদার চোরাবাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। সস্তায় জিনিস কেনার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল তাঁর।

খাট দুটোয় আমি আর আমার ছোট ভাই অনিল শুতুম রাত্তির বেলা। দিনের বেলা আমার ভাই ও ঘরে ঢোকার বিশেষ সুযোগ পেত না। দিনের বেলা ঐ ঘরখানি ছিল একটি তুমুল আড্ডাখানা এবং কৃত্তিবাসের অফিস। মাঝে মাঝে রাত্তিরেও বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ ও ঘরে থেকে যেত—ফণিভূষণ আচার্যের বিয়ের রাত্রে আট-ন'জন বন্ধু কি করে ঐ ছোট ঘরে শুয়েছিল কে জানে—প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা বিমল রায়চৌধুরী জানলার বেদিতে কি করে সারারাত শুয়েছিল, তা আজও এক বিস্ময়।

সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি আমি তখন, দীপক মজুমদার এবং আনন্দ বাগচী পড়ে স্কটিশের ফার্স্টইয়ারে। দীপক আমার স্কুলের বন্ধু—জেল খাটার ব্যাপার-ট্যাপারে আমার দু'বছর পর ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, এবং আনন্দ বাগচী তখনই বিখ্যাত লেখক, আমিই সবচেয়ে অখ্যাত নগণ্য ছিলাম—তিনজনে কৃত্তিবাস বার করি। বস্তুত আমি কবিতা লেখা শুরু করি দীপক মজুমদারের অনুকরণে। ইস্কুলে পড়ার সময়েই দীপক খ্যাতনামা কবি—নানা বামপন্থী কাগজে ওর বড়ো বড়ো কবিতা ছাপা হয়, ওর বন্ধু শচীন ভৌমিকের সঙ্গে (শচীন ভৌমিক সাহিত্য ছেড়ে এখন বোম্বের সিনেমা মহলে খুব টাকা পিটছে শুনতে পাই) 'ভাষণ' নাম দিয়ে মার্কসবাদী প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনা করে ফেলেছে, বিমল ঘোষ কিংবা গোপাল হালদারকে দীপক যথাক্রমে বিমলদা এবং গোপালদা বলে ডাকে—আমি দীপককে যথেষ্ট ঈর্ষা করতুম। ইস্কুলে পড়ার সময় কবিতা-টবিতা বা কোনরকম সাহিত্য রচনার কথা আমার মাথাতেই আসেনি। ঘুড়ি ওড়াবার দারুণ নেশা ছিল, বন্ধু আশু ঘোষের সঙ্গে প্রায় টুপটাপ করে বাইরে বেড়াতে যেতুম, অতিশয় দরিদ্রের সন্তান বলে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় থেকেই টিউশানি করতে হয়েছে

আমাকে—সাহিত্য কোথাও ছিল না। কিন্তু ইস্কুলের বন্ধুরা যখন দীপক মজুমদারকে বেশ একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখত—আমার রাগ হতো—আমি বলতুম, যা যা, কবিতা লেখা কি আর শক্ত, যে-কেউ লিখতে পারে! অবশ্য, রাগ হলেও, দীপক এমনই এক অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে যার আকর্ষণ কাটানো যায় না, সুতরাং দীপকের বন্ধু হবারও সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের তিন মাস ছুটি। তখন আমি বেশ আদর্শবাদী ছিলুম। তীব্র রোমান্টিক দেশপ্রেম আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের সেবা করা। মুচি, পরামানিক এদের লেখাপড়া শেখানো—গ্রামে গিয়ে রাস্তা বানাব, রুগীর সেবা করব—বাথরুমে ঢুকলেই এইসব ভালো ভালো চিন্তা আমাকে পেয়ে বসত। ১৫ই আগস্ট, ২৬শে জানুয়ারি, ২৩শে জানুয়ারি এই সব দিন সকালবেলাই স্নান-টান সেরে সশ্রদ্ধ চিত্তে মিটিং শুনতে যেতাম। বয়স্কাউট এবং মণিমেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে আমি কুচকাওয়াজ, বিউগল বাজানো, ফার্স্ট-এড শিখে নিয়েছি। দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিছিলে যোগ দিয়ে বেলেঘাটায় এক মুসলমানের হাত থেকে জল খেয়ে অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বলা যায় না, যদি ঠিকঠাক সুসঙ্গে পড়তাম, এতদিনে হয়তো আমি সর্বোদয় আন্দোলনের একটা ছোটখাটো নেতাও হয়ে যেতাম। কিন্তু আমাকে পথভ্রষ্ট ও নষ্ট করল বাল্য-প্রণয় ও সাহিত্যের পোকা। প্রেম এবং সাহিত্য এই দুটোই মানুষকে সমষ্টি থেকে ছিনিয়ে এনে নিঃসঙ্গ করে দেয়। ফলে, আমার সমাজসেবক হওয়া হলো না—একটা পুঁচকে মেয়ে আর একদল বখাটে ছোকরা লেখক আমাকে পথ ভুলিয়ে দিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের সেই তিন মাসের ছুটি থেকে শুরু।

তখন আমি এক বন্ধুর বোনের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রত্যেক দিন দু'বেলা দু'খানা করে চিঠি লিখি, সেগুলো রবীন্দ্রনাথের কোটেশান-কণ্টকিত, বিদ্যে ফলাবার জন্য মাঝে মাঝে ব্রাউনিং কীটসও। বাড়ি থেকে কিছু একটা সন্দেহের আঁচ দেখা দিল। বাবার কড়া হুকুম হলো—দুপুরবেলা আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারব না। ইংরেজি শেখার জন্য, বাবা আমাকে একটা টেনিসনের কাব্যসংগ্রহ দিয়ে বললেন, রোজ দুপুরে তার থেকে দুটি করে কবিতা অনুবাদ করতে হবে। সে কি অসম্ভব দুঃখময় জীবন। গ্রীষ্মের দুপুরে টেনিসনের কবিতা! বন্দীদশায় কষ্ট লাঘব করার জন্য আমি একটা কায়দা বার করলুম। টেনিসনের এক একটা কবিতা বার করে লাইন গুনে নিয়ে বই মুড়ে রাখতুম। ধরা যাক চব্বিশ লাইন—অনুবাদ না করে মন থেকে বানিয়ে ২৪ লাইন লিখে ফেলতুম নিজেই। প্রেমে পড়ার ফলেই কবিত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কিনা জানি না—কুড়ি পঁচিশ মিনিটের

মধ্যেই লেখা হয়ে যেত—বাকি সময়টা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজে মজে থাকতুম। বাবা অনুবাদগুলো মিলিয়ে দেখতেন না। বিকেল বেলা বলতেন, কি অনুবাদ করেছিস, পড়ে যা! আমি গড়গড় করে পড়ে যেতুম নির্ভয়ে। বাবার কাছ থেকে কোনোদিনও বাহবা পাইনি, কোনো উৎসাহবাক্য শুনিনি, নিছক দুপুরের টাস্ক হিসেবেই সেগুলো দেখতেন। পত্রিকা বলতে 'দেশ' আর 'বসুমতী' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার নাম জানতুম না। বসুমতী দেখতে কি ছিরি, দেশ খানিকটা ছিমছাম—তাই একদিন কি খেয়ালে 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায় ঐ একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। কিছুদিন বাদেই আমার নামে ডাকে একটা দেশ পত্রিকা এল—তাতে ঐ কবিতাটি ছাপা হয়ে গেছে! ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম লেখা দেখে খুব যে আনন্দ হয়েছিল তা নয়। কোথাও একটা কবিতা ছাপা হওয়া যে কোনো সাংঘাতিক ঘটনা এ জ্ঞানই আমার তখন ছিল না। কারণ, দেশের ঐ কবিতাটার কথা আমি আমার প্রেমিকাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলুম বলে সে খুব রাগ করেছিল এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন আর কোনো কবিতা ছাপার জন্য পাঠাবার কথা আমার মনেই আসেনি।

থার্ড ইয়ারে যখন পড়ি—আমার তখন সর্বসমেত গোটা ছ'য়েক কবিতা ছাপা হয়েছে, দীপকের বন্ধু, আমরা দু'জনে ঠিক করলুম, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের অনুকরণে দুজনে একসঙ্গে একটি কবিতার বই বার করব। বড়ো বড়ো ব্যাপার ছাড়া দীপকের মাথায় কিছু আসে না। সিগনেট প্রেস তখন প্রকাশনার জগতে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে—দীপক ঠিক করল আমাদের বই ছাপবে সেই সিগনেট প্রেস। দীপকের অটোগ্রাফ খাতায় রামকিঙ্কর বেইজ একটা স্কেচ এঁকে দিয়েছিলেন, এক বিশাল চেহারার রমণীর পায়ের কাছে একজন খুদে পুরুষ—ঠিক হলো সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করা হবে—ঐ স্কেচ অনুযায়ী মলাট এঁকে দিতে। দুজনে চলে গেলুম সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। দীপক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব খবর রাখে—সত্যজিৎ রায়ের ডাকনাম যে মাণিক তাও তার জানা, প্রথমেই সে মাণিকদা বলে সম্বোধন করে ফেলল। আমি একটু বেশি লাজুক—আমি এলেবেলের মতন এক পাশে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের প্রস্তাব শুনে সত্যজিৎ রায় অপ্রস্তুতভাবে গলা খাঁকারি দিলেন, চেয়ারে বসে স্বস্তি না পেয়ে খাটে আধশোয়া হলেন, কিন্তু ছেলেমানুষের প্রগলভ আবদার শুনেও অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন না, দু'-একটা কবিতা শুনলেন পর্যন্ত, আলগা ভাবে নিলেন, বাঃ ভালোই তো, বেশ বেশ—তা আপনারা এক কাজ করুন, সিগনেট প্রেস থেকে যখন ছাপাবেন ঠিক করেছেন, তখন ওখানকার ডিকে অর্থাৎ দিলীপ গুপ্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, মলাটের কথা পরে দেখা যাবে। দীপক অবদমিতভাবে বলল, মলাট কিন্তু

আপনাকেই আঁকতে হবে—আমরা আপনাকে দিয়েই আঁকাব ঠিক করেছি, অন্য কারুর আঁকা চাই না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আগে ডিকের সঙ্গে...। এলগিন রোডে চমৎকার সাজানো-গোছানো বাড়ি সিগনেট প্রেসের। এইসব বাড়িতে সাধারণত কুকুর থাকে। আমার দারুণ ভয়। সোফা-কৌচে বসার অভ্যেসও আমার নেই। দীপক অকুতোভয়। আসলে, আমাদের যদি বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকত সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে দেখা করার সাহসই পেতুম না। ওঁর মতো ব্যস্ত বিখ্যাত লোকের দেখা পাওয়াই দুর্লভ। কত বিখ্যাত গ্রন্থকার সিগনেট প্রেস থেকে বই ছাপা হলে ধন্য হয়ে যায়—আমরা তো কোন ছার। কিন্তু অকুতোভয় বলেই দীপক নানা কীর্তি করতে পেরেছে। আর আমি তো তখন ছিলুম ওর আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র। আমার তখনই বেশ বড়োসড়ো চেহারা, কলেজের মারামারিতে আমার ডাক পড়ে—আর দীপক রোগা টিংটিংয়ে, ছোটখাটো—কিন্তু বিনা দ্বিধায় আমায় হুকুম করে এবং মানতে বাধ্য করে। আমি বরাবরই দেখছি, রোগা লোকেরা অনায়াসে আমাকে গলার জোরে দমিয়ে রাখে; ওর সব কটি মতামত আমি মেনে নিতে বাধ্য হই। যেমন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জীবনে কত উল্টো কথাই যে আমাকে বুঝিয়েছে, যেমন বিমল রায়চৌধুরী—কত ডাহা মিথ্যে কথা যে আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে! একমাত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই রোগা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বিশেষ কব্জা করতে পারেনি—রোগা লোকদের মধ্যে একমাত্র শক্তিই, দিনের বেশির ভাগ সময়, বিনীত নম্র থাকে।

চাকরের হাতে স্লিপ পাঠিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। দিলীপকুমার গুপ্ত এসে ঢুকলেন, বিশাল রাশভারী চেহারা, গমগমে কণ্ঠস্বর। এই এক আশ্চর্য মানুষ, যখন হাসেন বুকের সব জানালা খুলে দেন। আমাদের মতন দুটি নোংরা জামাকাপড় পরা চোয়াড়ে চেহারার ছোঁড়াকে তিনি একটুও অবহেলা করলেন না, যেন তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সকাল ন'টায় গিয়েছিলুম—উঠলুম বেলা দেড়টায়—মাঝখানে কত লোককে তিনি দেখা না করে ফিরিয়ে দিলেন, তবু আমাদের সঙ্গে গল্প তাঁর ফুরোয় না। সে এক রহস্যময় ব্যাপার। যাই হোক, দীপকের প্রস্তাব শুনে তিনি একটুও নিরুৎসাহ দেখালেন না। বরং দারুণ আগ্রহ। শুধু একটি ছোট পরামর্শ তিনি দিলেন। শুধু দু'জনের কবিতা নিয়ে স্বার্থপরের মতন বই বার করবে কেন? আরও অনেকের কবিতা নিয়ে বই করো—যাকে বলে পত্রিকা। একটি নতুন কবিতার পত্রিকা হোক—যাতে শুধু তোমাদের মতন তরুণদেরই কবিতা থাকবে।

কৃত্তিবাস পত্রিকার সেই থেকে জন্ম। পত্রিকার সমস্ত পরিকল্পনা ডিকে করে

দিয়েছিলেন। নাম তাঁরই ঠিক করা। প্রথম সংখ্যার মলাটের ডিজাইন, মলাটের ব্লক, কাগজ, লে-আউট—সবই তাঁর বুদ্ধি। এবং আর একটি কথাও তিনি বলেছিলেন—তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই, তোমরা নেবে? বিজ্ঞাপনের দামের বদলে আমি ছাপার কাগজটা সব দেব।—এরকম অসাধারণ ভদ্রতার নজির আমি আর দ্বিতীয়বার কারোর কাছ থেকে পাইনি।

দীপকের তখন কোনো আয় নেই, আমি দু'জায়গায় টিউশনি করে দশ প্লাস পনেরো এই পঁচিশ টাকা পাই—শ্যামপুকুরের বস্তিতে এক মুদির ছেলেকে এবং কুমোরটুলীর এক কেলটি জড়ভরত মেয়েকে রোজ দু'বেলা পড়াতে হয়। আনন্দ বাগচীকেও আমরা সম্পাদক হিসেবে রেখেছিলাম—কারণ সে তখনই বেশ নাম করা কবি ও দীপকের বন্ধু। সত্যি কথা বলতে কি, আনন্দ কোনোদিনই কৃত্তিবাসের জন্য তেমন পরিশ্রম করেনি। প্রথম তিন সংখ্যার বেশির ভাগ কাজ করেছিল দীপক—প্রেসের ব্যাপারে আমার কোনোই জ্ঞান ছিল না তখন।

প্রথম সংখ্যার কৃত্তিবাস দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ও রকম সুমুদ্রিত ঝকঝকে কবিতা পত্রিকা আজ পর্যন্ত আর একটাও বেরোয়নি—ডিকে'র পরিকল্পনা ছাড়া বাকি কৃতিত্ব সবই দীপকের। অরবিন্দ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার—এই সব খ্যাতিমান কবিদের কবিতা জোগাড় করল দীপক। দীপকের কাজ ছিল—যত পত্রিকায় যত কবিতা বেরোয় সেই সব কবিদের বয়েস ও ঠিকানা জোগাড় করা এবং বয়সে তরুণ হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কলেজে আমার সঙ্গে তখন পড়ত মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শিবশম্ভু পাল—যতদূর মনে আছে ওদের কবিতা আগে কোথাও ছাপা হয়নি—আমি ওদের নিয়ে এলুম কৃত্তিবাসে। সেই সময়ের পরিচয় পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের একটা দুর্দান্ত কবিতা ছাপা হয়েছে। আমাদের ক্লাসে বাংলা পড়াতেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কি কারণে জানি না, তিনি একদিন শঙ্খ ঘোষের ঐ কবিতাটির উল্লেখ করলেন। খুঁজলুম শঙ্খ ঘোষকে—তাঁর বিখ্যাত কবিতা "দিনগুলি রাতগুলি" ছাপা হয়েছে কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায়। চতুর্থ সংখ্যা থেকে কৃত্তিবাসের অফিস হলো আমার বাড়ির ঠিকানায়, দায়িত্বও প্রায় পুরোপুরি আমার ঘাড়েই এসে পড়ল। আমার বখে যাওয়া সম্পূর্ণ হলো। বাড়িতে তুমুল আড্ডা, পড়াশুনো গোল্লায় দিলুম, ততদিনে আমার বাল্যপ্রণয় ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমিও আমার লাজুক ভালোমানুষী ছেড়ে—তেড়িয়া একরোখা হয়ে উঠেছি। কলেজের মাইনের টাকা ভাঙতে শিখেছি, তাশের জুয়া এবং মদ্যপানে অবিলম্বে দীক্ষা হয়ে গেল। সাহিত্যের বিষাক্ত নেশায় মেতে উঠলুম।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখেন না—কিন্তু গল্পলেখকদের দল ছেড়ে কবিদের সঙ্গেই তার প্রধান আড্ডা। বিপজ্জনক ও শয়তানি পরিকল্পনায় তার জুড়ি ছিল না তখন। শিল্পের নামে জীবন নষ্ট করাই ছিল তার ব্রত। শক্তি তখন কবিতা লেখে না, স্ফুলিংগ সমাদ্দার নামে ছোট গল্প লেখে। নোংরা জামাকাপড় ও একমুখ দাড়ি নিয়ে কফি হাউসে বসে থাকে ও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে। আমাদের প্ররোচনায় শক্তি অবিলম্বে চলে এল কবিতার জগতে। দীপকের কলেজেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ত উৎপলকুমার বসু—লাজুক শান্ত চেহারা—অতিদ্রুত মিচ্‌কে বদমায়েসিতে পাকা হয়ে উঠল। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত'র যাদবপুরের বাড়িতে তার এলোমেলো বইয়ের টেবিল আরো এলোমেলো করে দিয়ে এসেছি। মফঃস্বলে মাস্টারি করত তারাপদ রায়—প্যান্টের তলায় পাজামা পরে, হাতে টিনের সুটকেশ নিয়ে আসত মাঝে মাঝে—সবার সামনে প্যান্টের বোতাম খুলে স্ট্রিপ টিজ দেখাত। একে তো বাজখাঁই গলা—কোনো রকম সভ্যতার ধার ধারত না তারাপদ, প্রথম দিন এসেই ধুলো পায়ে আমার বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে র‍্যাক থেকে বইপত্র তুলে নিয়ে বগল বন্দী করল, আমাদের তাশ খেলায় সেভের্ন নো ট্রামপস ডেকে হেসে উঠল হো হো করে। শংকর চট্টোপাধ্যায় তাশ খেলা পছন্দ করে না—তাশ উল্টে দিয়ে সাহিত্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠত শুধু।

এই লেখাটা শুরু করেই ভুল করেছি। প্রথম দিকে নিজের কথাই সাতকাহন করে বলেছিলুম, তারপর মনে হলো, ছি ছি, সেটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু অন্যদের কথা আনতে গিয়ে দেখছি লেখাটা যে বিরাট বড়ো হয়ে উঠছে। বুঢ়া আর ভাস্করের কথা বলতে গেলেই তো কত কথা লিখতে হয়। আর তন্ময় দত্তের আবির্ভাব ও দ্রুত প্রস্থানের নাটকীয় কাহিনী। প্রণব মুখার্জী, মানস রায়চৌধুরী, দীপকের বিবর্তন—এ সব আর বলব কখন! তার চেয়ে কৃত্তিবাসের গোড়ার কথাটুকুই শুধু থাক। কে কে তখনও আসেনি সেইটুকু শুধু সেরে রাখি।

এখনকার কৃত্তিবাসের স্তম্ভ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তখন আসেনি। সে তখন নমিতা মুখোপাধ্যায় নামে ছেলেখেলায় ব্যস্ত। অনেকদিন পর একদিন এল—সুট-টাই পরে, গম্ভীরভাবে। শরৎকে ফুটপাথে বসাতে বেশ সময় লেগেছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত—তখন দূর থেকে আমাকে মারবে বলে শাসাচ্ছে। সুধেন্দু মল্লিককে তখনো চিনিই না। সমীর রায়চৌধুরী তখন হাংরি হওয়া দূরে থাক, কবিতা লেখাই শুরু করেনি, কিন্তু সবার অকৃত্রিম বন্ধু সুনীল বসু তখনো লাজুক—এখনো। আর জ্যোতির্ময় দত্তের ওপর অকারণে চটা ছিলুম। গুজব শুনতাম, প্রেসিডেন্সী কলেজের সাতানব্বই বছরের ইতিহাসে ওরকম ব্রিলিয়ান্ট ছেলে নাকি আর

আসেনি। তখন কারুর সম্পর্কে ভালো কিছু শুনলেই রাগ হবার সময়। আরো শুনতাম, সে বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। একদিন দেখলাম, সত্যিই শ্যামবাজারে একটা খালি ডবলডেকারে বসে ও বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের সঙ্গে গল্পে মশগুল। বুদ্ধদেব বসু তখন আমার কাছে দেবতার সমকক্ষ—কোনোদিন তাঁর কাছে যাব, কথা বলব—এ সৌভাগ্যের কথা কল্পনাই করতে পারি না এবং তাঁর মেয়েও তো দেবীরই মতন। তার প্রেমিক ঐ জ্যোতির্ময় দত্ত। সে নাকি খুব অহংকারী ও দুর্মুখ এই শুনেছিলাম, সুতরাং আলাপ করার সাহস পাইনি। বুদ্ধদেব বসুর ওই মেয়েই বা কম কিসের? খুব চালিয়াৎ ছিল তখন, জানি না—এখন কেমন! একদিন ভরসা করে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ২০২-এ গেছি। দরজা খুলল সেই মেয়েটি, মিমি। জিজ্ঞেস করলাম বুদ্ধদেব বসু বাড়ি আছেন? তাঁর সঙ্গে একটু দেখা হতে পারে কি?

সমবয়সী যুবা—কিন্তু আমাদের মানুষ বলে গ্রাহ্যই করল না মেয়েটি, হাতে তেঁতুলের আচার ছিল, তাই চাটতে চাটতে অতিশয় অবহেলা ভরে বলল, হ্যাঁ, বাড়িতে আছেন। কিন্তু, দেখা হবে কিনা বলতে পারি না।

সতেরো বছর বয়সে

দেবাশিষ বসুকে

আমার একটা নদী ছিল। আমার একটা পাহাড় ছিল। আমার একটা নিজস্ব আকাশ ছিল। তখন আমার বয়েস সতেরো।

মেয়েদের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার মতন আমারও তখন হাফ প্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যান্ট পরার বয়েস। আমার প্রথম ফুলপ্যান্টটি ছিল ঘি রঙের ওপর খয়েরি ডোরাকাটা, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় সসম্মানে থার্ড ডিভিশনে পাস করার জন্য আমার মা তাঁর লক্ষ্মীপুজোর কৌটোর জমানো পয়সা দিয়ে সেটি কিনে দিয়েছিলেন। এছাড়া দুর্গাপূজার সময় মামাবাড়ি থেকে পেয়েছিলাম একটা নীল রঙের বুশ শার্ট, এক জোড়া ছাই রঙের কেডস আমার আগে থেকেই ছিল। এইসব পরে সেজেগুজে আমাকে রীতিমত একটি শৌখিন যুবকের মতন দেখাত। সিঁথি কাটার বদলে সেই প্রথম চুল উল্টাতে শুরু করেছি। অবশ্য, অনেকেই তখন আমায় যুবক বলে স্বীকার করত না—ছেলেটা, ছেলেটা বলেই উল্লেখ করত।

আমাকে সেবার গেঞ্জি কিনে দেবার কথা মনে পড়েনি আমার মা, বাবার। একদিন দারুণ বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়েছি ভাস্করদের বাড়িতে। বৈঠকখানার দরজা খুলে ভাস্কর বলল, জামাটা খুলে ফ্যাল। পাখার তলায় একটু কাঁপতে কাঁপতে বলছিলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাস্কর জোর করেই শেষ পর্যন্ত জামাটা খোলালো। তারপর বড়দা বড়দা ভাব করে এক ধমক দিয়ে বলল, দ্যাখ, সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তুই কি রাত্তিরের দিকে কয়লা গুদোমে কাজ করিস নাকি? খোল, শিগগির ওটাও খোল।

আমার গেঞ্জিটা ছিল সত্যিই খুব ময়লা আর পেঁজা পেঁজা, একটু টানাটানি করলেই পুরপুর করে ছিঁড়ে যায়। প্রত্যেকবার কাচার সময় একটু বেশি করে ছেঁড়ে বলে আমি আর ওটা কাচাকাচির ঝামেলায় যেতাম না। সেটা খুলতেই ভাস্কর এক সট মেরে সেটাকে ফেলে দিল রাস্তার হাঁটু জলে। আমার কষ্ট হয়েছিল গেঞ্জিটার জন্য, প্রিয়-বিচ্ছেদের মতন।

ভাস্কর ওর নিজের একটা গেঞ্জি এনে পরতে দিয়েছিল। ধপধপে ফর্সা, ধোপাবাড়িতে কাচা ও ইস্তিরি-করা। গেঞ্জিও যে আবার ইস্তিরি করা যায়, সেই ব্যাপারটাই আমি জানতাম না তখন।

ওঃ, সেই কৈশোর যৌবনে কী দারুণ বড়োলোক ছিলাম আমি। অফুরন্ত ধন-

সম্পদ, কী করে খরচ করব, তার ঠিক ছিল না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে, তখন মনে হয়, এই সব বৃষ্টি আমার, যাব খুশি স্নান করে নাও। শুকনো জমিতে আর কোনো মলিন কৃষকের তো চোখের জল ফেলবার দরকার নেই, এই তো আমি বৃষ্টিজলে সব ভিজিয়ে দিচ্ছি। মধুপুরের লাল রঙের রাস্তাটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে, সেখানে একটা খুব বড়ো কদমফুলের গাছ। কদমগাছের ডাল নরম হয়, তবু আমি তরতর করে বেয়ে উঠে যেতে পারি। এত ফুল, ইচ্ছে করলে এ সবই তো আমার। গাছটার প্রায় ডগার কাছে উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা অদ্ভুত ভালোলাগার অনুভূতি হয়েছিল যে ভেবেছিলাম, এখন আমি অনায়াসেই এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে পারি। এমন সুখী মৃত্যু কোনো মানুষের হয় না। আবার এক-একদিন রাত্তিরবেলা ছাদে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হতো, বুকের মধ্যে এতখানি ভালোবাসা আছে যে দশখানা পৃথিবী ভর্তি মানুষকে সেই ভালোবাসা দিলেও ফুরোবে না।

মধুপুরে গিয়েছিলাম ভাস্করদের সঙ্গে। আমার জীবনের প্রথম ফুলপ্যান্ট ও বুশ শার্ট পরে সেই প্রথম ভ্রমণ-অভিযান। সদ্য স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকার ফলে তখন আমাদের একা একা বাইরে বেড়াতে যাবার অধিকার জন্মেছে।

প্রথমে ঠিক ছিল, ওরা তিনজন যাবে, ভাস্কর, আশু আর উৎপল। ভাস্করের এক আত্মীয়ের একটা বাড়ি মধুপুরে এমনিই একলা একলা খালি পড়ে থাকে। সুতরাং থাকার জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, এবং ওটুকু হলেই বাবা-মা'দের সহজে রাজি করানো যায়। কিন্তু তিনজনে বাইরে বেড়াতে যাবার নানান অসুবিধে। সাইকেল রিকশা ভাড়া নিতে হয় দুটো, এর মধ্যে কে একটাতে একা চড়বে, তা নিয়ে গণ্ডগোল হয়। ক্যারাম কিংবা তাস তিনজনে খেলা যায় না। তাছাড়াও তিনজন একসঙ্গে থাকলে হঠাৎ হঠাৎ ঝগড়া বেধে যায়। এটা আমরা একবার ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গিয়েই বুঝেছি। সেইজন্যই ভাস্কর আমায় বলল, নীলু, তুই শুধু ট্রেন ভাড়াটার ব্যবস্থা কর, তাহলেই তোকে আমরা নিয়ে যেতে পারি।

মধুপুরের ট্রেন ভাড়া তখন যাওয়া-আসা চোদ্দ টাকা। আমি তার চেয়ে অনেক বেশি, তেইশ টাকা যোগাড় করে ফেললাম। বলেছি না, অভাব কাকে বলে তাই-ই জানতাম না সেই সময়। মার কাছ থেকে তিন টাকা, কাকার কাছ থেকে তিন টাকা, বড়োমামার কাছ থেকে পাঁচ টাকা, আমার তিন কলেজে-পড়া মাসি —প্রত্যেকের কাছ থেকে দু'টাকা করে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঝুনু মাসিই আপত্তি তুলেছিল খানিকটা, তবু শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, এছাড়া স্কুলের জ্যামিতি বাক্সটা বিক্রি করে এক টাকা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া মেডেলটা বেচে আড়াই টাকা, পর পর দু' সপ্তাহের রেশন তোলবার সময় একটু বেশি ঝুঁকি

নিয়ে মোট এক টাকা বারো আনা করে সরিয়ে ফেলা, এইরকমভাবে আরো উঠতে পারত, কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে ভেবে থেমে গেলাম। দাদার কাছ থেকে টাকা চাইনি, চাইলেও পেতাম না, তবে দাদাকে ধরেছিলাম বাবার কাছ থেকে অনুমতিটা আদায় করে দেবার জন্য। অম্লানমুখে মিথ্যে কথা বলায় দাদার জুড়ি নেই।

রাত্তিরবেলা বাবার সঙ্গে দাদার কথা হয়, আমি ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে যাবে?

দাদা বলল, ভাস্করদের হোল ফ্যামিলি যাচ্ছে। ভাস্করের বাবা আমাকে বললেন, ওদের তো ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এমনিতেই এখন পড়াশুনা করবে না, সেই জন্যই নিয়ে যাচ্ছি বাইরে।

বাবা বললেন, আমার এখন হাত খালি, টাকাপয়সা দেওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।

দাদা বলল, মেসোমশাই তো টাকাপয়সা কিছুতেই দিতে দেবেন না। উনি বললেন, নীলু আমার ছেলের মতন, ওর জন্য আবার টাকাপয়সা কি লাগবে? তাও আমি জোর করে ট্রেনের রিটার্ন টিকিট কেটে দিতে চেয়েছি আমার টিউশানির টাকা থেকে, তাছাড়াও আরো দশটা টাকা দিতে পারি হাত খরচ হিসেবে।

বাবা বললেন, কিন্তু নীলু সাঁতার জানে না, ওকে কি একা একা বাইরে পাঠানো উচিত?

দাদা বলল, মধুপুরে তো পুকুর-টুকুর বিশেষ নেই। শুকনো জায়গা। যদি পুরী যেত, তাহলে না হয় ভয় ছিল। নীলুর প্রায়ই জ্বর হয়, মধুপুরের জল-হাওয়া ভালো। আমার মনে হয় কিছুদিন থেকে এলে ওর ভালোই হবে। এমনিতে তো সহজে সুযোগ পাওয়া যায় না।

বাবা তখন জিজ্ঞেস করলেন মায়ের মতামত। মা বললেন, সে তোমরা যা ভালো বুঝবে। বাবা একবার আমার নকল ঘুমন্ত মুখের দিকে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত দাদাকে বাবা বললেন, ওকে তিন-চারখানা পোস্ট কার্ড কিনে দিস। গিয়ে যেন নিয়মিত চিঠি লেখে।

সে কথা শুনে আমি বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলুম।

পরদিন সকালে দাদা আমায় জিজ্ঞেস করল, আমি যে তোর পারমিশান আদায় করে দিলুম, তার বদলে তুই আমায় কি দিবি?

আমি দাদাকে বলতে পারতাম, তুমি কি চাও, বলো? তুমি তৈমুরলঙের পুরো সাম্রাজ্যটা চাও, আমি তোমায় লিখে দিতে পারি। তুমি ট্রেজার আয়ল্যান্ডের গুপ্তধন নেবে? কিংবা আকাশের একটা জলভরা মেঘ?

তার বদলে দাদা অতি সামান্য জিনিস চাইল? সে বলল ফিরে এসে টানা তিন মাস তুই আমার গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার কেচে দিবি!

আমি একবাক্যে মেনে নিলাম। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের জামাকাপড় কাচা নিজের নিজের। আমার মায়েব তখন স্বাস্থ্য খারাপ ছিল।

ট্রেনে আমরা চারজন সদ্য যুবক সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের শাসন করবার কেউ নেই। যে-কোনো স্টেশনে ট্রেন থামলে আমবা ইচ্ছে করলেই প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারি। কাবলি ছোলা আর আদা কিংবা ঝালমুড়ি কিংবা গুলাবি বেউরি যত খুশি কিনে খেতে পারি। ভাস্কর এক-একটা স্টেশনে নামে আর সিটি দিয়ে ট্রেন ছাড়বাব পব দৌড়ে লাফিয়ে কায়দা করে ওঠে।

সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন উপযাচক হয়ে আমাদের অভিভাবক সাজতে চায়। তাবা উপদেশ দেয়, ও ভাই, খোলা দবজার পাশে দাড়িও না, ও খোকা জানলা দিয়ে অতখানি মাথা ঝুকিও না! আমরা এসবে অবশ্য কর্ণপাতও করি না। যতই অন্যরা আমাদের খোকা, ছেলেটা বা ভাই বলে সম্বোধন করুক, আমরা নিজেদের যুবক বলেই দাবি করতে পারি অনায়াসে। চাণক্য শ্লোকে পড়েছি, প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্র বদাচরেৎ। বদাচরেৎ মানে বদ ব্যবহার নয়। মিত্রবৎ অর্থাৎ ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলে ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করবে। থার্ড ডিভিশন পেলে কী হয়, আমি সংস্কৃত বেশ ভালো জানি। ট্রেনের লোকগুলো নিশ্চয়ই চাণক্য শ্লোক পড়েনি।

শক্তিগড় স্টেশনে আমি নেমে প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়েছিলাম। এবার আমার পালা। দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার প্রতিযোগিতায় আমিই বা ওদের কাছে হেরে যাব কেন? তেমন কোনো তেষ্টা না পেলেও আমরা চার ভাঁড় চা খেয়ে নিলাম। তারপর ভাড়গুলো একটা ল্যাম্প পোস্টের দিকে টিপ করে করে ছোঁড়া হলো, আগু ছাড়া লাগাতে পারল না কেউই।

আমি ট্রেনের গায়ে এক হাতের হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। ট্রেন ছাড়তে একটু দেরি হলেই বড়ো উতলা লাগে। কতক্ষণে মধুপুরে পৌঁছাব? হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, মাঝরাস্তায় যেন কোনোক্রমে আমাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি কেউ বলে ওঠে, এ ট্রেন আর এগোবে না, আবার ফিরে যাবে হাওড়ায়? কোনোক্রমে একবার মধুপুর পর্যন্ত যেতে পারলে হয়।

পচাৎ করে একজন পানের পিক ফেলল জানলা দিয়ে, একেবারে আমার প্যান্টের ওপরে। ঠিক যেন খুনখারাবি রং। আমি শিউরে উঠলাম। আমার একমাত্র ফুলপ্যান্ট। এখন আমি কি করব? আমার সঙ্গে আর দুটো পাজামা, একটা হাফ প্যান্ট আর দুটো শার্ট আছে। বাইরে বেরুবার সময় সবসময় এই ফুলপ্যান্টটা

দিয়েই চালাব ভেবেছিলাম। আমি জানলায় সেই লোকটির কাৎলা মাছের মতন মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম স্তম্ভিত হয়ে।

আমি দৌড়ে গিয়ে টিউবওয়েলটায় সবেমাত্র হাত দিয়েছি, অমনি বেজে উঠল ট্রেনের সিটি। তিনবন্ধু সমস্বরে চ্যাচাতে লাগল আমার নাম ধরে। আমি দু'এক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে আবার ছুটলাম পেছন ফিরে। জীবনে অত জোরে আগে ছুটিনি। আমিও ছুটছি, ওরাও চ্যাঁচাচ্ছে। ওরা বলতে চাইছে, যে-কোনো কামরায় উঠে পড়তে। কিন্তু সে কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। বন্ধুদের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে ওঠার প্রতিযোগিতায় আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফার্স্ট হয়ে লাফিয়ে পড়লাম নিজেদের কামরার মধ্যে। ততক্ষণে আমার কান্না পেয়ে গেছে।

আশু, উৎপল, ভাস্কর সেই পিক-ফেলা লোকটাকে বকুনি দিতে লাগল দারুণভাবে। আরো অনেক লোক দেখছিল আমাদের দিকে। কিছু লোক হাসতে লাগল।

সেই লোকটি বোধহয় এক-বর্ণও বাংলা বোঝে না। ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যদিও তার গোল গালো এবং বড়ো আকৃতির কাৎলা মাছের মতন মুখ ঠিকই, তবু এরকম মুখেও সরল অসহায়তা ফুটে ওঠে। যাই হোক, পানের পিক গায়ে ফেলার জন্য তো একটা লোককে মারা যায় না, বড়ো জোর পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেখানে পান খাওয়া নিষিদ্ধ।

লোকটিকে প্রচুর বকুনি দিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেবার পর ভাস্কর বলল, নীলু প্যান্টটা খুলে ফ্যাল।

ভাস্করের কথা শুনে আমার রাগ ধরে। যখন তখন যেখানে সেখানে প্যান্ট বা শার্ট খুলে ফেলা যায় নাকি?

আমি জেদের সঙ্গে বললাম, না।

আশু বলল, এক্ষুনি ধুয়ে না ফেললে কিন্তু ঐ দাগ আর উঠবে না।

আমার ঘি রঙের প্যান্টে সেই টকটকে লাল পানের পিক একেবারে গাঢ় হয়ে মিশে গেছে। ও আর উঠবে না আমি বুঝেছি। এইটুকু অভিমান নিয়ে আমি বললাম, উঠবে না তো উঠবে না, আমি এটাই পরে থাকব।

উৎপল বলল, প্যান্টটা খুলে ফেলে শিগগির বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ভিজিয়ে দে। তোর ঘেন্না করছে না?

না।

ভাস্কর বলল, কেন পাগলামি করছিস। নিচে আণ্ডার প্যান্ট পরিসনি? প্যান্টটা খুলে ফ্যাল।

—বলছি তো খুলব না।

তখন তিনবন্ধু চেপে ধরল আমাকে। যেন ওরা মজা পেয়েছে, কামরার অন্য লোকরা আরো বেশি মজা পেয়ে হাসতে লাগল। ভাস্কর আমার কোমরে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলতে লাগল, খোল শিগগির খোল।

আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণযাত্রাটি কি সুন্দর হতে পারত না? এত লোক থাকতে শুধু আমার প্যান্টেই কেন দাগ লাগবে? এত লোকজনের সামনে প্যান্ট খুলে ফেলার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো নয়?

কোনোক্রমে ওদের হাত ছাড়িয়ে আমি ছুটে গেলাম বাথরুমের দিকে।

আমি যে মধুপুরের কথা লিখব, সেরকম মধুপুর পৃথিবীতে এখন আর কোথাও নেই। সেইরকম মধুপুর মাত্র কয়েক বছরের জন্য থাকে আবার উধাও হয়ে যায়। আমি শত চেষ্টা করলেও সেই মধুপুরে এখন আর যেতে পারব না। শুধু সতেরো বছর বয়েসেই সেই মধুপুর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

আমাদের বাড়িটা ছিল টুকটুকে লাল রঙের। সেই একরকম বাড়ি থাকে, বাইরের দেয়ালে প্লাস্টার থাকে না, ইটের ওপরই রং করা, প্রতিটি ইট বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়িটা দোতলা, সামনে একটি বড়ো গাড়ি বারান্দা। আসলে চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা একটি প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়িটা বসান। রেল স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে।

ভাবা যায় কি, গোটা একটা বাড়ি শুধু আমাদের? একতলায় চারখানা ঘর, দোতলায় চারখানা। তার মধ্যে শুধু দোতলার একটি ঘরের চাবি আমাদের দেওয়া হয়নি। সে ঘরে কী আছে আমরা জানি না। আমাদের চারজনের যদিও একটা মাত্র ঘরই যথেষ্ট।

বাড়িটি পাহারা দেয় একজন সাঁওতাল। এখানকার বাগানের ফল ফুল সে-ই ফলায়, সে-ই বিক্রি করে। সে বাবুদের কাছ থেকে আগেই চিঠি পেয়েছে, সুতরাং আমাদের খাতির করে গেট খুলে দিল। সে লেখাপড়া জানে না, চিঠি পেলে অন্য লোকের কাছে গিয়ে পড়িয়ে নেয়। কুচকুচে কালো, রীতিমতন লম্বা ও বলশালী এই মানুষটির নাম পরী। এরকম একজন পুরুষের নাম পরী হতে পারে? নাম শুনেই আমরা হেসে উঠি এবং বারবার ওকে ওর পুরো নাম জিজ্ঞেস করি। ও নিজেও হাসে। পরী ছাড়া ওর অন্য নাম নেই। ওর পদবী মাঝি। পরী কথাটা যে কিসের অপভ্রংশ তা আমরা কিছুতেই বার করতে পারি না। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, সাঁওতালরা কেউ কখনো নৌকো চালায় না, এদিকে তার সুযোগই নেই, তবু ওদের অনেকের পদবী মাঝি হয়।

ওর পরী নামটা শুনে প্রথমে যতই অদ্ভুত লাগুক, দু'তিন দিন ঐ নামে ওকে ডাকতে ডাকতে তারপর সেটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন পরী বললে

আর ডানা লাগানো মেয়ের ছবি চোখে ভেসে ওঠে না, ঐ শক্ত সবল কালো লোকটিকেই মনে পড়ে।

মানুষের যে-টুকু শুধু প্রয়োজন, তার থেকে অতিরিক্ত কিছু পেলেই মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। কলকাতায় আমাদের ছোট ছোট বাড়িতে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়, মধুপুরে আমাদের চারজনের জন্য গোটা একটা বাড়ির সাতখানা ঘর, অতবড়ো বাগান, তারপরেও দিগন্ত জোড়া মাঠ ও সীমাহীন আকাশ, এসব পেয়ে আমরা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেলাম। আমরা প্রত্যেকেই যেন এক একজন রাজপুত্র।

কোনো নির্বাচনের প্রয়োজন হলো না, ভাস্কর নিজে থেকেই আমাদের দলের নেতা হয়ে গেল। তার কারণ, আমরা চারজনে মিলে যদি এক সঙ্গে চ্যাঁচাতে শুরু করি, তাহলে ভাস্করই শেষ পর্যন্ত জিতবে, ওর গলার জোর সবচেয়ে বেশি। চারজনেই আমরা সমবয়েসী হলেও আশু একটু বেশি লম্বা, কিন্তু তার ভালোমানুষ-স্বভাবের জন্য দলের নেতৃত্বটা সে বিনা দ্বিধায় ভাস্করকে ছেড়ে দিল। উৎপলের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাই সে স্বেচ্ছায় নিয়ে নিল বিরোধী পক্ষের নেতার ভূমিকা। আমি এলেবেলে।

ভাস্কর তক্ষুনি চাল, ডাল, মুরগি, আলু-পেঁয়াজ, তেল, মশলা আনবার জন্য টাকা দিয়ে দিল। বাড়িটার পেছন দিকে একটা টালির ঘরে পরীর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা থাকে, তারাই রান্না করে দেবে। ভাস্কর নিয়ে এসেছে প্রচুর বিস্কুট, কণ্ডেন্সড মিল্ক আর চায়ের প্যাকেট, সুতরাং আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ভাবনা নেই।

জিনিসপত্র নামিয়ে রেখেই আমি বাগানটা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। এক সময় অনেক ভালো ফুল গাছ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সেগুলির তেমন যত্ন নেই। আর রয়েছে প্রচুর আতা আর পেয়ারা গাছ। আতা গাছের প্রায় জঙ্গলই বলা যায়। একটা চমৎকার বুনো গন্ধ, যেমন গন্ধ কলকাতায় কেউ কখনো পায় না। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে অযত্নে ফুটে থাকা অসংখ্য বনতুলসী। একটু এগিয়ে আমি দেখতে পেলাম পরপর দুটি সফেদা গাছ। তাতে সফেদা ফলে আছে পর্যন্ত। তার একটি গাছে বসে আছে একটি চকলেট রঙের বড়ো ল্যাজ-ঝোলা পাখি। সেই পাখিটা একমনে আমাকে দেখছে।

এই পাখিটাকে আমি চিনি। দমদমে আমাদের মামাবাড়ির বাগানে এরকম একটি পাখি আমি দেখেছিলাম। এর নাম ইষ্টকুটুম। এই পাখি কোনো বাড়ির কাছে উড়ে এসে বসলে সেই বাড়িতে অতিথি আসে। এখানে তো আমরাই অতিথি। এই ইষ্টকুটুম পাখিটা নিশ্চয়ই আমাদেরই স্বাগতম জানাবার জন্য এখানে বসে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছ?

পাখিটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। আমরা যে এসেছি, সেটা দেখে যাওয়াই যেন ওর কাজ ছিল।

আর একটুখানি এগিয়ে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললুম। এই বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও রয়েছে। পুকুরটা বেশি বড়ো নয়। কিন্তু বেশ গভীর বলেই মনে হয়, জলের রং কালচে ধরনের, মাঝখানে ফুটে আছে কয়েকটা লাল রঙের শালুক। আর তখন আমি শালুক পদ্মের খুব একটা তফাত জানতুম না। তাই প্রথমে পদ্মই ভেবেছিলাম, পরে উৎপল আমার ভুল ভাঙিয়ে দেয়।

দাদা বলেছিল, মধুপুরে জলের ভয় নেই, সে-কথা সত্যি নয়। এই তো আমাদের বাড়ির সঙ্গেই একটা পুকুর। কিন্তু আমার একটুও ভয় করল না, পুকুরটা দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এবং তক্ষুনি মনে মনে সেটাকে 'আমার পুকুর' বলে ঘোষণা করে দিলাম। যা কিছু সুন্দর দেখি, সবই আমার একেবারে নিজস্ব করে নিতে ইচ্ছে করে।

পুকুরটার একপাশে একটা পাথর বাধানো ঘাট রয়েছে। এমন নির্জন ছিমছাম পুকুরটা দেখলে অনেকক্ষণ এর পাশে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘাট দিয়ে জলের কাছে নেমে একটু জল ছুঁলাম। দারুণ ঠাণ্ডা। আমার ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভাস্কর আর উৎপল ভালোই সাঁতার জানে। আশুও জানে বোধহয়। ওরা নিশ্চয়ই আমার এই পুকুরে নেমে দারুণ দাপাদাপি করবে। যাক, আমিও এখানেই চট করে সাঁতারটা শিখে নেব।

এবার পুকুরটার চারপাশ একবার ঘুরে দেখলেই বাগানটা দেখা সম্পূর্ণ হয়। যিনি এই বাড়িটা প্রথম বানিয়েছিলেন, তিনি খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন নিশ্চয়ই। বাগানের মাঝে মাঝেই রয়েছে সাদা পাথরের বেঞ্চ, তার দু'একটা ভেঙে গেলেও কয়েকটা এখনো আস্ত আছে। কারুর যদি ইচ্ছে হয় এই বাগানে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার, সেই জন্যই বুঝি ঐ বেঞ্চের ঠিক ওপরেই একটা পেয়ারা গাছের ডাল ঝুঁকে আছে, ওর ওপর উঠে দাঁড়ালেই হাত বাড়িয়ে পেয়ারা পাড়া যায়। দেখা রইল, এখন থাক। প্রত্যেকটা বেঞ্চ আমি হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে গেলাম, কোনো কারণ নেই, এমনিই।

বেলা প্রায় একটা বাজে, মাথার ওপর ঝকঝকে রোদ। নতুন জায়গায় এলেই দারুণ খিদে পায়। পরী চাল ডাল কিনে এনে রান্না চাপাতে কত দেরি করবে কে জানে। ঐ পেয়ারাগুলোরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। তার আগেই বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুঁয়ে না এলে বন্ধুদের আগেই পুরো বাগানটা আমার হবে না যে।

বাগানের চারদিকের যে পাঁচিল, তার একটা জায়গা ভাঙা মনে হয়, বাইরের

লোকেরা কেউ ইচ্ছে করে ঐ জায়গাটা ভেঙে বাগানের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের একটা রাস্তা বানিয়েছে।

সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে আমি একটু বাইরে উঁকি দিয়েই দারুণ চমকে উঠলাম। আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বাইরেটা ফাঁকা মাঠের মতন, এখানে সেখানে দু'একটা ছাড়া ছাড়া গাছ। সেই রকম একটা বড়ো গাছে হেলান দিয়ে একজন মহিলা দাড়িয়ে রয়েছেন। অসম্ভব ফর্সা গায়ের রং, খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, একটা হলুদ শাড়ি পরা, লাল রঙের ব্লাউজ, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ মনে হয়, এই আমার বড়ো মাসি অর্থাৎ রাণু মাসীর সমানই হবেন বোধহয়। এরকম একজন মহিলাকে দেখে আমি ভয় পাব কেন? তবু ভয় করতে লাগল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে এরকম দুপুরবেলা একজন মহিলা একা গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এতে ভয় পাবার কিছু না থাকলেও ওঁর চোখের দৃষ্টি দেখেই ছমছমিয়ে উঠেছিল আমার গা। উনি এক দৃষ্টিতে এদিকেই চেয়ে আছেন, আমাকে দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই, অথচ আমাকে দেখতে পাবার কোনো ভাবই ওঁর মুখে ফোটেনি। হঠাৎ কারুকে দেখতে পেলে কেউ ওরকম এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে না, মনে হয় যেন ঐ মহিলার দৃষ্টি আমার শরীর ফুঁড়ে যাচ্ছে।

আমি বলবার চেষ্টা করলুম কে? কিন্তু বলতে পারলুম না। আমার মনে হলো, এই দুপুরবেলা...ইনি বোধহয় মানুষ নন...

পেছন ফিরেই আমি একটা দৌড় লাগালাম। বাগানের গাছপালা ভেঙে এক ছুটে সোজা বাড়ি।

২

বিকেলবেলা আমরা বেরুলুম মধুপুর পরিদর্শনে। খেতে খেতেই আমাদের চারটে হয়ে গিয়েছিল, তারপর ঘণ্টাখানেক শুয়ে শুয়ে গুলতানি করে কেটেছে। কি অসম্ভব ভালো মুর্গির ঝোল রেঁধেছিল পরীর বৌ। ডাল, ভাত, আলু সেদ্ধ, ঘি আর মুরগির মাংস। আমরা কেউই আগে কখনো এতখানি ভাত খাইনি। এখন থেকে প্রত্যেকদিন দু'বেলা আমরা কী খাব, তা আমরা নিজেরাই ঠিক করব। বাড়ির মতন নয় যে হঠাৎ খেতে বসে দেখব ট্যাংরা মাছের ঝোল!

মধুপুর শহরের দোকানপাট যা কিছু সব স্টেশনের ধারেই। আসবার সময় আমরা দেখে এসেছি। সেদিকে আর যাবার ইচ্ছে নেই। বাগানটা ঘুরে বাড়ির পিছন

দিকের মাঠেই ঘুরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করল বন্ধুরা। পাথরের বেঞ্চটায় উঠে কয়েকটা পেয়ারা পেড়ে নেওয়া হলো তার আগে। এই পেয়ারাগুলোর জাতই আলাদা, ভেতরটা লাল।

বাগানের বাইরে এসে আমি সেই বড়ো গাছটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। এখন সেখানে কেউ নেই। আমি লজ্জা বোধ করলুম। আমার কি চোখের ভুল হয়েছিল? না, না, তা হতেই পারে না, আমি কলকাতার রাস্তায় প্রায় এক মাইল দূর থেকে বাসের নম্বর পড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু দিনের বেলা একজন মহিলাকে দেখে ভয় পেলাম? ছি, ছি, আমি এমনিতেই ভূতের ভয় পাই না কখনো। বন্ধুদের কাছে কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেছি শেষ পর্যন্ত। ওরা শুনলে আর আমার রক্ষে রাখত না।

কিন্তু কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই, দুপুরবেলা একজন ভদ্রমহিলা ওখানে একা দাঁড়িয়ে কী করছিলেন? কোথা থেকেই বা এলেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল।

দূরে ছোট ছোট দু'একটা পাহাড়ের রেখাচিত্র দেখা যায় আকাশের গায়ে। আমি বন্ধুদের বললাম, চল, ওর একটা পাহাড় থেকে ঘুরে আসি।

উৎপল হেসে বলল, ওখানে যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে জানিস? পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। অথবা তার বেশিও হতে পারে। পাহাড়গুলো দেখে মনে হয় কাছে, কিন্তু আসলে—।

ভাস্কর বলল, গত বছর আমরা দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম। তখনো উৎপল ভেবেছিল আমরা পাহাড়ে আসিনি। কারণ ওর মতে সব পাহাড়ই দূরে।

উৎপল বলল, ঐ পাহাড়গুলো কত দূরে তুই বলতে চাস?

ভাস্কর বলল, বড়ো জোর এক ঘণ্টা।

উৎপল বলল, তোর মাথা খারাপ। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কত বাজি?

আশু বলল, তার আগে ঠিক হয়ে যাক হেঁটে না দৌড়ে।

ভাস্কর তক্ষুনি স্টার্ট করতে চাইছিল, কিন্তু আশু বলল যে, ঐ ব্যাপারটা কাল সকালে করলেই ভালো হয়, কারণ আজ একটু বাদেই সন্ধে হয়ে যাবে, তখন পাহাড়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই।

আমরা এমনিই হাঁটতে লাগলাম সামনের দিকে। এর মধ্যেই সামনে যতদূর দেখা যায় আকাশটা হলিউডের ওয়েস্টার্ন ছবির আকাশের মতন লাল টকটকে হয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে গিয়েই দেখি একটা সরু পাতলা নদী, আর তার ধারে দাঁড়িয়ে

দুটি ছেলে রিং নিয়ে খেলছে। দুটি ছেলেই আমাদের চেয়ে ছোট, তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে বয়েস, নিশ্চয়ই স্কুলে পড়ে। আমরা স্কুলের ছেলেদের একেবারেই দুগ্ধপোষ্য নাবালক মনে করি।

ভাস্কর সাঁ করে দৌড়ে গিয়ে রিংটা ধরেই ছুঁড়ে দিল ওপরের দিকে। এত জোরে যে মনে হলো সেটা আকাশেই মিলিয়ে যাবে। সেটা নিচের দিকে নামতেই আশু সেটা লুফে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। আমরা চারজন অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়লাম। ফটাফট করে রিং ছোড়াছুঁড়ি হতে লাগল, ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে। তারা এত জোরে রিং খেলা তার আগে দেখেনি।

নদীটায় জল বেশি নেই, ভাস্কর ছপছপিয়ে ওপারে চলে গিয়ে বলল, এদিকে দে, এদিকে।

আমি একবার রিংটা হাতে পেয়ে সেই ছেলে দুটির দিকে দিয়ে বললাম, নাও, ধরো।

ওরা ধরতে পারল না, রিংটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল নদীতে। আশু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নাম কী ভাই?

ছেলে দুটির নাম অভিজিৎ আর সঞ্জয়। ওরাও এসেছে কলকাতা থেকে, হেয়ার স্কুলে পড়ে। ওদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতেই ওরা পেছন দিকে হাত দেখিয়ে বলল, এই তো।

আমরা অবাক। সেখানে কোনো বাড়ি আছে বোঝাই যায় না, সেদিকে রীতিমতন বড়ো বড়ো গাছের একটি জঙ্গল। আসলে সেটিও একটি বাগান এবং তার ভেতরের বাড়িটি একতলা বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় এখানে এসেছে দশ দিন আগে। ওরা দেওঘর পর্যন্ত ঘুরেও এসেছে।

এইসব জায়গায় লোকে বেড়াতে আসে সাধারণত বিশেষ সীজনে।

পুজোর কিছু আগে থেকে শুরু হয় সেই সীজন, তারপর সারা শীতকালটা চলে। আনাজ জিনিসপত্র নাকি খুব সস্তা থাকে এখানে এবং জলের এমন গুণ যে পাথর খেলেও হজম হয়ে যায়। আমরা এসেছি ঘোর বর্ষায়। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে, কলেজে বি. এ. পরীক্ষার সীট পড়েছে বলে আমাদের এমনিতেই ছুটি। কিন্তু স্কুলগুলো তো এখন বন্ধ নয়। স্কুল নষ্ট করে অভিজিৎ সঞ্জয় এখানে বেড়াতে এসেছে কেন? সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

ছেলে দুটিকে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বেড়ালুম। একটু বাদেই ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। আমাদের কারুর কাছেই টর্চ নেই। আকাশে পাতলা পাতলা মেঘ, চাঁদের কোনো চিহ্ন নেই।

অভিজিৎ বলল, এখানে কিন্তু সাপ আছে।

সঞ্জয় বলল, আমাদের বাগানে একটা বড়ো সাপ বেরিয়েছিল পরশুদিন!

সাপের কথা শুনেই আমার পা সুলসুল করে উঠল। সাপ জিনিসটা আমি একদম পছন্দ করি না। তার চেয়ে বাঘ, সিংহ অনেক ভালো।

ভাস্করও বলল, চল, ফেরা যাক।

অন্য কেউই আপত্তি করল না।

ফেরার পথে আমরা ছেলে দুটিকে ওদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে এলাম। বাড়িটার ভেতরে ঝনঝন করে পুজোর ঘণ্টা বাজছে। ছেলেদুটি জানাল যে ঐ বাড়ির মধ্যে একটা কালী মন্দির আছে, রোজ সেখানে পুজো হয়। আমাদের ওরা ভেতরে যেতে বলল, কিন্তু আমরা রাজি হলাম না।

অভিজিৎ বলল আপনারা ক্যারাম খেলতে জানেন? আমাদের বাড়িতে ক্যারাম বোর্ড আছে।

উৎপল ক্যারামে চ্যাম্পিয়ান। একবার স্ট্রাইকার হাতে পেলে সে ন' খানা ঘুঁটি ফেলে দেয়। সে একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, কার সঙ্গে খেলব? তোমাদের বাড়িতে কেউ ভালো খেলতে পারে?

সঞ্জয় বলল, আমরা পারি!

—ঠিক আছে, পরে একদিন এসে দেখব, তুমি কেমন খেল!

আশু বলল, আমরা ব্যাডমিন্টনের সেট এনেছি, তোমরা যদি খেলতে চাও, কাল সকালে এসো আমাদের বাড়িতে।

ঘন গাছপালার ভেতরে বাড়িটা প্রায় অন্ধকার। এক জায়গায় মিটমিট করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে শুধু। ছেলেদুটি সেই গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমাদের বাড়িতেও যে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেটা আমরা আগে খেয়ালই করিনি। ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়িটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমরা পরী পরী বলে চেঁচাতে লাগলাম। পরী এল বেশ দেরি করে। চোখ দুটো লালচে ধরনের, মুখে অদ্ভুত হাসি। হাতে একটা ছোট্ট মোম।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আলো জ্বালোনি কেন?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, আলো কোথায় পাব?

—কোথায় পাব মানে? আলো নেই?

—বাবুরা তো এধারে বিজলিবাতি আনেনি।

মধুপুর শহরে ইলেকট্রিসিটি থাকলেও এ বাড়িটা শহর থেকে বেশ দূরে। আর যেহেতু বাড়ির মালিকরা বছরে একবার মাত্র আসে কয়েকদিনের জন্য, তাই খরচ

করে ইলেকট্রিক আনেনি।

দিনেরবেলা পরী ছিল অতি বিনীত ও নরম প্রকৃতির। রাত্তিরবেলা সে যেন খানিকটা বদলে গেছে। বাবু বলে আমাদের খাতির করতে চাইছে না। আমরা কি অন্ধকারে থাকব? আমাদের জন্য যে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, সে চিন্তাই যেন ওর মাথায় নেই।

পরপর দু' রাত্তির পরীর এই রকম ব্যবহার দেখে আমরা রহস্যটা বুঝেছিলাম। সে দিনেরবেলা এক রকম থাকে আর রাত্তিরবেলা বদলে যায়। আসলে সন্ধে হলেই সে মহুয়া খেয়ে নেশায় টং হয়ে থাকে।

ভাস্কর একটু কড়া গলায় বলল, বিজলি বাতি নেই তো লণ্ঠন-টণ্ঠন কী আছে জ্বালো?

পরী জানাল যে বড়ো বড়ো হ্যাজাক লণ্ঠন বাবুরা দোতলার একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। সে ঘরের চাবি তার কাছে নেই।

—তা হলে আমরা কি অন্ধকারে থাকব নাকি সারা রাত?

—আপনারা মোমবাতি আনেননি?

আমরা কি কলকাতা থেকে মোমবাতি কিনে আনব নাকি? দুপুরে যখন বাজারে যায়, তখন পরীরই আনা উচিত ছিল খেয়াল করে। রান্নাঘরে একটা মাত্র হ্যারিকেন আছে। সেটাও পরী আমাদের দিতে পারবে না, কারণ তা হলে রান্না হবে কী করে? তার কাছে ঐ একটুকরো মোমবাতি ছাড়া আর মোমও নেই।

সেই টুকরো নিয়েই কোনোক্রমে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে এসে ভাস্কর আর আশু ওদের সুটকেশ থেকে দুটো টর্চ বার করল। তারপর ভাস্কর পরীকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলল, যাও, অনেকগুলো মোমবাতি নিয়ে এসো বাজার থেকে।

পরী সেই যে গেল, রাত দশটার আগে আর ফিরল না।

আমাদের দলের মধ্যে শুধু উৎপলের হাতেই একটা ঘড়ি আছে। ওটা ওর নিজের। দলের নেতা হিসেবে ভাস্কর ঐ ঘড়িটা নিজের হাতে পরতে চেয়েছিল, উৎপল রাজি হয়নি।

সর্বক্ষণ টর্চ জ্বেলে বসে থাকা যায় না। আবার টর্চ নেভালেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাই না। চতুর্দিক দারুণ নিস্তব্ধ. তবু এরই মধ্যে ছাদের কাছে একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডেকে উঠতেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। অথচ, আমরা কেউই ভীতু নই। নতুন জায়গায় অন্ধকার মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে, তার আগে ভয় ভয় ভাবটা যায় না।

আমার বারবার মনে পড়তে লাগল, দুপুরবেলা দেখা সেই মহিলার কথা।

এখন সেই মূর্তিটিকে আরো অবাস্তব মনে হচ্ছে। যেন গাড়ি বারান্দার কাছে হঠাৎ আবার দেখতে পাব। সেই কথাটা বলার জন্য বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করছিল, তবু কিছুতেই মন ঠিক করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত যে বলিনি, তাতেই আমি জিতে গেছি।

আমাদের সতেরো বছর বয়েসে কলকাতায় লোডশেডিং নামে কিছু ছিল না। ঘুমের মধ্যে ছাড়া, একটানা বেশিক্ষণ অন্ধকার দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কারুর নেই। আমরা একটুক্ষণের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। অন্ধকারের মধ্যে গল্পও জমে না।

ভাস্কর একসময় বলে উঠল, ধুৎ, ভালো লাগছে না। আয় তো আমার সঙ্গে।

টর্চ জ্বেলে আমরা বারান্দায় অন্য প্রান্তে বন্ধ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মস্ত বড়ো পেতলের তালা। এই ঘরের মধ্যে রয়েছে বড়ো বড়ো হ্যাজাক। তার একটা জ্বালতে পারলেই আলোর কোনো সমস্যা হতো না। নাড়াচাড়া করে দেখা গেল তালাটা খোলা সহজ নয়।

ভাস্করদের যে আত্মীয়দের বাড়ি এটা, তাঁদের একটি ছেলের নাম নৃসিংহ। তাকে আমরাও সবাই চিনি। নৃসিংহ কেন আমাদের এই ঘরটার চাবি দেয়নি? আমরা কি ওদের জিনিসপত্র নিয়ে নিতাম?

ভাস্কর রেগে দরজাটার গায়ে একটা লাথি মেরে বলল, তোদের মধ্যে কেউ যদি এই তালাটা খুলতে পারিস তা হলে আমি তার পায়ের ধুলো নেব।

ভাস্করকে আমাদের পায়ের ধুলো দেবার জন্য আমি আর আশু খুব চেষ্টা করলাম। কিছুই লাভ হলো না। উৎপল শুধু বলল, একটা পেরেক পেলে আমি খুলে দিতাম!

সেই অন্ধকারে তাকে অবশ্য পেরেক যোগাড় করে দেওয়া গেল না।

পরী ফিরল রাত দশটার পর, খুব চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে। তার হাতে সরু সরু তিনটে মাত্র মোম, পাচ টাকা দিয়ে সে ঐ মোম তিনটে কিনতে পেরেছে। মধুপুরে যে মোমের এত দাম, তা তো আমরা জানতাম না। পরীকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলল, হ্যাঁ বাবু, ইয়ে মধুপুর হ্যায়, সব চীজ মাঙা। তারপরই সে হেসে উঠল হা হা করে।

তার সঙ্গে আর তর্ক করা গেল না। রাত্তিরের খাওয়া অতি সাধারণ, নিরামিষ —ভাত, ডাল, আলু ভাজা আর বেগুন পোড়া। তবে, এখানকার ঘিতে ভারী চমৎকার গন্ধ।

ওপরে উঠে এসেই আমরা শুয়ে পড়লুম। এত সরু মোমের আলোয় বই পড়া যাবে না, তাসটাসও খেলা যাবে না। এতক্ষণে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটল না

দেখে আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলুম। আমার মেঘ ভালো লাগে, কিন্তু রাত্তিরবেলা আকাশ মেঘলা থাকলে আকাশটাই দেখা যায় না, সেটা ভালো লাগে না।

ঘরে দু'খানা খাট ছিল, আমরা সে দুটোকে টেনে এনে জুড়ে দিয়ে সবাই এক সঙ্গে শুয়েছি। ঠিক সামনেই একটা জানলা। একটুক্ষণ শুয়ে থাকার পর আশু বলল, ঐ জানলাটা বন্ধ করে দেব?

উৎপল বলল, কেন?

—যদি রাত্তিরে হঠাৎ বৃষ্টি আসে?

—সে যখন বৃষ্টি আসবে তখন দেখা যাবে। এই গরমের মধ্যে জানলা বন্ধ করার কোনো মানে হয়?

আশু তখন সরল ভাবে কাঁচুমাচু গলায় বলল, ভাই, সত্যি কথা বলছি, ঐ জানলাটার দিকে তাকালে আমার একটু ভয় করছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি যেন একটা মুখ দেখতে পাব। যতই অন্য কথা ভাবছি—

একজন কেউ ভয়ের কথা বললেই অন্যরা সাহসী হয়ে যায়। আমরা সবাই মিলে আশুকে রাগাতে লাগলুম। আশু বলল, ঠিক আছে বাবা, আমি উপুড় হয়ে শুচ্ছি

আবার খানিক বাদে উৎপল উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, আমার ছোট বাথরুম পেয়েছে, কেউ আমার সঙ্গে যাবি?

বাথরুমটা একতলায়, ইদারার পাশে। আমিও খাওয়ার পর হিসি করতে ভুলে গেছি, বেশ পেয়েছে, কিন্তু অন্ধকারে ঐ অতদূর যেতে হবে বলে চেপে যাচ্ছিলুম। এবার উৎপলের সঙ্গে যাবার জন্য উঠে বসতেই ভাস্কর উৎপলকে বলল, কেন, তুই ভয় পাচ্ছিস বুঝি? একলা যেতে পারছিস না?

উৎপল বলল, কেন ভয় পাব? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কেউ যাবে কিনা!

উৎপল ফিরে এল বড্ডই তাড়াতাড়ি। এত কম সময়ে একতলায় গিয়ে বাড়ির বাইরে বাথরুম থেকে ঘুরে আসা যায় না।

ভাস্কর বলল, তুই না করেই ফিরে এসেছিস।

উৎপল বলল, বাঃ, গেলুম আমি আর অমনি অমনি ফিরে আসব?

আশু বলল, ও নিচে যায় নি। পাশের ছাদে—।

উৎপল বলল, ভ্যাট।

আশু পাশ ফিরে উৎপলের পেটটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বল।

তখন আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লুম উৎপলের ওপর। সারা খাট জুড়ে হুটোপুটি।

প্রচণ্ড কাতুকুতু পেয়ে উৎপল স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, আমিও তাহলে পাশের ছাদে যাব। সঙ্গে সঙ্গে এল, ভাস্কর আর আশু।

একটু একটু ভয়ের কী চমৎকার শিরশিরে নেশা। ভয় পাবার মতন আমরা কিছুই দেখিনি, কিছুই হয়নি, তবু শরীরটা ছমছম করে। দূরে কোথায় ট্টি ট্টি ট্টি ট্টি করে একটা রাত পাখি ডাকছে। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ফিরে এসে একটু বাদেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে এমনিই বিনা কারণে একবার ঘুম ভেঙে গেল। সামনের খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশের মেঘ কেটে গেছে, বোধহয় চাঁদও উঠেছে, ঝকঝক করছে অসংখ্য তারা। আকাশ যে আমার মনের কথাটা বুঝেছে, এ জন্য দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা ধন্যবাদ দিয়ে, পাশ ফিরে সুখী হৃদয়ে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা জেগে উঠেই মনে হলো, ইস, সারা রাতটা শুধু ঘুমিয়ে এমনি এমনিই কেটে গেল? কোনো ঘটনা ঘটল না? একটু ভূত-টুত এলে মন্দ হতো না।

আশু আর উৎপল আগেই উঠে গেছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওরা হাসতে লাগল, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ!

আমি ঘুমন্ত ভাস্করের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ভাস্করের নাকের নিচে কার্তিক ঠাকুরের মতন পুরুষ্টু গোঁফ, গালে দাড়ি। ভাস্করের ফর্সা মুখটায় ঐ কালো রং খুলেছে বেশ ভালো। এখন ওকে একটা ময়ূরের পিঠে বসিয়ে কাঁধে তীর-ধনুক ঝুলিয়ে দিলেই হয়।

ভাস্করকে না জাগিয়ে আমরা পাশের ছাদে গিয়ে খুব হাসতে লাগলুম।

দারুণ সুন্দর সকালবেলাটা। ঝকঝক করছে রোদ। দূরের সেই জঙ্গলের মতন বাগান বাড়িটা থেকে টুং টুং শব্দ আসছে পুজোর ঘণ্টার। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করে। এক ঝাঁক শালিক ঝগড়া করছে সামনের বাগানে। এই সব শব্দই যেন এক তারে বাঁধা।

বাগান থেকে পরী জিজ্ঞেস করল, চা দেব?

আমরা শোওয়ার ঘরে বসেই চা খেতে লাগলুম। নিচের ডাইনিং হলে যেতে আলস্য লাগছে। ভাস্করের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসি চাপতে পারছি না, মাঝে মাঝে দম ফাটা হাসি বেরিয়ে আসছে। ভাস্কর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

না তো!

আমরা তিনজনে একদলে গিয়ে

ওকে আলাদা করে দিয়েছি ভেবে ও রাগতে লাগল ভেতরে ভেতরে। একবার ও গালটা চুলকালো, কিন্তু ওর আঙুলে যে রং লেগে গেছে, তা টেরও পেল না।

খানিকটা বাদে আমরা নিচে নেমে ইঁদারার পাশে গিয়ে মুখ ধুলাম। আয়না তো নেই যে ভাস্কর নিজের মুখ দেখতে পাবে। উৎপল ইঁদারার ধারে গিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, এটা কত গভীর রে? দ্যাখ দ্যাখ ভাস্কর।

ভাস্কর এক পলক মাত্র ইঁদারাটা দেখল। অনেক নিচে জলের ওপর ওর মুখের ছায়া পড়লেও তাতে দাড়ি গোঁফ বোঝা যায় না। ভাস্করের এখনো ভালো করে ঘুম কাটেনি, সে বলল, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। তোদের পাঁড়েজি? পাঁড়েকে বল ডিম ভাজা আর পরোটা করতে।

চোখ মুখ ধোওয়ার পর ভাস্করের মুখের কালি সামান্য মাত্র উঠেছে, গোঁফটা পুরোপুরি অক্ষতই আছে।

ড্রইং রুমে এসে আমরা বসেছি, হঠাৎ বৃষ্টি নামল। এই আকাশ পরিষ্কার ছিল, কোথা থেকে এসে গেল মেঘ। এই সব শুকনো জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয়। আজ সকালে আমাদের পাহাড় দেখতে যাবার কথা ছিল, বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে।

এই বৃষ্টির মধ্যেই ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজিয়ে সেই কালকের ছেলে দুটি হাজির। গায়ে ঝকঝকে নীল রঙের রেইন কোট। শালপাতায় মোড়া একটা ঠোঙা হাতে ভেতরে ঢুকে তারা বলল, আপনাদের জন্য প্রসাদ এনেছি।

তারপরেই ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলল, ওমা, আপনার মুখে।

আমি, মঞ্জু আর উৎপল হাসতে হাসতে পেট চেপে মাটিতে বসে পড়লাম, কিছুতেই হাসি থামাতে পারি না, হাসতে হাসতে বুঝি মরেই যাব।

এত তুচ্ছ কারণে এত অফুরন্ত পরিষ্কার হাসি বুঝি শুধু সতেরো বছর বয়সেই সম্ভব।

ভাস্কর অতি স্মার্ট ছেলে। প্রথমে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে সুটকেশ থেকে নিয়ে এল ছোট আয়না, আসল ব্যাপারটা বুঝেও ও কিন্তু তক্ষুনি মুখ মুছলও না বা রাগও করল না। নানা রকম মুখভঙ্গি করে ও ছেলে দুটিকে আরো মজা দেখাতে লাগল। কখনো চোখ পাকিয়ে অসুর সাজছে, কখনো ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে জেনারেল কারিয়াপ্পা!

বৃষ্টি আরো জোরে এসে গেল। আজ সকালে আর বেড়াতে যাবার আশা নেই। ডিম ভাজা অবশ্য পাওয়া গেল না, তবে পরোটা আর বেগুন ভাজা দিয়ে আমাদের ব্রেক ফাস্ট সারা হলো।

ভাস্কর বলল, একটা সাইকেল থাকলে এখানে খুব সুবিধে। নিজেরাই বাজার থেকে অনেক কিছু কিনে আনতে পারি।

উৎপল বলল, বিশেষ করে আজ আলোর কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। পাঁচ টাকার তিনটে সরু সরু মোমবাতি দিয়ে আমাদের পোষাবে না।

অভিজিৎ বলল, আপনারা ক্যারাম খেলবেন বলেছিলেন, আমাদের বাড়িতে চলুন না।

উৎপল বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে যাব ভাই?

আশু বলল, বরং তোমাদের সাইকেলটা একটু দেবে? আর তোমাদের একজনের রেন কোটটাও একটু ধার নিচ্ছি, আমি চট করে একবার শহরের দিক থেকে ঘুরে আসছি।

আমাদের সকালের খাবারদাবার দিয়ে গেছে পরীর বউ, আর একটি সাত-আট বছরের বাচ্চা ছেলে। পরীর আর পাত্তা নেই। বোধহয় কাল রাত্তিরের ব্যবহারের জন্য লজ্জা পেয়েছে।

ভাস্কর শার্টের পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে কিছু টাকা আশুকে দিয়ে বলল, ডিম-ফিম কিনে আন তো। সকালবেলা ডিম না খেলে আমার মনে হয় কিছু খাওয়াই হয়নি।

আশু ফিরে এল খুব তাড়াতাড়ি। পথেই তার সঙ্গে পরীর দেখা হয়ে গেছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে ভিজে পরী হাতে একটা বড়ো মাছ ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, আর একটা পুঁটলিতে এক ডজন ডিম। এসবই সে এনেছে ধারে।

পরীর মুখে ঠিক কালকের মতন বিনীত, নরম হাসি। মাছ আর ডিমের দাম যা বলল, একেবারে অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা। আমরা তখুনি ঠিক করে ফেললাম, পরীকে দিয়ে আমরা যা কিছু বাজার করার দিনের বেলাই করাব। রাত্তিরের দিকে ওর হাতে একদম টাকা দেওয়া হবে না।

ভাস্কর বলল, লাগাও ডিম ভাজা আর আর এক রাউণ্ড চা!

উৎপল এর মধ্যে এক প্যাকেট তাশ এনে অভিজিৎ আর সঞ্জয়কে নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করছিল। আশুকে ফিরতে দেখেই বলল, এবার কিন্তু ব্রীজ খেলা হবে।

উৎপলটা একেবারে তাশের পোকা। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমরা ব্রীজ খেলা শিখেছি। বাইরে বেড়াতে এসে আমার তাশ খেলতে ইচ্ছে করে না। এমনকি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বেড়াতেও আমি রাজি। কিন্তু উৎপল কিছুতেই ছাড়বে না। তাশ খেলার চার নম্বর সঙ্গী হবার জন্যই তো ওরা আমায় এনেছে।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় খানিকক্ষণ উৎসুক হয়ে বসে রইল আমাদের পাশে। কিন্তু কতক্ষণ আর ওদের ধৈর্য থাকবে। ওরা বেচারিরা এসেছিল আমাদের সঙ্গ পেতে। কিন্তু ব্রীজ খেলার মাঝখানে কোনো কথা চলে না, শুধু টু হার্টস আর থ্রি নো ট্রামপস। আর একটা খেলা শেষ হলেই তর্ক। কুক্ষণে আমি উৎপলের পার্টনার হয়েছিলাম, প্রায়ই ভুল ডাক দিয়ে বকুনি খেতে লাগলাম।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় কখন উঠে গেছে পাশ থেকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ বাইরে গলা ফাটানো চিৎকার। সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে সঞ্জয় আমাদের ডাকতে ডাকতে আসছে।

আমরা তাশ ফেলে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঞ্জয় এত ভয় পেয়ে গেছে যে খালি বলছে, দাদা, আমার দাদা!

সে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে বাগানের পেছন দিকটা, আমরা সেদিকে ছুটতে শুরু করতেই সঞ্জয় বলল, দাদা জলে ডুবে গেছে।

ভাস্কর, আশু, উৎপল ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল পুকুরে। আমার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, শিগগির আমি সাঁতার শিখে নেবই নেব।

অভিজিৎকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কতক্ষণ আগে সে ডুবে গেছে কে জানে! আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। আমি এ পর্যন্ত কোনো মৃত্যু দেখিনি। আমি দেখতেও চাই না।

পরক্ষণেই আমার অনুতাপ হলো। ছিঃ, আমি এত স্বার্থপর। আমি মৃত্যু দেখতে চাই না বলে চোখ বুজে আছি। তার মানে আমি ধরেই নিয়েছি অভিজিৎ বাঁচবে না। অভিজিতের বদলে যদি আমি জলে ডুবে যেতাম, তাহলে কি আমিও মরতাম?

ঠাকুর-দেবতার কথা আমার খুব একটা মনে পড়ে না। তবে পরীক্ষা দেবার সময় সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাই প্রত্যেকবার। জলে-ডোবা মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সরস্বতী ঠিক যোগ্য দেবী কিনা সে কথা বিচার না করে আমি চোখ খুলে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলাম, হে সরস্বতী, বাঁচিয়ে দাও, সব বাঁচিয়ে দাও!

চ্যাঁচামেচি শুনে পরীও এসে পড়ল এবং লাফিয়ে পড়ল। ভাস্কর আর আশু এর মধ্যেই অভিজিৎকে খুঁজে পেয়েছিল, পরী দক্ষ হাতে ওপরে তুলে আনল তাকে।

অভিজিতের চোখ খোলা, শরীরটা মৃগী রুগীর মতন কাঁপছে। ওকে উপুড় করে শুইয়ে ওর পেটে চাপ দেওয়া হতে লাগল, পরী দুর্বোধ্য হিন্দীতে কাকে যেন গালাগালি দিয়ে চলেছে।

আমরা সবাই দারুণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ভাস্কর এই সময় দলনেতার ভাবযুক্ত একটা কথা বলল।

ভাস্কর বলল, আশু, উৎপল ওকে তোল, ওকে এক্ষুনি ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার ডাকা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা অভিজিৎকে তুলে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি সঞ্জয়ের হাত চেপে ধরে বললাম, এসো। সঞ্জয় কান্না থামিয়ে এখন বোবা হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে মাঠটা পেরিয়ে সঞ্জয়দের বাড়িতে এসে পৌঁছোতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। আমরা ঢুকলাম পেছন দিক দিয়ে।

বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমাকে আর একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হলো।

একটা লিচু গাছের নিচে একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে আছেন এক মহিলা। স্থির, যেন পাথরের মূর্তি। চোখ দুটি সামনের দিকে, মনে হয় যেন পলকও পড়ছে না।

কোনো সন্দেহ নেই, কাল দুপুরে আমি এই মহিলাকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়ির কাছে। সেই হলদে শাড়ি, কালো ব্লাউজ।

আমরা গাছপালা ভেদ করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছি, তবু সেই মহিলা একবারও তাকালেন না আমাদের দিকে, এক গোছা বুনো ফুলের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেন তিনি ধ্যান করছেন। বৃষ্টি এখন খুব ঝিরিঝিরি করে পড়লেও একেবারে থামেনি। মহিলা বৃষ্টিতে ভিজছেন, তবু যেন হুঁশ নেই। আমি সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে?

সঞ্জয় বলল, আমার দিদি।

কিন্তু এতবড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও সঞ্জয় তার দিদিকে জানানোর প্রয়োজন মনে করল না। আবার আমরা ছুটে গেলাম ওদের বাড়ির দিকে।

৩

ডাক্তার ডাকতে হয়নি, সঞ্জয়ের বড়োমামা অভিজিৎকে শুইয়ে দিলেন কালীমূর্তির সামনে। তারপর নিজেই চিকিৎসা করতে লাগলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই অভিজিৎ বলল, মা!

সঞ্জয়ের বড়োমামাকে দেখলে ভক্তিও হয়, ভয়ও জাগে একটু। মিশমিশে

গায়ের রং, বিশাল লম্বা। বাঙালির মধ্যে অত কালো আমি আগে কখনো দেখিনি। একটা গেরুয়া লুঙ্গি পরা, সম্পূর্ণ খালি গা, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলে ঠিক সিনেমার কাপালিকের মতন মনে হয়, কিন্তু তিনি মা কালীর সামনেই সিগারেট খাচ্ছিলেন, সেটাই যেন একটু বিসদৃশ। কাপালিকেরা তো গাঁজার কলকে টানে।

তিনি আমাদের বললেন, যাক, ছেলেটার একটা জলের ফাঁড়া ছিল, আজ কেটে গেল। কতবার বারণ করেছি ও বাড়িতে যেতে, ওখানে পুকুর আছে। তা শুনবেই বা কেন, জলই তো ওকে টেনেছিল। তোমাদের মধ্যে কে ওকে বাঁচিয়েছ?

উৎপল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আশু বলল, আমাদের বাড়ির যে চৌকিদার, পরী, সে-ই ওকে তুলেছে।

কোনো ব্যাপারে গর্ব করা একদম আশুর ধাতে নেই।

বড়োমামা বললেন, তোমরা তখন পুকুরে চান করছিলে বুঝি?

এবার উৎপল বলে ফেলল, না, আমরা তাশ খেলছিলাম, হঠাৎ সঞ্জয়ের চিৎকার শুনে আমরা গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমিই প্রথমে ওকে জলের তলায় পেলাম।

আশু আবার বলল, পরী ঠিক সময় এসে না পড়লে, কী যে হতো বলা যায় না। ছেলেটা কখন একলা গিয়ে পুকুরে নেমেছে।

বড়োমামা বললেন, ঐ যে বললাম, ফাঁড়া ছিল, জল তো ওকে টেনেছিল, ও বাড়িটা তো সারা বছর খালি পড়ে থাকে, ভাগ্যিস তোমরা ছিলে! যাক, আর কোনো চিন্তা নেই। দা ডেঞ্জার ইজ ওভার। তোমরা বসো, তোয়ালে দিচ্ছি, মাথাটাথা মুখে ফেল।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ভাস্করই একমাত্র ঝট করে নিজের শার্টটা খুলে ফেলেছিল। আশু আর উৎপলের পুরো পায়জামা শার্ট পরা। এক্ষুনি সব ছেড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ওঁরা জোর করে আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেনই। আমরা খানিকটা আগেই এক গাদা খাবার খেয়েছি, তবু চারটে করে সন্দেশ খেতেই হলো।

অভিজিতের মা প্রথম দিকটায় খুব কান্নাকাটি করছিলেন। এখন শান্ত হয়ে গেছেন। অভিজিৎকে তিনি গরম দুধ খাওয়াচ্ছেন।

ওর মায়ের বেশ মা মা চেহারা। মুখে একটা স্নিগ্ধভাব আছে। একটা চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরা। ছেলের সেবা করতে করতেই উনি বারবার বলতে লাগলেন, বাড়ির তৈরি সন্দেশ খাও, একটাও রাখবে না...তোমরা না থাকলে আজ কী যে হতো!

অভিজিৎ উদ্ধারপর্বে আমার যদিও কোনো ভূমিকা নেই, তবু আমাকেও

সন্দেশ খেতে হলো। অবশ্য, আমি যে সরস্বতীকে ডেকেছিলাম, তাতেও তো কাজ হতে পারে। সরস্বতীও তো জলেরই দেবী, এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে, ওর নামের মানেতেই তো বোঝা যায়।

এত কাণ্ডের মধ্যেও সঞ্জয়ের দিদিকে একবারও খবর দেওয়া হলো না কিংবা কেউ তাঁর কথা উল্লেখই করছে না দেখে আমি ক্রমশ দারুণ অবাক হচ্ছিলাম।

অভিজিৎ আর সঞ্জয়ের আর এক দিদি আছে। সে প্রায় আমাদেরই বয়সী, তার নাম ঝুমা। পরে জেনেছি, সেও ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, কিন্তু সেদিন সে আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলল না।

একটুক্ষণ কথাবার্তাতেই আমরা জানলাম যে সঞ্জয়ের বড়োমামা এখানে বারো মাসই থাকেন। তিনিই এই কালীমন্দিরের পূজারী। মাঝে মাঝে ওঁর মুখে ইংরিজি কথাবার্তা শুনে মনে হলো বড়োমামা লেখাপড়াও জানেন, নিছক গ্রাম্য কাপালিক নন। উনি খুব ঘন ঘন চা আর সিগারেট খান। সঞ্জয়রা এখানে বেড়াতে এসেছে, সঞ্জয়ের বাবার অফিসে খুব জরুরি কাজ আছে বলে তিনি ওদের এখানে রেখে ফিরে গেছেন কলকাতায়, তবে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে আসেন।

আমরা বসেছিলাম মন্দিরের ঢাকা দালানে। বৃষ্টি থেমে গেছে। এই সময় সেখানে এলেন সেই যুবতী। অসহ্য সুন্দর তাঁর রূপ। ঠিক যেন জ্যান্ত দেবী সরস্বতী। শুধু মুখখানায় বিষাদ মাখানো। এমন সুন্দর অথচ এমন দুঃখী মুখ আমি কখনো দেখিনি।

তিনি সেখানে দাঁড়াতেই সঞ্জয়ের মা আস্তে করে বললেন, আয় রাণু, বোস।

মহিলা আমাদের দিকে একপলক শুধু তাকিয়ে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, খোকনের কি হয়েছে মা? ও ঠাকুরের সামনে শুয়ে আছে কেন?

মা বললেন, খোকন যে জলে ডুবে গিয়েছিল। এই ছেলেরা ওকে বাঁচিয়েছে।

অভিজিতের দিদির মুখখানা একেবারে বদলে গেল। দারুণ ভয় পেয়ে বললেন, অ্যাঁ, জলে ডুবে গিয়েছিল? খোকন, খোকন!

মহিলাটি একেবারে যেন অভিজিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিতে গেলেন। মা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, থাক, থাক রাণু, ও এখন একটু শুয়ে থাক।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে রইলেন অভিজিতের সামনে।

আমি একদৃষ্টে শুধু ঐ মহিলাকেই দেখছিলাম, অন্য কিছু খেয়াল করিনি, ভাস্কর আমার হাত ধরে টেনে বলল, চল, বাড়ি যাবি না। আমাদের জামাকাপড় ছাড়তে হবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, সঞ্জয়ের দিদি আমার রাণু মাসির বয়েসী, আর এঁর নামও

রাণু। অবশ্য রাণু মাসির সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঞ্জয়ের বড়োমামা আমাদের সঙ্গে এলেন খানিকটা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কদিন থাকবে?

ভাস্কর বলল, আট দশ দিন।

তিনি বললেন, তোমরা বললে, তোমরা তাশ খেলছিলে। ব্রীজ জানো নাকি?

উৎপল সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। অকশান, কনট্রাক্ট দুটোই জানি।

বড়োমামা বললেন, আমারও খুব তাশ খেলার শখ। এখানে সবসময় সঙ্গী পাই না। দুপুরের দিকে চলে এসো না, খেলা যাবে।

উৎপল সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাল।

ও বাড়ি ছাড়িয়ে মাঠটা পেরিয়ে আসতে আসতে আমি বললাম, সঞ্জয়ের দিদি কী রকম একটু অদ্ভুত না? কতক্ষণ পরে এলেন, তারপর আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বললেন না।

ভাস্কর বলল, উনি তো পাগল।

আমি চমকে উঠে বললাম, পাগল? যাঃ! তুই কি করে জানলি?

ভাস্কর বলল, ও তো চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দেখলি না কী রকম ফাঁকা ফাকা দৃষ্টি। আহা, এত সুন্দর দেখতে!

আমি কিছুতেই মানতে চাইছিলাম না। কিন্তু দেখা গেল আশু আর উৎপলও ভাস্করের কথাই বিশ্বাস করছে।

আমার মনটা যেন মুষড়ে গেল। পাগল শুনলেই ভয় হয়। কোনো পাগল সম্পর্কে আগে আমার অন্য কোনো অনুভূতি হয়নি, এই প্রথম বেদনা বোধ করলাম।

আমাদের বাগানে ঢুকে পুকুরটার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। পুকুরের জল এখন শান্ত, নিথর, মাঝখানের লাল শালুকগুলোর ওপর কয়েকটা ফড়িং ওড়াউড়ি করছে। দেখলে বোঝাই যায় না যে একটু আগে একটা কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল। একটা সুন্দর প্রাণ সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যেত।

ভাস্কর বলল, পুকুরটা ছোট হলে কী হয়, বেশ গভীর আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাস্কর, মানুষ কেন পাগল হয় রে?

ভাস্কর বলল, কী জানি?

আমি অন্য বন্ধুদের দিকে তাকালাম। ওরাও জানে না।

পুকুরের এ পাশে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা আছে অভিজিতের সাইকেলটা। সেটা দেখেই সেদিকে আমরা এক সঙ্গে দৌড় লাগালাম। উৎপল সবচেয়ে আগে গিয়ে সেটা ছুঁয়ে ফেললেও আমি বললাম,

এই দ্যাখ, তোদের জামাকাপড় ছাড়তে হবে, শুধু আমারই সব শুকনো—আমাকে আগে চড়তে দে। আমার পরেই, উৎপল, তোকে দেব।

উৎপল আপত্তি করল না। ওরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল, আমি সাইকেলটা নিয়ে প্রথমে বাগানের মধ্যেই কয়েকবার চক্কর দিলাম। আর আপন মনে বারবার বলতে লাগলাম, মানুষ কেন পাগল হয়? কেন পাগল হয়?

কয়েকবার পাক দিয়ে আমার কিছুটা আত্মবিশ্বাস জাগল। পাড়ার শিবুদার দোকান থেকে পচাত্তর পয়সা ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে সাইকেল চড়া শিখেছিলাম বছর দুয়েক আগে। তারপর আর প্র্যাকটিস নেই। সেই জন্য ঠিক ভরসা ছিল না পারব কি না। কিন্তু বেশ পেরে যাচ্ছি। সেই জন্য ইচ্ছে হলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে।

ওদের কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম গেট দিয়ে। বাঁদিকে গেলে মধুপুর শহর, ডানদিকে কী আছে জানি না। আমি বেরুলাম ডানদিকেই। অনেক পরে পরে দু-একটা বাড়ি। সব বাড়িগুলোই ফাঁকা মনে হয়। হয়তো পুজোর সময় এই সব বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে।

রাস্তাটা লাল রঙের। কিছুদূর এগোবার পর আর বাড়ি নেই। রুখু উদলা মাঠ। রাস্তাটা খানিক পরেই ঢালু হতে শুরু করল। তখনই আমি আবিষ্কার করলাম সেই কদমফুল গাছটা। ফুলে একেবারে ভরে আছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অবাকও লাগে। এতদূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছটা এমন সুন্দর সাজে সেজে আছে কার জন্য? কেউ তো দেখতে আসবে না।

সাইকেল থেকে নেমে আমি গাছটায় চড়তে লাগলাম। ইচ্ছে করলে আমি এই গাছটার সব ফুল পেড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তার দরকার কি, এই গাছটাই তো আমার। আমি ছাড়া তো আর কেউ ওর কাছে থামেনি। একটা ফুলের ওপর হাত রেখে আমি গাছটিকে জিজ্ঞেস করলাম, নিই? একটা নিই এখন?

নরম তুলোর বলের মতন কদমফুল। গালে ছোঁয়ালে ভারী আরাম লাগে। এত সুন্দর একটা জিনিস বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। কথাটা ভাবলেই সারা শরীরে একটা ভালো লাগার অনুভূতি হয়। পরক্ষণেই মনে পড়ে, যারা পাগল, তাদেরও কি একটা কদম ফুলের গাছ দেখলে ভালো লাগে?

রাস্তাটা ঢালু হয়ে গিয়ে একটা নদীতে পড়েছে। নিতান্তই ছোট মেঠো নদী, কারণ এই বর্ষাকালেও তাতে জল বেশি নেই, বড়ো জোর হাঁটু সমান। স্বচ্ছ জল, তলার বালি স্পষ্ট দেখা যায়। কাল বিকেলে যে নদীটা দেখেছিলাম, সেটাই ঘুরে এদিকে এসেছে, না এটা অন্য কোনো নদী, তা অবশ্য জানি না।

রাস্তা থেকে বাঁ পাশে খানিকটা দূরে নদীর ধারে একটা বড়ো পাথর। সেটার

ওপর গিয়ে বসলাম। জলে স্রোত আছে, পাথরটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে জলটা ঘুরছে সেখানে। কী পরিষ্কার জল, ইচ্ছে করলেই চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। এই ছোট্ট নদীটাকে আমার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। আমি সাঁতার জানি না, যাতে আমি জলে ডুবে না যাই সেইজন্য এই নদী বেশি গভীর হয়নি। আমি এটা অনায়াসে পার হতে পারি। পাথর থেকে নেমে পাজামাটা গুটিয়ে আমি চলে গেলাম ওপারে। মাঝখানটায় প্রায় কোমর সমান জল। জীবনে এই প্রথম আমার একটা নদী পার হওয়া। যতই ছোট হোক, নদী তো, স্রোত আছে যখন। সেই নাম-না-জানা নদীটার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, আমি মাঝে মাঝেই এখানে আসব।

আশ্চর্য, আমি এতক্ষণ আছি, অথচ এই রাস্তা দিয়ে আর একটাও গাড়ি চলেনি, কোনো মানুষও দেখিনি। কেউ যায় না, অথচ একটা রাস্তা এমনি এমনি রয়েছে। রাস্তাটাও এই নদীতেই শেষ। নদীর অন্য পারে যতদূর দেখা যায় শুধু মাঠ আর দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়। কোনো রাস্তাকে এরকম হঠাৎ শেষ হতে আমি দেখেছি কি আগে? কলকাতায় অনেক বন্ধ গলি আছে, সেগুলো কোনো দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায়। আর এই রাস্তাটা এসে ডুব দিয়েছে নদীতে, আর ওঠেনি। চমৎকার না?

ফেরবার সময়, যে-সব বাড়িগুলোকে জনহীন ভেবেছিলুম, তারই একটা বাড়িতে একজন খুব লম্বা লোককে দেখতে পেলুম। লোকটি একটা লাঠি হাতে একটা কুকুরকে তাড়া করছেন। কুকুরটা কী কারণে যেন লোকটির দিকে ছুটে ছুটে ঘেউঘেউ করছে। লোকটির মুখে অল্প অল্প দাড়ি, তবু তাঁকে বাঙালি বলেই মনে হয়। বাঙালিদের মুখে কী একটা থাকে, দেখলেই ঠিক চেনা যায়। আমি আর সেখানে সাইকেল থামালুম না।

বাড়িতে এসে দেখি, ওপরতলাটা একদম চুপচাপ। ওরা সব গেল কোথায়? আমাকে ফেলেই কোথাও চলে গেল নাকি? ওপরে এসে দেখলাম, ওরা তিনজন খুব মনোযোগ দিয়ে সেই বন্ধ ঘরের তালাটা খোলার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে একটা বড়ো পেরেক যোগাড় করেছে ভাস্কর, সেটা দিয়ে উৎপল নানারকম কায়দা দেখাতে ব্যস্ত। পেরেক দিয়ে তালা খোলা যায়, তা আমি কখনো শুনিনি।

পেছনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখে আমি বললাম, তালা খোলার সবচেয়ে ভালো উপায় কী জানিস? দড়ির গিঁট খোলার যা উপায় তাই।

আশু জিজ্ঞেস করল, কী উপায়?

—আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করার পর সেখানকার বড়ো লোকরা একগোছা বিরাট জট পাকানো দড়ি তাঁর সামনে এনে বলেছিল, এই গিঁট না ছাড়ালে পারস্যের রাজা হওয়া যায় না।

উৎপল বলল, আঃ এখন বকবক করিস না, কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আশু বলল, আলেকজাণ্ডার খুলতে পারলেন?

—আলেকজাণ্ডার বললেন, গিঁট খোলার সবচেয়ে সহজ উপায়টা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তলোয়ারটা বার করে এক কোপে সব দড়িগুলো কেটে ফেললেন। সেই রকম তালা খোলার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তালাটা ভেঙে ফেলা।

উৎপল তব রাগী মুখখানা ফিরিয়ে বলল, তুই ভাঙ দেখি তালাটা। দেখি তোর কত ক্ষমতা।

ঠিক জায়গা মতন গল্পটা বলতে পেরে আমার একটু গর্ব হয়েছিল। সুতরাং দমে না গিয়ে বললাম, একটা হাতুড়ি নিয়ে আয়, এক্ষুনি ভেঙে দিচ্ছি।

উৎপল বলল, দ্যাখ।

সে একটা টান মারতেই তালা খুলে গেল, আমরা চমকে উঠলাম।

ভাস্কর উৎপলের কাঁধ চাপড়ে বলল, তুই আর কষ্ট করে লেখাপড়া করছিস কেন? চুরি-ফুরির লাইনে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবি।

উৎপল বলল, ওসব কথা পরে হবে, আগে আমার পায়ের ধুলো নে। সায়েণ্টিফিক ব্রেন থাকলে সব কিছুই করা যায়।

ভাস্কর নিচু হয়ে সত্যিই উৎপলকে প্রণাম করল। উৎপল তাতেও খুব সন্তুষ্ট না হয়ে আমার আর আশুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোরাও পায়ের ধুলো নে।

আশু বলল, যাবার দিন তুই যদি তালাটা আবার বন্ধ করতে পারিস সেদিন পায়ের ধুলো নেব আমি।

দরজা ঠেলে আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা। অনেক দিন জানলা-টানলা খোলা হয়নি বলে ভেতরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

সত্যি কথা বলতে কি, তালাটা খুলে ফেলায় আমি একটু নিরাশই বোধ করলুম। যতক্ষণ ঘরটা বন্ধ ছিল, ততক্ষণ মনে হচ্ছিল ঐ ঘরে যেন কিছু একটা রহস্য আছে। অনেক বন্ধ ঘর দেখলেই এরকম মনে হয়। কিন্তু এ ঘরটাতে কোনো রহস্যই নেই, নিছকই কাজের জিনিসপত্র, থালাবাসন, লেপ, তোশক, দু'খানা ইজিচেয়ার, এইসব। একটু ভালো করে দেখার পর অবশ্য একটা রোমাঞ্চকর জিনিস চোখে পড়ল। ঘরের কোণে ক্যাম্বিসের পোশাক পরানো একটা দো-নলা বন্দুক। তখন বুঝতে পারলুম, এই জিনিসটার জন্যই এ ঘরের চাবি আমাদের দেওয়া হয়নি।

দু'খানা হ্যাজাক তুলে নিয়ে উৎপল বলল, বাস, আলোর প্রবলেম সলভড।

ভাস্কর বন্দুকটা হাতে নিয়ে পোশাক ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর পাকা শিকারীর ভঙ্গিতে দু'হাতে সেটা বাগিয়ে ধরে বলল, গুলিটুলিও আছে নিশ্চয়ই।

আশু বলল, এই ওটা রেখে দে। বন্দুক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার দরকার নেই।

ভাস্কর বলল, আমাদের বাড়িতে বন্দুক আছে, আমি বন্দুক চালাতে জানি।

—তবু, রেখে দে!

উৎপল বলল, এই ঘর আমি খুলেছি, এ ঘরের দায়িত্ব আমার। ভাস্কর, বন্দুক নিয়ে ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না।

হ্যাঁ, উৎপল ঠিকই বলেছে, এই ঘরটা এখন থেকে উৎপলের। ভাস্কর খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, যাক একটা বন্দুক আছে যখন জানা গেল ; তখন আর কোনো ভয় নেই? ডাকাত-ফাকাত এলে...

তারপরই বিছানার বাণ্ডিল থেকে সে একটা তাকিয়া বার করে নিয়ে বলল, এটাও খুব কাজে লাগবে, একটা কান-বালিশ না থাকলে আমার ঠিক ঘুম হয় না।

প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই ভাস্কর বন্দুকের বদলে একটা বালিশ নিয়ে খুশি হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। খাওয়া শেষ হতে না হতেই উৎপল বলে উঠল, আজ আর কিন্তু ঘুমোনো-টুমোনো চলবে না, বড়োমামা তাস খেলার নেমন্তন্ন করেছেন।

অভিজিৎদের বড়োমামা এর মধ্যেই আমাদেরও বড়োমামা হয়ে গেছেন। ওঁর নামটা তো আমরা জানি না।

পরীকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দিকে যে বাড়িটাতে কালীমন্দির থাকে, সেই বাড়ির বাবুকে তুমি চেনো?

পরী বলল, ডাগদারবাবু বহুত আচ্ছা আদমী।

আমরা বললুম, যিনি কালীপুজো করেন, তিনি ডাক্তারবাবু?

পরী বলল, হাঁ। বহুত আচ্ছা দাওয়াই দেন। পয়সা লেন না।

পরে জেনেছিলুম অভিজিতের বড়োমামা সত্যিই এম. বি. বি. এস. পাস অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। কিছুদিন পাটনা শহরে প্র্যাকটিসও করেছিলেন, পরে সব ছেড়েছুড়ে এখানে কালীপুজো করেন ও গরীব-দুঃখী লোকদের ওষুধ দেন।

ও বাড়িতে পৌঁছে আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম। মন্দিরের ঠিক সামনেই কুয়োতলায় অভিজিতের দিদিকে স্নান করানো হচ্ছে। অত বড়ো একজন মহিলাকে অন্য কেউ চান করিয়ে দেয়, আগে দেখিনি। একজন স্ত্রীলোক ওঁর হাত ধরে আছেন শক্ত করে, আর অভিজিতের মা বালতি করে জল ঢেলে দিচ্ছেন ওঁর মাথায়।

অভিজিতের দিদির ব্যবহারে কিন্তু পাগলামির কোনো লক্ষণই নেই। খুব নরম কাতর গলায় তিনি বলছেন, মা আমায় ছেড়ে দাও না। আমি নিজেই তো চান করতে পারব!

মা বললেন, আর এই তো হয়ে গেল!

দিদি বললেন, কেন তোমরা আমার ওপর জোর কর, আমি কি নিজে কিছু পারি না?

মা বললেন, কেন পারবি না! শুধু একটু বুঝে-সুঝে চলতে হবে। তুই কুয়োর মধ্যে নামতে গিয়েছিলি কেন? কুয়োর মধ্যে কেউ নামে? সর্বনাশ হয়ে যেত না একটা?

দিদি যেন খুবই লজ্জা পেয়ে বললেন, আর কোনোদিন নামব না।

আমরা খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়লুম। একজন যুবতী মহিলাকে স্নান করানোর দৃশ্য বোধহয় আমাদের দেখে ফেলা উচিত না। কিন্তু আমরা তো হঠাৎ এসে পড়েছি। এখন ফিরে যাব কি?

আমরা চারজন ঘেঁষাঘেঁষি করে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অভিজিতের মা আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, খাওয়া হয়ে গেছে? এসো, ভেতরে গিয়ে বসো!

আশু জিজ্ঞেস করল, অভিজিৎ এখন কেমন আছে?

—ভালো, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়েছে।

এই সময় সঞ্জয় বেরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

বড়োমামা তখন খেতে বসেছেন। এ বাড়িতে দেরি করে খাওয়া-দাওয়া হয়, আমরা অসময়ে এসে পড়েছি। আমাদের বসান হলো ভেতরের একটি ঘরে। সে ঘরটির দেয়ালগুলো জুড়ে বড়ো বড়ো র‍্যাক, তাতে নানারকমের বই ঠাসা। ঘরটিতে চেয়ার-টেবিল নেই, একটা লাল রঙের কার্পেট পাতা, তার ওপর ছড়ানো কয়েকটা তাকিয়া। একেবারে যেন তাসের আসর পাতা রয়েছে।

খাওয়া সেরে বড়োমামা মস্ত বড়ো একটা পানের ডিবে হাতে নিয়ে সে ঘরে এসে বসলেন। নিজে এক সঙ্গে দুটি পান মুখে পুরে আমাদের দিকে ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও।

আমরা কেউই পান খাই না। তবু যেন শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যই ভাস্কর এক খিলি পান তুলে নিল। ভাস্কর বনেদী বাড়ির ছেলে, ও এইসব আদবকায়দা জানে। আমরা আর কেউ নিলুম না।

খুব দামী, প্লাস্টিকের দু' প্যাকেট তাস বার করলেন বড়োমামা, তারপর খুব কায়দার সঙ্গে শাফল করতে করতে বললেন, কী খেলবে, অকশান? না কনট্রাক্ট?

পাঁচজনের মধ্যে একজনকে বাদ দিতেই হবে। আমার কোনো মতামত না নিয়েই উৎপল বলল, নীলু, তুই তা হলে একটু বোস। আমরা তিনজন খেলি বড়োমামার সঙ্গে।

আমাকেই ওরা সবচেয়ে কাঁচা খেলোয়াড় মনে করে। তাস খেলা থেকে বাদ পড়ায় আমার খুব আপত্তি ছিল না, কিন্তু খেলার পাশে চুপচাপ বসে থাকা একটা অসহ্য ব্যাপার। তাস খেলা তো আর ফুটবলের মতন নয় যে দর্শকরাই বেশি উত্তেজিত হবে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথায় বড়োমামা আমাদের পরিচয় জেনে নিলেন। নিজের সম্পর্কেও বললেন দু'একটা কথা। এখন আর ওঁকে কাপালিকের মতন মনে হয় না। তবে মানুষটি নিশ্চিত খানিকটা অসাধারণ। এমনিতে ডাক্তার, তার ওপর কালীপুজো করেন, ঘরে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর বইও রয়েছে। সিগারেট, পান, চা--তিনটেরই খুব নেশা।

কথায় কথায় উনি বললেন, আমার দিদির বড়ো মেয়েটিকে দেখেছ তো তোমরা? একটু মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। আমার জ্যাঠামশাই পাগল ছিলেন, আমার এক খুড়তুতো ভাইও...আমাদের বংশে একটু পাগলামির ধারা আছে, সেইজন্যেই ও বেচারা...রাণু পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, বি.এ.-তে হিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, তারপর থেকেই—

ভাস্কর আমার দিকে আড়চোখে তাকাল, ভাবখানা এই, দেখলি তো আমি আগেই বলেছিলুম কিনা।

বড়োমামা আবার বললেন, অনেক রকম চিকিৎসা হয়েছে, ও বেচারীর তো কোনো দোষ নেই, নিজেই বুঝতে পারছে, কোনো চিকিৎসাশাস্ত্র এখনো বংশানুক্রমিক পাগলামি সারাতে পারে না...এখানে এনে রেখেছি যদি মায়ের দয়াতে কিছু হয়...

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সারবে না?

বড়োমামা বললেন, মা যদি দয়া করেন, নিশ্চয়ই সারবে। কখনো আশা ছাড়তে নেই। এখানকার কুয়োর জল খুব ভালো...কত লোকের কত রোগ সেরে গেছে। দূর দূর জায়গা থেকে লোকে আমাদের বাড়ির কুয়োর জল নিতে আসে।

একটু বাদে সঞ্জয় এসে আমাকে বলল, নীলুদা, আপনি তো তাস খেলছেন না, আপনি আমার সঙ্গে ক্যারাম খেলবেন?

সেটাই ভালো মনে করে, আমি সঞ্জয়ের সঙ্গে উঠে গেলাম পাশের ঘরে। সেখানে সঞ্জয়ের ছোড়দি ঝুমা বই-খাতা খুলে খুব মন দিয়ে পড়ছে।

ঝুমা আমার দিকে একবার চেয়ে দেখল, কোনো কথা বলল না। মেয়েটা যেন অহংকারে একেবারে মটমট করছে। ওর কি ধারণা ও আমাদের চেয়ে ইংরিজি বেশি জানে? একবার ভাস্করের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেখুক না। আমি যদিও পরীক্ষায় ইংরিজিতে কম নম্বর পেয়েছি, কিন্তু ইংরিজি গল্পের বই আমি নিশ্চয়ই ঢের বেশি পড়েছি ওর থেকে।

আমরা মেঝেতে ক্যারাম বোর্ড পেতে বসতেই ঝুমা তার ছোটো ভাইকে ধমক দিয়ে বলল, এই এখানে খেলা চলবে না। দেখছিস না আমি পড়ছি?

সঞ্জয় বলল, আমরা কোথায় খেলব? এক ঘরে দাদা ঘুমোচ্ছে, দিদির ঘরে মা যেতে বারণ করেছে।

—বারান্দায় যা।

সঞ্জয় একটুক্ষণ তর্ক করে হার মেনে ক্যারাম বোর্ড নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুমা আর একবার অবজ্ঞার দৃষ্টি দিল আমার দিকে। যেন সে বোঝাতে চায়, আমরা এলেবেলে খেলাধুলো নিয়ে সময় নষ্ট করি, কিন্তু সে শুধু পড়াশুনো ভালোবাসে!

সঞ্জয়ের সঙ্গে খেলতে শুরু করেই আমি চমকে উঠলুম। ওরে বাবা, এ যে বিচ্ছু ছেলে একেবারে! সাঙ্ঘাতিক খেলে। একমাত্র উৎপলই এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

সুতরাং মান বাঁচাবার জন্য আমাকে বলতেই হলো, অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই, টিপ নষ্ট হয়ে গেছে, তবে দেখবে, একটা রিবাউন্ট মার দেখাব?

কিন্তু আমি যতই রিবাউন্ট মারের কায়দা দেখাই, তাতে কোনো সুবিধে হলো না, পর পর দুটি গেম সঞ্জয় আমাকে যা তা ভাবে হারিয়ে দিল। এবং এত সহজভাবে হারাবার ফলেই সে আর খেলায় বেশি উৎসাহ পেল না। আমি দেখলাম, ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে।

ওকে বললাম, তুমি ঘুমোতে যাও, সঞ্জয়!

আমি আর তাস খেলার জায়গায় ফিরে না গিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আজও আকাশ মেঘলা করে আছে। বিকেলের দিকে বোধহয় বৃষ্টি নামবে। আকাশের একদিক কালো হয়ে আছে। আমি কালো রং এমনিতে খুব পছন্দ করি না। একমাত্র কালো মেঘই আমার ভালো লাগে। এইরকম কালো মেঘ আকাশকে কী গম্ভীর করে দেয়। এক-এক সময় মেঘ দেখলে মনে হয়, আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া হিমালয়কে দেখতে পাচ্ছি।

চাতালে উঠে আমি কালীমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মূর্তিটি বেশ বড়ো, কালো পাথরের। আমার সতেরো বছরের জীবনে ঠাকুর-দেবতারা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। ভগবান বলে কি সত্যিই কিছু আছে? এই

আকাশের নীল যবনিকার আড়ালে থাকেন দেবতারা? যখন আরো ছোট ছিলাম, এই সব বিশ্বাস করতে খুব ভালো লাগত। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়ে মনে হতো, হঠাৎ হয়তো আমিও কোনো দেব-দেবীর দেখা পাব। খুব বৃষ্টির পর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম ব্যগ্রভাবে, আমার আশা ছিল, সব মেঘ সরে গেলে আমি হঠাৎ একদিন এক ঝিলকে স্বর্গের দৃশ্য দেখতে পাব।

কিন্তু সতেরো বছরে পৌঁছে, ঐ সব চিন্তাকে ছেলেমানুষি বলে ভাবি। এমনকি কালী ঠাকুরের মূর্তির দিকে সোজাসুজি চাইতে আমার লজ্জা হয়।

ঈশ্বর আছেন কি নেই, এই চিন্তা ছাড়া আর যে দ্বিতীয় চিন্তাটি আমায় বিব্রত করে, তা হচ্ছে নারী সম্বন্ধে। আমার চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই আমি দীপান্বিতাকে চিঠি লিখি, সেও আমাকে লেখে। সপ্তাহে অন্তত একবার দীপান্বিতাকে না দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারি না, কেন এই দেখা করবার ইচ্ছেটা। কেন এই ব্যাকুলতা। কেন দীপান্বিতার হাতটা ধরলেই আমার বুক কাঁপে? শুধু হাত ধরা কেন, দূর থেকে ওকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ শব্দ আমি নিজেই শুনতে পাই। কেন এরকম হয়, প্রেম-ভালোবাসার অনেক গল্পের বই আমি পড়েছি, তবু নিজের জীবনে সেটা কিছুতেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। কেন কোনো শাড়ি বা ফ্রকপরা মেয়েদের দেখলেই একটা দুরন্ত কৌতূহল জাগে, ঐ সব পোশাকের মধ্যে ওদের শরীরটা দেখতে কেমন? ছবিতেই তো দেখেছি অনেক, তবু কেন প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা এই উগ্র কৌতূহল। এমনকি কোনো মহিলার পায়ের গোড়ালি থেকে সামান্য একটু শাড়িটা উঁচু হয়ে গেলে সেদিকে লোভীর মতন চোখ চলে যায়। কেন? অথচ, আবার দৈবাৎ বেশি দেখে ফেললেও দারুণ লজ্জা হয়।

সেইজন্যই মা কালীর দিকে ভালো করে তাকাতে পারি না। মা কালীর শরীরে কোনো পোশাক নেই, তিনি অত্যন্ত বেশি রকমের নারী, তাঁর দিকে তাকালে আমার একই সঙ্গে লজ্জা, শিহরণ, ভয় এবং পাপবোধ জাগে।

আমার পাশে একটা ছায়া পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেলাম। অভিজিতের দিদি, সেই রাণুদি কখন নিঃশব্দে এসে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

আমি প্রথমেই হাত জোড় করে ফেললাম। যেন, আমি কালীঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্যই এখানে দাঁড়িয়েছি। এবং রাণুদিকে বলতে চাইছি, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ছেড়ে দিন, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে, কোনো কথা বলতে পারছি না। আমার এক ছুটে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত, অথচ পা দুটো যেন গেঁথে গেছে মাটির

সঙ্গে। পাগলদের সঙ্গে যে কী রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আমি কিছু জানি না।

বেশ কিছুক্ষণ রাণুদি সেই রকমভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, তোমার নাম কী?

আমি অতিকষ্টে খানিকটা সামলে নিয়ে আমার নামটা বললাম।

উনি বললেন, তোমরাই আজ খোকনকে বাঁচিয়েছ?

এক্ষেত্রে আশুব মতন বিনয় করবার কোনো মানেই হয় না বলে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

—বাঃ! তোমরা কলকাতায় কোথায় থাক? কোন কলেজে পড়? তোমরা বুঝি বন্ধুরা মিলে প্রায়ই কোথাও বেড়াতে যাও?

আশ্চর্য ব্যাপার, রাণুদির গলার আওয়াজে কিংবা কথায় কোনো রকম পাগলামির ভাব নেই। আমার মাসিরাও এই রকম কথা বলে। রাণুদির কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি। আর আমার সব মাসিদের চেয়ে অন্য যত মহিলা আগে দেখেছি, তাদের চেয়ে রাণুদি বেশি সুন্দর।

রাণুদি বললেন, কী সুন্দর আজকের দিনটা! মেঘলা মেঘলা, ছায়া ছায়া। এইসব দিনে ইচ্ছে করে না অনেক দূরে বেড়াতে যেতে?

আমি বললুন, হ্যাঁ।

—প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা দিনের চেয়ে আলাদা, তাই না।

—হ্যাঁ।

—আমার ইচ্ছে করে একলা একলা কোনো পাহাড়ে উঠতে। একদম ওপরে, আর কেউ থাকবে না, শুধু আকাশ আর আমি...হবে না। কোনো দিন হবে না! কোনো দিন হবে না। তুমি পাহাড়ে উঠেছ, নীলু?

—হ্যাঁ।

—তোমার বুঝি খুব ভক্তি, তুমি ঠাকুরের সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?

—হ্যাঁ।

এমনকি রাণুদি যদি জিজ্ঞেস করতেন, তুমি বুঝি নাকের শিকনি চেটে চেটে খাও? তা হলেও আমি হ্যাঁ বলতুম। রাণুদির কোনো কথার প্রতিবাদ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রাণুদি একটু কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একি, তোমার প্যান্টে রক্তের দাগ?

সেই পানের পিকের ছোপ। ভালো করে ওঠে নি। আমি লজ্জায় সেখানটায় হাত চাপা দিলাম।

বাড়ির ভেতর থেকে রাণুদির মা বেরিয়ে এসে রাণুদিকে লক্ষ করছিলেন, এবার তিনি ডেকে বললেন, ও রাণু, তুই একটু ঘুমিয়ে নিবি না?

রাণুদি বললেন, হ্যাঁ মা, যাচ্ছি।

তারপর যেন আমার কাছ থেকে অনুমতি নেবার ভঙ্গিতে রাণুদি বললেন, আমার মা ডাকছেন, আমি যাই?

আমি মাথা হেলালুম।

ঠিক যেন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হঠাৎ ছেড়ে গেল, রাণুদি চলে যাবার পর সেইরকম মনে হলো আমার। অথচ, রাণুদি তো কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করেননি। পাগলামির কোনো চিহ্নই নেই। আমি শুধু রাস্তায় পাগলদের দেখেছি, যারা লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে, কিংবা খুব খারাপ ভাষায় গালাগালি দেয়। রাণুদি এত সুন্দর, এত নরম ব্যবহার, তবু কেন ওকে পাগল বলা হচ্ছে।

চাতাল থেকে নেমে আমি কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের বাড়িটার চেয়েও এই কুয়োটা অনেক বড়ো, ওপারে একটা চৌকো কাঠের ঢাকনা, সেটাও আবার তালা দিয়ে আটকান। শুধু একটু বালতি গলার মতন ফাঁক আছে।

রাণুদি এই কুয়োর মধ্যে নামতে চেয়েছিলেন। সেটাই কি ওঁর পাগলামি? সব কুয়োর মধ্যেই ছোট্ট ছোট্ট লোহার সিঁড়ি থাকে। আমাদের বাড়ির কুয়োটা প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, ঐ সিঁড়িগুলো দিয়ে তলা পর্যন্ত নামলে মন্দ হয় না। শুধু ইচ্ছে হওয়াটাই পাগলামির চিহ্ন? আমার তো কত রকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। তাহলে, আমিও কি পাগল?

৪

পরদিন সকালবেলা আর কোনো কথা নয়, আমরা বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সঞ্জয় আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য আবদার ধরেছিল, কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেই তাকে আমরা বাদ দিলাম। অভিজিৎ এখনো দুর্বল, তাকে নেওয়া যাবে না, সঞ্জয় গেলে সে দুঃখ পাবে। তা ছাড়া আমরা কখন ফিরব না ফিরব, কিছু তো ঠিক নেই।

সঞ্জয়ের বড়োমামা অবশ্য আমাদের নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। উনি বললেন, ওগুলো তো পাহাড় নয়, মাঠের মধ্যে ছোট ছোট টিলা। শুধু শুধু মাঠ ভেঙে অতখানি যাবে কেন? পাহাড় দেখতে চাও, ট্রেনে করে দেওঘর চলে যাও, তারপর টাঙ্গা ভাড়া নিয়ে ত্রিকূট দেখে এসো।

কিন্তু টাঙ্গা চড়ে পাহাড় দেখতে যাওয়ার চেয়ে আমরা পায়ে হেঁটে একটা পাহাড়কে আবিষ্কার করতে চাই।

বেশ ভোর ভোর আমরা বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গে রইল কিছু রুটি আর ডিমসেদ্ধ। আশুর ওয়াটার বটল আছে। শুধু বৃষ্টি এলে আমাদের ভিজতে হবে, বেশ তো, ভিজব।

পাহাড়ের রাস্তা চেনার তো কোনো অসুবিধে নেই। সোজা সামনে তাকিয়ে হাঁটলেই হয়। কিন্তু আমরা যতই সামনের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে যাই, পাহাড়গুলো যেন ডানদিকে সরে যায়।

পাথুরে মাঠ, গাছপালা কম, আমরা পথে দুটো নদী আর দু-তিনটে সাঁওতালদের গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। গ্রামের লোকরা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন আমরা ছাড়া আর কোনো প্যান্ট-শার্টপরা মানুষ এদিকে আগে আসেনি।

আমরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কখনো গাছের ডাল ভেঙে, কখনো পাথরের টুকরো নিয়ে লোফালুফি করতে করতে এগোতে লাগলাম আর মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, রুটি আর ডিমসেদ্ধগুলো এবার খেয়ে ফেললেই হয়। কিন্তু উৎপল ওর ঘড়ি দেখে সময়ের হিসেব রাখছে। আগেই ঠিক করা হয়েছে, ন'টার আগে কিছুতেই খাওয়া হবে না। কেন না, তা হলে একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে যাবে।

কালকের দুপুরের সেই কালো মেঘ এখনো থমকে আছে। রাত্তিরে খুব জোর বৃষ্টি হয়ে গেলে আমাদের উপকারে লাগত। তার বদলে, যে কোনো সময় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনাটা আঁকা রয়েছে আকাশে। ঐ মেঘের জন্যই গুমোট, খুব গরম লাগছে হাঁটবার সময়। জামাগুলো ঘামে ভিজে যাওয়ার ফলে আমরা সবাই জামা খুলে হাতা দুটো কোমরে জড়িয়ে গিঁট বেঁধে নিলাম। ভাস্কর আড়চোখে দেখে নিল আমার গেঞ্জিটা। ও ভুলে গেছে যে এটা ওরই গেঞ্জি। এবার বাধার সম্মুখীন হলাম। সামনে একটা বেশ বড়ো নদী। এ নদী হেঁটে পার হওয়া যাবে না। ঘোলা রঙের জল।

ভাস্কর নেমে গিয়ে নদীর জল ছুঁয়ে দেখে বলল, স্রোত খুব একটা বেশি নেই। সাঁতরে পার হওয়া যাবে।

আশু বলল, জামা-প্যান্ট সব ভিজিয়ে?

ভাস্কর বলল, তাতে কী হয়েছে? একটু বাদেই শুকিয়ে যাবে আপনা আপনি। এত দূর এসে তো আর ফেরা যায় না!

উৎপল বলল, তোরা সবাই জামা-প্যান্ট খুলে একটা পুটলি বেঁধে ফ্যাল, আমি সেই পুটলিটা এক হাতে উঁচু করে নিয়ে আর এক হাতে সাঁতরে চলে যাব।

এ আর কতখানি!

উৎপল সেটা পারলেও পারতে পাবে ভেবে আশু আর ভাস্কর কোনো আপত্তি করল না। তাছাড়া, উৎপল যদি কোনোক্রমে পুঁটলিটা ভিজিয়ে ফ্যালে, তাহলে সেই উপলক্ষে অনেকক্ষণ ওর পেছনে লাগা যাবে। ভাস্কর প্যান্টের বোতাম খুলতে শুরু করল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানে কোনো কথা বলার অধিকার আমার নেই।

আশু আমার দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু নীলু? ও কী করে পার হবে?

ভাস্কর বলল, তাই তো, নীলুটা যে আবার সাঁতার জানে না? এই জন্য তোকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাই না। সাঁতারটা শিখে রাখতে পারিসনি? তোকে কতবার বলেছি, হেদোয় ভর্তি হ!

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম, তোরা যা। আমি এখানেই বসে থাকব।

উৎপল একটু চিন্তা করে বলল, দু'জনে মিলে নীলুকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না?

আশু বলল, সেটা রিস্কি। যে একদম সাঁতার জানে না, হঠাৎ ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরলে...

সেরকম ভাবে আমি যেতেও চাই না! আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, বলছি তো, তোরা যা, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আশু সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে, আমি নীলুর সঙ্গে এখানে থাকছি। তোরা দু'জন ঘুরে আয়। পাহাড় তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

এরকম সময় কারুর সমবেদনাতেও সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আমি আশুকে এক ধমক দিয়ে বললাম, তোকেও থাকতে হবে না, আমি একাই থাকতে পারব।

ভাস্কর বলল, হুঁ! তাহলে ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা করা যাক। কিন্তু তার আগে রুটি আর ডিম-ফিমগুলো খেয়ে ফেললে হয় না?

উৎপল ঘড়ি দেখে বলল, ন'টা বাজতে এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি। তোরা নিজেরাই ঠিক করেছিলি...

আশু বলল, তা বলে তো আর ওগুলোও জলে ভেজাবার কোনো মানে হয় না—যদি আমরা সাঁতরেই যাই।

একটা বড়ো শাল গাছের তলায় বসা হলো। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। পিকনিক করতে হলে এরকম জায়গাতেই আসা উচিত।

আমার অভিমান এমনই তীব্র হলো যে খিদেটাও যেন চলে গেল। আমি বললাম, আমি খাব না, তোরা খেয়ে নে।

উৎপল বলল, খা, খা, আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুই কাল সকাল থেকে আমার কাছে সাঁতার শিখবি!

আটখানা ডিম ও বারোখানা রুটি প্রায় চোখের নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। আশুর ওয়াটার-বটল থেকে সবাই এক ঢোক করে জল খেয়ে নেবার পর ভাস্কর বলল, এবার কী করা যাবে!

আমার চোখ তখন নদীর ওপারে।

সাঁতার না জানারও যে একটা উপকারিতা আছে, সেটা সেদিন টের পেলাম। সাঁতার জানতুম না বলেই সেদিন একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হলো।

ওপারে দেখা গেল আট দশটা মোষ আর কয়েকটা সাঁওতাল ছেলে। তারা নদীর পারে এসে এক মুহূর্তও দেরি করল না। মোষসমেত হুড়মুড়িয়ে জলে নেমে পড়ল। মোষগুলো জন্ম থেকেই সাঁতার জানে। সেই মোষের পিঠে চেপে সাঁওতাল ছেলেগুলোও দিব্যি চলে এল এপারে।

আমি উঠে গিয়ে একটি সাঁওতাল ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ভাইয়া, ইধার নদী পার হোনে কা কই ব্রীজ হ্যায়? সেতু?

সে কী বুঝল কে জানে। সে বলল, নেহি হ্যায়।

আমি আবার বললাম, তোমার একঠো মোষের পিঠে মানে ভঁইস কা পিঠি মে হামকো পার কর দেগা।

সে কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম, আট আনা পয়সা দেগা।

সে কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম, আট আনা পয়সা দেগা।

ছেলেগুলো খুব হাসতে লাগল। আমি সে হাসি গ্রাহ্য না করে একটা বেশ জোয়ান চেহারার মোষের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, গুঁতায় গা নেহি তো?

কাছের ছেলেটি বলল, নেহি। আপ উঠিয়ে গা।

সেই আমাকে সাহায্য করে মোষটার পিঠে চাপিয়ে দিল। মোষটা দিব্যি শান্ত, কোনো আপত্তিই করল না।

আমি সগর্বে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখলি? আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা?

ওরা তিনজনেই চুপ।

আমি আবার বললাম, ইচ্ছে করলে তোরাও মোষের পিঠে আসতে পারিস।

উৎপল বলল, ফালতু আট আনা পয়সা খরচা করতে যাব কেন?

ওদের প্যান্ট-শার্টের পুঁটলিটা আমার হাতে দিয়ে ওরাও নেমে পড়ল জলে।

আমি নিজের প্যান্ট না খুলেই মোষের পিঠে চড়ে বসেছি। আর নামার কোনো মানে হয় না।

বেশি কায়দা দেখাবার জন্য, মোষটা জলে নামতেই আমি আস্তে আস্তে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। শুধু শুধু আমার প্যান্টটাই বা ভেজানো কেন? খুব ব্যালেন্স করে থাকতে হবে।

সাঁতার কেটে আবার মোষটার খুব কাছে চলে এসে ভাস্কর একবার মুখটা তুলে দারুণ ধমক দিয়ে বলল, এই, ঝোস। বেশি ইয়ার্কি না? একবার পড়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্বিঘ্নে এপারে এসে পৌঁছালাম। মোষের সঙ্গী সাঁওতাল ছেলেটি মোষের ল্যাজ ধরেই চলে এসেছে। আমি তাকে একটা আধুলি দিতেই সে সেটা একটা কানের মধ্যে ফিট করে ফেলল, আবার মোষটাকে নিয়ে নেমে পড়ল জলে। পয়সা সম্পর্কে যেন ওর কোনো লোভ নেই।

কিছুক্ষণ আগেকার অভিমানটা কেটে গিয়ে আমি বেশ একটা জয়ের আবেগে উৎফুল্ল। বন্ধুদের কাছ থেকে আমি কখনো দয়া নিতে চাই না।

ভাস্কর এপারে উঠে বলল, আগে জানলে তোয়ালে নিয়ে আসতাম। মাথাটা ভিজে থাকবে।

আমি বললাম, মনে কর না বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি পড়লে তো ভিজতেই হতো।

উৎপল বলল, নীলুটাকে দেখেছি পাহাড়েই রেখে আসতে হবে। কেন না, ফেরার সময় তো আর ওর জন্য মোষ রেডি থাকবে না।

আমি বললাম, আমি গ্ল্যাডলি পাহাড়ে থেকে যেতে রাজি আছি।

সেখান থেকে পাহাড় আর বেশি দূর নয়। আমরা পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

দূর থেকে একটা পাহাড় মনে হলেও আসলে রয়েছে পর পর কয়েকটা। মাঠের মধ্যে দুম করে এই পাহাড়গুলো উঠেছে। খুব বেশি বড়ো নয়, বেশ ছোটখাটো, ছিমছাম, এখানেও গাছপালা বেশি নেই।

আমি বিস্মিতভাবে বললাম, দেখেছিস একটা জিনিস? ঠিক পাশাপাশি চারটে পাহাড় রয়েছে।

আশু বলল, ঠিক।

আমি বললাম, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই একটা করে পাহাড় নিয়ে নিতে পারি। কোনো ঝগড়া হবে না। কে কোনটা নিবি বল?

ভাস্কর উদারভাবে বলল, তুই আগে বেছে নে।

একেবারে ডানদিকের পাহাড়টা আমার প্রথম দেখেই পছন্দ হয়েছিল। বেশ

গোল ধরনের, মাথার ওপরে একটা একলা গাছ।

আমি বললাম, আমি ভাই ঐ পাহাড়টা নিচ্ছি। আমার পাহাড়ে আমি একলাই যাচ্ছি, তোরা কেউ আসিস না।

দৌড়ে চলে গেলাম সেদিকে। আমি একটা পাহাড় জয় করতে যাচ্ছি। আমার নিজস্ব পাহাড়। শরীরে দারুণ উত্তেজনা।

ভেবেছিলাম এক দৌড়েই উঠে যেতে পারব। কিন্তু যত ছোট মনে হয়, তত ছোট নয় পাহাড়টা, আস্তে আস্তেই ওঠা উচিত ছিল। দৌড়াবার জন্য হাঁপিয়ে গেলাম, একেবারে চূড়ায় উঠে নাম-না-জানা গাছটাকে ধরে দম নিতে লাগলাম। গরমের চোটে শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র যেন জ্বালা করছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পর বাতাসে শরীর জুড়োলো। নিচের গাছপালাগুলো খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে, দূরে সেই নদীটা একটা সাদা ফিতের মতন। আমার জীবনের প্রথম পাহাড় চড়া। আমি সত্যি সত্যি উঠেছি। স্বপ্নে নয়। আমি ভাস্করদের মতন দার্জিলিংয়ে যাইনি, দার্জিলিংয়ের মতন উঁচু না হোক, তবু এই পাহাড়ই আমার প্রিয়।

হঠাৎ মনে পড়ল রাণুদির কথা। উনি একলা একটা পাহাড়ে উঠতে চান। বলেছিলেন, কখনো হবে না। কেন হবে না? রাণুদিকে এখানে নিয়ে আসা যায় না? আমি সঞ্জয়ের বড়োমামাকে আজই বলব। রাণুদি চান পাহাড়ের ওপর একলা দাঁড়াতে, যেখানে আকাশ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এই রকম একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে, রাণুদির মনের অসুখ সেরে যেতে পারে।

রাণুদির জন্য আমার দারুণ ব্যাকুলতা বোধ হলো। তক্ষুনি খুব ইচ্ছে হলো রাণুদিকে দেখতে। দীপান্বিতাকে দেখার ইচ্ছে যেমন হয়, কিংবা তার চেয়েও বেশি। কেন আমার এরকম হচ্ছে। রাণুদি আমার চেয়ে বয়েসে কত বড়ো। রাণু মাসিকে দেখার জন্য তো এমন তীব্র ইচ্ছে হয় না। রাণুদি আমাকে ভালো করে চেনেনেই না, তবু আমার মনে হতে লাগল, রাণুদিকে না দেখলে আমিই বুঝি পাগল হয়ে যাব।

আ-আ-ও-ও-ও, টার্জানের মতন এই রকম আওয়াজ শুনে আমি পেছন ফিরে তাকালাম।

আমার ঠিক পাশের পাহাড়টার চূড়ায় উঠে ভাস্কর ঐ রকম ডাক ছাড়ছে আর নিজের জামাটা পতাকার মতন ওড়াচ্ছে। অন্য দুটো পাহাড়ের ওপরেও আশু আর উৎপল উঠে এসেছে। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম পরস্পরকে জানান দেবার জন্য।

আমরা চারজন যেন এই পৃথিবীর রাজা। আমাদের মাথায় আকাশের মুকুট, আর পায়ের তলায় পড়ে আছে পৃথিবী।

অন্য চিৎকার বন্ধ করে ভাস্কর বলতে লাগল, ধোঁয়া! ধোঁয়া!

আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, কী, কী?

ভাস্কর একদিকে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করছিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, দুটো পাহাড়ের মাঝখানের জায়গাটায় খানিকটা ঝোপ মতন, সেখান থেকে সত্যিই ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সুতরাং আর একটা আবিষ্কারের জিনিস পাওয়া গেল। আমি আর ভাস্কর হু-হু করে নামতে লাগলাম নিচের দিকে। আশু আর উৎপলকেও ইঙ্গিত করলাম ঐ দিকে আসতে।

নিচে নামবার সময় কোনো পরিশ্রম হয় না। কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই আমি আছাড় খেলাম বেশ জোরে। আর একটু হলে গড়িয়ে অনেক নিচে পড়তাম, তাহলে আর আমার একটা হাড়ও আস্ত থাকত না। সামলে নিলাম কোনোক্রমে। বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছটায় চোট লেগে, প্যান্টটা ছিঁড়ে পা কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। পা কাটে কাটুক, কিন্তু প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল বলে যেন আমার বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো। নাঃ, ফুলপ্যান্ট পরা আমার ভাগ্যে নেই।

ইস, আমি কী বোকা। পাহাড়ে চড়বার জন্য তো হাফ প্যান্টই ভালো, আমি কেন হাফ প্যান্টটা আজ পরে আসিনি। জানবই বা কী করে, আগে তো কখনো পাহাড়ে চড়িনি।

ভাস্কর আমার থেকে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই আশু আর উৎপলও এসে গেল।

নিচের সমতল জায়গাটায় ঝোপের মধ্যে একটা ছোট বাঁশের ঘর। দেখেই মনে হয়, নতুন তৈরি করা হয়েছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে ঘরটার সামনে থেকেই।

পাথর-টাথর সাজিয়ে সেখানে একটা চুল্লি বানানো হয়েছে, তার ওপরে একটা মাটির হাঁড়ি বসানো। গন্ধতেই বোঝা যায়, ভাত ফুটছে। গেরুয়া পোশাক পরা মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন লোক সেখানে বসে। আর ঘরের দরজার পাশে প্যান্ট-শার্ট পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পকেটে হাত দিয়ে। দু'জনেই খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

প্যান্ট-শার্টপরা লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম। সেদিন সাইকেল নিয়ে বেড়াতে গিয়ে একে আমি দেখেছিলাম একটা বাড়িতে। একটা লাঠি নিয়ে কুকুর তাড়াচ্ছিল।

আমরা চারজন চারদিক থেকে নেমে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালাম।

গেরুয়া পরা লোকটি বলল, লেড়কা লোগ ঘুমনে আয়া।

প্যান্ট-শার্টপরা লোকটি হেসে আমাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে

অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছ বুঝি? তোমরা তো মধুপুরে শিব-নিবাস বাড়িটায় উঠেছ, তাই না?

ভাস্কর দলনেতা হিসাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, আমিও তোমাদের কাছাকাছিই আছি। এই সাধুজী, আত্মারামজী এখানে থাকেন, আমি মাঝে মাঝে এখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি।

সাধুজী বললেন, বৈঠো, তুমলোগ বৈঠো। পানি পিওগে? ইধার এক ঝর্ণা হ্যায়, পানি বহুৎ আচ্ছা, একদম মিঠা—

আশু গিয়ে ঝপ করে সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলল। অগত্যা আর উপায় কী, আমরাও প্রণাম করলাম। উনি বিড়বিড় করে কী যেন আশীর্বাদ করলেন আমাদের মাথা ছুঁয়ে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটে ঢাকনাটা লাফাচ্ছে। সেই গন্ধে বেশ চনমনে খিদে পেয়ে গেল। আমরা কখন ফিরব কোনো ঠিক নেই, সারাদিন আর খাওয়া জুটবে না। কেন যে আরো বেশি করে খাবার আনিনি।

পেতলের চকচকে ঘটিতে সাধুজী জল এনে দিলেন, সেই জলই খেয়ে নিলাম পেট ভরে। প্যান্ট-শার্টপরা লোকটি জিজ্ঞেস করল, আমরা কোন দিক দিয়ে এসেছি। ভাস্কর সবিস্তারে কাহিনীটি বলল। আমি মোষের পিঠে চড়ে নদী পার হয়েছি শুনে সে হো-হো করে হেসে উঠল, সাধুজীর ঠোঁটেও মুচকি হাসি দেখা দিল।

প্যান্ট-শার্টপরা লোকটি জানাল যে আমরা অনেক ঘুর-পথে এসেছি। আমাদের লেগেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা, কিন্তু মধুপুর থেকে মাত্র দু'ঘণ্টাতেই এখানে পৌঁছানো যায়, গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ আছে আর ঐ নদীটার ওপরে সাঁকোও আছে এক জায়গায়।

আমরা পাহাড়কে চোখের সামনে রেখে সোজা এগিয়ে এসেছি, তবু সেটাও ঘুর-পথ হলো? আশ্চর্য ব্যাপার!

উৎপল বলল, আমরা এবার যাই। আপনি আমাদের সেই শর্টকাটের রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দেবেন?

প্যান্ট-শার্টপরা লোকটির নাম অজিত রায়। আমরা তাঁকে অজিতদা বলে ডাকতে লাগলুম। তিনি সাধুজীকে বললেন, বাবা, আপ ভোজন কর লিজিয়ে। ম্যায় আভি আ রাহা হুঁ।

তারপর তিনি এলেন আমাদের একটু এগিয়ে দিতে। আমি বললাম, কিন্তু ঝর্ণাটা আমরা একবার দেখব না? ঝর্ণা না দেখেই ফিরে যাব?

অজিতদা বললেন, এ ঝর্ণাটা দেখবার মতন কিছু না। তোমরা গিরিডি গেছ? সেখানে সুন্দর একটা জলপ্রপাত আছে। উশ্রী ফলস। খুব বিখ্যাত। দেখনি? তাহলে কালই চলে যাও।

আমি বললাম, তবু এই ঝর্ণাটা আমি একবার দেখবই!

অজিতদা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে বললেন, ফেরার সময় তোমরা এদিক দিয়ে গেলেই রাস্তা পেয়ে যাবে। আর ঝর্ণাটা এই দু'নম্বর পাহাড়টার পেছনে। আমি ভাই সাধুবাবার কাছে যাচ্ছি। ওনাকে ক'দিন ধরে খুব জপাচ্ছি। এই সাধু একটা দারুণ জিনিস জানেন। অ্যালকেমি কাকে বলে জানো? সোনা তৈরি করার ফর্মুলা। কিছু কিছু সাধু এখনো সেই বিদ্যে জানে। সেই জন্যই তো আমি প্রায়ই এসে এনার পায়ের কাছে পড়ে থাকি।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, সত্যিই সোনা তৈরি করতে জানেন? আপনি প্রমাণ পেয়েছেন?

অজিতদা বললেন, হুঁ, একদিন আমার চোখের সামনে এক টুকরো তৈরি করে দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কায়দাটা শেখাচ্ছেন না আমাকে। বলছেন, ওতে নাকি মানুষের লোভ বেড়ে যায়। আচ্ছা, চলি ভাই!

আমরা ঝর্ণার দিকে খানিকটা এগোবার পর উৎপল বলল, আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে খুব গুল ঝেড়ে গেল লোকটা। সোনা আবার কেউ তৈরি করতে পারে নাকি?

আশু বলল, পারতেও তো পারে। খাঁটি সাধু-সন্ন্যাসীদের তো অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে।

উৎপল বলল, ওসব সাধুদের স্রেফ ম্যাজিক।

ভাস্কর বলল, আমরাও এই সাধুর কাছে একটু ম্যাজিক দেখলে পারতাম।

ঝর্ণা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। একটা খুব সরু জলের ধারা, তবে জলটা বেরুচ্ছে মাটি ফুঁড়ে। মাটির নিচে জল আছে, আমরা সবাই সে কথা জানি, টিউবওয়েল পুঁতলেই তো জল বেরোয়, তবু মাটি ভেদ করে জল উঠতে দেখলে অবাক লাগে। আপন মনে, অবিরাম জল বেরিয়েই আসছে। কোনোদিন কি এ জল ফুরোয় না?

সবারই খিদে পেয়ে গেছে, কেউ আর বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। ভাস্কর বলল, শুধু শুধু এই একটা ছোট্ট ঝর্ণা দেখার জন্য আরো অনেক দেরি হয়ে গেল। এই নীলুটার জন্যই তো! ঝর্ণা দেখব, ঝর্ণা দেখব! কী দেখলি? এটা না দেখলে কী ক্ষতি হতো?

একটা ঝর্ণা না দেখলে কী ক্ষতি হয়? কিছুই না। শুধু, একটা ঝর্ণা না দেখলে

সেই ঝর্ণাটা না-দেখা থেকে যায়।

ভাস্কর 'ইয়ারো ভিজিটেড' কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগল। কবিতাটা আমাদের কলেজের পাঠ্য। ইয়ারো নামে একটা ঝর্ণা ছিল, কবি বলেছেন, সেটা দেখার চেয়ে না-দেখাই ভালো ছিল।

কিন্তু এ পৃথিবীর সব ঝর্ণা আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

৫

দেওঘর বেড়াতে গিয়ে ফিরতে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল। মধুপুর স্টেশনে এসেই নামলাম রাত ন'টায়। মাত্র একটাই টাঙ্গা, যেন ঠিক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমরা ভেতরে বসলাম, উৎপল টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসে গান গাইতে লাগল। তারপর আমরাও যোগ দিলাম সেই গানে।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে রাস্তার ওপরে বেশ কিছু লোকের গলার আওয়াজ পেলাম। তারপর দেখলাম সঞ্জয়ের বড়োমামাকে। তিনি জামা গায়ে দিয়েছেন। আমাদের দেখে তিনি বললেন, টাঙ্গাটা পাওয়া গেছে, ভালো হয়েছে। এটা নিয়েই তা হলে আমি থানায় যাই।

উৎপল জিজ্ঞেস করল, থানায়? কেন?

বড়োমামা বললেন, সন্ধে থেকে রাণুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

এই তিন-চারদিনে রাণুদির সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। তাঁর ব্যবহারে আমরা পাগলামির সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পাইনি। মাঝে মাঝে তিনি শুধু চুপ করে বসে থাকেন, তখন কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। অন্য সময় একদম স্বাভাবিক।

এদিক সেদিকে যে-কয়েকটা বাড়ি ছড়িয়ে আছে, সেই সব বাড়ির মালি ও চৌকিদাররা বেরিয়ে এসেছে। সব জায়গায় খুঁজে দেখা হয়েছে এর মধ্যে, রাণুদি কোথাও নেই।

আমার প্রথমেই মনে পড়ল আমাদের বাড়ির পুকুরটার কথা। তাছাড়া রাণুদি একদিন কুয়োর মধ্যে নামতে চেয়েছিলেন।

বড়োমামা বললেন, না, ও জলে ডুবে যাবে না। রাণু সাঁতার জানে। তা ছাড়া সব কটা বাড়ির কুয়োও দেখা হয়েছে।

টাঙ্গা নিয়ে বড়োমামা চলে গেলেন থানায়। যাবার সময় বিড়বিড় করে বলে

গেলেন, থানায় গিয়ে কী লাভ হবে কে জানে! তবু দিদি বলছে বারবার।

আমরা প্রথমেই সঞ্জয়কে ধরে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিলাম।

আমরা সকালবেলা দেওঘর যাবার সময়ও দেখেছিলাম রাণুদিকে। উনি খুব ভোরে উঠে পুজোর জন্য ফুল তোলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে হাত নেড়েছিলেন দূর থেকে।

সঞ্জয় বলল, দুপুর থেকেই দিদির মেজাজ খারাপ হয়েছিল। একটাও কথা বলছিল না কারুর সঙ্গে। মা কতবার ডাকলেন, কতবার বিকেলের চা খাবার জন্য সাধাসাধি করলেন, দিদি একবারও মুখ ফেরায়নি পর্যন্ত। দুপুর থেকে ঠিক এক জায়গায় বসে ছিল অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা—

এরকম আমরাও দেখেছি। এক জায়গায় ঠায় চার-পাঁচ ঘণ্টা একটু না নড়াচড়া করে বসে থাকতে যে কেউ পারে, তা রাণুদিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ অন্য সময় রাণুদি বেশ ছোটাছুটিও করতে পারেন। এই তো কাল সকালেই রাণুদি আমাদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেললেন।

সঞ্জয় বলল, ঐ রকমভাবে দিদি মাঝে মাঝেই বসে থাকে বলে মা আর ডাকেননি। হঠাৎ সন্ধের পর দেখলাম, দিদি নেই। তারপর থেকেই তো সবাই মিলে খুঁজছি—

আমরা পাহাড় দেখে এসে খুব গল্প করেছিলাম। রাণুদি তাই শুনে বলেছিলেন, ইস, তোমরা আমায় নিয়ে গেলে না? আমার খুব ইচ্ছে করে যেতে। আমায় কেউ কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না, আমি পাগল না! আমরা তক্ষুনি বলেছিলাম, আর একদিন আমরা রাণুদি আর সঞ্জয়দের সবাইকে নিয়ে ঐ পাহাড়ের ধারে পিকনিক করতে যাব।

রাণুদি এই অন্ধকারে একা একাই সেই পাহাড়ের দিকে চলে যাননি তো? অথবা প্রথম দিন যে দেখেছিলাম, দুপুরবেলা রাণুদি মাঠের মধ্যে একটা গাছে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই রকম এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে যদি কোথাও বসে থাকেন, তা হলে খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত।

কিন্তু রাণুদিকে পেতেই হবে। আমরা চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম।

আমার কাছে টর্চ নেই, শুধু চোখ দিয়েই যেন অন্ধকার ফুঁড়তে লাগলাম। অবশ্য খুব বেশি অন্ধকার ছিল না, পাতলা পাতলা জ্যোৎস্না ছিল আকাশে। সেই আলোতে অসুবিধেও হয় অনেক, ছোট ছোট গাছ বা পাথরের স্তূপকেও মানুষ বলে মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু ভয় ভয় করছিল। রাত্তিরবেলা একলা একলা মাঠের মধ্যে ঘোরা তো আমার অভ্যেস নেই। হঠাৎ এক একটা গাছ দেখে সন্দেহ হয়, এই গাছটা কি দিনের বেলা ছিল এখানে? অথবা অধিকাংশ

গাছকে ঘোমটা পরা বউ বলে মনে হয় কেন? এক এক সময় সত্যিই তাই মনে হয়। আমি থমকে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকি, রাণুদি! রাণুদি!

কেউ কোনো উত্তর দেয় না!

পরীক্ষার সময় যেমন ভগবানকে ডাকতে হয়, ঠিক সেই রকমই ব্যাকুলভাবে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে ভগবান, রাণুদিকে যেন আমি খুঁজে পাই। অন্য কেউ না, আমিই আগে রাণুদিকে দেখব।

ছুটতে ছুটতে কত দূর গিয়েছিলাম জানি না। এক সময় মনে হলো, এবার আমিই বুঝি রাস্তা হারিয়ে ফেলব।

আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না, অন্যরাই আগে রাণুদিকে খুঁজে পেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনলাম, পাওয়া গেছে। এই তো রাণুদি। তারপরই কয়েকটা জোরালো টর্চের আলো। আমিও দৌড়ে গেলাম সেদিকে।

রাস্তাটা যেখানে ছোট নদীটায় মিশে শেষ হয়ে গেছে, তার পাশে যে বড়ো পাথরটায় আমি একদিন এসে বসেছিলাম, ঠিক সেখানেই বসে আছেন রাণুদি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়, ঝুমা, আশু, উৎপল আর সতীশ নামে বড়োমামার এক কর্মচারী। এদের সকলের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যায় অজিতদাকে। তিনিই এখানে রাণুদিকে প্রথম দেখতে পেয়ে সঞ্জয়দের খবর দিয়েছেন। কাছেই অজিতদাদের বাড়ি।

অজিতদা একা এত রাত্তিরে একটি মেয়েকে ওখানে বসে থাকতে দেখে অনেকবার ডাকাডাকি করেছিলেন, রাণুদি কোনো উত্তর দেননি।

সঞ্জয় বলল, এই দিদি, ওঠো! এখানে বসে আছ কেন? মা চিন্তা করছেন।

রাণুদির যেন শ্রবণশক্তি নেই। দেহে প্রাণ আছে কি না তাতেই সন্দেহ জাগে, এমন স্তব্ধ নিশ্চল মূর্তি।

আমরা সবাই মিলে ডাকতে লাগলাম, সঞ্জয় ওর হাত ধরে টানতে লাগল, তবু কোনো হুঁশ নেই।

এই সময় অভিজিতের সঙ্গে রাণুদির মা-ও এসে পড়লেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে রাণুদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ও রাণু, রাণু! এ কী করছিস মা? এমনভাবে আমাদের চিন্তায় ফেলতে আছে?

রাণুদি এবার মুখ ফিরিয়ে খুব শান্তভাবে বলল, মা চুপ করো। ঐ দ্যাখো, ভগবান।

রাণুদি আঙুল দিয়ে একটা বুনো গাছ দেখালেন।

অমনি তিন-চারটি টর্চের আলো পড়ল সেই গাছটার ওপরে। কী আর দেখা যাবে, মাঠে কিংবা নদীর ধারে সাধারণ গাছ যেমন থাকে, সেই রকম একটা।

বাণুদির মা বললেন, তুই এখানে বসে আছিস কেন? চল, বাড়ি চল।

বাণুদি ঠিক সেই একই গলায় বললেন, ভগবান আমাকে ডেকে এনেছেন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

বড়োমামার শাগরেদ সতীশবাবু বললেন, বাণুদিদি তো ঠিকই বলছে। সব কিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন। যে-কোনো জীব, এমনকি গাছপালার মধ্যে।

বাণুদি বললেন, ভগবান আমার দিকে চেয়ে আছেন।

মা বললেন, ইস, মাথার চুল সব ভিজে। আজ তো বৃষ্টি হয়নি, তুই কোথাও চান করেছিস নাকি?

বাণুদি বললেন, মা তোমরা এসব কথা বলছ কেন? ভগবান আমায় ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না।

বাণুদির মা কেঁদে ফেললেন। সতীশবাবু বললেন, বাণুদিদি, ভগবান তো সব জায়গায় দেখতে পান। বাড়িতে গেলেও ভগবান তোমাকে দেখবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

বাণুদি বললেন, আমার একটা কী যেন জিনিস হারিয়ে গেছে, মনে করতে পারছি না। আমার কী হারিয়েছে তোমরা বলতে পারো?

অভিজিৎ বলল, দিদি তোমার কিছু হারায়নি তো।

বাণুদি বললেন, তোরা জানিস না, তোরা কেউ জানিস না, উঃ, মা, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি আর পারছি না।

অভিজিৎদা সতীশবাবুকে বললেন, ওকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত। ওর পক্ষে এখন বেশি কথা না বলাই বোধহয় ভালো।

বাণুদির মা, অভিজিৎ, সঞ্জয়, মামারা দু'পাশ থেকে বাণুদিকে জোর করে ওঠাবার চেষ্টা করল। আমরাও হাত লাগাবো কি না বুঝতে পারছিলাম না। আমরা একটাও কথা না চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাণুদি কান্না কান্না গলায় বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা। ভগবান রাগ করবেন।

এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। বাণুদি যে গাছটা দেখিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে সরসর করে একটা শব্দ হলো। অমনি সেই গাছটার ওপর আবার টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে একটা গিরগিটি। এরকম গিরগিটি এখানে খুবই দেখা যায়, এত লোকজন দেখে বেচারা খুবই ঘাবড়ে গিয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে।

বাণুদি সেদিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, ঐ যে, ঐ যে দ্যাখো, ঐ যে ভগবান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। এমনকি যে সতীশবাবু একটু আগে বললেন, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন, তিনিও না হেসে পারলেন না।

উৎপল বলল, একটা খাঁচা-টাঁচা থাকলে এক্ষুনি ভগবানকে ধরে ফেলা যেত।

আমাদের হাসি শুনেই বোধহয় রেগে গেলেন রাণুদি। হঠাৎ সকলের হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারলেন নদীটার ধার ঘেঁষে।

বেশিদূর যেতে পারলেন না অবশ্য, তার আগেই অজিতদা লম্বা লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ধরে ফেললেন ওকে। আমরাও ছুটে গিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু অজিতদার আগে পৌঁছোতে পারিনি।

অজিতদার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন রাণুদি। পারলেন না। অজিতদা ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, বাড়ি চলুন।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি...তুমি কে? তুমি কি সত্যময়ের ভাই?

অজিতদা বললেন, না, আমার নাম অজিত রায়। আপনি আমাকে চিনবেন না।

রাণুদি হঠাৎ আবার কেঁদে ফেললেন, আমার জিনিসটা তোমরা কেউ খুঁজে দেবে না, শুধু শুধু তোমরা আমায় কষ্ট দিচ্ছ কেন?

অজিতদা আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নিয়ে চলো।

আমরা রাণুদিকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে লাগলাম, অজিতদা শক্ত করে ধরে রইলেন এক হাত। রাণুদি ছটফটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না, আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে, ছেড়ে দাও।

সেই অবস্থাতেই আমরা জোর করে নিয়ে আসছিলাম, রাস্তার ওপর উঠে হঠাৎ রাণুদি আবার শান্ত হয়ে গেলেন। শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠেলছ কেন? আমি কি হাঁটতে পারি না? আমাকে নিজে নিজে যেতে দাও, প্লীজ।

আমরা রাণুদিকে ছেড়ে দিয়ে গোল করে ঘিরে রাখলাম। রাণুদি কিন্তু আর পালাবার চেষ্টা করলেন না। রাণুদি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের মাকে খুঁজে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরলেন। তারপর খুব কাতর গলায় বললেন, মা, আমি পারছি না, খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু এক এক সময়...মা আমি পাগল হতে চাই না, আমি পাগল হতে চাই না...

সে কথাটা শুনে আমারও কান্না পেয়ে গেল। রাণুদির তো কোনো দোষ নেই। ওদের বংশে কে একজন পাগল ছিল, সেই জন্য ওকেও পাগল হয়ে যেতে হবে?

এই কি ঈশ্বরের নিয়ম? তাহলে কী করে মানব যে ঈশ্বর বলে কিছু আছে?

বাকি রাস্তাটা রাণুদি নিজেই স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এলেন, আমরাও ফাঁক ফাঁক হয়ে গেলাম। খানিকবাদে একটা টাঙ্গার ঝমঝম আওয়াজ পেলাম। বড়োমামা ফিরে এসেছেন। থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ কেউ সঙ্গে আসেনি, তারা পরে যা হয় ব্যবস্থা নেবে বলেছে।

বড়োমামা খুব স্নেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল রাণু? কোথায় গিয়েছিলি?

রাণুদি বললেন, জানি না বড়োমামা, আমি কিছু জানি না।

—তুই আজ সন্ধেবেলা মায়ের প্রসাদও খাসনি। আয়—

সবাই মিলে গিয়ে বসলাম মন্দিরের সামনের চাতালে। রাণুদির মা আমাদের প্রসাদ দিতে লাগলেন। অজিতদাকে অবশ্য আর দেখতে পেলাম না। অজিতদা গেটের বাইরে থেকেই নিশ্চয়ই চলে গেছেন।

রাণুদির মাও খোঁজ করলেন অজিতদার। তিনি নেই দেখে আফসোস করে বললেন, চলে গেল? অনেক উপকার করেছে ছেলেটি। অতদূর...নদীর ধারে পাথরের আড়ালে বসেছিল রাণু...ঐ ছেলেটি না দেখলে সারা রাত ওকে খুঁজেই পাওয়া যেত না...কী যে হত।

আমরা সবাই অজিতদার কৃতিত্ব মেনে নিলাম। সত্যি, ওর জন্যই আজ রাণুদিকে ফিরে পাওয়া গেছে। কাল সকালেই একবার অজিতদাকে গিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে হবে।

রাণুদির মা বললেন, তোমরা চেনো ছেলেটিকে? ওকে একবার ডেকে এনো তো আমার কাছে।

রাণুদির মা বেশ শক্ত মহিলা। ওঁর এক মেয়ের তো এই অবস্থা, কয়েকদিন আগে অভিজিৎ জলে ডুবে গিয়েছিল—এসব সত্ত্বেও ওঁকে কখনো একেবারে ভেঙে পড়তে দেখিনি। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেন বটে, আবার একটু বাদেই নিজেকে সামলে নেন।

বড়োমামা ভেতর থেকে একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাণুদির পাশে এসে বললেন, একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে যে? দিই?

রাণুদি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানালেন।

বড়োমামা বললেন, এখানেই দেব, না ভেতরে গিয়ে শুবি?

—এখানেই দাও।

সেই ইঞ্জেকশানটা দেবার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই রাণুদির চোখ ঘুমে ঢুলে এল। তখন আমরাও চলে এলাম আমাদের বাড়িতে।

সারাদিন জসিডি-দেওঘরে ঘোরাঘুরি করেও আমরা একটুও ক্লান্ত হইনি, কিন্তু রাণুদিকে খোঁজাখুঁজি করার পর্বটার জন্যই আমরা যেন বেশ অবসন্ন বোধ করলুম। রাণুদির কথাটা ভাবলেই মনটা ভার হয়ে যায়।

রাণুদি হঠাৎ হঠাৎ এখানে সেখানে চলে যান। এরপর থেকে কি ওরা রাণুদিকে ঘরে আটকে রাখবে?

পরদিন সকালে অজিতদার বাড়ি আর যেতে হলো না আমাদের। অজিতদাই এসে হাজির হলেন। আমাদের তখন সদ্য ঘুম ভেঙেছে, পরীর ডাকাডাকি শুনে নিচে গিয়ে ওকে দেখতে পেলাম।

অজিতদা বললেন, তোমাদের কাছে একটু চিনি ধার করতে এলাম। আমার চিনি ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে চিনি এনে চা করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, সেই জন্য—

ভাস্কর বলল, আপনি আমাদের এখানেই চা খেয়ে যান না।

শুধু চা নয়। দেওঘর থেকে দু'বাক্স প্যাড়া এনেছিলাম আমরা। সেই প্যাড়াও জোর করে খাওয়ালাম ওকে। আমরা চারজনে যেন রীতিমত একটা সংসার চালাচ্ছি। কোন বেলা কী রান্না হবে, তা আমরাই বলে দিই। এমনকি, বাড়িতে অতিথি এলেও আমরা মিষ্টি খেতে দিতে পারি।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, আপনি কাল অন্ধকারের মধ্যে ঐ জায়গায় রাণুদিকে দেখতে পেলেন কী করে?

অজিতদা বললেন, রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর আমার খানিকক্ষণ বাইরে হাঁটা অভ্যেস। সেই হাঁটতে হাঁটতে ঐ কেন্ট নালাটার দিকে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনলাম কে যেন কাঁদছে বেশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাণুদি কাঁদছিলেন?

হ্যাঁ। আমি তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো আদিবাসী মেয়ে টেয়ে হবে। সেই বা কাঁদছে কেন জানার জন্য কৌতূহল হলো। তারপর শুনলাম, মেয়েটি ঐ নালাটা থেকে আঁজলা করে জল তুলে মাথায় দিচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে, আমার মাথা শান্ত করে দাও, হে ভগবান, আমি তো তোমার সব কথা শুনি, তবু কেন আমি পারি না পারি না। এসব শুনে খুবই অবাক হলাম। তখন আমি একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে? আপনি এখানে বসে আছেন কেন? ব্যস, আমি কথা বলা মাত্রই মেয়েটি একেবারে চুপ। আর আমি যত কথাই জিজ্ঞেস করি, কোনো উত্তর নেই। আমি বাড়ি ফিরেই যাচ্ছিলাম তবু মনে হলো, ভদ্রঘরের মেয়ে, ওখানে একা বসে থাকা ঠিক নয়, তারপর এদিক

গোলমাল শুনতে পেয়ে বুঝলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাস্কর বলল, রাণুদি কিন্তু এমনিতে খুব ভালো।

অজিতদা বললেন, হুঁ।

আশু বলল, রাণুদির মা আপনাকে একবার ও বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

উৎপল বলল, এখুনি চলুন না। একবার ঘুরে আসবেন।

আমি বললুম, সেই ভালো। রাণুদিকেও একবার দেখে আসা যাবে।

অজিতদা বললেন, অন্য এক সময় যাব। আমার একটু দরকার আছে, এখুনি একবার বেরুতে হবে।

ভাস্কর বলল, চলুন না, কতক্ষণ আর লাগবে?

অজিতদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাব। কাল রাত্তিরে ওর পর আর কোনো গণ্ডগোল করেনি তো মেয়েটি?

আমি বললাম, তারপরই তো ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো। সেইজন্য সকালবেলা একবার দেখতে যাব।

এই সময় সঞ্জয় এসে উপস্থিত হলো। ওর মা ওকে পাঠিয়েছেন। সকালবেলা ওদের বাড়িতে আমাদের সকলের জলখাবারের নেমন্তন্ন।

অজিতদাকে দেখে সঞ্জয় বলল, আপনিও চলুন!

অজিতদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, জলখাবারের কী কী আইটেম?

সঞ্জয় বলল, লুচি, আলুর দম আর মালপো।

অজিতদা বললেন, বাঃ, শুনলেই জিভে জল আসে, কিন্তু আমি ভাই এখন যেতে পারছি না যে, একবার জসিডি যেতেই হবে, ন'টা চল্লিশের ট্রেন...

অজিতদাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম সঞ্জয়দের বাড়িতে। শুনলাম, রাণুদি তখনো ঘুমোচ্ছেন।

রাণুদির বদলে ঝুমা আজ তুলছে পুজোর ফুল। ফুল তুলবার সময় বোধহয় শাড়ি পরতে হয়, কেন না, এর আগে কক্ষনো শাড়ি পরা অবস্থায় দেখিনি, সে স্ল্যাকস আর পাঞ্জাবি পরতে ভালোবাসে। শাড়ি পরে তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

ঝুমার সঙ্গে আমাদের ভাব হয়েছে এর মধ্যে, তবু এখনো একটু অহঙ্কারী অহঙ্কারী ভাবে তাকায়। যেন আমরা ওর তুলনায় ছেলেমানুষ। আমাদের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই ঝুমার সঙ্গে একটু বেশি আগ্রহ নিয়ে কথা বলে।

পুজো করার সময় বড়োমামার গায়ে একটা লাল চাদর জড়ানো থাকে। গম্ভীর গলায় সংস্কৃত মন্ত্র পড়ছেন আর এক হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। ইনিই আবার কাল ইঞ্জেকশান দিলেন রাণুদিকে। খুব সংকটের সময় ইনি কালীঠাকুরের চরণামৃতের বদলে ওষুধপত্রের ওপরই নির্ভর করেন।

বাগানে কুড়ি-পঁচিশজন দেহাতী নারী পুরুষ আছে। আজ শনিবার, আজ বড়োমামা বাইরের লোকদের ওষুধ দেন।

পুজো শেষ করেই বড়োমামা একটি সিগারেট ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে এক কাপ চা এনে দেওয়া হলো। আমাদের দেখে তিনি বেশ উৎফুল্লভাবে বললেন, এসে গেছ? আজ আর কোথাও বেড়াতে যাওনি বুঝি? আর যে কত দেখবার জায়গা বাকি রয়ে গেল।

ভাস্কর বলল, কাল গিরিডি ঘুরে আসব ঠিক করেছি।

বড়োমামা বললেন, বেশ তোমরা খাবার টাবার খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণ রুগী দেখে নিই।

বড়োমামা বাণদি সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না। কালকের রাত্তিরের ঘটনায় আমরা এখনো উত্তেজিত হয়ে আছি, ওর মধ্যে তার চিহ্ন নেই কোনো। এর আগেও, অভিজিৎ যেদিন জলে ডুবে গিয়েছিল, সেদিনই দুপুরের পর থেকে তিনি ঐ ঘটনা আর উল্লেখ করেননি একবারও। আমাদের কাছে এগুলো এক একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, বারবার মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। অবশ্য আমাদের জীবনে এসব অভিজ্ঞতা নতুন, বড়োমামা নিশ্চয়ই এরকম অনেক দেখেছেন। কি বা বয়স বাড়লে মানুষ সব কিছুকেই অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেয়?

বড়োমামা যখন রুগী দেখতে লাগলেন, আমরাও ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি বসলেন বাগানেই একটা চেয়ার টেবিল পেতে। কী দারুণ যত্ন করে উনি প্রত্যেকটি রুগীকে দেখেন। বিনা পয়সাতে যে কত আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব, কে জানত। প্রত্যেকটি রুগীকে প্রশ্ন করে করে তিনি ওদের নাড়ী নক্ষত্র জেনে নিচ্ছেন। ওদের কথা শুনছেন মন দিয়ে। কারুর কারুর হাতে ওষুধ তুলে দেবার পর বলছেন, আগের বারের মতন এবারও যদি শুনি তুই এক সঙ্গে সব কটা ওষুধ খেয়ে ফেলেছিস, তাহলে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেব।

বড়োমামা যেন এখন অন্য মানুষ। ইনিই ভক্তি করে কালীপুজো করেন। আবার কালীর সামনেই সিগারেট খান, ঘন্টার পর ঘন্টা তাস খেলে কাটান, আবার তিনিই এখন গরীব দুঃখী মানুষদের জন্য অন্তর ঢেলে দিচ্ছেন।

এক এক সময় আমার মনে হয়, একজন মানুষের মধ্যেই অনেকগুলো মানুষ থাকে।

দুপুরবেলা উৎপল যাবে বড়োমামার সঙ্গে তাস খেলতে। আমি যেতে চাইলাম না। ওরা কোনোদিনই আমাকে চান্স দেয় না, পাশে বসিয়ে রাখে। তার থেকে বাড়িতে শুয়ে থাকা ভালো।

উৎপল বলল, চল না, শুধু শুধু ঘুমিয়ে কাটাবি কেন দুপুরটা।

ভাস্কর বলল, ও বাড়িতে গিয়ে ঝুমার সঙ্গে প্রেম করতে পারিস, আমরা তো থাকব না, বেশ একা-একা।

আমি বললাম, আমায় খেলতে দে আর তুই ঝুমার সঙ্গে প্রেম কর গিয়ে।

উৎপল বলল, ধ্যাৎ! তুই এখনো ফোর ক্লাবস-এর পর কটা নো ট্রামপস ডাকতে হয় সেটাই শিখতে পারলি না, তোকে কেউ খেলতে নেয়!

আমি বললুম, আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ব, সেই ঢের ভালো। যা তোরা ঘুরে আয়।

দুপুরবেলা ঝুমা ওর নিজের ঘরে বসে পড়ে। দু-একবার সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছি, কিন্তু কেন জানি না, ও যেন আমাকেই বিশেষ করে পাত্তা দেয় না। আমার খুব রোগা চেহারা বলে? আশুর একটা ফুলপ্যান্ট আমি ধার করে পরছি, সেটাতে আমাকে যথেষ্ট ভালো দেখায় এখন।

যাই হোক, ওতে আমারও কিছু যায় আসে না। ওরকম উটিয়াল মেয়েদের আমিও পছন্দ করি না মোটেই।

ওরা চলে যাবার পর আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলাম। এত বড়ো বাড়িটাতে আমি এখন একা। এই কথাটা ভাবলেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হয়। কলকাতার তুলনায় এখানকার দুপুরগুলো কী অসম্ভব নিস্তব্ধ। এই বাড়িটা শহরের বাইরের দিকে বলে প্রায় একটাও গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। এখান থেকে টাঙ্গা ধরতে হলে প্রায় এক মাইল হেঁটে যেতে হয়।

এক কাক শুধু একটানা কা-কা করে ডেকে যাচ্ছে। সেই ইষ্টকুটুম পাখিটাকে যে প্রথম দিনই এসে দেখেছিলুম, তারপর আর একদিনও দেখতে পাই না। ওর কাজ কি শুধু অতিথি এসেছে কি না দেখে যাওয়া?

প্রায় ঘণ্টাখানেক বই পড়ার পর একটু ঝিমুনি এসে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ফাঁকা বাড়িতে একলা ঘুমিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। নিচের দরজাটা খোলা, যদি কোনো চোর-ফোর ঢুকে পড়ে?

উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসতেও আলস্য লাগছে।

এক সময় সিঁড়িতে ধুপধাপ করে পায়ের শব্দ হলো।

আমি প্রথমে একটু চমকে গেলেও, পরের মুহূর্তেই বুঝে গেলাম। কোনো বয়স্ক লোক এভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে না।

সঞ্জয় দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে বলল, নীলুদা, তুমি ঘুমোচ্ছ?

আমি বই মুড়ে রেখে বললাম, না। এসো।

—তবে যে ভাস্করদারা বলল, গিয়ে দেখবি নীলুদা ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে?

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। এবার অভিজিৎ।

সে বলল, তুমি তো জেগেই আছ। ব্যাডমিন্টনের সেটটা একটু দেবে, আমরা খেলব। তুমি খেলবে?

সঞ্জয় বলল, এই, তুই দিদিকে একলা রেখে এলি?

অভিজিৎ বলল, র‍্যাকেটগুলো তুই নিয়ে আয়। দেরি করছিস কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিদি? রাণুদি?

সঞ্জয় বলল, হ্যাঁ। মা বলেছেন, দিদিকে কখনো একলা ছাড়া হবে না, যেখানে যাবে, আমরাও যাব।

ব্যাডমিন্টনের নেটটা ওদের দেখিয়ে বললাম, চলো, নিয়ে চলো।

তরতর করে আমি চলে এলাম নিচে।

রাণুদি আমাদের বাড়ির সামনেই একটা গাদা ফুলের গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পরী ওকে তির্যকভাবে দেখছে।

রাণুদি আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, ওরা তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল বুঝি?

আমার সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ হলো। রাণুদি আজ ভালো মুডে আছেন। ওঁর মুখের একটা কথা শুনলেই বোঝা যায়, এখন আর কোনো গোলমাল হবে না।

অভিজিৎরা সব কিছু নিয়ে নেমে এসেছে।

একদিকে শুধু একটা বাঁশ পুঁততে হয়েছে, আর একদিকে বেশ সুবিধেমতন জায়গায় একটা পেয়ারা গাছ আছে। সেখানেই বেশ কায়দা করে নেটটা বাধা যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রাণুদি, আপনি খেলবেন?

রাণুদি বললেন, না! তোমরা খেলো। আমার একটু একটু মাথা ব্যথা করছে।

আমি তবু জোর করে বললুম, একটু খেলুন না, দেখবেন মাথা ব্যথা সেরে যাবে।

অনিচ্ছার সঙ্গে রাণুদি একটা র‍্যাকেট হাতে তুলে নিলেন। আমি আর সঞ্জয় একদিকে এসে দাঁড়ালাম। ওদিকে রাণুদি আর অভিজিৎ।

র‍্যাকেট চালানো দেখলেই বোঝা যায়, রাণুদি বেশ ভালোই খেলতে পারতেন। কিন্তু আজ মন নেই। একটু বাদেই বললেন, নাঃ তোমরা খেলো, আমি পারছি না।

কিছুক্ষণ আমি পেটাপেটি করলাম ওদের সঙ্গে। সঞ্জয় আর অভিজিৎ একদিকে আর আমি একলা। কিন্তু এসব কাচ্চাবাচ্চার সঙ্গে খেলে সুখ নেই। একটা চাপ তুলতে পারে না। ওরা ক্যারামে আমায় হারিয়ে দিতে পারে বটে কিন্তু

ব্যাডমিণ্টনে আমার তুলনায় পিঁপড়ে।

আমিও সবে দাঁড়িয়ে বললাম, এবার তোমরা দুজনে একটা গেম খেলো। আমি আসছি।

রাণুদি সেখানে নেই। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম, রাণুদি বাড়ির ভেতরে গেছেন। নিচের তলার ঘরগুলোয় উঁকি মেরে দোতলায় উঠে এলাম।

রাণুদি আমাদের ঘরের খাটে শুয়ে আছেন, চোখ বোজা, দু'আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আছেন কপালটা।

আমার পায়ের শব্দ শুনেই রাণুদি চোখ মেলে উঠে বসলেন।

আমি বললুম, শুয়ে থাকুন না! খুব বেশি মাথা ব্যথা করছে?

—হ্যাঁ।

আমি দুরুদুরু বক্ষে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার মাথা টিপে দেব!

রাণুদি একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, না!

খাট থেকে নেমে এসে বললেন, তোমরা যে আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে বলেছিলে? গেলে না?

—নিশ্চয়ই যাব। আপনি কবে যাবেন বলুন?

আমার খুব কাছে এসে, প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ এনে রাণুদি অদ্ভুত কাতর, শূন্য গলায় বললেন, জান, নীলু, মাথা ব্যথা করলেই আমার ভয় হয়। যদি আমি পাগল হয়ে যাই আবার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না, না, আপনার কিচ্ছু হবে না!

—আমায় এক বছর নার্সিং হোমে রেখেছিল। সেখানে যে আমার কী খারাপ লাগে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। ওরা আমায় খুব কষ্ট দেয়, জান? খারাপ কথা বলে। আমি বাবাকে বলেছিলাম, বাবা, তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে নার্সিংহোমে বন্দী করে রেখ না, আমি ভালো হয়ে যাব, কথা দিচ্ছি, ভালো হয়ে যাব।

—আপনি তো ভালোই হয়ে গেছেন রাণুদি।

—কাল রাত্তিরে যে আবার পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আচ্ছা নীলু, কাল কি আমি খুব বেশি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? খুব?

—না, না।

—তাহলে তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠেলছিলে কেন? পাগলকেই তো লোকে ওরকম করে।

এই কথার আর কী উত্তর দেব, আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

—কাল আমি একা একা কোথায় চলে গিয়েছিলাম। আমার কিছু মনে নেই। সেই জায়গাটা আমায় দেখাতে পারো?

—হ্যাঁ।

—চলো তো!

— অনেকটা দূরে কিন্তু। আপনি হাঁটতে পারবেন? আপনার মাথা ব্যথা করছে।

—মাথা ব্যথা করার সময় শুয়ে থাকলেই আমার বাড়ে।

—কোনো ওষুধ খাবেন না?

—আমার সব ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। তুমি যাবে?

নিচে এসে দেখি অভিজিৎ আর সঞ্জয় লাফিয়ে লাফিয়ে র‍্যাকেট ঘোরাচ্ছে। আমি বললুম, আমি একটু রাণুদিকে নিয়ে ঘুরে আসছি। তোমরা খেল। বৃষ্টি এলে সব ভেতরে তুলে দিও কিন্তু।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় খেলা থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকাল পরস্পরের দিকে। আমি বুঝতে পেরে বললাম, ভয় নেই, আমিই তো সঙ্গে যাচ্ছি। ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

তারপর ওদের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললাম, কাল রাত্তিরের সেই নদীটার কাছে যাচ্ছি। তোমরাও একটু বাদে ওদিকে চলে আসতে পারো।

রাণুদি ততক্ষণে গেটের কাছে চলে এসেছেন। আমি দৌড়ে এসে ওঁকে ধরে ফেললাম।

রাণুদি আজ পরে আছেন নীল রঙের একটা শাড়ি। ওঁর ফর্সা শরীরের সঙ্গে নীল রংটা বেশ মানায়। চুলগুলো সব খোলা। রাণুদিকে আমি কখনো খোঁপা বাঁধতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এই যে আমি রাণুদির পাশে হেঁটে যাচ্ছি, এতেই আমার অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে। এটা যে আমার দারুণ সৌভাগ্য।

আনন্দে মশগুল হয়ে আমি চুপচাপ ছিলাম। তারপর এক সময় মনে হলো, রাণুদিকে চুপচাপ থাকতে দেওয়া উচিত নয়। চুপ করে থাকাই তো রাণুদির প্রধান অসুখ। কথা বললেই রাণুদি ভালো হয়ে যাবেন।

—রাণুদি, আপনি কোন কলেজে পড়তেন?

—ব্রেবোর্ণে।

—তাই নাকি? আমার দু'জন মাসিও ওখানে পড়ে। আমার আর এক মাসির নামও রাণু। সে অবশ্য ইউনির্ভার্সিটিতে পড়ে এখন।

—আমিও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু আর পড়া হলো না...তখন থেকেই আমার বেশি মাথা খারাপ হলো, খুব ভীষণ পাগল হয়ে গেলাম।

—রাণুদি, ও কথা আর বলবেন না! আপনি তো এখন ভালো হয়ে গেছেন।

—আমি ভালো হয়ে যাইনি, নীলু! আমি জানি। কিন্তু আমি ভালো হতে চাই! জানো, ইউনিভার্সিটিতে একদিন আমি ক্লাসের মধ্যে এমন হয়ে গেলাম হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করলাম একদম স্যারের সামনে। বলেই রাণুদি ফিকফিক করে হাসতে আরম্ভ করলেন। আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, ভাবো তো, ক্লাসের মধ্যে কোনো ছাত্রী যদি নেচে ওঠে একেবারে ধেইধেই করে...সব ছেলেমেয়েরা দারুণ চ্যাঁচামেচি করতে লাগল...তারপর কী হয়েছিল আমার মনে নেই!—

—সে কতদিন আগেকার কথা?

—তিন বছর। তারপর ছ'মাস বাদে আমি আবার ভালো হয়ে গিয়েছিলাম। আবার ভাবলাম পড়ব, পরীক্ষা দেব ..হলো না, তিন মাস পরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম একদিন। যখন জ্ঞান হলো, নিজের নামটাও মনে করতে পারি না...আচ্ছা নীলু, তুমি আমার নাম জানো? বলো তো।

—আপনার নাম রাণু।

—ভালো নাম কী?

—তা তো জানি না।

—মাধুরী। মাধুরী সেনগুপ্ত। মনে রাখবে। আমার যদি হঠাৎ মনে হয়, আবার আমার নাম ভুলে যাচ্ছি, তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেব।

রাণুদির মুখে এসব কথা শুনলেই একটু ভয়-ভয় করে। আমি রাণুদিকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি, আমাকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে! বাবাঃ, নিজের নাম ভুলে যাওয়া কী সাঙ্ঘাতিক কথা। নিশ্চয়ই তখন রাণুদির খুব কষ্ট হয়েছিল।

খানিকটা দূর যাবার পর রাণুদি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে আমার সঙ্গে এলে, তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে।

—না, খারাপ লাগবে কেন?

—আমি তো পাগল, তোমার ভয় করে না? অনেকেই তো আমায় ভয় পায়।

—না রাণুদি! আমি আপনাকে একটুও ভয় পাই না। আমার খুব খুব ভালো লাগছে, আপনি বিশ্বাস করুন, দারুণ ভালো লাগছে।

রাণুদি ব্যাকুলভাবে বারবার বলতে লাগলেন, তোমার ভালো লাগছে, নীলু? সত্যি ভালো লাগছে? সত্যি?

এবার অদূরেই আমার সেই কদমগাছটা দেখতে পেলাম। আজও সেটা ফুলে ভরা। এই গাছ ভর্তি সমস্ত ফুল আমার। আমি সব রাণুদিকে দিয়ে দিতে পারি।

রাণুদি দৌড়ে জলের কাছে নেমে গেলেন। আজ যেন একটু বেশি জল এই

নদীটায়। তবে সেইরকমই স্বচ্ছ জল, ভেতরে কয়েকটা পুঁচকে পুঁচকে মাছ দেখতে পাচ্ছি।

—ঐ যে ঐ পাথরটা, ওখানে আপনি বসেছিলেন।

রাণুদি পাথরটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাত্তিরবেলা ওখানে কোনো মানুষ বসে থাকলে রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া খুবই শক্ত।

—আমার কিচ্ছু মনে নেই, নীলু। মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা আমি আগে কখনো দেখিই নি। আমি একটু বসব এখানে?

—হ্যাঁ, বসুন না!

—বসলে...আমি যদি আবার পাগল হয়ে যাই?

—আঃ, রাণুদি, ও কথা বলবেন না। আপনি তো ভালো হয়ে গেছেন।

রাণুদি পাথরটার ওপর বসলেন পা ঝুলিয়ে। লাল রঙের চটি জোড়া ছুড়ে দিলেন এক পাশে, তারপর জলে পা ডোবালেন। পাথরের কাছেই যে জলের ঘূর্ণিটা, সেটা যেন রাণুদির পা দুখানি নিয়ে খেলা করতে লাগল খুব খুশি হয়ে।

আমিও রাণুদির কাছেই বালির ওপর বসে জলের মধ্যে পা রাখলুম।

—আমি এখানে বসে কী করছিলুম নীলু?

—আপনি চুপ করে বসেছিলেন শুধু। আপনি বলেছিলেন, ভগবান আপনাকে এখানে ডেকে এনেছেন।

—সত্যি বলেছিলাম?

—হ্যাঁ।

—কী জানি। আমি যখন পাগল হয়ে যাই, তখন বোধহয় দেখতে পাই ভগবানকে। এমনিতে অন্য সময় তো পাই না। অন্য সময় কিচ্ছু মনে হয় না।

—আপনি আর একটাও মজার কথা বলেছিলেন। এই যে গাছটা এখানে একটা গিরগিটি বসেছিল, আপনি সেটাকে দেখিয়ে বললেন, ঐ যে ভগবান।

নদীর স্রোতের মতনই কুলুকুল শব্দে হেসে উঠলেন রাণুদি। হাসতে হাসতেই বলতে লাগলেন একটা গিরগিটিকে...এমা...একটা গিরগিটি ভগবান! পাগল হলে মানুষ কত অদ্ভুত কথা বলে! নীলু, তুমি আগে কোনো পাগল দেখেছ?

—না।

—আমিও দেখিনি। মানে, রাস্তায় দেখেছি, কিন্তু চেনাশুনো কারুকে দেখিনি...শেষে কিনা আমি নিজেই পাগল হলাম! আমি বুঝতে পারি, জানো, এক এক সময় আমি আগে থেকেই টের পাই যে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন একটা ঝড় ওঠে...বাইরের সব শব্দ একটু একটু করে মুছে যায়, সেই ঝড়ের শব্দ ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাই না...আমি চেষ্টা করি, ভীষণভাবে চেষ্টা

করি নিজেকে সামলাবার, আমার তখন সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হয়।

রাণুদি দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর শরীর। একটু বাদে যখন হাত সরালেন, ওঁর দু'চোখে তখনো জল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন।

আমার বুকটা যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। আমি কি কিছুতেই রাণুদির দুঃখ দূর করতে পারি না? একটা যদি কোনো মন্ত্র পেতাম, সেই মন্ত্রের জোরে আমি দুনিয়ার সব মানুষের দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারতাম যদি।

সেরকম কোনো মন্ত্র আমি জানি না, কিন্তু তার বদলে আর কী দিয়ে আমি রাণুদির মন ভোলাতে পারি? এই নদীটা আমি দিতে পারি রাণুদিকে, এই আকাশ।

—রাণুদি, আপনি কদম ফুল ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ। আমি সব ফুল ভালোবাসি।

—দাঁড়ান, আমি আসছি।

দৌড়ে গিয়ে কদমগাছটায় চড়ে বসলাম। বেশি তাড়াহুড়োতে একটা পাতলা ডালে পা দিতেই সেটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল, আমি পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। গাছটাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, নিই? তোমার থেকে ফুল নিই? ফুল তো পরের জন্যই। তোমার ফুলের এর চেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার হতে পারে না।

প্রায় কুড়ি পঁচিশটা ফুল ছিঁড়ে এনে ফেলে দিলাম রাণুদির কোলের ওপর।

রাণুদি খুব খুশি হয়ে বললেন, এত?

তখনই রাণুদিকে মনে হলো দেবীর মতন। আমি যেন রাণুদিকে পুজো করছি। রোদ্দুরের একটা রেখা এসে পড়েছে রাণুদির পিঠের ওপর ছড়ানো কালো কুচকুচে চুলে। রাণুদির বিষাদমাখা চোখ দুটিতে সদ্য খুশির ঝলক। নিটোল চিবুকটা নুইয়ে রাণুদি ফুলগুলোর গন্ধ নিচ্ছেন, রাণুদির বুক, কোমর ও উরুতে যেন মাধুর্যের চুম্বক বসানো, নগ্ন পা দুটি খেলা করছে জলে। আমার ইচ্ছে হলো, রাণুদির পা দুটি আমার বুকে জড়িয়ে ধরি।

আমি টের পেলাম, আমার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমি এক পলকের জন্য পোশাকের নিচে রাণুদির আসল শরীরটা মনশ্চক্ষে দেখে নিলাম, রাণুদি যেন সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে বসে আছেন ঐ পাথরটার ওপর। আমার নিশ্বাস গরম হয়ে গেল।

রাণুদি নিশ্চয়ই আমাকে ভাবছেন একটা বাচ্চা ছেলে। কিন্তু আমি তখন রাণুদিকে মনে মনে সব জায়গায় দারুণভাবে আদর করছি। আর মনে মনেই বারবার বলছি, রাণুদি, আমি তোমায় ভালোবাসি, ভীষণ ভালোবাসি, কত

ভালোবাসি তুমি জানো না।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, আমায় তোমার মনে থাকবে? নাকি কলকাতায় গিয়েই ভুলে যাবে?

—আপনাকে কোনোদিন ভুলব না, রাণুদি।

—কিন্তু আমি যদি তোমায় ভুলে যাই? কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি, আমার অনেক কিছুই মনে থাকে না..তোমার সঙ্গে এসে কিন্তু আমার মাথার ব্যথাটা অনেকটা কমে গেল।

রাণুদি একটা ফুল ছুঁড়ে দিলেন জলে। সেটা দুলতে দুলতে ভেসে চলল। আমরা দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুই না, জল দিয়ে একটা ফুল ভেসে যাচ্ছে—অথচ এক এক সময় তা দেখতেই কত ভালো লাগে।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, এই ফুলটা কোথায় যাবে? অনেক দূর, তাই না? যেখানে এই নদীটা গিয়ে মিশেছে...আমরা তো ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখতে পারি, এই নদীটা কোথায় গেছে। যাবে, নীলু?

—হ্যাঁ চলুন।

—এই নদীটা নিশ্চয়ই অন্য আর একটা নদীর সঙ্গে মিশেছে। আমরা কোনদিকে যাব, নদীটা যেখান থেকে জন্মেছে, সেদিকে, না নদীটা যেখানে গিয়ে পড়েছে?

—যেদিকে আপনার ইচ্ছে!

—কিন্তু কোনটা কোনদিকে আমরা বুঝব কী করে?

—যেদিকে স্রোত, সেইদিকে যাই চলুন।

—না, আমি স্রোতের উল্টো দিকে যাব!

ঠিক যেন একটা বাচ্চা মেয়ের মতন আবদার করা গলায় রাণুদি বললেন, এই কথাটা। তারপর হেসে উঠলেন। আবার বললেন, আমি তো পাগল, তাই সব সময় উল্টো কথা বলি।

রাণুদির মুখে 'পাগল' শব্দটা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না।

রাণুদি পাথর থেকে নেমে জলের ওপর দাঁড়ালেন। শাড়ির পাড়টা ভিজে যাচ্ছে বলে একটু উঁচু করলেন শাড়িটা। গোড়ালি থেকে এক বিঘৎ ওপরে। ঠিক মাখন দিয়ে তৈরি রাণুদির পা। ইচ্ছে করে, জিভ দিয়ে চাটি।

রাণুদি আমার কাধে একটা হাত রেখে বললেন, চলো, আমরা জলের ভেতর দিয়েই যাব কিন্তু।

রাণুদি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন ভেবে কাঁধে হাত রাখলেন খুব অনায়াসে। কিন্তু উনি জানেন না যে, যেখানে ওঁর হাতটা ছুঁয়েছে, আমার কাঁধের

সেই জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল। আমি রাণুদির শরীরের গন্ধ পাচ্ছি। আমার দুর্দান্ত ইচ্ছে করছে, রাণুদির বুকে আমার মাথাটা পাগলের মতন ঘষি।

কিন্তু আমাদের নদীর উৎস বা মোহনা দেখতে যাওয়া হলো না। দূরে দেখলাম, সঞ্জয় আর অভিজিৎ ছুটে আসছে।

ওরা কোনো খবর আনছে ভেবে আমি থমকে দাঁড়ালাম। না, কোনো খবর নেই, অনেকক্ষণ ব্যাডমিন্টন খেলার পর হঠাৎ কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছে ওদের।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অভিজিৎ বলল, বিকেল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাড়ি যাবে না। চা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, দিদিকে মা খুঁজবে।

রাণুদি বললেন, না, এখন যাব না। তোরা যা।

ওরা দু'জনেই জলের মধ্যে নেমে এল। সঞ্জয় বলল, এই নীলুদা, মা কিন্তু রাগ করবে।

আমি বললাম, রাণুদি, তা হলে আজ বাড়িই চলুন।

—না।

রাণুদি একা একাই এগিয়ে গেলেন খানিকটা। অভিজিৎ আর সঞ্জয় দু'জনে দু'দিক থেকে রাণুদির হাত চেপে ধরে বলল, এই দিদি।

—বলছি না যাব না!

রাণুদি ওদের এমন জোর ঠেলে দিলেন যে বেচারা দু'জন জলে পড়ে জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলল।

রাণুদির চোখ বিস্ফারিত, শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। অসম্ভব রাগী ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি রাণুদিকে ধরতে সাহস পেলাম না।

রাণুদি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই যাবি না আমার সঙ্গে?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সঞ্জয় আর অভিজিৎ জল থেকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাণুদির এরকম চেহারা আমি আগে দেখিনি। ওর পাগলামি মানে তো শুধু চুপ করে থাকা।

একটুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু রাণুদি আবার সহজ হয়ে গেলেন। খুব বিস্মিতভাবে দুই ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তোরা ভিজে গেলি কী করে?

সঞ্জয় মিনমিন করে বলল, দিদি, বাড়ি চলো।

রাণুদি বললেন, চল, বাড়ি যাচ্ছি! তোরা বড্ড ইয়ে, জল দেখলেই অমনি জল ঘাঁটতে হবে! নীলুকে দ্যাখ তো, কীরকম প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে।

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জল থেকে ওপরে উঠে এসে রাণুদি বললেন, আমরা অনেকক্ষণ এখানে বসে আছি, তাই না? ইস, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। চল, চল বাড়ি চল।

তারপর আমার দিকে চোখ কুঁচকে একটা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করে হাসিমুখে বললেন, আমরা চুপি চুপি, আর একদিন...এই নদীটা দেখতে...

তারপর কদমগাছটার কাছে এসে বললেন, আমায় এই গাছটা থেকে ফুল পেড়ে দিয়েছিলে? রোজ আমাকে কদম ফুল দেবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

অভিজিৎ বলল, আমিও গাছে উঠতে পারি।

রাণুদি বললেন, তুই গাছে উঠবি না। নীলু এনে দেবে, ও তোর চেয়ে বড়ো।

আমি বললাম, তা ছাড়া আমার এটা নিজস্ব গাছ।

রাণুদি হেসে ফেলে বললেন, তাই নাকি? ওমা, তোমার নিজস্ব গাছ আছে? আমার নেই কেন! আমার নিজস্ব কোনো জিনিসই নেই। আমার ছিল, আগে অনেক ছিল, কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। আমার কী কী হারিয়েছে জানিস, খোকন, মিন্টু।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় আমার দিকে তাকাল। রাণুদি মুখটা কুঁচকে ফেললেন। মনে হলো, তিনি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন।

আমার দিকে চেয়ে আবার স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নীলু, সত্যি করে বলো তো, কাল রাত্তিরে যে পাথরটায় বসেছিলাম, আজ তো আবার সেই পাথরটাতেই আমি বসলাম, তাহলে আজও কি আমি কোনো পাগলামি করেছি?

—না, একটুও না।

—আমার মনে পড়ছে না। সত্যি করে বলো।

—সত্যি বলছি, আপনি খুব ভালো আছেন।

রাণুদি যেন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, তাহলে চলো।

একটুখানি গিয়ে অজিতদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। উনি বোধহয় ফিরছিলেন স্টেশন থেকে। আমাদের দেখে নিজের বাড়ির গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালেন।

সঞ্জয় বলল, ঐ তো অজিতদা।

অজিতদা হাত তুলে নমস্কার করলেন রাণুদিকে।

রাণুদি বললেন, আমার নাম মাধুরী সেনগুপ্ত। এরা আমার ভাই। বোঝাই যাচ্ছে, কাল রাত্রে অজিতদাকে যে দেখেছেন, তা রাণুদির মনে নেই।

অজিতদাও নিজের নাম বললেন।

রাণুদি বললেন, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

অজিতদা মৃদু হেসে বললেন, তা হতে পারে। আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তো আমি প্রায়ই যাই।

—আপনি কি সত্যময়ের ভাই?

—না। আমার কোনো দাদা নেই। সত্যময় বলে তো কারুকে আমি চিনি না।

—আমাদের সঙ্গে সত্যময় বলে একজন পড়ত, খুব চেহারার মিল আপনার সঙ্গে। এই রকম ছোট ছোট দাড়ি...এই বাড়িটা আপনার?

—আমি এই বাড়িতে থাকি। আসুন না, ভেতরে এসে একটু বসবেন? তোমরাও এসো।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু মা চিন্তা করবেন যে। মা বিকেলে বাড়ি ফিরতে বলেছেন।

রাণুদি বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই মা আমাকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে বারণ করেছেন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেলে...বাঃ আপনার বাগানে তো অনেক ফুল।

—আসুন না, একটু বসে চা খেয়ে যাবেন, কতক্ষণ আর লাগবে।

সঞ্জয় বলল, আমি এক কাজ করি। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি, মাকে খবর দিয়ে দেব।

সেটাই খুব ভালো ব্যবস্থা। সঞ্জয় দৌড়ে চলে গেল।

অজিতদা গেট খুলে দিলেন। সেখানে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে রাণুদি হাসতে হাসতে বললেন, আপনি জানেন, আমি পাগল?

অজিতদাও হেসে বললেন, আমি এমন ওষুধ জানি, যাতে সব পাগলামি সেরে যায়।

সেই গেট পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রাণুদির জীবনে একটা নতুন পর্ব শুরু হলো।

৬

অজিতদা আর রাণুদির প্রেমের মতন, এমন প্রবল, প্রচণ্ড প্রেম আর কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ। দু-তিন দিনের মধ্যেই এমন হলো যে কেউ কারুকে যেন এক নিমেষের জন্যও দৃষ্টি-ছাড়া করতে পারে না। অবশ্য টানটা রাণুদির দিক থেকেই যেন বেশি। রাণুদির এ এক নতুন পাগলামি।

ঘুম থেকে উঠেই রাণুদি জিজ্ঞেস করেন, অজিত কোথায়?

অজিতদা থাকেন একা। একজন লোক ওর বাড়িতে রান্না করে দেয়। সেখানে রাণুদির সব সময় যাওয়াটা ভালো দেখায় না বলে রাণুদির মা অজিতদাকে ডেকে পাঠান তাঁদের বাড়িতে। রাণুদির কোনো ইচ্ছেতে বাধা দেওয়া যায় না।

অজিতদা যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়ির আগের মালিককে চিনতেন বড়োমামা। বছরখানেক হলো বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন মালিককে বড়োমামা দেখেননি। অজিতদার জামাইবাবু কিনেছেন, কিন্তু তিনি এর মধ্যে আসেননি একবারও। অজিতদারা দিল্লির লোক, সেখানে অজিতদা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়ে তিনি জামাইবাবুর নতুন বাড়িটায় থেকে যাবার জন্য এসেছেন। সেই সঙ্গে বাগান-টাগানগুলো পরিষ্কার আর কিছু কিছু সারানোর কাজও করে যাবেন।

অজিতদার ব্যবহারও খুব ভদ্র। রাণুদির সঙ্গে তিনি এমনভাবে মেশেন যাতে কোনোক্রমেই রাণুদির মনে আঘাত না লাগে। অজিতদার সঙ্গে থাকলে রাণুদি একদম ভালো হয়ে যান।

আমাদের বাড়িটাই হয়ে গেল কেন্দ্রস্থল।

রাণুদির মা আর কোনো ব্যাপারে আপত্তি না করলেও রাণুদিকে তিনি একা-একা অজিতদার বাড়িতে পাঠাতে চান না। কখনো রাণুদি নিজে থেকে যেতে চাইলেও তখন সঞ্জয় আর অভিজিৎ সঙ্গে যাবেই। এদিকে রাণুদিদের বাড়িতেও অজিতদা রাণুদির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে অস্বস্তি বোধ করেন।

সেইজন্যই আমাদের বাড়িটা বেছে নেওয়া হয়েছে। একতলার বসবার ঘরে কিংবা বাগানের বেঞ্চে ওদের দু'জনকে সারাদিনের প্রায় যে-কোনো সময়েই দেখতে পাওয়া যাবে। আগে যেমন রাণুদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতেন এক জায়গায়, এখন ঠিক সেইরকমই তার চেয়েও বেশি সময় গল্প করেন অজিতদার সঙ্গে। কী যে অত গল্প কে জানে।

সঞ্জয় আর অভিজিৎও খেলতে আসে আমাদের বাড়িতে। এমনকি, দিদিকে পাহারা দেবার জন্যই কি-না কে জানে, ঝুমাও আসতে শুরু করেছে। ঝুমা ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসে। ক'দিন ধরেই আকাশ পরিষ্কার। আমরা ব্যাডমিন্টনের একটা টুর্নামেন্ট শুরু করে দিয়েছি।

এক এক সময় অজিতদা আর রাণুদিও এসে যোগ দেন আমাদের খেলায়। ওরা দু'জন পার্টনার। তখন পাশাপাশি দু'জনকে চমৎকার মানায়। অজিতদা বেশ লম্বা আর চমৎকার শরীরের গড়ন, মুখে অল্প অল্প দাড়ির জন্য ওকে দেখায় বেশ সিনেমার নায়কের মতন। আর রাণুদির তো রূপের কোনো তুলনাই নেই। বিশেষত, রাণুদির মুখখানা যখন হাসি মাখানো থাকে, তখন রাণুদিকে ঠিক কোনো স্বর্গের দেবী বলেই মনে হয়।

ভাস্কর আমাদের দলের নেতা হিসেবে খানিকটা ভারিক্কি ধরনের। ওর সঙ্গে সঞ্জয়দের বড়োমামা অনেক কিছু আলোচনা করেন। ভাস্করের মুখ থেকে আমরা

অনেক খবর পেয়ে যাই।

অজিতদা আর রাণুদির এমন উদ্দাম মেলামেশা নিয়ে ও বাড়িতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। বড়োমামাই রাণুদির মাকে বুঝিয়েছেন যে রাণুদির ওপর এখন জোর করা ঠিক হবে না। তাতে ফল আরো খারাপ হতে পারে। গত তিন-চার দিন যে একবারও রাণুদির ব্যবহারে কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি, সেটা ভালো লক্ষণ।

এর আগে অনেকবারই ওঁরা রাণুদির বিয়ের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বিয়ে না দেবারই পরামর্শ দিয়েছেন ওদের। মেয়ে পাগল জানলে কেউ জেনে-শুনে বিয়ে করবে না। আবার না জানিয়ে, এই ব্যাপারটা গোপন করে বিয়ে দিলে তার ফল খুবই খারাপ হতে পারে। তা ছাড়া রাণুদির মা বলেছেন, আমি যার তার হাতে আমার মেয়েকে দেব না, তার চেয়ে বরং সারা জীবন ও আমার কাছেই থাকবে।

ভাস্করের কাছ থেকে আমরা আর একটা খবরও পেলাম। রাণুদির মা একদিন অজিতদাকে আলাদা ডেকে কয়েকটা কথা বলেছেন, সে কথা ভাস্কর শুনে ফেলেছে।

দৃশ্যটি এরকম।

অজিতদা আর রাণুদি বসেছিলেন ওদের বাড়ির বাগানে একটা বেঞ্চের ওপর। সন্ধেবেলা। এক সময় রাণুদি, 'একটু আসছি' বলে উঠে গিয়েছিলেন বাড়ির ভেতরে, খুব সম্ভবত বাথরুম-টাথরুম করবার জন্য। সেই সময় রাণুদির মা তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন অজিতদার কাছে।

রাণুদির মা বলেছিলেন, বাবা অজিত, তোমাকে দু একটা কথা বলব?

অজিতদা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বলেছিল, হ্যাঁ, বলুন, মাসিমা!

রাণুদির মা বললেন, বসো, তুমি বসো। রাণু তোমাকে খুব পছন্দ করে, তা দেখে আমার খুব ভালো লাগে। রাণু তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকে, খুব ভালো থাকে, ক'দিন ধরেই খুব ভালো আছে, এজন্য আমি যে কী শান্তি পেয়েছি, তা তোমাকে কী বলব! তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ।

অজিতদা বললেন, আমার মনে হয়, ও পুরোপুরিই ভালো হয়ে যাবে।

—তা যদি হয় তো তার থেকে আনন্দের তো আর কিছু নেই। দেখেছ তো মেয়েটা এমনিতে কত ভালো, ওর মনে কত দয়ামায়া, তোমাকে একটা কথা বলি, মেয়েটা খুব সরল, অনেক কিছুই বোঝে না, তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি দেখো, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

—আমি ওর ক্ষতি করব?

—সে কথা বলছি না। আমরা বড়ো দুঃখী, এ মেয়েটার জন্য আমার এক মুহূর্ত শান্তি নেই, তাই বলছি, তুমি পুরুষমানুষ, দুদিন পর ছুটি ফুরোলে তোমাকে তো চলে যেতেই হবে, শুধু দেখো, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়, ও তো কিছুই বোঝে না।

অজিতদা তখন রাণুদির মায়ের পা ছুঁয়ে বলেছে, মাসিমা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা ওর তো কোনো ক্ষতি হবেই না, বরং আমি রাণুর ভার নিতে চাই, আমার কাছে ও ভালো থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রাণু আমার কাছে কোনো দিন কষ্ট পাবে না।

ভাস্কর খুব কাছাকাছি থেকে এটা দেখেছে ও শুনেছে। এই ঘটনা জেনে অজিতদার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মন ভরে যায়। রাণুদির জীবনে যে হঠাৎ এই পরিবর্তন আসবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রাণুদির বাবা প্রত্যেক শনিবার আসেন শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখিনি। তিনি আগের শনিবার আসেননি, টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে আগামী সপ্তাহেও আসতে পারবেন না। উনি এলে আমরা সবাই এক সঙ্গে একদিন গিরিডি যাব ঠিক করেছিলাম। এবার ঠিক হলো, আমরা নিজেরাই যাব। অজিতদাও যেতে রাজি হয়েছেন, তার মানে রাণুদিও যাবেন।

রাত্তির বেলা খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পরও রাণুদি আর অজিতদা বাগানে হাত ধরে বেড়ান। আমি ছাদ থেকে দেখতে পাই, চাঁদের আলোয় ওদের সামান্য ছায়া পড়েছে, সেই ছায়া সঙ্গে নিয়ে ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন। আমার একটুও ঈর্ষা হয় না। আমি রাণুদিকে ভালোবাসি। রাণুদি সুখী হয়েছেন বলেই আমার মনটা সর্বক্ষণ আনন্দে ভরে থাকে। অজিতদার প্রতি আমি সাঙ্ঘাতিক কৃতজ্ঞ বোধ করি।

বড়োমামা রাত্তিরের দিকে আজকাল আমাদের বাড়িতেই তাস খেলতে আসেন। ইচ্ছে করেই আসেন বোঝা যায়। খেলা ভাঙলে তিনি বাগানে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, রাণু, এবার বাড়ি চল মা, ঘুম পায়নি?

রাণুদি বলেন, চলো বড়োমামা, যাচ্ছি।

আজও তিনি অজিতদাকে ছাড়বেন না। অজিতদাও ওদের সঙ্গে রাণুদিদের বাড়িতে যাবেন। তারপর অজিতদা একটুক্ষণ গল্প করবেন বড়োমামার সঙ্গে। তারপর রাণুদি শুয়ে পড়লে, অজিতদা তাঁর ঘরে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে মিষ্টি করে বলবেন, এবার ঘুমোও রাণু। আমি আবার কাল সকালেই আসব।

এর আগে, প্রত্যেক রাতে রাণুদিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হতো। এখন অজিতদার স্পর্শই রাণুদির ঘুমের ওষুধ।

অজিতদা দারুণ গল্প করতে পারেন। খুব জমিয়ে দিলেন ট্রেনের কামরায়।

অজিতদার শখ হচ্ছে খুঁজে খুঁজে নানান সাধু-সন্ন্যাসী বার করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা। এইজন্য তিনি হরিদ্বার লছমনঝোলা থেকে শুরু করে কাশী, উজ্জয়িনী এইসব জায়গাতেও ঘুরেছেন। কতরকম অভিজ্ঞতা। সেই সব গল্প শুনতে শুনতে ট্রেনের পথটা যে কখন পার হয়ে গেল, খেয়ালই করিনি।

রাণুদির মাকেও আমরা সঙ্গে এনেছি। উনি অবশ্য আসতে চাইছিলেন না, আগে দু-তিনবার গিরিডি ঘুরেছেন, কিন্তু রাণুদিই জোর করে বলেছিলেন, চলো মা, চলো, চলো।

রাণুদি মাকে খুব ভালোবাসেন। তার এমন খুশির সময় রাণুদি মাকেও ছাড়তে চান না। অজিতদাও বলেছেন, হ্যাঁ, আপনিও চলুন, মাসিমা। সবাই যাচ্ছি, আপনি কেন একলা থাকবেন।

বড়োমামা অবশ্য আসেননি, ওঁর পুজো আছে। তিনি সতীশবাবুকে পাঠিয়েছেন সব কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য। এই বেড়ানোটা আমাদের অন্যরকম হলো। অনেকটা যেন বাড়ি বাড়ি মতন, মা মাসি-পিসিদের সঙ্গে।

গিরিডি থেকে উশ্রী ফলস দেখতে যাবার জন্য টাঙ্গা ভাড়া করা হলো তিনখানা। একটা টাঙ্গায় শুধু অজিতদা আর রাণুদি, ওদেরটাই চলল আগে আগে। যেন দুই দেশের রাজকুমার ও রাজকুমারী, আমরা সবাই ওদের অনুচর। আমরা শুনলাম, ঐ টাঙ্গা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। আগে কক্ষনো রাণুদির গান শুনিনি।

ঝুমা বলল, দিদি এক সময় খুব ভালো গান গাইত!

রাণুদির মা বললেন, কত বছর বাদে ও গাইছে বল তো? অন্তত [illegible] বছর না?

বলতে বলতেই ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

উশ্রী ফলসে গিয়ে রাণুদি আমাদের সঙ্গে কোরাসে গাইলেন অনেকগুলো গান। সব ব্যাপারেই রাণুদির দারুণ উৎসাহ। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হুটোপুটি দৌড়োদৌড়ি করছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন রাণুদিকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এ এক অন্যরকম রাণুদি।

জায়গাটায় বেশ ভিড়। আমাদের রবিবারের বদলে অন্য কোনো একদিন আসা উচিত ছিল। কয়েকটা ছেলে জলপ্রপাতের ওপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নিচে। দেখলে ভয় করে। জল যেন টগবগ করে ফুটছে সেখানে, তবু তারই মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ছেলেগুলো সাঁতার কেটে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। ইস, এখনো আমার সাঁতারটা শেখা হলো না!

রাণুদি অজিতদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওরকম পারবে?

অজিতদা হেসে বললেন, তা পারব বোধহয়।

সঙ্গে সঙ্গে অজিতদা জামার বোতাম খুলতে লাগলেন। অজিতদা সুইমিং ট্রাঙ্ক পরেই এসেছিলেন. প্যাণ্ট আর শার্ট খুলে ফেলার পর তার মেদহীন শরীরটা যেন ঝকঝক করে উঠল। তিনি জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন।

তখন মত পাল্টে ফেললেন রাণুদি। তিনি এসে অজিতদার হাত ধরে বললেন, না, তোমাকে লাফাতে হবে না, তুমি নিচে গিয়ে সাঁতার কাটো।

অজিতদা বললেন, তা কখনো হয়...তুমি বললে, এখন যদি না লাফাই, তুমি ভাববে. আমি পারব না।

রাণুদি বললেন, না, আমি তা ভাবব না। আমি জানি, তুমি পারবে।

রাণুদির মা-ও এসে বললেন, না, না, এত উঁচু থেকে লাফাবার দরকার নেই বাপু। দেখলেই ভয় লাগে।

অজিতদা বললেন, কোনো ভয় নেই, মাসিমা। আমার অভ্যেস আছে।

রাণুদি চেঁচিয়ে উঠলেন, না।

তার আগেই অজিতদা লাফিয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ, নায়কদেরই এইরকম মানায়। অত ওপর থেকে ঠিক যেন পাখির মতন উড়ে অজিতদা গিয়ে পড়লেন নিচের উত্তাল জলের মধ্যে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেলেন একেবারে, তারপরই মাথা ঝাঁকিয়ে তাকালেন ওপরে।

রাণুদির মুখখানা নিভে গিয়েছিল, আবার আলো জ্বলে উঠল। রাণুদি তরতরিয়ে দৌড়ে চলে গেল নিচের দিকে।

ভাস্কর বলল. আমিও এখান থেকে লাফাতে পারি।

আশু ওর কাঁধে হাত রেখে গম্ভীরভাবে বলল, না, দরকার নেই। চল, নিচে চল। ভাস্কর তবু লাফাতে চাইছিল, আশু ওকে টেনে নিয়ে গেল জোর করে।

আশু কেন ভাস্করকে বারণ করল, তা বুঝতে আমার একটু অসুবিধে হলো না। এইমাত্র অজিতদা লাফিয়ে পড়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এখন ভাস্করও সেইরকম লাফালে ঐ কৃতিত্বটা অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে। আমার সন্দেহ হলো, আশুও বোধহয় লাফাতে পারে।

ওরা সবাই চলে গেল নিচে স্নান করতে। অভিজিৎ আর সঞ্জয়কে পাহারা দেবার জন্য আমি থেকে গেলাম ওপরে। ঝুমাও সাঁতার জানে না, বেড়াতে এসেও সে সঙ্গে একটা বই এনেছে, একটা গাছে হেলান দিয়ে বই পড়তে লাগল। আমি ওপর থেকে দেখতে লাগলাম ওদের সকলের জলখেলা। ঠিক সিনেমার মতন লাগে।

রাণুদির মা প্রচুর রুটি আর মাংস আর সন্দেশ আর কমলালেবু এনেছেন,

গোল হয়ে সবাই মিলে বসে খেয়ে নিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, এত খাবার শেষ করা যাবে না, একটু পরেই মনে হলো, আর কিছু থাকলে মন্দ হতো না।

টাঙ্গাওয়ালাদের আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যাওয়ার মানে হয় না, খানিকটা বেড়াতে হবে। অজিতদা একলা একলা একটু জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতেই রাণুদিও চলে গেলেন সেদিকে।

রাণুদির মা জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কোথায় যাচ্ছে?

আমার মনে হলো, অজিতদা মাসিমার সামনে সিগারেট খেতে পারছেন না বলেই একটু আড়াল খুঁজছেন।

মাসিমা বললেন, তুমি একটু ওদের সঙ্গে যাও না নীলু।

আমার খুব অস্বস্তি হলো। এরকমভাবে যাওয়া যায়? মাসিমা কেন যেতে বলছেন, তা কি আর আমি বুঝি না। কিন্তু এরকম পাহারাদারের ভূমিকা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। সঞ্জয় কিংবা অভিজিৎ গেলেই তো পারত।

মাসিমার মুখের ওপর না-ও বলতে পারি না। মাসিমা চোখ দিয়ে আমায় অনুসরণ করছেন, অন্যদিকে যে কেটে পড়ব, তারও উপায় নেই। যেতে হলো ওদিকেই।

ওঁরা তন্ময় হয়ে কথা বলছিলেন, তবু অজিতদা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন, পেছন ফিরে বললেন, এসো নীলু, একটু ঘুরে আসা যাক এদিকটা থেকে।

আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি খাও নাকি?

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বললাম, না, না।

রাণুদি বললেন, কতদিন পর বেড়াতে এলাম। মধুপুর আসার পরে থেকে একদিনও আমি কোথাও যাই না।

অজিতদা বললেন, এরপর একদিন আমরা ঝাঁঝা কিংবা শিমুলতলার ওদিকে যাব। শিমুলতলাও খুব সুন্দর জায়গা।

আমরা যেদিকে এগোচ্ছি সেদিকটায় পাতলা জঙ্গল। মাটিতে কাচের মতন চকচকে কিছু জিনিস মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে কয়েকটা তুলে নিলাম। পাশগুলো কাচের মতন ধারালো নয়, চাপ দিলে মুড়মুড় করে ভেঙে যায়। অজিতদা বললেন, এগুলো অভ্র। গিরিডিতে অভ্রের খনি আছে।

আমি আগে কখনো অভ্র দেখিনি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছিলাম। রাণুদি অজিতদাকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার ফিরবে না?

অজিতদা বললে, আর একটু যাই। তোমার ভালো লাগছে না?

অজিতদা আমার হাতে একটা গোপন চাপ দিলেন। ইঙ্গিতটা আমি বুঝে

গেলাম। আমি বললাম, আমি এখানে একটু বসছি, খুব সুন্দর ছায়া। আপনারা ঘুরে আসুন। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। শুকনো পাতা খসে পড়ে তলাটা বেশ বিছানার মতন হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়ি। কিন্তু হাত দিয়ে দেখলাম তলাটা ভিজে ভিজে, বোধহয় রাত্তিরেই এখানে বৃষ্টি হয়েছে। আমার আগেও এখানে কারা যেন এসে বসেছিল, অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো, খালি প্যাকেট আর একটা কালো রঙের চুলের কাঁটা পড়ে আছে।

এর একটা মুহূর্ত যেন এক একটা ঘণ্টা! কত দূরে চলে গেলেন ওরা? আমি একলা একলাও ফিরতে পারি না। মাসিমা আমাকে প্রহরী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অজিতদা আমার হাত টিপে আমাকে থেকে যেতে বললেন কেন? নিশ্চয়ই নিরালায় গিয়ে রাণুদিকে আদর করবেন।

এই কথাটা মনে আসা মাত্রই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হলো। কান দুটো গরম গরম লাগল। কী আদর করছে অজিতদা, কোথায় কোথায়? ওরা কি শুয়ে পড়েছে? আমাকে দেখতেই হবে।

অরণ্যচারী প্রাণীর মতন আমি নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। জুতো জোড়া খুলে রেখে গেলাম এক জায়গায়। মাঘ মাসের শীতের মতন আমি কাঁপছি। আমার শরীরে এখন উত্তেজনা।

খুব বেশি দূর যেতে হলো না। রাণুদি একটা উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি পরে এসেছেন, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সেই রং স্পষ্ট দেখা যায়। পা টিপে টিপে আমি চলে এলাম খুব কাছে।

না, ওরা মাটিতে শুয়ে পড়েনি।

খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অজিতদা দুহাতে ধরে আছেন রাণুদির মুখখানা। দুজনের দৃষ্টি স্থির। তেমনভাবে আর কেউ তাকাতে পারবে না। যেন দুজনের চোখের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে একটা অদৃশ্য সেতু।

অজিতদা বললেন, একবার?

রাণুদি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না, বলো।

অজিতদা বললেন, কোনোদিন না। তুমিও আমায় ছেড়ে যাবে না তো রাণু?

—না, না, না—

অজিতদা রাণুদিকে বুকে টেনে নিয়ে রাণুদির ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম।

অজিতদা নয়, আমিই রাণুদিকে চুমো খাচ্ছি। একবার নয়, অনেক অনেক বার।

৭

সকালবেলা রাণুদি এসে বসে আছেন আমাদের বাড়িতে। অজিতদা তখনো আসেন নি।

সকালবেলায় চা-টা আজকাল সবাই আমাদের বাড়িতেই খায়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার মোটামুটি একটা যৌথ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চায়ের পর ন'টা সাড়ে ন'টার সময় জলখাবার আসে রাণুদিদের বাড়ি থেকে। দুপুরের খাওয়াও বলতে গেলে প্রায়দিনই রাণুদিদের বাড়িতে, দু-এক দিন অবশ্য আমাদের বাড়িতেও সবাই মিলে রান্না করি। অজিতদা মুরগি কিনে আনেন। নিজেই তিনি মুরগি ছাড়ান এবং রান্না করেন। বেশ ভালো রান্নার হাত অজিতদার।

পরী এসে চা দিয়ে গেল। একটা ট্রেতে করে খালি কাপ ও বড়ো টি-পট বেশ যত্ন করে সাজিয়েও আনে। আজকাল আর পরী রাত্তিরের দিকে মহুয়ার নেশা করে হল্লা করে না, সন্ধের পরই ও কোথায় যেন চলে যায়, কখন ফেরে টের পাই না। সকালবেলায় ও শান্তিশিষ্ট ভালোমানুষ।

আশু পট থেকে চা ঢালছিল, আমি রাণুদির মুখের দিকে চেয়ে বললাম, অজিতদা তো এখনো এলেন না।

রাণুদি বললেন, ঘুম থেকে ওঠেনি বোধহয়।

—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাণুদি সঞ্জয়কে বললেন এই টুকুন, তুই ডেকে নিয়ে আয় না।

সঞ্জয় ক'দিন ধরেই উৎপলের কাছে দারুণ উৎসাহে তাসের ম্যাজিক শিখছে। সে এখন যেতে চায় না। সে বলল, দাঁড়াও না বাবা, আসবে।

ভাস্কর বলল, অজিতদা এলে আবার এক রাউণ্ড চা খাওয়া যাবে। এটা শেষ করে ফেলা যাক।

ন'টা বেজে গেল, তখনো অজিতদা এলেন না।

এরকম তো হয় না। এখানে বেশি বেলা পর্যন্ত কেউই ঘুমোয় না। ভোর হতে না হতেই জানলা দিয়ে চোখে এসে আলো পড়ে আর কতরকম পাখির ডাক। চোখ মেলার পরই মনে হয়, আঃ কী সুন্দর দিনটা। আমরা তো রাত্তির বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে আবার ছটা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়ি।

আমাদের খাবার ঘরের একপাশে একটা পুরোনো আমলের ইজিচেয়ার আছে। আগে আমাদের চারজনের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল, কে প্রথমে দৌড়ে এসে চেয়ারটা দখল করবে। এখন অবশ্য সেই ইজিচেয়ারটা রাণুদির জন্যই রিজার্ভ করা। রাণুদি পা মুড়ে বসতে ভালোবাসেন।

আমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে ছিলাম বলে সময়টা খেয়াল করিনি। কিন্তু রাণুদি একেবারে চুপ করে বসে আছেন। মুখ দেখলেই বোঝা যায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। রাণুদির মন খারাপ আমার একদম সহ্য হয় না।

আমি পাজামা আর গেঞ্জি পরে ছিলাম, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, প্যান্টটা পরে আসি, অজিতদাকে ধরে আনতে হবে।

ভাস্কর বলল, যা পরে আছিস, ঐ পরেই যা না। এখানে তোকে আর কে দেখছে?

কেউ একজন ঐটুকু বললেই হলো। সত্যি তো, পাজামা গেঞ্জি পরে এখানে রাস্তায় বেরোলে ক্ষতি কী? এ তো আর শহর নয়। সঞ্জয়কে বললাম, এই, তোর সাইকেলটা আনিস নি?

রাণুদি বললেন, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

কর্তব্যপরায়ণ ভাইয়ের মতন সঞ্জয় আর অভিজিৎ তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তখন আমি বললাম, চল না, আমরা সবাই মিলে ঘুরে আসি! খানিকটা হাঁটাও হবে।

আশু আর উৎপল আলস্য করে রয়ে গেল। বাকি আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। গেটের মুখেই দেখা হলো ঝুমার সঙ্গে। ভাস্কর তাকে বলল, চলো, আমরা নদীর ধারটায় যাচ্ছি। তুমি যাবে?

ঝুমার সঙ্গে ভাস্করের বেশ জমে গেছে। প্রায়ই ওরা আলাদা কথা বলে। রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে এই নিয়ে আমরা তিনজন ভাস্করকে খুব প্যাক দিই। তবে আমি যে রাণুদিকে কতটা ভালোবাসি, সে কথা আর কেউ জানে না। রাণুদিও কি জানে?

অজিতদার বাড়ি খুব কাছে নয়। অন্তত পৌনে এক মাইল হবেই। তবে এই সব ফাঁকা জায়গায় দূরকে দূর বলে মনে হয় না।

বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। বাবা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে মা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্য লিখেছেন। অথচ ভাস্কররা আরো কয়েকদিন থেকে যেতে চায়। আমাকে হয়তো একলাই ফিরে যেতে হবে। এইসব ছেড়ে ফিরে যাওয়া যায়? এই ক'দিন তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে কলকাতায় আমার বাবা, মা, কলেজ, কফি হাউস এসব আছে। বাবার অসুখ করলে আমিই বা কী করব, দাদারাই তো রয়েছে। তবু জানি, মা লিখেছেন যখন, তখন যেতেই হবে, নইলে বাবা দারুণ রাগারাগি করবেন।

অজিতদার বাড়ির কাছাকাছি এসে রাণুদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আমি জানি, ও বাড়ি নেই।

আমারও সেই কথা মনে হচ্ছিল। ক'দিন ধরেই অজিতদা বলছিলেন, আমাকে একবার জসিডি যেতে হবে, কয়েকটা কাজ আছে। রাণুদি যেতে দিচ্ছিলেন না। অজিতদা প্রায়ই জসিডি যান।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে কাল কিছু বলে গেছেন?

—না। তবু আমার মনে হচ্ছে।

—আমার মনে হচ্ছে বাড়িতে হয়তো মিস্তিরি-টিস্তিরি এসেছে।

—না, দেখো, ও বাড়িতে নেই।

ভাস্কর গেট দিয়ে ঢুকল না। সে বলল, তোরা অজিতদাকে ডাক, আমি একটু ঝুমাকে নিয়ে নদীর ধারটা ঘুরে আসছি।

আমি মনে মনে বললাম, ঐ নদীটা আমার। কিন্তু আজকের জন্য ভাস্কর আর ঝুমাকে আমি আমার নদীটা দিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করলে, ভাস্কর, তুই আমার গাছ থেকে কদমফুল পেড়ে ঝুমাকে দিতে পারিস।

অজিতদা সত্যি বাড়ি নেই।

বাগানে একজন মালি কাজ করছিল, সে বলল, বাবু তো বাহার

—কখন?

—বহুত সুবা মে।

আমি রাণুদিকে বললাম, অজিতদা নিশ্চয়ই কোনো কাজে বেরিয়ে গেছেন, অত সকালে আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছেন, আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠিনি, তাই খবর দিতে পারেননি।

রাণুদি আমার দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

মালিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁহা গিয়া কুছ বোলা?

সে জানাল যে সে বিষয়ে সে কিছু জানে না। লোকটি একটু গম্ভীর ধরনের, বেশি কথা পছন্দ করে না।

পাহাড়গুলোর কাছে সাধুবাবার ডেরায় অজিতদার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, অজিতদা বলেছিলেন, উনি প্রায়ই ঐ সাধুর কাছে যান। আজও সেখানে যাননি তো? আমরা পরে অজিতদাকে অনেকবার সেই সোনা তৈরির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছি। অজিতা বলেছিলেন, কিছুতেই শেখাতে চাইছে না আমাকে, কিন্তু সাধুটি সত্যিই জানে। সাধুসন্ন্যাসীর ওপর অজিতদার খুব বিশ্বাস।

রাণুদি একটা পাহাড়ের ওপর উঠতে চেয়েছিলেন। অজিতদার খোঁজে আজই রাণুদিকে ঐ পাহাড়ে নিয়ে গেলে হয়। আমি এক্ষুনি রাজি আছি।

কিন্তু আগে রাণুদির মা আর বড়োমামার অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া অতদূরের রাস্তা, এতখানি কি রাণুদিকে হাঁটানো উচিত? অজিতদা সঙ্গে থাকলেও না হয় কথা ছিল।

নদীর ধারে ভাস্করকে ঝুমার সঙ্গে নির্জনে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া গেল না। অভিজিৎ আর সঞ্জয় সেদিকে দৌড়ে গেল।

আমিও রাণুদিকে বললাম, একটু ওখানে গিয়ে বসবেন?

রাণুদি বললেন, না, ভালো লাগছে না।

আমরা ফিরে চললাম। রাণুদি আর আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন না, চলে গেলেন নিজেদের বাড়িতে। আমি ক্ষীণভাবে দু'একবার বলবার চেষ্টা করলাম, দেখুন, একটু বাদেই নিশ্চয়ই অজিতদা এসে যাবেন। রাণুদি সে কথার কোনো মূল্য দেননি।

দুপুরের মধ্যেও অজিতদার পাত্তা পাওয়া গেল না। দুপুরে ও-বাড়িতেই খাওয়ার জন্য বড়োমামা আমাদের ডেকে পাঠালেন। রাণুদি নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। একবারও এলেন না আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

বড়োমামা আর রাণুদির মায়ের মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে।

রাণুদির মা একবার বললেন, একটা কিছু খবর দিয়ে গেল না কেন?

বড়োমামা বললেন, নিশ্চয়ই কোনো কাজে গেছে। আগে থেকে বললে রাণু কি ওকে যেতে দিত? রাণু যে ওকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থাকতে চায়।

মাসিমা বললেন, রাণু আগেও কয়েকটি ছেলেটেলেদের সঙ্গে মিশেছে। আমি কোনোদিন ওতে বাধা দিইনি। কিন্তু রাণুর এরকম অবস্থা তো আগে কখনো হয়নি?

বড়োমামা বললেন, আগেকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা তো এক নয়। এ ছেলেটিকে তো আমার বেশ ভালোই মনে হয়।

মাসিমা বললেন, কিন্তু হঠাৎ যদি চলে যায়?

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, তবু আমি বললাম, আমি একবার চট করে ঘুরে আসছি।

সাইকেলটা নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। সকালবেলা অজিতদার বাড়ির মালিকে একটা জরুরি কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। অজিতদা কোনো মালপত্র নিয়ে গেছেন কি না। এমনি খালি হাতে গেলে তো কখনো না কখনো ফিরে আসবেনই। অবশ্য অজিতদা সম্পর্কে এরকম সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। হঠাৎ মালপত্র নিয়ে আমাদের কিছু না বলে উনি উধাও হয়ে যাবেনই বা কেন? উনি যেতে চাইলে তো ওঁকে কেউ জোর করে আটকে রাখত না। তাছাড়া রাণুদিকে

উনি কথা দিয়েছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি।

বাগানের গেটটায় তালাবন্ধ।

মালি, মালি বলে কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাকলাম। কোনো সাড়া নেই।

সাইকেলটাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে, কাঠের গেটটা বেয়ে উঠে টপকে নামলাম ওদিকে। খুবই সোজা ব্যাপার। মালির ঘরটাও বন্ধ। সে কোথায় গেছে কে জানে। আমাদের বাড়ির মালির মতন এ বাড়ির মালি বৌ-ছেলে নিয়ে থাকে না। অজিতদার ঘরেও তালা ঝুলছে। তবু দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ভিতরটা অন্ধকার, আলো দেখা যায় না, তবু মনে হলো ভেতরে জিনিসপত্র কিছু রয়েছে।

আমাকে এই অবস্থায় কেউ দেখলে নির্ঘাত চোর ভাববে। আর চোরের মতন যখন ঢুকেছিই, তখন দু'একটা জিনিস চুরি না করারও কোনো মানে হয়। এ বাড়িতে দু'তিনটে গন্ধলেবুর গাছ রয়েছে। কয়েকটা লেবু ছিঁড়ে পকেটে ভরে নিয়ে আবার গেট পেরিয়ে চলে এলাম বাইরে।

বিকেলের দিকে রাণুদির মনে আবার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। আমরা সবাই এই ভয়ই পাচ্ছিলাম।

আমরা বসেছিলাম কালী মন্দিরের সামনের চাতালে। মাসিমা ফলটল কাটছেন, বড়োমামা পুজোয় এক্ষুনি বসবেন। হঠাৎ বাড়ির মধ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে রাণুদি চলে গেলেন গেটের দিকে। আমরাও সবাই পেছন পেছন দৌড়োলাম।

গেটটা খোলার আগেই ধরে ফেললাম রাণুদিকে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, রাণুদি, কোথায় যাচ্ছেন?

রাণুদি বললেন, জানি না। ছাড়ো আমাকে।

আমি বললাম, রাণুদি, অজিতদা খবর পাঠিয়েছেন, একটু বাদেই আসবেন।

রাণুদি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অজিতদা? অজিতদা কে?

—আমাদের অজিতদা। সত্যি খবর পাঠিয়েছেন।

—আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে। আমি খুঁজতে যাচ্ছি।

বড়োমামা এসে পড়ে বললেন, রাণু, কোথায় যাচ্ছিস মা? আমি পুজোয় বসব এখন, পুজো দেখবি না?

রাণুদি বললেন, আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে। আমার কী হারিয়েছে তোমরা বলতে পারো? আমার মনে পড়ছে না যে?

বড়োমামা এক গাল হেসে বললেন, ওমা, দেখো মেয়ের কাণ্ড! এক কানে দুল পরেছিস, আর একটা দুল কোথায় গেল? কোথায় হারালি? বাড়ির মধ্যেই কোথাও পড়েছে দ্যাখ।

সত্যিই রাণুদির এক কানে দুল নেই। আমরা আগে লক্ষ্য করিনি।

রাণুদি বললেন, দুল? আমি দুল হারিয়েছি? না তো?

বড়োমামা রাণুদির হাত ধরে সেই হাতটা ওঁর দুলহীন কানে ছুঁইয়ে বললেন, এই বালিশের পাশে--

এতে বেশ কাজ হলো। রাণুদির চোখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল যেন, আপন মনে বললেন, ও, দুল নেই, তাহলে বিছানায় বালিশের পাশে—

রাণুদি আমাদের সঙ্গে ফিরে এলেন। সঞ্জয় দৌড়ে গিয়ে রাণুদির দুলটা খুঁজে নিয়ে এল। রাণুদি সেটা পরে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি পুজো দেখব। আমি এইখানে বসব?

খুব কাতর গলায় রাণুদি বড়োমামাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি দৌড়ে গিয়েছিলুম বলে আমায় কেউ বকবে না তো?

দু'তিনজনে মিলে একসঙ্গে বলে উঠল না, না, কেউ বকবে না। বকবে কেন?

আমার খুব রাগ হলো অজিতদার ওপর। এরকম একটি মেয়েকে ছেড়ে কেউ চলে যায়? অজিতদার কি হৃদয় নেই?

আমরা সবাই সতর্ক, আমরা সবাই পাহারাদার। রাণুদি কখন কী করে বসবেন কোনো ঠিক নেই।

রাণুদি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর এক সময় আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, এই তুমি আমার নাম জানো?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি তো রাণুদি।

—না, আমার আর একটা নাম আছে না? কী আমার ভালো নাম বলো তো?

—মাধুরী।

—হ্যাঁ, মাধুরী। তুমি ঠিক বলেছ। তুমি সব জানো। আচ্ছা বলো তো, আমার কী হারিয়ে গেছে?

—ঐ দেখুন, রাণুদি, বড়োমামা পুজো করছেন।

রাণুদি উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা আচ্ছন্নের মতন টলতে টলতে কালী প্রতিমার কাছে গিয়ে বললেন, আমি পুজো করব?

কালী প্রতিমার পাশে রাণুদিকে দারুণ সুন্দর দেখাল। রাণুদি ও কক্ষনো চুল বাঁধেন না, মস্তবড়ো চুল পিঠের ওপর ছড়ান, মুখখানা চকচক করছে, আমি যেন এক মুহূর্তের জন্য রাণুদিকেও নগ্ন দেখলাম। ঠাস করে আমার নিজের গালে চড় মারবার ইচ্ছে হলো। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে।

বড়োমামা মন্ত্র পড়া থামিয়ে রাণুদির দিকে ঝুঁকে তাঁর হাত ধরে বললেন, হ্যাঁ, রাণু, পুজো করবে। তুমি বসো আমার পাশে।

বাণুদি বললেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো করব না? আমায় ফুল দাও।

মাসিমা বললেন, রাণু, লক্ষ্মীটি এদিকে সরে এসো। ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে নেই।

বড়োমামা বললেন, দিক। ওর যা ইচ্ছে করুক।

রাণুদি কালীঠাকুরের গলা থেকে জবা ফুলের মালাটা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর প্রতিমার বিশাল স্তনের ওপর হাত রেখে বললেন, আঃ কী ঠাণ্ডা।

মাসিমা চোখ বুজে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, না, পাপ হবে, পাপ হবে। কেউ ওকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে এসো।

আমি তড়াক করে উঠে গিয়ে রাণুদির হাত ছুঁয়ে বললাম, চলুন রাণুদি, বেড়াতে যাবেন?

রাণুদি জবাফুলের মালাটা চাবুকের মতন ধরে সপাং করে মারলেন কালীমূর্তির মুখে।

এতটা বাড়াবাড়ি রাণুদি আগে কক্ষনো করেননি। বড়োমামাও উঠে দাঁড়িয়ে রাণুদিকে টেনে সরিয়ে আনলেন সেখান থেকে। মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ রাণু, ওরকম করতে আছে? সবাই দেখছে।

রাণুদি বললেন, ও তো পাথর। ওর তো লাগে না।

বড়োমামা বললেন, হোক পাথর, তবু আমরা পুজো করি তো। যাঁকে আমরা পুজো করি, তাকে কক্ষনো অপমান করতে নেই।

—ওর কি কোনো জিনিস হারিয়েছে? তুমি বলো, বড়োমামা, কালীঠাকুরের কোনো জিনিস হারায়?

—না, ওর হারায় না। উনি সবাইকে দান। তোমাকেও দেবেন।

—মিথ্যুক কোথাকার।

—যাও রাণু এখন গিয়ে শুয়ে থাকো। পুজোটা সেরে নিই, তারপর তোমার ইঞ্জেকশান দেব।

—আমি শোব না। আমি বসব।

অজিতদা নেই, আমিই যেন অজিতদা। আমি সাহস করে রাণুদির হাত ধরে বললাম, চলুন রাণুদি, আমরা বাগানের ঐ বেঞ্চটায় বসি।

আপত্তি না করে আমার সঙ্গে চলে এলেন রাণুদি। বেঞ্চটায় বসে গভীর বিস্ময়ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কি সেই নদীর ধারের পাথর? তুমি জানো, এটা সেই পাথর?

—না, পাথর কেন হবে? এটা বেঞ্চ। আপনাদেরই বাড়িতে

—তা হলে আজ আমি পাগল হইনি, না?

—না!

—তাই তো বলছি, আমি পাগল হইনি। আমি ভালো আছি। অথচ আমি ভাবছিলাম ঝড় হচ্ছে। সত্যি সত্যি ঝড় হচ্ছে না।

—হ্যাঁ, হয়েছে একটু আগে।

—তুমি বেশ সব জানো।

—রাণুদি, আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি।

রাণুদি খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আমার একটা পোষা বেড়াল ছিল, খুব ভালোবাসতাম তাকে। দ্যাখো, এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়েছে, তাহলে আমি পাগল হইনি, পাগল হলে তো কিছু মনে থাকে না।

রাণুদি অজিতদার কথা একবারও বলছেন না। অজিতদাকে ভুলে গেছেন হয়তো। এই বিস্মরণের মূল্য কী সাঙ্ঘাতিক!

রাণুদির মুখখানা ফুরফুরে হাসি মাখানো। যেন ভেতরে ভেতরে কিছু একটা নিয়ে মজা করছেন। এমনও মনে হতে পারে, যেন সবটাই ওর অভিনয়। শুধু কালী প্রতিমাকে ফুলের মালার চাবুক মারার সময় মুখখানা যেমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীও সেরকম মুখের ভাব ফোটাতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

রাণুদি বললেন, আমার আরো একটা কথা মনে পড়ে গেছে, আমি যখন জাপান গিয়েছিলাম...আমি জাপান গিয়েছিলাম তুমি জানো তো, সে অনেক দিন আগে, কত বেড়ালাম, কত জায়গা দেখলাম...কিন্তু সেই জাপানে গিয়েও আমার অনেকগুলো জিনিস হারিয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। পরে শুনেছিলাম, রাণুদি কখনো জাপানে যাননি। অথচ কী বিশ্বাসযোগ্য ভাবে কথাগুলো বলছিলেন। কেন মাথায় হঠাৎ জাপান এল, কে জানে।

—তুমি জাপানে গিয়েছ?

—না, যাইনি।

—আমি তোমায় নিয়ে যাব। আমি সব চিনি, রাস্তা-টাস্তা সব, তবে, ওখানে বড্ড জিনিস হারিয়ে যায়...আমার কী কী হারিয়ে গেছে ঠিক মনে নেই...শুধু জাপানে কেন, আমি যেখানেই যাই, অনেক জিনিস হারিয়ে যায়। তোমার কিছু হারিয়ে যায়?

—হ্যাঁ, যায় মাঝে মাঝে।

—আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন কিন্তু আমার কিছু হারাতো না, হ্যাঁ,

সত্যি বলছি, কোনোদিন কিছু হারায়নি, তখন জিনিসগুলো খুব হালকা হালকা ছিল তো, খুব হালকা।

কথা বলতে বলতেই রাণুদি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন!

—বাঃ যাব না? সেই যে, যেগুলো হারিয়ে গেছে, খুঁজব না?

রাণুদিকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই ভাস্কররা এগিয়ে এল এদিকে। ওরা ঠিক নজর রেখেছে; রাণুদি হঠাৎ দৌড় মারলে সবাই মিলে ধরে ফেলতে হবে।

তাহলে কি রাণুদিকে এখন থেকে ঘরে আটকে রাখতে হবে? অজিতদাই এ জন্য দায়ী।

পুজো শেষ হয়ে গেছে, বড়োমামা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে এলেন। রাণুদি আগে ইঞ্জেকশান নিতে একটুও আপত্তি করতেন না। আজ বড়োমামাকে দেখেই রীতিমতন চিৎকার করে বললেন, না।

তারপর দৌড় লাগালেন। সে এক রীতিমতন চোর চোর খেলার মতন শুরু হলো। আমরা সবাই মিলে নানাদিক থেকে ছুটতে লাগলাম রাণুদিকে ঘিরে। রাণুদি মাথা নীচু করে তীব্র বেগে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছেন। এমনিতে এখনো হাসছেন রাণুদি, কিন্তু আমরা কেউ ওকে একবার ধরে ফেললেই উনি কেঁদে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠলেন, না, না আমায় ছেড়ে দাও, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমরা ওকে ধরে রাখতে পারছি না।

একবার রাণুদি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, খুব জোরে। আবার উঠে পড়বার আগে আমরা সবাই গোল হয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

বড়োমামা নরম গলায় বললেন, লেগেছে, রাণু?

রাণুদি দুহাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা আমায় কিচ্ছু বলো না।

কী করুণভাবে রাণুদির সেই মাটিতে বসে থাকা। আমরা কেউ ওকে ধরে তোলবারও চেষ্টা করলাম না।

—তোমরা আমায় মারবে? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আজ তো আমি পাগল হইনি? আমি আজ ভালো আছি।

বড়োমামা বললেন, না না রাণু, তোমায় মারব কেন? তুমি ওঠো, চলো, বাড়ির ভিতরে চলো।

—আমায় নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেবে? দিও না! আমাকে ভীষণ ব্যথা দেয়, আমার খুব একলা একলা লাগে।

—না, নার্সিংহোমেও পাঠাব না। তুমি বাড়িতেই থাকবে। ইঞ্জেকশানটা

দিয়েনি? ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো লাগবে।

—না! আমার ভালো লাগার দরকার নেই।

রাণুদি আবার উঠে দাঁড়াতেই দু'তিনজন ওঁকে চেপে ধরল। আমি অবশ্য গেলাম না। রাণুদি কষ্ট পাচ্ছেন, আমি আর দেখতে পারছি না।

বড়োমামা ভাস্করদের বললেন, রাণুদির হাত শক্ত করে ধরে থাকতে। তারপর তিনি ইঞ্জেকশানের সূচটা ফুটিয়ে দিলেন।

ঠিক তখনই ক্যাচ করে শব্দ হলো বাগানের গেটে। সেখানে দেখা গেল অজিতদার লম্বা চেহারাটা।

তক্ষুনি আমার মনে হলো, অজিতদার অন্তত আর এক মিনিট আগে আসা উচিত ছিল। সেটাই হতো ঠিক নাটকীয় মুহূর্ত।

অজিতদা প্রায় দৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন, আর আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে রাণু? কী হয়েছে?

রাণুদি মুখটা তুলে অকৃত্রিমভাবে অবাক হয়ে বললেন, ইনি কে? ইনি কি সত্যময়ের ভাই?

অজিতদা বললেন, আমি এসেছি, রাণু, আমি। আমার দিকে তাকাও।

রাণুদি তাকালেন, কিন্তু দৃষ্টিতে কোনো পরিচয় প্রকাশ পেল না। ফিসফিস করে কী বললেন, বুঝতে পারলাম না আমরা।

অজিতদা ভাস্করদের বললেন, তোমরা ওর হাত ধরে আছ কেন? ছেড়ে দাও, ও এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বড়োমামার দিকে ফিরে বললেন, কাল অনেক রাত্তিরে আমার বাড়িতে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছিল, দিল্লি থেকে। অফিসের একটা জরুরি ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই জামাইবাবু আমায় ফিরে যেতে বলেছেন। আজ সকালেই টেলিগ্রামটার একটা উত্তর দেওয়া দরকার...এখানে, মধুপুরের পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা খারাপ, তাই জসিডি যেতে হয়েছিল।

আমি একটু ক্ষুণ্ণভাবে বললাম, জসিডি থেকে আসতে এত সময় লাগল?

অজিতদা আমাকে একটু ছোট বকুনি দিয়ে বললেন, জসিডিতে আমার অন্য দু-একটা কাজও ছিল।

রাণুদি এবার একটু জোরে বললেন, জাপানে...একটা জঙ্গলের মধ্যে...আমার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে...কেউ জানে না।

অজিতদা বললেন, আমি একটু রাণুর সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই।

বড়োমামা বললেন, কিন্তু ও তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে, ইঞ্জেকশান দিলাম যে, ঐ যে দ্যাখো না চোখ বুজে আসছে।

রাণুদি টেনে টেনে সুর করে বললেন, তা-র-প-র খুব-বৃষ্টি-প-ড়-ল! ক-ত জল! ঢেউ-এর প—র ঢেউ! খালি ঢেউ...উঁচু উঁচু, ঠিক যেন মা-নু-ষে-র মতন এক একটা ঢেউ, জ্যা-ন্ত! হ্যাঁ।

অজিতদা বললেন, তাহলে এখনই একটা দরকারি কথা বলি। রাণু, তুমিও একটু মন দিয়ে শোনো। আমাকে শিগগিরই দিল্লি ফিরে যেতে হবে, আমি রাণুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। রাণুর বাবা কবে আসবেন?

বড়োমামা কোনো ব্যাপারেই সহজে অবাক হন না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, এই শনিবারেই তো আসবার কথা।

অজিতদা বললেন, তারও তো আর চার দিন বাকি। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি রাণুকে বিয়ে করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি রাণুকে সারিয়ে তুলতে পারব। অবশ্য, রাণুর মতামতটাও জানতে হবে। ও যদি রাজি থাকে।

রাণুদি এত বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছুই বুঝলেন না বা শুনলেন না। তিনি তখন অভিজিতের কাঁধে ভর দিয়ে ঢুলছেন।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত রাণুদি ঘুমিয়েই কাটালেন। এর মধ্যে তাকে কিছু খাওয়ানোও যায়নি। বিকেলের দিকে জেগে উঠেও রাণুদি চিনতে পারলেন না অজিতদাকে। তখন তার সেই একদম চুপচাপ থাকার অবস্থা, কেউ হাজারটা কথা বললেও উত্তর দেবেন না।

তবে, অসীম ধৈর্য অজিতদার। রাণুদি জেগে ওঠার পর তিনি সর্বক্ষণ বসে রইলেন রাণুদির কাছে। রাণুদির প্রগাঢ় স্তব্ধতা ভাঙবার জন্য তিনি একাই কথা বলে যেতে লাগলেন অনর্গল।

আমাদের সবারই মন ভার হয়ে আছে। সবাই ঠিক একটা কথাই ভাবছি, রাণুদি কি আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন? অথবা, হঠাৎ অজিতদার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মনটা একেবারে বিকল হয়ে গেছে? যদিও অজিতদার খুব বেশি দোষ নেই, মাত্র একটা দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছিলেন না। মানুষের তো এরকম কাজ থাকতেই পারে। অজিতদা কোনো খবর দিয়ে যাননি রাণুদিকে। সেটা ওঁর বোঝার ভুল। উনি ভেবেছিলেন, খবর দিতে এলে রাণুদি ওঁকে ছাড়বেন না। আর আমাদের কাছে কোনো খবর দিয়েও বোধহয় কোনো লাভ হতো না, রাণুদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করতেও পারতেন। তা হলেও এই একই অবস্থা হতো।

ফেরার পর থেকে অজিতদা যে-রকম যত্ন করছেন, তাতে আমরা ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

সারাদিন আমাদের কোনো খেলা-টেলা জমল না। আমরা একবারও চেঁচিয়ে কথা বলিনি বা হাসি-ঠাট্টা করিনি।

সন্ধের পর অনেকক্ষণ আমরা রাণুদিদের বাড়িতেই কাটালাম। বড়োমামাও আজ বেশ গম্ভীর। নিয়মমতন পুজো করলেন ঠিকই, তারপর আমাদের পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলেন, চোখ দুটো উদাস। এই বংশে আগে একজন পাগল হয়ে গিয়েছিল বলে রাণুদিকেও সেই রোগে ধরল! সম্পূর্ণ বিনা দোষে!

বড়োমামা এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমরা কিন্তু আজ এখানে খেয়ে যাবে।

আমরা একবাক্যে না, না বলে উঠলাম। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া মানেই একটা দারুণ হৈ-চৈ-এর ব্যাপার। বিশেষত যে-কদিন রাণুদি ভালো ছিলেন, ওঁর উপস্থিতিই আমাদের, অন্তত আমাকে তো খুব বেশি ভাবে আকৃষ্ট করত। আজ এই নিরানন্দ পরিবেশে আমাদের একেবারেই খেতে ইচ্ছে করবে না।

আমাদের বাড়িতে রান্না হয়ে গেছে বলে আমরা উঠে পড়লাম। অজিতদাব কাছ থেকেও বিদায় নিলাম না, অজিতদা রাণুদির ঘরে রয়েছেন, এখন আর ডিসটার্ব করার দরকার নেই।

মাঠ ভেঙে ফেরার পথে উৎপল বলল, রাণুদিকে পাগল জেনেও অজিতদা বিয়ে করতে চাইছেন, অজিতদার সত্যি দারুণ সাহস। আব পাগল মানে তো আর একটু-আধটু পাগল নয়।

ভাস্কর বলল, এ বিয়ে হবে কি-না খুব সন্দেহ হচ্ছে।

—কেন?

—রাণুদির মা রাজি নন। বড়োমামা আমাকে বলেছেন। মাসিমা বলছেন, দিল্লি, ঐ অতদূরে রাণুদিকে পাঠিয়ে তিনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। তিনি রাণুদিকে নিজের চোখের কাছে রাখতে চান। অজিতদা কলকাতার ছেলে হলে কোনো আপত্তি ছিল না।

—অজিতদা ট্রান্সফার নিতে পারেন না?

—ট্রান্সফার নেওয়া কি অত সোজা? অজিতদা অবশ্য বলেছেন, উনি খুবই চেষ্টা করবেন, সম্ভবত পেয়েও যাবেন এক বছরের মধ্যে। যাই হোক, এখন সব কিছুই নির্ভর করছে রাণুদির বাবার ওপরে।

আমরা সবাই জানি, রাণুদির বাবাকে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে। ওঁকে

অনুরোধ করা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য।

সাড়ে ন'টার মধ্যেই আমাদের খাওয়া হয়ে গেল। এখানে এসে এত তাড়াতাড়ি আর একদিনও খাইনি। এরপর উৎপল কিছুক্ষণ তাস খেলার প্রস্তাব দিল, সে বিষয়ে খানিকটা মতভেদ দেখা দিল আমাদের মধ্যে। আমরা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। সারাদিন বেশ গরম ছিল, এখন চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া। এই এক অদ্ভুত আবহাওয়া এখানে, দিনের বেলা যতই উত্তাপ থাকুক, শেষ রাত্তিরের দিকে গায়ে চাদর দিতে হয়।

দূরে কার যেন চ্যাচামেচি শুনতে পেলাম। আমরা উৎকর্ণ হয়ে একটুক্ষণ শুনেই বুঝতে পারলাম, রাণুদিদের বাড়ি থেকে সঞ্জয় বা অভিজিৎ কেউ ভাস্করদা, নীলুদা বলে ডাকছে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেইভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে লাগলাম। এমনকি একটা টর্চও আনিনি, মাঠ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। নিশ্চয়ই ও বাড়িতে খুব একটা কিছু বিপদ হয়েছে।

গেট দিয়ে যাবার ধৈর্য নেই, পাঁচিল ডিঙিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে ছুটলাম।

সঞ্জয় তখনো ডেকে চলেছে। কাছেই বড়োমামা দাঁড়িয়ে, তাঁর হাসি মুখ।

বড়োমামার মুখ দেখেই আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। বড়োমামা আমাদের দেখে বললেন, দেখেছ, ছেলেটার কাণ্ড। এত করে বললাম, কালকে খবর দিলেই হবে, তা শুনলে না।

সঞ্জয় খুব উত্তেজিত ভাবে বলল, দিদি ভালো হয়ে গেছে।

এই খবর দেবার জন্য সঞ্জয় আমাদের ডেকে এনেছে বলে আমরা তক্ষুনি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

বড়োমামা ঠাট্টা করে বললেন, এদিকে সাহস নেই, অন্ধকারের মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়ে খবর দিতে ভয় পায়, তাই এখান থেকে চ্যাচাচ্ছে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, রাণুদি কোথায়?

বড়োমামা বলল, চলো, দেখা করে আসবে। সত্যি অজিত ছেলেটা বোধহয় মন্ত্র-টন্ত্র জানে। আর যাই হোক, ছেলেটির মনের জোর আছে সাঙ্ঘাতিক। একথা স্বীকার করতেই হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স যেখানে হার মেনে যায়, সেখানেও মানুষ মনের জোরে জিততে পারে।

রাণুদি আর অজিতদা এক সঙ্গে খেতে বসেছেন। মাসিমা এমন ভাবে পরিবেশন করছেন, যেন ঠিক মেয়ে জামাইকে খাওয়াচ্ছেন। পরে শুনেছিলাম, রাণুদি স্বাভাবিকভাবে কথা বলার পর মাসিমা অজিতদার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন, আনন্দের কান্না। অজিতদাকে তিনি বলেছিলেন, বাবা, তুমি সত্যিই

অসাধ্য সাধন করতে পারো। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

রাণুদি আমাদের দেখে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে, ফোর মাস্কেটিয়ার্স, আজ সারাদিন তোমাদের দেখা নেই কেন?

অজিতদা আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

আমি মনে মনে প্রথমে রাণুদি তারপর অজিতদা, তারপর যত রাজ্যের ঠাকুর দেবতা, সব ক'জন ভগবান এবং গোটা পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধন্যবাদ দিলাম। রাণুদির ভালো হবার জন্য যারা সামান্যমাত্রও দায়ী, তারা সকলেই আমাকে ক্রীতদাস করে রাখতে পারে।

ভাস্কর বলল, আমাদের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে কাল খেলা আছে কিন্তু! সক্কালবেলা যেতে হবে!

রাণুদি বললেন, আমি ঠিক যাব। আমিই তোমাদের ডেকে তুলব দেখো। তোমরা এখানে খেয়ে যাও।

—আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

—ওমা, এর মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? যাঃ! একটা করে মাছ ভাজা খাও অন্তত, অনেক মাছ ভাজা আছে। মা, ওদের দাও না!

রাণুদি কিছুতেই শুনলেন না। সেই ভরা পেটেই আমাদের আবার মাছ ভাজা খেতে হলো।

আমরা গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে এলাম। আবার আমাদের জীবনটা চমৎকার হয়ে গেল। শুধু একটু একটু মন খারাপ লাগতে লাগল আমার। বাড়ি থেকে আর একটা কড়া চিঠি এলেই আমায় ফিরে যেতে হবে। বাবা এখন কেমন আছেন কে জানে। রাণুদি আর অজিতদার বিয়েটা বোধহয় আমার দেখা হবে না।

এর পরের দুটো দিন আমাদের খুবই আনন্দে কাটল। শুধু আমরা নয়, রাণুদির মা-ও এখন বুঝে গেছেন যে অজিতদার সঙ্গে বিয়ে হলেই রাণুদি বেঁচে যাবেন। অজিতদা যতক্ষণ সঙ্গে থাকেন, ততক্ষন রাণুদি একেবারে স্বাভাবিক। রাণুদি শুধু দেখতে সুন্দর নন, এমনিতে ওঁর মনটা খুব নরম আর দয়ালু, অন্য কারুর কষ্ট উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না।

একবার হোঁচট খেয়ে আমার পা কেটে গেল আর তার জন্যই কী দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাণুদি। এমন করতে লাগলেন, যেন কেঁদেই ফেলবেন। আমার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের খানিকটা অংশ উড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল বেশ, আমার খুবই ব্যথা লেগেছিল, কিন্তু অন্যদের সামনে তো আর তা প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি বলছিলাম। রাণুদি আমাকে জোর করে এনে বসালেন আমাদের বাড়ির বারান্দায়। রান্নাঘর থেকে গরম জল আনিয়ে

আমার ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে দিলেন। ততক্ষণে রাণুদির হুকুমে সঞ্জয় দৌড়ে ওদের বাড়ি থেকে ডেটল, তুলো, মারকিওরোক্রোম আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসেছে। ওষুধ মাখিয়ে আমার পা-টা লাল করে দিতে দিতে রাণুদি বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, খুব লেগেছে, তাই না? ইস, খুবই লেগেছে!

...এমন মানুষও পাগল হয়। এটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায় নয়?

রাণুদি আমার হায়ে হাত দিচ্ছেন বলে আমার লজ্জাও করছিল, আবার রাণুদির ছোঁয়ায় আমার ব্যথাও যেন কমে গিয়েছিল একেবারে। রাণুদি আমার এত কাছে, আমি রাণুদির চুল ও শরীরের গন্ধ পাচ্ছি, একেবারে রাণুদির নিজস্ব গন্ধ, ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে রাণুদির বুকের আভাস, ঠিক যেন সোনার...। আমি মনে মনে আবার অজিতদা হয়ে গিয়ে রাণুদিকে খুব আদর করতে লাগলাম। আমার অদৃশ্য দুটি হাত খেলা করতে লাগল রাণুদির শরীরে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন এই পায়ের ব্যথাটার জন্য আমার খুব জ্বর হয়, তাহলে আমি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকব, রাণুদি আসবেন আমার কাছে, আমার শিয়রের কাছে বসবেন, আমার গায়ে হাত দেবেন, তখন আমিও রাণুদিকে—।

কত লোকই তো বাইরে বেড়াতে যায়, সাধারণভাবে কয়েকদিন আনন্দ ফুর্তি করে, আবার ফিরে আসে। কোনো অন্যরকম ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সেবার মধুপুরে ঐ কয়েকটা দিনেই কত কী যে ঘটেছিল! অবশ্য, আমি যতবারই বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছি, প্রত্যেকবারই অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। সামান্য ছোটখাটো টুকিটাকি ব্যাপারও কত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। তবে, জীবনে সেই প্রথমবার গুরুজনদের সঙ্গে ছাড়া স্বাধীনভাবে বেড়াতে যাওয়ার কোনো তুলনাই হয় না অন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

এরপর, আমাদের মধুপুর-প্রবাসের দিনগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনাটি ঘটল।

আমাদের ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেন্ট খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। বড়োমামা একটা কাপও ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। সিঙ্গলস-এর খেলায় উৎপল, রাণুদি, ঝুমা আর ভাস্কর জমিয়ে দিয়েছে খুব, আমিও এই খেলাটা তেমন খারাপ খেলি না। নেহাত পায়ে এই চোটটা লাগবার পর খোঁড়াতে হচ্ছে, ভালো দৌড়তে পারছি না, এই যা! ডাবলস-এর খেলায় রাণুদির পার্টনার অজিতদা, কিন্তু অজিতদার আর যত গুণই থাক, ব্যাডমিন্টনটা খেলতে পারেন না মোটেই, সুতরাং রাণুদি আর একলা কত সামলাবেন। আমি আর উৎপল রাণুদিদের টিমটাকে যা-তা ভাবে হারিয়ে দিলাম। যদিও তাতে আমার খুব একটা আনন্দ হলো না, রাণুদিকে হারিয়ে আমার মায়া হতে লাগল। রাণুদির মন ভালো রাখবার জন্য ওঁকে সব ব্যাপারেই

জিতিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু খেলতে নেমে আর সে-কথা মনে থাকে না।

রাণুদি অবশ্য খুব একটা ভেঙে পড়লেন না। অজিতদাকে বললেন, আমরা এবার কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে নিয়ে, দেখো, পরের বছর ওদের সবাইকে হারিয়ে দেব।

অজিতদা হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, পরের বছরও আমরা সবাই মধুপুরে আসব। কী, কথা রইল তো?

ভাস্কর বলল, নিশ্চয়ই।

বৃহস্পতিবার দিন বিকেলে দারুণ হাওয়া উঠে আমাদের খেলাটা ভেস্তে গেল। অবশ্য, এই কদিনও আমরা খেলেছি জোর করেই। শীতকাল ছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলা জমে না। হাওয়াতে সার্ভিস ঠিক থাকে না, মারলাম একদিকে, কর্ক চলে গেল অন্য দিকে।

সেদিন খেলা বন্ধ করে নেট গুটিয়ে আমরা মাঠের ওপরেই বসলাম গোল হয়ে। পরী সেখানেই আমাদের চা দিয়ে গেল। মধুপুরে এসে আমরা দুবেলা চা খাওয়ায় খুব রপ্ত হয়ে উঠেছি। কলকাতায় মাঝে মাঝে সকালে শুধু এক কাপ চা খেতাম। এখানে এসে আমরা যেন পুরোপুরি বয়স্ক হয়ে উঠেছি।

আস্তে আস্তে সন্ধে নেমে এসেছে, আমরা অজিতদার কাছে দিল্লির গল্প শুনেছি। দিল্লি সম্পর্কে রাণুদির আগ্রহই বেশি। অন্য মেয়েরা নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পায়, কিন্তু রাণুদি তো সাধারণ মেয়েদের মতন নন।

রাণুদি এক সময় বললেন, আমি জানি, দিল্লিতে গেলে আর আমার কোনোদিন অসুখ করবে না। আমি একদম ভালো হয়ে যাব।

অজিতদা বললেন, তুমি তো ভালোই হয়ে গেছ রাণু।

রাণুদি বললেন, দিল্লি থেকে তুমি আমাকে একবার হিমালয় পাহাড় দেখাতে নিয়ে যাবে? আমার খুব পাহাড় দেখতে ইচ্ছে করে।

অজিতদা বললেন, নিশ্চয়ই।

সেই সময় একটা গাড়ির শব্দ হলো।

এই রাস্তায় গাড়ি প্রায় আসেই না, তাই আমরা সবাই কথা বন্ধ করে সেদিকে তাকালাম। তাহলে বোধহয় কাছাকাছি কোনো বাড়িতে লোক এল।

আমাদেরই বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকল কয়েকজন পুলিশ।

আমরা অবাক। হঠাৎ পুলিশ এখানে? সেই যে রাণুদি একদিন হারিয়ে যাবার পর বড়োমামা পুলিশে খবর দিয়েছিলেন, তারপর আর পুলিশ সে ব্যাপারে কোনো খোঁজও নেয়নি একবারও। এতদিনে বুঝি সেই কথা মনে পড়েছে। পুলিশের ব্যাপারই আলাদা।

পুলিশকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অজিতদা বিদ্যুতের মতন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলেন বাগানের দিকে।

একজন পুলিশ অফিসার চিৎকার করে বললেন, হল্ট! অর আই উইল ফায়ার।

অজিতদা না থেমে পৌঁছে গেলেন পাঁচিলের কাছে। সেখানে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে বার করলেন একটা কী যেন। আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না অজিতদাকে।

পরের মুহূর্তেই গুলির শব্দ হলো।

আমরা বিমূঢ় হয়ে বসেছিলাম। ভাস্কর চেঁচিয়ে উঠল, শুয়ে পড়, সবাই শুয়ে পড়!

হাত ধরে জোর করে টেনে সে রাণুদিকেও শুইয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছে। স্কুল থেকে একবার স্ট্রাইক করে মিছিল নিয়ে আমরা গেছিলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, তখন পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। খুব কাছ থেকে সেই প্রথম আমি গুলির শব্দ শুনি, আর এই এবার দ্বিতীয়বার।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, এবার গুলি চালিয়েছে অজিতদা। তার মানে অজিতদার কাছে সব সময় একটা রিভলবার থাকে।

রোমাঞ্চে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বিপ্লবী! অজিতদা নিশ্চয়ই একজন বিপ্লবী! গোড়া থেকে অজিতদার ব্যবহারে একটু অন্যরকম কিছু ছিল। একজন সত্যিকারের বিপ্লবী আমাদের সঙ্গে এত সহজভাবে মিশেছেন।

আমি রাণুদির দিকে তাকালাম।

অজিতদার জন্য রাণুদির নিশ্চয়ই এখন আরো বেশি গর্ব হবে। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে ভগবান, অজিতদা যেন ধরা না পড়েন। কিছুতেই না।

অনেকগুলো পুলিশ আমাদের বাগানের ফুলগাছ মাড়িয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। কয়েকজন ধপাস ধপাস করে পার হয়ে গেল পাঁচিল। আরো দু'বার গুলির শব্দ হলো। নিশ্চয়ই কারুর গায়ে লাগেনি, কারণ কেউ তো ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠেনি।

আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেই যাচ্ছি। তখনো যে অজিতদা ধরা পড়েন নি, তা বোঝা যায়। এই অন্ধকারের মধ্যে অজিতদা বহুদূর চলে যেতে পারবেন।

তখন রাণুদির কান্নার শব্দ পেলাম।

মাটিতে মুখ চেপে রাণুদি বলছেন, বাঁচবে না, আমি জানি, ও বাঁচবে না!

৯

মাঝপথে পুজো থামিয়ে বড়োমামা সতীশবাবুকে নিয়ে টর্চ হাতে চলে এলেন এ বাড়িতে। গুলির শব্দ তিনিও শুনতে পেয়েছেন।

পুলিশরা কেউ আর নেই বাগানে। আমরাও সবাই মাঠ ছেড়ে চলে এসেছি বারান্দায়। বড়োমামাকে দেখে আমরা প্রথমে সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম, তাতে উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তারপর ভাস্কর নেতৃত্ব নিয়ে সবাইকে থামিয়ে ঘটনাটা জানাল।

বড়োমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, পুলিশ? আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। এ বাড়িতে একটা বন্দুক আছে আমি জানি। ভাবলাম, তোমরাই কেউ ছেলেমানুষী করে সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে—

কথা থামিয়ে বড়োমামা রাণুদির দিকে তাকালেন। রাণুদির ব্যবহারে খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু এখনো প্রকাশ পায়নি।

রাণুদির মুখখানা বিবর্ণ, তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশরা ওকে মেরে ফেলবে, তাই না? ওকে মারবার জন্য এসেছে!

বড়োমামা বললেন, কী ব্যাপার, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

পুলিশের গাড়িটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। ভাস্করকে নিয়ে বড়োমামা এগিয়ে গেলেন সেই গাড়িটার কাছে। যাবার সময় বললেন, রাণু, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। একটু চুপ করে বসে থাকো, আমি সব খবর জেনে আসছি।

কোথা থেকে কিছু লোক এসে এর মধ্যেই গাড়িটার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল ওখানে যাবার, কিন্তু সবাই মিলে চাঞ্চল্য দেখানো রাণুদির সামনে উচিত হবে না।

আমি রাণুদিকে জিজ্ঞেস করলাম, অজিতদা আপনাকে একবারও বলেননি যে উনি বিপ্লবী?

রাণুদি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না।

এত বড়ো একটা ব্যাপারে আমরা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেও সেই তুলনায় রাণুদি যেন অনেক শান্ত। কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে কীভাবে ওর মনের মধ্যে দেখা দেবে, তার কোনো ঠিক নেই।

ভাস্কর আর বড়োমামা একটু বাদেই ফিরে এলেন। বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যায় নি। গাড়িতে রয়েছে শুধু ড্রাইভার আর একজন রোগা মতন পায়জামা শার্ট-পরা লোক। তারা বিশেষ কিছু বলতে পারেনি কিংবা বলতে চায়নি। শুধু বলেছে, ডাকু পাকড়ানে আয়া!

ভাস্কর বলল, ঐ রোগা পায়জামা শার্ট পরা লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হলো।

খুব সম্ভবত ও দু-একদিন ডিম বিক্রি করতে এসেছিল।

উৎপল বলল, ঐ ব্যাটাই স্পাই!

বড়োমামা বললেন, তোমরা এখানে বসে কী করবে। চলো, সবাই আমাদের ওখানে চলো। দিদিকেও খবরটা দিতে হবে।

আশু বলল, আমরা দু-একজন এখানে থাকি। গাড়ি যখন রয়েছে, পুলিশরা তো এখানে ফিরে আসবেই, তখন খবরটা পাওয়া যাবে।

বড়োমামা বললেন, ড্রাইভারকে বলেছি, ইন্সপেক্টর এলে আমাকে একবার খবর দিতে। আমি এখানকার পুরোনো লোক, পুলিশের লোকরা সবাই আমাকে চেনে। আয় রাণু।

রাণুদি বললেন, ওরা যদি ওকে মেরে ফেলে, তারপর আমাদের দেখতে দেবে?

বড়োমামা বললেন, মেরে ফেলবে মানে? মারা অত সহজ নাকি?

আমার ইচ্ছে করল, মাঠের মধ্যে যেদিকে পুলিশরা অজিতদাকে তাড়া করে গেছে, সেই দিকটায় গিয়ে একবার দেখে আসি। চুপিচুপি দূর থেকে দেখব—

সে কথা উচ্চারণ করা মাত্রই সবাই ধমকে দিল আমাকে। গুলিগোলা চালিয়েছে, তার মধ্যে যাওয়া মানে বিপদকে আরো ডেকে আনা।

রাণুদি আপত্তি করলেন না, বড়োমামার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। বাগানে আমাদের চায়ের কাপ ডিসগুলো এখনো পড়ে আছে। মাত্র পনেরো কুড়ি মিনিট আগেও আমরা এখানে কী সুন্দর গল্প করছিলাম, এর মধ্যে কত কী হয়ে গেল। ওরা অজিতদাকে ধরতে পারবে?

ও বাড়ির চাতালে গিয়ে আমরা কলকোলাহল করে এই ঘটনাই আলোচনা করতে লাগলাম। বড়োমামা এর মধ্যে অসমাপ্ত পুজো সেরে নিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, অজিতদাকে পুলিশ তাড়া করেছে শুনে মাসিমা ধপ করে বসে পড়ে অজ্ঞানের মতন হয়ে গেলেন, চোখ দুটো কী রকম যেন হয়ে গেল। আর তখন রাণুদিই সেবা করতে লাগলেন মাকে। মা [illegible] কী হলো, কী হলো? বলে তিনি তাড়াতাড়ি কুয়োর কাছ থেকে এক মগ জল এনে মায়ের চোখ মুখে ছিটোতে লাগলেন।

পুলিশরা ফিরে এল প্রায় এক ঘণ্টা বাদে।

কনস্টেবলরা বসে রইল গাড়িতে; ইন্সপেক্টরের মতন পোশাক পরা তিনজন পুলিশ গেট খুলে ভেতরে এল জুতো মশমশিয়ে। কালীমন্দির দেখে তারা ভক্তিভরে প্রণাম করল প্রথমেই।

আমাদের মধ্যে বড়োমামাই শুধু কথা বললেন। পুলিশদের দিকে সিগারেটের

প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বড়োমামা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপারটা হলো বলুন তো! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

একজন পুলিশ অফিসার বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে বলল, ব্যাটা এবারেও ভেগে পড়ল। নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল মোশাই, আপ্‌নাদের ভি সর্বনাশ করে দিত।

রাগে গা জ্বলে গেল আমার। এরা অজিতদাকে গালাগাল দিচ্ছে। এরা বিপ্লবীদেরও ক্রিমিন্যাল বলে।

বড়োমামা চাতালটা দেখিয়ে দিয়ে পুলিশ তিনজনকে বললেন, বসুন না। বৈঠিয়ে আপলোগ। সিংজী, সব ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

পুলিশ তিনজন বসে পড়ল চাতালে। একজন জিজ্ঞেস করল, জুতা খুলনে হোগা?

বড়োমামা বললেন, না, ঠিক আছে।

সিংজী যার নাম, সেই পুলিশটি পকেট থেকে একটা ছবি বার করে বলল, ইয়ে দেখুন, শিবনাথ পাণ্ডে। ডাকু আউব খুনী। পাটনায় তিন তিনটে কেস ঝুলছে। এবকম ডেঞ্জারাস আদমি আপনার বাড়িতে ঘুষেছিল।

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছবিটা দেখলাম। অজিতদাবই যে ছবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখে দাড়ি নেই শুধু তবু চিনতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু অজিতদার আসল নাম শিবনাথ পাণ্ডে? অজিতদা একটা ছদ্মনাম নিলেও উনি বিহারী হয়ে বাঙালি সাজবেন কী করে। ওঁর বাংলায় তো কোনো খুঁত নেই। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে। পুলিশ একজনের দোষ অন্যের নামে চাপায়।

বড়োমামাও অজিতদাকে বাঙালি বলায় সিংজী বলল, হাঁ হাঁ, ওর মা বাঙালি, বাবা বিহারী। লেকিন, বাঙালিদের সঙ্গেই ওর বেশি কারবার। আউর ভি দেখুন।

সিংজী আরো তিন-চারখানা ছবি বার করে দেখাল। সব কটাই অজিতদার।

বড়োমামা বিহ্বল ভাবে বললেন, আপনাদের কোনো ভুল হয়নি তো?

সিংজী বলল, আরে নেহি, ডাক্তারবাবু! ইনারা দু'জন পাটনা থেকে এসেছেন, ইনারা খুব ভালো করে চিনেন। একবার ধরাও পড়েছিল শালা।

বড়োমামা বললেন, রাণু, তুমি ভেতরে যাও। খোকন, দিদিকে ভেতরে নিয়ে যা তো!

রাণুদির পাশেই ছিলাম আমি। রাণুদি নিজের ঠোঁটটা শুধু কামড়ে ধরেছিলেন, আর কোনোরকম অসুস্থতার চিহ্ন প্রকাশ পায়নি। তিনি শান্তভাবে বললেন, না, আমি এখানেই থাকব। আপনারা কি ওকে মেরে ফেলেছেন?

সিংজী রাণুদির আপাদমস্তক দেখে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন,

ইনাকেও আমার ইন্টারোগেট কবতে হবে। তব আপনা নসীবসে বেঁচে গেছেন। ও বহুৎ ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। নিজের শালার বউ, ওয়াইফের ভাইয়ের যে ইস্তিরি, তাকে ও পহেলা খুন করে।

সেখানে একটা বোমা পড়লেও আমরা এতটা বিস্মিত হতাম না। আমি তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অজিতদাকে বিপ্লবী বলেই ভাবছিলাম। কিন্তু অজিতদা বিবাহিত? একজন মহিলাকে তিনি খুন করেছেন? কোনো খুনী অন্যদেব সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করতে পারে?

আমার মুখ থেকে আপনিই বেবিয়ে এল, মিথ্যে কথা!

একজন পুলিশ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ ছোকরা কে আছে?

বড়োমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওবা পাশের বাড়িতে থাকে, ওবা কিছু জানে না। এই তোমরা এখন সব ভেতরে যাও।

এতেও কিন্তু রাণুদিব মধ্যে বিষম কিছু ব্যাপাব ঘটল না। তিনি ধীর পায়ে চলে গেলেন বাড়িব দিকে। আমবা দুরু দুরু বুকে সেদিকে চেয়ে রইলাম। রাণুদি গতি বাড়ালেন না একটুও, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে ঢুকে গেলেন নিজের ঘবে।

পুরো ঘটনাটা আমরা এবপরে শুনলাম। অজিতদা ওরফে শিবনাথ পাণ্ডে মোটামুটি লেখাপড়া শিখে পাটনায় একটা চাকরি করতেন। বিয়ে-টিয়ে করে সংসারীও হয়েছিলেন সাধারণ লোকের মতন। তারপব নিজের শ্যালকের স্ত্রীব সঙ্গে একটা অবৈধ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন কবে ফেলেন রাগের মাথায়। সেই থেকে ফেবার। বছব দেড়েক ধরে ফেরার থাকার সময় খরচ চালাবার জন্য গোটা দুয়েক ডাকাতি করেছেন, তাব মধ্যে মজঃফরপুরে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় একজন ক্যাশিয়ার খুন হয়, সে খুনের ব্যাপারেও অজিতদাই দায়ী বলে পুলিশ সন্দেহ করে।

মধুপুরের বাড়িটা মোটেই ওব জামাইবাবুর নয়। মালির কাছ থেকে অজিতদা ওটা ভাড়া নিয়েছেন। এখানকার অনেক ফাঁকা বাড়িই মালিরা গোপনে ভাড়া দেয়। এইসব জায়গায় লুকিয়ে থাকার খুব সুবিধে। একবার কলকাতায় পুলিশ ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, একটুর জন্যে ফস্কে যায়। মধুপুরে প্রায় চার মাস ধরে ও লুকিয়ে আছে, ওর কিছু সাকরেদও নিশ্চয়ই আছে আশেপাশে। এখান থেকেই কাছাকাছি কোনো জায়গায় আবার ডাকাতির ফন্দি আঁটছিল, পুলিশের এরকম সন্দেহ।

সেইদিনই প্রথম আমরা চারজনে একসঙ্গে এক ঘরে শুতেও ভয় পেলাম।

যদি অজিতদা হঠাৎ ফিরে আসে? অজিতদার মুখখানা মনে পড়লেই এখন ভয় করছে।

ভাস্কর বলল, তোরা যাই বলিস আর তাই বলিস, আজ আমি বন্দুকটা মাথার কাছে রাখতে চাই।

আমরা কেউই আর আপত্তি করতে পারলুম না। বন্দুক নিয়ে আসা হলো সেই বন্ধ ঘর থেকে। তবু যেন একটা বন্দুক দেখলে একটু সাহস জাগে।

উৎপল বলল, অজিতদা কোথায় লুকোতে পারেন, সেটা বোধহয় একমাত্র আমরাই জানি।

ভাস্কর বলল, হ্যাঁ, সেই পাহাড়গুলোর কাছে সাধুর আখড়ায়।

উৎপল বলল, ও নিশ্চয়ই আসল সাধু নয়। ডাকাতের মতন চেহারা। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম।

আশু বলল, সে কথা আগে বলিসনি কেন?

উৎপল বলল, বলিনি, মানে বলে কী হবে, এই ভেবেছিলুম। আমি অজিতদাকে তো সন্দেহ করিনি। তোদেরও লক্ষ্য করা উচিত ছিল, সাধুটা ভাত রাঁধছিল। বিহারী সাধুরা ভাত খায়?

ভাস্কর বলল, ওর মুখের হিন্দিটাও যেন কেমন কেমন। ঐ লোকটাও নিশ্চয়ই বাঙালি।

আশু বলল, আমার একবার মনে হয়েছিল, পুলিশের কাছে ঐ সাধুটার কথা বলব কি না।

ভাস্কর বলল, আমাদের কী দরকার? অজিতদা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি! আমরা ওকে ধরিয়ে দিতে যাব কেন?

আশু বলল, তবুও এটা আমাদের ডিউটি পুলিশকে সাহায্য করা। তাছাড়া রাণুদিকে নিয়ে অজিতদা কী করতে চেয়েছিল কে জানে? বোধহয় গয়নাগাঁটি সমেত রাণুদিকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পরে খুন করে ফেলত।

ভাস্কর বলল, কী দারুণ লোক মাইরি! একদম বুঝতে পারিনি।

আশু বলল, তোরা কি বলিস? কাল সকালে পুলিশের কাছে ঐ পাহাড়ের কথাটা আমাদের জানিয়ে আসা উচিত নয়?

উৎপল বলল, চুপ! কার যেন পায়ের শব্দ শুনলাম।

আমরা কান পেতে রইলাম। আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। আশু আর ভাস্কর সাহস করে একবার বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল ধুৎ কোথায় পায়ের শব্দ। কেউ তো নেই।

উৎপল বলল, আমার বার বার মনে হচ্ছে, অজিতদা যেন ফিরে এসে লুকিয়ে

দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে।

ভাস্কর বলল, অত ভয় পাবার কিছু নেই। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, সব আজ বন্ধ থাকবে। তোরা ঘুমিয়ে পড়লেও আমি একলা আজ রাতটা জেগেই কাটিয়ে দেব।

উৎপল বলল, পুলিশ-ফুলিসে আমাদের খবর দেবার কোনো দরকার নেই। তারপরও যদি অজিতদা ধরা না পড়ে আর আমাদের ওপর রিভেঞ্জ নেয়?

ভাস্কর বলল, অত সোজা নয়। তাছাড়া আমরা তো চলেই যাব এখান থেকে। আর থাকতে ভালো লাগছে না।

আশু বলল, রাণুদির কী হবে?

উৎপল বলল, আজ কিন্তু খুব চমৎকার সামলে নিয়েছে।

ভাস্কর বলল, আর একটা কথা ভেবে দেখেছিস? মনে কর, কাল কোনো এক সময় অজিতদা যদি চুপিচুপি ফিরে এসে রাণুদিকে নিয়ে যেতে চায়? রাণুদি যদি রাজি হয়ে যায়? রাণুদিকে এমনভাবে জাদু করেছে যে রাণুদি বোধহয় এখনো রাজি হবে।

উৎপল বলল, লোকটার মেয়ে পটাবার ক্ষমতা আছে। একটা পাগল মেয়েকে পর্যন্ত...

ভাস্কর বলল, রাণুদিকে নিতে চাইলে কী হবে বল না?

আশু বলল, আমরা আটকাব। আমরা চার জনে মিলে ওকে বেঁধে ফেলতে পারব না?

উৎপল বলল, ওর কাছে রিভলবার আছে।

ভাস্কর বলল, আমাদেরও বন্দুক আছে। তোরা বিশ্বাস করছিস না, কিন্তু আমি সত্যিই বন্দুক চালাতে পারি। অন্তত ভয় দেখাতে তো পারব।

আশু বলল, নীলুটা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি রে?

উৎপল বলল, কী জানি সাড়া শব্দ তো পাচ্ছি না। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

ভাস্কর বলল, সেই যেদিন সারাদিন ছিল না অজিতদা, সন্ধের পর জসিডি থেকে ফিরল, সেদিন আমি লক্ষ করেছিলাম, ওর প্যান্টে চোরকাঁটা লেগে আছে। জসিডিতে গেলে প্যান্টে চোরকাঁটা ফুটবে কোথা থেকে! সেদিনও মিথ্যে কথা বলেছিল, নিশ্চয়ই ঐ সাধুটার কাছেই গিয়েছিল মাঠ ভেঙে।

আশু বলল, কেন, ঐ টেলিগ্রামের ব্যাপারটা? মধুপুরের যন্ত্র খারাপ, সেইজন্য জসিডিতে যেতে হয়েছে, এটাও তো গুল। পরদিন রাণুদির বাবাকে টেলিগ্রামটা তো আমিই সঞ্জয়কে নিয়ে সাইকেলে গিয়ে পাঠিয়ে এলাম মধুপুর থেকে। ওরা

বলল, কই না তো, আগের দিন তো যন্ত্র খারাপ ছিল না। আমি অবশ্য তখন ভেবেছিলাম, কোনো কারণে ওর জসিডি যাবার দরকার ছিল। রাণুদিকে ভোলাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছে।

ভাস্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রাণুদির এবার কি হবে বল তো?

সে কথার কেউ উত্তর দিল না।

একটু পরে ওরা তিন জনেই আমার দিকে ফিরে ব্যস্ত হয়ে বলল, এই নীলু, তুই কাঁদছিস কেন?

আমি কিছুতেই কোনো কথা বলতে পারলাম না, অকূল কান্না যেন আমায় ভাসিয়ে দিতে চাইছে। রাণুদির ওপর এতখানি অন্যায় সহ্য করা আমার পক্ষে যেন অসম্ভব। অথচ, আমি কীই বা করতে পারি!

পৃথিবীতে অনেক ডাকাত বদমাইশ আছে, আমি জানি। কিন্তু সত্যিকারের কিছু ভালো লোকও তো আছে। রাণুদির জন্য অজিতদা নামের লোকটি কি একটি খাঁটি ভালো লোক হতে পারত না? যে মানুষটির জন্য রাণুদি নিজের মনটাকে ফিরে পাচ্ছিলেন, সেই মানুষটার আসলে কোনো হৃদয় নেই। এ অন্যায, বিষম অন্যায়, অসহ্য অন্যায়।

ওরা কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

ভেবেছিলাম, সকালবেলা উঠে দেখব, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। অজিতদা চা খেতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে, রাণুদি ব্যাডমিন্টন খেলছেন...পুলিশ, রিভলবার, গুলি এ-সবই একটা দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু তা হলো না। পুলিশ অনবরত ঘোরাঘুরি করতে লাগল, আমাদেরও জেরা করল অনেকক্ষণ ধরে। অজিতদাকে ওরা এখনো ধরতে পারেনি, কিন্তু অজিতদা সম্পর্কে আরো খবর শুনতে লাগলাম নানা রকম।

পরের দু'দিন রাণুদি একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কাটালেন। ঠিক পাগলামি নয়, একটা যেন ঘোর লাগা ভাব। হাঁটছেন, কথা বলছেন, সবই ঠিক আছে, অথচ বোঝা যায় কিছুই ঠিক নেই। কখনো দাঁড়িয়ে থাকছেন একটা ফুল গাছের পাশে, কখনো কালী মূর্তির সামনে বসে গুনগুন করে গান গাইছেন আপন মনে।

একবার আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, তোমরা আর ব্যাডমিন্টন খেলছ না?

আমরা সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ খেলব। আপনি খেলবেন আমাদের সঙ্গে?

রাণুদি একটুক্ষণ যেন চিন্তা করে বললেন, না তোমরাই খেল. আমার ইচ্ছে করছে না।

রাণুদির কোনো কথাই অসংলগ্ন নয়। কিন্তু এক মিনিট দু'মিনিটের মধ্যে প্রসঙ্গ

বদলে ফেলছেন।

আমরা অজিতদার নাম রাণুদির সামনে একবারও উচ্চারণ করিনি। উনি নিজেই অন্তত দুবার জিজ্ঞেস করলেন ও ধরা পড়েছে? ওকে ওরা মেরে ফেলেছে?

অজিতদার কথা রাণুদি ভুলে যাননি বলেই, ওঁর স্বাভাবিক চেতনা রয়েছে। অথচ এটাও স্বাভাবিক নয়। খুব গভীর দুঃখ বোধ বা আঘাত পাবার কোনো চিহ্ন নেই ওঁর ব্যবহারে।

আমি সর্বক্ষণ রাণুদির কাছাকাছি রইলাম এই দু'দিন। কিন্তু আমি তো অজিতদা নই। আমি রাণুদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার মন্ত্র জানি না। রাণুদির চোখে আমি তো একটা বাচ্চা ছেলে, আমি আর ওঁর কতখানি সঙ্গী হবো?

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভাস্কর বলল, আর ভালো লাগছে না, চল আজই ফিরে যাই।

কেউই আপত্তি করল না। আমাদের এখানে স্ফূর্তি চলে গেছে। অজিতদার কোনো খবর নেই। পুলিশ মহল চুপচাপ। এদিকে সর্বক্ষণ রাণুদির কী হয়, কী হয় চিন্তা। রাণুদিকে দেখলে মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে উনি ভেঙে পড়বেন। এক এক সময় কথা বলতে বলতে রাণুদি দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে যান, মুখের রং রক্তবর্ণ হয়ে যায়, বোঝা যায় উনি প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন। রাণুদি কিছুতেই হার স্বীকার করতে চান না।

ওরা যেতে না চাইলেও আমাকে আজ-কালের মধ্যে একলা চলে যেতেই হতো। বাড়ি থেকে আবার চিঠি এসেছে। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিলাম তখনই। ট্রেন অবশ্য রাত্রিবেলা।

চা-টা খেয়ে আমরা গেলাম রাণুদিদের বাড়ি বিদায় নিতে। প্রথমেই দেখা হলো বড়োমামার সঙ্গে। তিনি আমাদের কথা শুনে খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, কলেজ-টলেজ খুলে যাচ্ছে বুঝি? আজ বাণুর বাবা আসছে, তোমরা ও-বেলা এসে একবার দেখা করে যেও অন্তত।

সঞ্জয় আর অভিজিৎ চেঁচামেচি করল খানিকটা। তারপর ঠিকানা দেওয়া নেওয়া হলো। ঝুমা বলল, এবার বাবার সঙ্গে আমিও ফিরে যাব। আমার আর একটুও পছন্দ হচ্ছে না এ জায়গাটা।

মুস্কিল হলো, রাণুদির কাছ থেকে কীভাবে বিদায় নেওয়া হবে? রাণুদি কথাটা কীভাবে গ্রহণ করবেন, তার তো ঠিক নেই। চারজনের মধ্যে আমার সঙ্গেই রাণুদির একটু বেশি ভাব বলে, ওরা বলল, নীলু, তুই-ই খবরটা জানিয়ে দে রাণুদিকে।

আমি তাতে রাজি নই। যদি আমাদের কথা শুনলে রাণুদি অন্যরকম হয়ে

যান? তার চেয়ে রাণুদিকে কিছু না বলে যাওয়া, বরং ভালো।

আমি ঠিক করলাম, রাণুদিকে একটা চিঠি লিখে সবাই মিলে সই করে সেটা রেখে যাব ঝুমার কাছে। রাণুদি কাল যদি আমাদের খোঁজ করেন, তখন সেটা দেখান হবে।

রাণুদির সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। রাণুদি বাগানে ঘুরছেন চঞ্চলভাবে। সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় চুপ করে কথা না বলে বসে থাকার অবস্থাটা এখন আর নেই। বরং ওঁকে যেন বেশ অস্থির বলে মনে হয়।

একবার আমাদের কাছে এসে হঠাৎ বললেন, তোমরা কিন্তু আমাকে সেই পাহাড়ের কাছে বেড়াতে নিয়ে গেলে না।

আমরা ঐ পাহাড়ের কথা শুনে চমকে উঠলাম। খুব সম্ভবত ওখানেই লুকিয়ে আছে অজিতদা। এখন ঐ পাহাড়ের কথা ভাবলেই ভয় করে।

—আজ যাবে? চলো না।

আমি আড়ষ্টভাবে বললাম, আজ!

রাণুদি বললেন, কেন, আজ তো বেশ ভালো দিন, বেশি রোদ্দুর নেই।

ভাস্কর বুদ্ধি করে বলল, ওখানে যাওয়া খুব মুস্কিল এখন। নদীর ওপর একটা সাঁকো ছিল, সেটা ভেঙে গেছে।

রাণুদি বললেন, কেউ কথা রাখে না।

পরমুহূর্তেই প্রসঙ্গ পাল্টে তিনি বললেন, কিছু কিছু ফুল দিনের বেলা ফোটে। আর কিছু ফুল ফোটে রাত্তিরবেলা, কেন এমন হয়?

তারপরই আবার বললেন, কিছু ফুল সূর্যকে ভালোবাসে, কিছু ফুল চাঁদকে। তাই না?

এসব কথা তো মোটেই পাগলামি নয়, বরং সুন্দর। শুধু একটু অপ্রাসঙ্গিক আর কথা বলার সময় রাণুদির চোখে একটা আলোর ঝিলিক দেয়।

সঞ্জয় গেটের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, নীলুদা, কয়েকটা লোক কী বলাবলি করতে করতে গেল জান? ওরা বলছে, অজিতদার বাড়ির সামনে নাকি একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ভোর থেকে।

আমি বললাম, তোমার সাইকেলটা নিয়ে এসো তো!

আশু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে?

আশু সাইকেলে একজনকে ক্যারি করেও খুব সহজে চালাতে পারে। সুতরাং ভাস্করের দিকে চোখের ইশারা করে আমরা দু'জনেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

একখানা নয়, দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অজিতদার সেই বাড়ির সামনে। বহু আদিবাসী ভিড় করে আছে সেখানে। এইসব নিরালা জায়গায় পুলিশের গাড়িও একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

বাইরে থেকেই আমরা দেখতে পেলাম হ্যাণ্ড-কাফ বাঁধা অজিতদা আর সেই সাধুটিকে। পুলিশ ওদের কাঁধ খিমচে ধরে ঘোরাচ্ছে। বোঝা গেল পুলিশ সার্চ করছে পুরো বাড়িটা আর বাগান। অজিতদার চুলগুলো রুক্ষ, জামাটা ছেঁড়া, চোখ দুটো লালচে। চেহারাটা একেবারেই যেন বদলে গেছে।

স্নাশু আর আমি চোখাচোখি করলাম। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কোনো লাভ নেই, খবরটা এক্ষুনি অন্যদের জানানো দরকার।

বড়োমামা তখন পুজোয় বসেছেন। আমরা ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মুহূর্তও দেরি করতে পারছি না যেন। খবরটা যদি কোনোক্রমে রাণুদির কানে যায়? তার আগেই কিছু একটা করা দরকার না।

মন্ত্র পড়া শেষ করে বড়োমামা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। এই প্রণাম সারতেও অনেকক্ষণ লাগে। ভাস্কর চটি খুলে কাছে এগিয়ে গিয়ে বড়োমামার কানে ফিসফিস করে খবরটা জানাল।

বড়োমামা মুখ তুলে ভাস্করের দিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেখতে দেখতে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গেল। তারপর চোখ মুছে ফিসফিস করে বললেন, নিয়তি! সবই নিয়তি!

ভাস্কর বলল, পুলিশ যদি ওকে নিয়ে এ বাড়িতে আসে?

বড়োমামা বললেন, তা আসবে বোধহয়।

ভাস্কর বলল, রাণুদিকে এখন বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

বড়োমামা বললেন, জোর করতে গেলে কোনো লাভ হবে কী? ও যদি নিজের ইচ্ছেতে যায়—

মাসিমা ব্যাপারটা শোনবার পর রাণুদিকে দু-একবার ডাকলেন। রাণুদি বাড়ির মধ্যে যাবেন না। তিনি এখন বাগানের প্রতিটি গাছের কাছে গিয়ে ফুলগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

কেউ কিছু ঠিকঠাক না করলেও আমরা সবাই এসে গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি। পুলিশের গাড়িগুলো এখান দিয়েই যাবে। আমরা তখন রাণুদির দৃষ্টি থেকে গাড়িগুলোকে আড়াল করে রাখব।

পুলিশের এমনই বুদ্ধি, গাড়ি দুটো ঠিক আমাদের গেটের কাছে এনেই দাঁড় করালো। সিংজী চেঁচিয়ে বলল, ও ডাক্তারবাবু, এবার শালে কো পাকড় লিয়া! কালীমাতা কি দয়া! একবার কালীমাইকে পরনাম করে যাই।

দারোগা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। আমাদের মুখে নীরব ব্যথা। এই খবরটা এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না বললে চলত না? প্রথম গাড়িটার মধ্যে বসে আছে অজিতদা, হাতকড়া বাঁধা, দু পাশে দুজন পুলিশ। অজিতদা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, কিন্তু স্থির দৃষ্টি। আমাদের চিনতে পারার কোনো চিহ্ন নেই।

চট করে পেছন ফিরে দেখলাম, রাণুদি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন এদিকে, যেন নিছক অলস কৌতূহলে।

একটা কিছু করা দরকার, এক্ষুনি একটা কিছু দরকার, আমরা সবাই ভাবলাম, কিন্তু কেউ কিছু করতে সাহস করলাম না। কেউ কি এখন জোর করে রাণুদিকে ফেরাতে পারে?

রাণুদি গেটের কাছে এসে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে এখানে?

তারপরই অজিতদার সঙ্গে রাণুদির চোখাচোখি হলো।

অজিতদা ঠিক আগেকার মতন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ, রাণু? এখন ভালো আছ?

রাণুদি বললেন, হ্যাঁ ভালো আছি। কেন ভালো থাকব না?

ব্যস শুধু এই দুটি কথা, আর কিছু না।

এরপরই রাণুদি পেছন ফিরে অহংকারের সঙ্গে চিবুকটা উঁচু করে রানীর মতন ভঙ্গিতে আবার হেঁটে যেতে লাগলেন। গর্বে বুক ফুলে উঠল আমার। রাণুদি অজিতদাকে মুখের মতন জবাব দিয়েছে। বদমাইশটা বুঝুক, ওকে বাদ দিয়েও রাণুদি ভালো থাকতে পারে।

রাণুদি বোধহয় এই মুহূর্তটার জন্যই ওর মনের শেষ জোরটুকু ধরে রেখেছিলেন। পুলিশের গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণুদি দৌড়তে লাগলেন, বাড়ির দিকেই। আমরাও সবাই ছুটে গেলাম রাণুদির পেছনে পেছনে।

প্রথমে মাসিমা আটকালেন রাণুদিকে। রাণুদি মায়ের হাত ধরে হাহাকার করে বললেন, মা, ও কে? ও কেন জিজ্ঞেস করল, আমি ভালো আছি কি না! ওকে তো আমি চিনি না।

তারপরই মাকে ছেড়ে রাণুদি চলে গেলেন কালী প্রতিমার সামনে। অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললেন, ও কে? মা, ও কে? আমি তো—

কথার মাঝখানে রাণুদি দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেলেন কালী ঠাকুরের পায়ের কাছে। ও রকম সোজাসুজি কোনো স্বাভাবিক মানুষ পড়তে পারে না। রাণুদির কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল...।

তারপর কতবছর কেটে গেছে।

রাণুদির সঙ্গে তারপর আর কখনো দেখা হয়নি। ইচ্ছে করলে দেখা করতে পারতাম, করিনি। ভাস্করের সঙ্গে এর পরও ঝুমার বছর দু-এক যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রে। অভিজিৎ এখন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে, দেখা হয়েছে কয়েকবার। রাণুদির খবর ওর কাছেই শুনেছি, রাণুদিকে বছরে প্রায় ছ-মাস রাখতে হয় নার্সিং হোমে। বাকি ছ-মাস কিছুটা ভালো অবস্থায় বাড়িতেই থাকেন। পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা আর কখনো আসে না। বাড়িতে থাকতে থাকতে যখন আবার বাড়াবাড়ি শুরু হয়, জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করেন, সেই সময় আবার নার্সিং হোমে দিতেই হয়।

রাণুদির চেহারা নিশ্চয়ই এখন অনেক বদলে গেছে। দেখলে চিনতে পারব কিনা সন্দেহ। না দেখাই ভালো।

বাইরে যাদের সঙ্গে আলাপ হয়, কত অন্তরঙ্গতা হয়, পরে কলকাতায় এসে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা আবার ফিকে হয়ে যায় আস্তে আস্তে। শুধু সতেরো বছরের সেই তীব্র বেদনাবোধ আমার এখনো যায়নি। আমার জীবনে আমি প্রথমে সত্যিকারের যে নারীকে ভালোবাসি, তিনি রাণুদি। যে ভালোবাসায় মানুষ একজনের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। আমার জীবন দিয়েও তো আমি রাণুদির কোনো উপকার করতে পারতাম না!

শুধু বেদনাবোধই নয়, আর একটি স্মৃতিও আমার মনে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। সেই যে একদিন দুপুরবেলা রাণুদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম ছোট নদীটার ধারে। স্বর্গের দেবীর মতন রাণুদি বসেছিলেন পাথরটার ওপরে, অনেকগুলি কদম ফুল আমি এনে দিয়েছিলাম রাণুদির কোলের পর। আমার নিজস্ব নদী, আমার নিজস্ব কদম গাছ, আমার নিজস্ব রাণুদি। সেদিনই রাণুদির সামনে বসে, রাণুদির রূপের পূজারী হয়ে আমি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছেছিলাম।

আমার সতেরো বছরের সেই বেদনা ও আনন্দে মেশা ছবিটি একটি সোনার ফ্রেমে বাঁধান রয়েছে। আমি মরে গেলেও সেই ছবিটি থেকে যাবে।